শংকর
অমনিবাস

শংকর

সাহিত্যতীর্থ
৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
পয়লা আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক
সাহিত্যতীর্থ
৮ ২ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট
কলকাতা ৬

দপ্তরীকার
ধর ব্রাদার্স
৯ রামমোহন রায় রোড
কলকতা ৯

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক
ন্যাশনাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি মদন মিত্র লেন
কলকাতা ৬

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যের
অতীত, বর্তমান ও
অনাগত পাঠক-পাঠিকাদের।

তোমাদের কোনো
তুলনা নেই, তোমাদের
ভালবাসার যোগ্য হওয়ার জন্যে
সাত জন্মের বিনিদ্র সাধনাও
তেমন কিছু নয়।

শংকর

শংকর-এর বই

বিশেষ রচনা

রসবতী ৬৫
বঙ্গ বসুন্ধরা ৭০
চরণ ছুঁয়ে যাই (১ম) ৭৫
চরণ ছুঁয়ে যাই (২য়) ৭৫
কত অজানারে ১২০
এই তো সেদিন ৫০
যোগবিয়োগ গুণ ভাগ ৩৫

ভ্রমণ সাহিত্য

এপার বাংলা ওপার বাংলা ৫৫
যেখানে যেমন ৫০
জানা দেশ অজানা কথা ৫০
মানবসাগর তীরে ৮০

ছোটদের বই

এক ব্যাগ শংকর ৩০
চিরকালের উপকথা ৩০
গল্প হলেও সত্যি ২০

কথাসাহিত্য

পাত্রপাত্রী ৪০
যাবার বেলায় ৫০
চেনা মুখ জানা মুখ ৪০
সপ্তরথী ৪০
এখানে ওখানে ৫০
মানচিত্র ৪০
সার্থক জনম ৪০
এক দুই তিন ৪০
যা বলো তাই বলো ৪০
এক যে ছিল ৩২

সংকলন

চলচ্চিত্রায়িত কাহিনীসংগ্রহ :
ছায়াছবি ১৫০

ভ্রমণ সমগ্র :
সপ্তসাগর পারে ১২৫

কিশোর রচনা সমগ্র ১০০

কোন পাতায় কি আছে

শংকর-এর আরও বই

ত্রয়ী উপন্যাস
স্বর্গ মর্ত পাতাল ৭০
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও
আশা-আকাঙ্ক্ষা)
জন্মভূমি ৫০
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ ও
বোধোদয়)
যুগল উপন্যাস
তনয়া ৬০
(সীমন্তসংবাদ ও নগরনন্দিনী)
তীরন্দাজ ৬০
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)
মনজঙ্গল ৬০
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

উপন্যাস
ত্রিভুবনেশ্বরী ৫০
চৌরঙ্গী ৮০
ঘরের মধ্যে ঘর ১৫০
অবসরিকা ৫০
লক্ষ্মীর সন্ধানে ৫০
সহসা ৪০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত ৫০
কামনা বাসনা ৪০
পটভূমি ৪০
বাংলার মেয়ে ৪০
সুখসাগর ৫০
দিবস ও যামিনী ৩০
যেতে যেতে যেতে ৪০
অনেকদূর ৩০
এবিসিডি ৫০
কাজ ৩৫
মুক্তির স্বাদ ৪০
মাথার ওপর ছাদ ৪০
একদিন হঠাৎ ৩৫
নবীনা ৩০
মানসম্মান ৪০
রূপতাপস ৩০
সোনার সংসার ৪০
জন-অরণ্য ৪০
মরুভূমি ৪০
আশা-আকাঙ্ক্ষা ৪০
সুবর্ণ সুযোগ ৪০
সম্রাট ও সুন্দরী ৫০
বিত্তবাসনা ২৫
বোধোদয় ৫০
নগর নন্দিনী ৪০
সীমন্তসংবাদ ৪০
স্থানীয় সংবাদ ২৫
সীমাবদ্ধ ৩৫
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৫০
পদ্মপাতায় জল ৫০

লেখকের নিবেদন

আমার আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার প্রিয় প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর দে কিছু উপহার দিতে আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলেন, আমি কি চাই? বহু জন্মদিন পেরিয়ে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে একজন সামান্য লেখকের হৃদয়ে কী এমন অপরিপূর্ণ পার্থিব বাসনা থাকতে পারে যা উপহার চাওয়া যায়? অনেক ভেবেচিন্তে সুধাংশুকে বললাম, আমার পাঠক-পাঠিকাদের কিছু দেওয়া মানেই তো আমাকে দেওয়া, কারণ সেই ১৯৫০ সাল থেকে তাঁদের দেওয়া ভালবাসাতেই আমার হৃদয়পাত্র পূর্ণ হয়ে রয়েছে; এই পরমপ্রাপ্তি ছাড়া অর্ধশতাব্দী ধরে বঙ্গসাহিত্যের আঙিনায় উপস্থিত থাকতে পারতাম না।

সুধাংশু মোটেই নিরুৎসাহ না-হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলো, জন্মদিনে বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের আমি কি উপহার দিতে চাই? একটু ভেবে বললাম, জীবন সংগ্রামের প্রথম পর্বে অনেক বই সংগ্রহ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সহজবোধ্য কারণে সেই বাসনা অচরিতার্থ থেকে গিয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমার এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যপ্রচেষ্টার কয়েকটি প্রিয় নমুনা একটি শোভন গ্রন্থাকারে এমনভাবে উপস্থাপিত হোক যা এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার প্রিয়জনদের সংগ্রহে পৌঁছে যেতে পারে একজন বাঙালি লেখকের জীবনসায়াহ্নের প্রীতি উপহার হিসেবে।

সেই অনুযায়ী এই সংগ্রহকার্যের শুরু। সঞ্চয়নকার্যে সাহায্য করলেন আমার বন্ধু শ্রীদিলীপ দে ও সুধাংশু নিজেই। আমার অতিপ্রিয় কিছু গল্প, কিছু রসসাহিত্য, কিছু রম্যরচনা, কিছু স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ এবং অবশ্যই একটি মনের-মতন উপন্যাস নিয়ে পাঁচশ পাতার এই উপহার-ডালি। উপন্যাস নির্বাচন করতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি'কেই এই সংকলনে স্থান দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই

উপন্যাসটা লিখতে পুরো একটা বছর সময় লাগলেও 'চৌরঙ্গী'র পরবর্তী পর্যায়ে আমি একটু আলাদা পথ ধরে একলা হাঁটবার সাধ মিটিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর দীর্ঘদিন ধরে অনেক মরমী পাঠক নিঃসঙ্গ এক পথিককে সাহিত্যের দুর্গম সরণি ধরে হাঁটতে দেখে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

শুনেছি, অনেক দেশে আজকাল প্রতি দশকে পাঠকদের প্রত্যাশা আমূল পাল্টে যায়। আমি যাঁদের চরণস্পর্শ করে এবং আশীর্বাদধন্য হয়ে সাহিত্যপথের যাত্রী হয়েছিলাম তাঁরা কিন্তু অন্য সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন—তাঁদের ধারণা ছিল সাহিত্যের অঙ্গনে গভীর মূল্যবোধের কোনো পরিবর্তন হয় না, সময় আজও রসস্রষ্টাকে স্পর্শদোষে অপমানিত করতে পারে না। আমার মতন একজন জনতা এক্সপ্রেসের যাত্রীর পক্ষে এই ধরনের সংরক্ষণ দাবি করা বাতুলতা মাত্র, কিন্তু যাঁদের আশীর্বাদতিলক কপালে ধারণ করে সেই কতদিন আগে সাহিত্যের পথে বের হয়েছিলাম তাঁরা বারবার ধ্রুবে বিশ্বাস রাখতে বলেছিলেন, তাঁদের উপদেশকে নিরর্থক মনে করার মতন কোনো কারণ আজও ঘটেনি।

সংকলন তো হল। কিন্তু পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ আকারের বইকে নামমাত্র মূল্যে পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থাপিত করার সমস্ত কৃতিত্ব সুধাংশুর। অসম্ভবকে কিভাবে সে সম্ভব করেছে তা জানতে চাইলে সুধাংশু বলেছে, "আপনার জন্মদিনে আপনার মনের মতন একটা উপহার দিতে পারলাম এইটাই বড় কথা। বেঁচে থাকার জন্য হিসেব নিকেশের প্রয়োজন আছে অবশ্যই, কিন্তু মাঝে-মাঝে হিসেবের শিকল না ছিঁড়লে সাহিত্যের সব সাধ পূর্ণ করা যায় না।"

অতএব শংকর অমনিবাস প্রকাশিত হল, যদিও আসলে এটি একটি 'মিনিবাস'। পাঠক-পাঠিকারা এই পাগলামোকে কি চোখে দেখলেন তা জানার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবা যাবে।

মধ্যরাতে স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত সুসংবাদ

নন্দনকাননে শ্রীভগবান তাঁর শ্রীদপ্তরে প্রভাতী ডিকটেশন শুরু করবার আগে তাঁর একান্ত সহায়িকাকে নির্দেশ দিলেন, "একবার ধর্মরাজকে ডেকে পাঠাও। ওঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

সহায়িকা তার দক্ষিণ হস্তের নেলপালিশ করা অনামিকাকে সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় করল। ইদানীং স্বর্গদপ্তরে সব কিছু হাইটেক। নখদর্পণ নামক একটি অতি আধুনিক যন্ত্রে হাইলেভেলের দেবদেবীদের পি এ-রা মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। নখাগ্র ওয়ান টু ফাইভ বিভিন্ন কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়, অসুবিধের মধ্যে খেয়ালের বশে অথবা অভ্যাসের দোষে নখ চেবানোর আর কোনও উপায় নেই স্বর্গের সহকারিণীদের।

পুরুষ সহকারী চিত্রগুপ্ত খবরটা নিয়ে নিল। যম এখনও তাঁর অফিসে কোনো মহিলা কর্মী নিতে চান না সহজবোধ্য কারণে—নরকে অনেক অপ্রিয় কাজকর্ম হয়, যা মেয়েদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। যম এই মুহূর্তে সিলেকশন বোর্ডে ব্যস্ত রয়েছেন, যাঁরা সম্প্রতি দেহরক্ষা করে পরলোকে এসেছেন তাঁদের কে কোন নরকে কতদিনের জন্য যাবেন তা এই সিলেকশন বোর্ডই ঠিক করেন। বলা বাহুল্য, ভীষণ ধরাধরি হয়, উৎকোচের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাই যমকে নিজেই সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হয়।

শ্রীভগবানের সহায়িকা আরও শুনল, নরকনিবাসীরা আজ কিছুক্ষণের জন্যে দপ্তরের সামনে বিক্ষোভও দেখাতে পারে। নরক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে। নরক নরকই, যার যা শাস্তি তাও মুখ বুজে ভোগ করতে হবে—কাউকে তপ্তকটাহে গরম তেলে ভাজা হবে, কাউকে বয়লারের গরম জলে সেদ্ধ করা হবে—সে বয়লার সরকারি না বেসরকারি তাতে কী এসে যায়?

চিত্রগুপ্ত এমনিতে ভীষণ কঠিনহৃদয়, যমদূতের মানসিকতা নিয়েই তিনি সমস্ত কাজকর্ম চালান, কিন্তু স্বর্গের অপ্সরাকন্যাদের ফোন পেলে খুব নরম হয়ে যান—এই কন্যারাই উঁচুতলার অনেক খবরাখবর রাখেন, যদি কখনও চিত্রগুপ্তের প্রমোশন ফাইলটা শ্রীভগবানের দপ্তরে যায় তখন এরা ভীষণ সাহায্য করতে পারে। মেয়েরা জানে, দীর্ঘ কর্মজীবনের সুবাদে চিত্রগুপ্ত ইদানীং ডেপুটি যম পদটিতে উন্নীত হবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। চিত্রগুপ্তই শ্রীভগবানের সহায়িকাকে বললেন, বেসরকারি হাতে চলে গেলে অনেক পাপীরই সর্বনাশ হবে! কারণ সরকারি নরকের তপ্তকড়াইতে প্রায়ই তেল থাকে না। বয়লারও টিউবলিকের ফলে অচল। ফলে এদের কাউকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতেই হয় না।

সহায়িকার নাম একান্তিকা, একটি জুনিয়র অপ্সরাকেও শ্রীভগবানের শ্রীদপ্তরে সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে। পোস্টিং-এর আগে সুতনুকা না কি নাম ছিল। শ্রীভগবানের দপ্তরে ওই ধরনের নামের কদর্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় ভেবেচিন্তে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে, অদ্বিতীয়া। যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর পি এ-র নাম অদ্বিতীয়া হওয়াই তো স্বাভাবিক। শ্রীভগবানের ভূমিকাটা সহজেই বোধগম্য হবে ত্রিভুবনে।

"একান্তিকা, প্রথমে দুটো সুভাষিত লিখে নাও।" মানসদর্পণে শুভাকাঙ্ক্ষীরা খবর পাঠিয়েছে, হাজার হাজার বছর আগে শ্রীভগবানের যেসব উক্তি বেদ বেদান্ত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ মাধ্যমে ইস্যু করা হয়েছিল তা বস্তাপচা হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, আধুনিক পদ্ধতিতে 'আজকের সুভাষিত' বলে প্রত্যেকদিন একটি বাণী নিয়মিত প্রচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীভগবান যমের কাছে দু'-একটা সাজেশন চেয়েছিলেন, কিন্তু লোকটার চিন্তাধারা নেতিবাচক এবং নিতান্তই কাঠখোট্টা! যম সাজেশন দিয়েছিলেন : 'যমের বাড়ি যদি না যেতে চাও তা হলে শ্রীভগবানের কথা শোনো।'

শ্রীভগবান অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন, গড্ তাঁর সুসমাচারগুলি অনেক ভালভাবে লিখিয়েছেন। এবার শ্রীভগবান বললেন, "লিখে নাও—'নিশিদিন ভরসা রাখিস, হবেই হবে', ইচ্ছে করেই একটু রবিঠাকুরী গন্ধ দিচ্ছি ভদ্রলোকদের নজরে পড়বার জন্যে।"

পরের বাণীটাও শ্রীমুখ থেকে নির্গত হল : 'আমিই তুমি! সুতরাং ভয় কী?' এর উক্তির পর কিন্তু শ্রীভগবানের উল্লেখ থাকছে না, কিন্তু এমনভাবে লেখা হচ্ছে যে লোকে বুঝে নেবে স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া এ-ধরনের কথা আর কেউ বলতে পারেন না, এই হেঁয়ালির স্টাইলে ফল ভাল হয়, কথাটা মনে থাকে।

পরের বিষয়টি একান্তিকা মনে করিয়ে দিল। প্রশ্নোত্তর পর্ব। নরলোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ কত রকমের প্রশ্ন করে। এতদিন যমের বক্তব্য ছিল, যুগযুগান্ত ধরে বেয়াড়া মানুষের যত রকম প্রশ্ন হতে পারে সব উত্তর দেবতারা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন।

যমের কথায় কান দেননি শ্রীভগবান, তাঁর কাছে স্বয়ং গণপতি গণেশ যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে স্পষ্ট যে, অসহায় মানুষ বহু প্রশ্নের উত্তব খুঁজে না পেয়ে পথহারা হয়ে পড়ে। গডের ভক্তরা চার্চে গিয়ে প্রতি সপ্তাহে যে সাহায্য পায় মন্দিরে সেইরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। এর পরেই ব্যবস্থা হয়েছে, মানসদর্পণ মারফত একান্তিকা কিছু কিছু প্রশ্নের নমুনা সংগ্রহ করবে এবং শ্রীভগবান নিজেই তার উত্তর দিয়ে দেবেন, কারণ শাস্ত্রসমুদ্র থেকে উত্তর-উদ্ধার সমুদ্রমন্থন থেকেও কঠিন হয়ে উঠেছে।

একান্তিকা বলল, "একটি ছোট্ট ছেলে জানতে চায়, বাবা ও মা একসঙ্গে সামনে উপস্থিত হলে কাকে প্রথম প্রণাম করতে হয়?"

"খুব সহজ প্রশ্ন একান্তিকা। ইতিপূর্বে গণেশ ওই সমস্যায় পড়েছিল, আগে মাকে প্রণাম করায় তার বাবা চটিতং শিব প্রলয়কাণ্ড বাধাবার তালে ছিলেন। আমিই বললাম, পিতাকে মহাগুরু বলা হয়, কিন্তু পিতা অপেক্ষা মাতা অধিকগুরু।"

"তার মানে মায়ের ওপরে কেউ নেই!"

"আছে আছে একান্তিকা। শ্রীভগবানের কাজটা অত সহজ নয়, অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত দিতে হয়, কারণ এটাই ত্রিলোকের উচ্চতম ন্যায়ালয়। লিখে নাও—মন্ত্রদাতা এবং জ্ঞানদাতা অবশ্যই পিতামাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

"বালকটির সেকেন্ড প্রশ্ন, শ্রেষ্ঠ মিত্র কে?"

একান্তিকার প্রশ্নে মৃদু হাসলেন শ্রীভগবান। বললেন, "শুনেছি,

ধর্মপ্রচারকরা বলে বেড়ায় ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এটা কিন্তু ঠিক নয়। অনেকদিন আগেই রুলিং দিয়েছি—ভার্যাসদৃশ মিত্র নেই, পুত্রের তুল্য প্রিয় নেই, মাতার ন্যায় গুরু নেই, ভ্রাতার মতন বন্ধু নেই এবং জামাতার ন্যায় দানপাত্র নেই।"

উত্তরটা লিখে নিতে নিতে একান্তিকা মুখ টিপে হাসল এবং বলল, "স্যর, এই উত্তরটা খুব পপুলার হবে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছেলেমেয়েরাও মজা পাবে।"

আরও একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। একজন সরকারি অফিসার জানতে চেয়েছেন, "যম কি সত্যিই একজন দেবতা? সবসময় যমের দক্ষিণদ্বারের কথা বলা হয় কেন?"

শ্রীভগবানের মুখে আবার মৃদু হাসি। "ঋক্‌বেদে ওই গোলমালটা হয়েছে। অন্তত পঞ্চাশবার যমের উল্লেখ হলেও, উনি যে দেবতা তা একবারও বলা হয়নি। আসলে যম প্রোমোটেড দেবতা, পুরাণে তা নোটিফায়েড হয়েছিল। কলকাতার রাজভবনের মতন নরকে চারটে গেট আছে। পূর্বদ্বারে সুন্দরী অপ্সরারা দেবতা এবং ঋষিদের রিসিভ করে। উত্তর দ্বারটি কোটিপতিদের জন্যে সংরক্ষিত। নিজের ভক্তদের জন্যে গণেশের বাবা শিব পশ্চিম দ্বারটি রিজার্ভ রেখেছেন। যা কিছু ভিড় এবং আতঙ্ক সব ওই সাউথ গেটে।"

নোট নিয়ে নিজের আসনে পৌঁছনো মাত্রই শ্রীদপ্তরে যমের প্রবেশ। "হ্যালো একান্তিকা! কেমন আছ? রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?"

বেঢপ মোটা হয়ে গেলে শ্রীদপ্তরে থাকা যায় না! এটা যম ভাল করেই জানেন। সুতরাং শখ করে কেউ এখানে স্লিমিং করে না!

যমের সঙ্গে দুটি কুকুর। একান্তিকা বলল, "ধর্মরাজ প্লিজ, শ্যাম ও শবলকে বাইরে বেঁধে রেখে আসুন। কিছু মনে করবেন না, আপনার বাহন মোষটি গতবারে শ্রীদপ্তরের লনের সমস্ত সবুজ ঘাস খেয়ে ফেলেছিল।"

একগাল হেসে যম বললেন, "এবিষয়ে তোমার নোট সেবারেই পেয়েছিলাম। এবার ওকে আনিইনি। এইটুকু তো রাস্তা, যমালয়ের রিকশয় চড়ে চলে এসেছি! কলকাতার কয়েকটা বড়লোক শেঠজীকে আমার রিকশ ডিউটিতে রেখেছি।"

কেন উড়ম্বর? অন্য শহরে পাপী বড়লোক নেই?"

"আছে, কিন্তু কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও তো কেউ হাতে টানা রিকশ দেখেনি, ফলে ওদের ট্রেনিং দিতে দিতেই ছ' মাস কেটে যাবে। ব্যয়সঙ্কুলকের জন্য আমার ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টও উঠে গিয়েছে, গুজব শুনছি সব বিভাগ বেসরকারি মালিকানায় চলে যাবে।"

শ্রীভগবানের কক্ষে নতমস্তকে প্রবেশ করে মহাবাহু সুভৈরব করজোড়ে নমস্কার করলেন পরম শক্তিময়কে।

শ্রীভগবান : "কবে ফিরলে? কী দেখলে? হাওয়া কোন দিকে?"

বিনয়াবনত যম মস্তক আরও নত অবস্থায় নিবেদন করলেন, "আপনি জানতে চেয়েছিলেন, এখনকার মানুষ আপনার ওপর কতটা নির্ভরশীল? কেন, মাত্র একটা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে ভগবানকে ভয় করার কথা স্বীকার করে?"

"তা, কেমন দেখলে অবস্থা?"

বারবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যম ফিসফিস করে জানালেন, "সর্বনাশা ব্যাপারটা হল, আজকাল কেউ ভগবানকে ভয় পায় বলে মনে হল না।"

"তা হলে আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই ঠিক! এত দেবদেবী, এত শাস্ত্র, এত বিধিব্যবস্থা, তবু শ্রীভগবানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়!"

"আমি স্যর মর্তে অনেকগুলো 'ভেক্‌ল্‌' পাঠিয়ে দিয়েছি, বেশ কিছু পাপীকে বিনা ওয়ারেন্টে তুলে আনবে মধ্যরাতে, কয়েকজনকে দিনকয়েক রামধোলাই দিলেই ফল পাওয়া যাবে।"

"সব সময়ে মধ্য রাতে গেরস্তর বাড়িতে যাওয়া কেন, হে মহিষধ্বজ?"

"ওটা ওই কায়দাটা স্যর, ইদানীং আমরা মর্ত পুলিশ থেকে শিখেছি, অপারেশনের খুব সুবিধে হয়, পার্টিকেও হকচকিয়ে দেওয়া যায়, যমদূতেরাও তাদের ওয়াইফদের কর্মবীর হিসেবে ইমপ্রেস করতে পারে।"

শ্রীভগবানকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখে মহিষধ্বজ ভুল বুঝলেন। "আপনি চাইলে, মধ্যরাতের রেইড ডবল এমনকি ট্রিপল করতে পারি, যদিও আমার ভেক্‌ল্‌গুলোর অর্ধেক স্পেয়ারপার্টসের অভাবে খারাপ

হয়ে পড়ে আছে।”

শ্রীভগবান নিরুত্তর। যম আবার ভুল করলেন। তাঁর আন্দাজ, আরও কঠোর স্টেপ নিতে চান শ্রীভগবান। “মর্ত পুলিশের মস্ত একটা সুবিধে আছে স্যর, ওরা যাকে খুশি ‘এনকাউন্টারে’ পিছন থেকে গুলি করতে পারে। তারপর মড়ার হাতে একটা রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে খবরের কাগজে ছবি ছাপাতে পারে। আমার তো ওই সুবিধে একেবারেই নেই, আমার মড়া নিয়ে কারবার। না মরা পর্যন্ত আমি কারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারি না, সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন, শ্রীভগবান।”

শ্রীভগবান : “তুমি থামো যম! যে দেশে পাঁচ বছর অন্তর ভোটে দেবতা পালটায় সেখানকার স্থানীয় যমদূতরা যা-খুশি করতে পারে। কিন্তু আমি তো চিরকালের, আমি শুধু যমের প্রভু নই, আমি প্রেমের ভগবান, ভক্তির ভগবান, ভালবাসার ভগবান, বিশ্বাসের ভগবানও বটে। আমি জানতে চাই, কী করে আমি প্রত্যেক জীবের হৃদয়সিংহাসনে ফিরে আসতে পারি। আমার বেশ অসহায় অবস্থা। আমাকে ভোটেও সরানো যায় না, আমি ইস্তফাও দিতে পারি না, বুঝেছ কৃতান্ত!”

“আমি কি তা হলে স্যর মধ্যরাতের অভিসার বন্ধ রাখব?”

যমের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বললেন, “সৃষ্টিটা এমনভাবে হয়েছে যে কারও বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে না।”

“পরে কথা হবে,” এই বলে ধর্মরাজকে বিদায় দিয়ে, শ্রীভগবান পঞ্চেন্দ্রিয় যন্ত্রে গণপতি গণেশের সঙ্গে একান্ত কথা বললেন। জানতে চাইলেন, “যম কি সৃষ্টির আদি থেকেই এই পোস্টে রয়েছেন?”

গণেশ জানালেন, “মোটেই নয়, ঋক্‌বেদ খুললেই দেখতে পাবেন আদিতে তিনি স্রেফ পিতৃলোকের চার্জে ছিলেন, নরকের অধিকর্তা হলেন পৌরাণিক সময়ে। ওঁর ফিজিক্যাল ফিটনেসও সন্দেহজনক, পায়ে মস্ত একটা ক্ষত রয়েছে, কে যেন অভিশাপ দিয়েছিলেন। খোঁড়ানো দোষ ঢাকতে যম বশংবদ একবার তুর (অর্থাৎ দ্রুত গমনশীল) নাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু চিত্রগুপ্ত ছাড়া কেউ এই নাম ব্যবহার করে না!”

অন্য একটা লাইনে চিত্রগুপ্তও ভিতরের খবর নেবার জন্যে বেজায়

আগ্রহী। "হ্যালো একান্তিকা, আমার প্রমোশন কেসটা নিয়ে আলোচনা কিছু হল? খুব গুজব গণেশের ডেপুটি ভগবান এবং আমার ডেপুটি যম দুটো ফাইলই শ্রীভগবানের কাছে পুট আপ করেছ তুমি। শোনো ভাই একান্তিকা, যদি সিলেকশন কমিটি হয় তা হলে শিবকে রেখো, কয়েক ডজন গাঁজাখোর, আফিমখোর, মোদো মাতালকে ওঁর ইঙ্গিতে আমি যমের দক্ষিণদ্বার থেকে সরিয়ে নিয়ে ওয়েস্ট গেটে পাঠিয়ে দিয়েছি। শোনো, তোমার যদি ওইরকম কোনও কেস থাকে বোলো, লজ্জা কোরো না।"

সাবধান হয়ে গেল একান্তিকা। "মর্তের কাউকে আমি চিনি না, ওখানে আমি কখনও যাইনি!"

"সে কি! এত বড় পোস্টে থেকে কখনও মর্ত ভিজিট করনি শুনলে আমার বদনাম হবে। চলো একদিন আমাদের সঙ্গে।"

"সে তো মিডনাইটে, মিস্টাব গুপ্ত!"

"তা বটে! মেয়েদের বদনাম হয়ে যেতে পারে! আমি ভাবছিলাম, যেদিন কোনও স্পেশাল গেস্ট থাকবে সেদিন স্পেশাল রথটা বার করব, খুব কম হলেও মাঝে মাঝে আমরা ভিআইপি ওয়েলকামও করি। এক সময়ে যম পুণ্যকর্মের পুরস্কারবিধাতাও ছিলেন, বুঝেছ একান্তিকা। ওই ডিপার্টমেন্ট এখনও আছে কিন্তু কোনো কাজকর্ম হয় না।"

পরের দিন শ্রীভগবান একটু সকাল-সকাল শ্রীদপ্তরে এসে পৌঁছলেন। একান্তিকাকে বললেন, "একটু উষ্ণ কমলরসের ব্যবস্থা রেখো।"

কমল রস মানে চা। একান্তিকা বুঝছে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, ভিআইপি-রা আসবেন।

আজকের সুভাষিত ডিকটেট করলেন শ্রীভগবান। "আমিই পরমবন্ধু, আমিই পিতামাতা, আমিই পিতামহ। আমিই গুরু, আমিই একমাত্র সত্য, আমিই পরমাগতি।"

"কীরকম মনে হচ্ছে?" একান্তিকাকে জিজ্ঞেস করলেন শ্রীভগবান।

"একটু বেশি পাবলিসিটি মনে হচ্ছে, স্যর!"

একমত হলেন শ্রীভগবান। "বেশি চাপ দিলে কোনও জীব আজকাল

ভগবানকেও বিশ্বাস করে না, অমন যে অমন পাতিলেবু সেও বেশি কচলালে তিক্তরস সরবরাহ করে।'

ভাবছেন শ্রীভগবান। "গড্ কী করে দিনের পর দিন আলাদা আলাদা সুসমাচার দেন?"

"ওসব ফাদাররা খেটেখুটে লেখেন। আপনার পুরুতরা তো পুরোহিতদর্পণের মন্ত্রের বাইরে যাবেন না।"

শ্রীভগবান বললেন, "ওদের দোষ নেই। যে রকম বলা হয়েছে, সেরকম করে যাচ্ছে। পুরোহিতকে কোনও চিন্তার স্বাধীনতা তো আমরা দিইনি।"

এবার প্রশ্নোত্তরিকা অথবা কুইজ। মানসদর্পণ মারফত একজন জানতে চেয়েছে, কারা কারা মাতৃস্থানীয়া?

শ্রীভগবান বললেন, "বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলেছি, কে কে মাতা। জননী, গুরুপত্নী, বউদি, শাশুড়ি, দিদি, জেঠিমা, কাকিমা, মাসি, মামি এবং পিসি এঁরা সকলেই মা।"

"কারা কন্যাসমা?"

শ্রীভগবান বললেন, "লিখে নাও—কন্যা, ছোটবোন, পুত্রবধূ, ভাইঝি, ভাগ্নী, ছোটভাইয়ের বউ, শিষ্যা, পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী ও শরণাপন্না নারী। এইসব কন্যাদের শাসন করতে হবে স্নেহ দিয়ে।"

একটু ভেবে শ্রীভগবান বললেন, "ইংরিজি মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের চ্যালেঞ্জ করো, ইংরিজি ভাষায় মায়ের একুশটা নাম ওদের জানা নেই—মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দোষা, সর্বদুঃখহা, পরমারাধ্যা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া ও দুঃখহন্ত্রী।"

"অর্ডিনারি মায়েদেরও এত দিক?" একটু অবাক হয়েই জানতে চাইছে একান্তিকা।

"কোনও মা-ই অর্ডিনারি নয়, একান্তিকা! আমার দুঃখ আমার মা নেই, আমি স্বয়ম্ভু!"

ভি আই পি-রা আসছেন না। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, স্থিতিকর্তা বিষ্ণু ও প্রলয়কর্তা শিবকে একই সঙ্গে শ্রীভগবান চায়ে নেমন্তন্ন করেছিলেন। লিখিত এজেন্ডা পাঠিয়েছিলেন : আলোচনার বিষয়—কেন মর্তবাসীরা

আমাদের সম্পর্কে আস্থা হারাচ্ছে?"

এঁরা জানিয়েছেন, লিখিত নোট যৌথভাবে পাঠাচ্ছেন দূত মারফত, মিটিং-এ আসা এখনই সম্ভব হচ্ছে না, বিভিন্ন জায়গায় পূজাপার্বণ উপলক্ষে সবারই আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।

"হ্যালো গজানন! তুমি কেমন আছ? একটু ফ্রি আছ নাকি?"

শ্রীভগবানকে সুপ্রভাত জানালেন শ্রীগণেশ। "ভগবান, ভালই হল আপনি পঞ্চেন্দ্রিয় যন্ত্র মারফৎ যোগাযোগ করলেন। এইমাত্র আমার সেক্রেটারি মিস্ লেখিকা একটা সীল করা খাম নিয়ে এল, প্রেরকদের নির্দেশ অনুযায়ী আপনার শ্রীহস্তে আমাকেই তা অর্পণ করতে হবে।"

সেক্রেটারিকে ডাকলেন শ্রীভগবান। "ধনেশ্বর আসছে, ওর জন্যে গোটা চারেক জাম্বো সাইজের লড্ডুক রেডি রাখো।"

"ধনেশ্বর!" লোকটি কে বুঝতে পারছে না একান্তিকা।

"গণেশ গো গণেশ! এক হাজার একটা নামের মধ্যে অন্তত গোটাপঞ্চাশেক নাম সব সময় মনে রাখবে—কমবয়সী দেবতা, একটু সেন্টিমেন্টাল আছে। বড় অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে মুণ্ডুটা হারিয়েছিল, অল্পেই অভিমান করে। ওর ফেভারিট নামগুলো লিখে রাখবে—গণনাথ, হেরম্ব, বিঘ্নরাজ, অতিমনা, আনন্দানন্দ, অজয়, ধনেশ্বর, এটসেটরা।"

"এটসেটরা নামটা তো খুব সুন্দর।"

"আঃ, ওটা নাম নয়, গড্ ওই শব্দটা খুব ভালবাসেন, সব তালিকার শেষে লাগিয়ে দেন, যার অর্থ 'ইত্যাদি'!"

লড্ডুক রেডি জেনে খুশি হলেন শ্রীভগবান। "যে যেটা খেতে চায় তা সময়মতো জোগাতে পারলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়, একান্তিকা। যদি কিছু পুরনো কাগজপত্তর থাকে রেডি করে রেখো, গণেশের ইঁদুরটা আজকাল সারাক্ষণ দাঁতে কাগজ কুচিয়ে যাচ্ছে, গণেশ বলছিল।"

একান্তিকার হাতে নোটবই রয়েছে। শ্রীভগবান বললেন, "মর্তের আর একটা প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দেবে নাকি? যমের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একজন সদ্য পিতৃহারা বালক জানতে চেয়েছে কীভাবে মরণ আসে। দুঃখ করেছে, যমের সব কিছু সিক্রেট, কিছুই পরিষ্কার করে জানবার উপায় নেই। অথচ যম আমাকে বলে, লোককে যমালয়ে টেনে আনাটাই তার উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য লোকে যাতে যমযন্ত্রণা এড়াতে

পারে এমন জীবনযাপন করুক।" শ্রীভগবান কিছুই বুঝতে পারছেন না, মর্তের দিকে আরও বেশি নজর দিতে হবে তাঁকেই।

এরপর শ্রীভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হল বাণী যা সবারই আগাম জানবার অধিকার রয়েছে। "কাম থেকে শরীরের উৎপত্তি। তারপর অধর্ম থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে আশা, আশা থেকে ব্যামোহ, ব্যামোহ থেকে লোভ, লোভ থেকে চিন্তা, চিন্তা থেকে জরা, জরা থেকে ব্যাধি এবং ব্যাধি থেকে মরণ।"

একান্তিকা বলল, "ব্যামো কথাটা অনেকবার শুনেছি, আমার ধারণা ছিল ওর মানে রোগ।"

শ্রীভগবান বললেন, "গাঁয়ের লোকরা জেনেশুনেই ব্যামো বলে—ব্যামোহ মানে চিত্তবিভ্রম!"

"এসো, এসো গণেশ। তোমার ওয়েট দেখছি বেশ কমে গিয়েছে, স্বর্গ হেলথ ক্লাবে নিয়মিত যাচ্ছ নাকি?"

"মায়ের নির্দেশ, সামনেই দুর্গাপুজো। আমাকে ওখানে লম্বোদর বলে, তাতে মা খুব কষ্ট পান। আর বাবা একদিন বললেন, ওজন কমাও, কিন্তু ভুঁড়ি কমিও না, যে সাপটা তোমার বেল্টের কাজ করছে তাকে বেশি টাইট করলে কষ্ট পাবে, রেগে কামড়ে না দেয়! মা তো তাই শুনে বলছেন, এবার মর্তে গিয়ে সাপের বিষদাঁত তুলিয়ে দেবেন, কলকাতার কাছে একটা লোক আছে, সে এই বিষের ব্যবসা করে।"

লড্ডুক একটির বেশি খাবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গণেশ। এর পর সুদৃশ্য পটে ধূমায়িত কমলরস এসে গেল। গণেশ বললেন, "এই জিনিসটা নন্দনকাননেও তৈরি করা গেল না। আমার মামার বাড়ি হিমালয়েই ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ কমলরস। একজন টি গার্ডেনের মালিককে স্বর্গের এইচ-আই-বি ভিসা দিলেই সমস্যাটা মিটে যেত, কিন্তু যম কিছুতেই রাজি নয়।"

"যমের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন—ও তো প্যারালাল একটা গভর্নমেন্ট, সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে।" এই বলে শ্রীভগবান তাঁর চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, গণেশ। মর্তে ক্রমশই আমরা সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমি

ভেবেছিলাম, লোকের ছেলেপুলে কম হচ্ছে। তারপর দেখছি, সবাই ভক্ত সংখ্যা বাড়াচ্ছে, কেবল আমি কমছি। আসলে ওখানে কেউ আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারেছ্ না, শ্রীভগবানের ওপর বিশ্বাস কোথায় ক্রমশ বাড়বে, না কমছে।"

"আপনি বর্ধমানের নাম ক্রমবর্ধমান করে দিন। মেদিনীপুর কথাটার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে দিই—জলরাশি দ্বারা ক্লেদিত পৃথিবীকে মধু-কৈটভের মেদ দিয়ে দৃঢ় করেছিলাম, তাই পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী।"

"মেদিনীপুর দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, গণেশ। পর পর পাঁচটা ম্যাজিসট্রেট খুন হওয়ার পরেও সায়েবরা এই নিষ্ঠুর কাজটা করেনি।"

এর পর শ্রীভগবানের নিবেদন : "বিলেপন লাগিয়ে, নামটাম পাল্টে মর্তের মনোজয় আর সম্ভব নয় বলেই আমার আশঙ্কা। আমি জানতে চাই, কোথায় কীসের অসন্তোষ? কোথায় প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না? আমি দেখলাম, তিনজন শক্তিশালী দেবতাকে যৌথভাবে অনাদিকাল থেকে এই দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে, সেই জন্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে লিখিতভাবে নোট পাঠিয়েছিলাম। সমস্ত সৃষ্টি তাঁদের কথায় ওঠে বসে, মর্ত তো ওঁদের নস্যি মাত্র। ওঁরা তো সব কিছুর লাস্ট ওয়ার্ড, যখন ইচ্ছে তখন সৃষ্টি করবার, মেরামতি করার এবং ধ্বংস করার আগাম ঢালাও অনুমতি তো রয়েছে, তবু এই অবস্থা কেন?"

"এই নিন সিল করা খাম।"

তাড়াতাড়ি সিল ভেঙে নোটটা পড়ে ফেললেন শ্রীভগবান। "আমি তিন জনকে আলাদা আলাদা চিঠি পাঠালাম, আর উত্তর এল যৌথভাবে, তিনজনেই সই করেছেন। ড্রাফটিং-এর স্টাইল দেখে মনে হচ্ছে বিষ্ণুর রচনা, কিন্তু তোমার বাবা কীভাবে সই করলেন!"

সোজাসাপটা উত্তর : "সৌজন্যবশত আমরা তিনজন সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা এবং সংহারকর্তা। প্রকৃত সত্যটি হল, সৃষ্টি কর্তৃত্ব, স্থিতি কর্তৃত্ব এবং সংহার কর্তৃত্ব শক্তিদ্বারা সম্পাদিত, আমরা কেবল নামকাওয়াস্তে!" পর পর তিনটে সই দেখে কিছুক্ষণের জন্যে বাক্যরহিত হয়ে পড়লেন শ্রীভগবান।

এই তিন মহাশক্তিমান দেব কী বলতে চাইছেন? গণেশ ভেবেচিন্তে ব্যাখ্যা করলেন, "তুলনাটা হল যেমন মোটরগাড়ি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু

পেট্রোল ছাড়া অচল। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিনটি মস্ত যন্ত্র। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে যন্ত্র নড়ে না।"

অভিযোগটা মারাত্মক। শ্রীভগবানকে ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখতে হবে। শ্রীগণেশ বললেন, "মর্তে সিনিয়র মিনিস্টারদের একই অবস্থা হয়। বিরাট বিরাট দপ্তর, বিশাল সব কর্মসূচি, কিন্তু অর্থমন্ত্রী অর্থ সরবরাহ না করলে ইঞ্জিন নট নড়নচড়ন।"

"তুমি বলছ, যে-ব্যবস্থায় অর্থই শক্তির উৎস, সেখানে অর্থমন্ত্রীই অন্য সব মন্ত্রীর মন্ত্রী!"

"আমি কিছু বলছি না, শ্রীভগবান। এঁরা বলছেন।" শ্রীভগবান গণেশের অবস্থা বুঝছেন, বেচারির এগোলেও মুশকিল, পেছলেও মুশকিল!

গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন শ্রীভগবান। ত্রিভুবনেশ্বরকে গণেশ বললেন, "অর্থ মন্ত্রকের উপমাটা যদি ভাল না লাগে, তা হলে মর্তে অনেক পদাধিকারী দুঃখ করে বলে, ঘরসংসার তোমার চাবিকাঠিটি আমার।"

শ্রীভগবান বললেন, "মহাশক্তিরূপিণী দুর্গার ওপরেই সমস্ত সৃষ্টি নির্ভর করছে, এইটাই তা হলে সত্য।"

শ্রীভগবান মনস্থ করে ফেললেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় যন্ত্রে কথা বলে নেবেন। একবার ভাবলেন টেলিকনফারেন্সিং করবেন ; শ্রীগণেশ পরামর্শ দিলেন, আলাদা আলাদা কথা বলুন।

পঞ্চেন্দ্রিয় যন্ত্রে শ্রীভগবান ধরলেন ব্রহ্মাকে। "হে চতুর্মুখ, হংসবাহন, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, আপনি দেবাদিদেব, সমগ্র সৃষ্টি আপনার মুখাপেক্ষী!"

সৌজন্য বিনিময়ের পরে, ব্রহ্মা যে খুব সন্তুষ্ট নন তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তিনি সবিনয়ে মনে করিয়ে দিলেন, ছবিতে তিনি চতুর্মুখ হলেও আসলে পঞ্চমুখ। এই পঞ্চম মুখটি ঊর্ধ্বভাগে। "আমি নাকি সৃষ্টিকর্তা বলে অহংকারী হয়ে উঠেছিলাম, আমার পঞ্চম মুখের তেজে কয়েকজন দেবতা এমনই নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছিলেন, যে রুদ্র অট্টহাস্য করে অঙ্গুষ্ঠ নখে আমার মুণ্ডটি ছিঁড়ে দেন। কিন্তু শ্রীভগবান, আপনি নিশ্চয় জানেন, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আমার মুখটি লাগিয়ে দিতে আমার কতটুকু সময়

লাগে?"

ক্ষমাভিক্ষা করলেন শ্রীভগবান। "আপনারা তিনজনই সৃষ্টির সব কিছু, আমি তো নিমিত্ত মাত্র!"

ব্রহ্মা : "ত্রয়ী বলে প্রকৃত অর্থে কিছু আছে কী? একদল বৈষ্ণব বলে বেড়াচ্ছে, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে আমার উৎপত্তি, অথচ আপনি জানেন, আমি অনেক আগে থেকেই ছিলাম। আমাদের মধ্যে কে বড়, সেই নিয়ে সেবার ঝগড়া হল। শেষে বিষ্ণু আমার উদরের মধ্যে প্রবেশ করে ত্রিলোক দর্শন করলেন। আমিও বসে থাকার পাত্র নই, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর উদরের মধ্যে প্রবেশ করে অনন্তলোক দর্শন করলাম। অসন্তুষ্ট বিষ্ণু তখন দেহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ওঁর নাভিপদ্ম দিয়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার গতি ছিল না!"

বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন শ্রীভগবান। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, সবাই মহাশক্তিমান, কিন্তু একজন চিফ অফ স্টাফ প্রয়োজন। দরকার হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ব্রহ্মা যে পঞ্চম মুখটিতে কটুকথা বলেন সেইটাই ব্যবহার করছেন। "আপনি ওঁদের পরামর্শ নিন, যদি মর্তে কিছু সমস্যা হয়ে থাকে। আমি কনস্ট্রাকশন লাইনের লোক, বাড়ি তৈরি করে চাবিকাঠি বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছি।"

অগত্যা পঞ্চেন্দ্রিয় যন্ত্রে দ্বিতীয় টেলিফোন! শ্রীভগবান বললেন, "হে ত্রৈলোক্যমোহন, রুক্মিণীমোহন, আপনার অনন্তবিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম, আপনাকে ফোন ধরতে হল। আপনাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও সময়ের অপচয়, কারণ আপনিই সকল কুশলের স্থিতিকারক, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান বলেই আপনার নাম বিষ্ণু।"

বিষ্ণু ভালমেজাজে নেই। ব্যঙ্গাত্মকভাবে উত্তর দিলেন, "মহাকাব্যে, পুরাণে আমার জয়গান, কিন্তু আপনি ভালভাবেই জানেন, আমি মৃত্যুর অধীন। বিষ্ণুযুগের শেষে আমার নিধন হতে পারে।"

"শিবেরও তো সেই একই আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে, হে নারায়ণ।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনারই সার্কুলারে রয়েছে, শিবের যুগ আমার যুগের দ্বিগুণ!"

"কিন্তু মৃত্যু তো আপনাকে শেষ করতে সক্ষম হবে না, বিষ্ণু। প্রলয়ের পরে শব্দহীন মহাশূন্যে জলের ওপর একটি বটের পাতায়

আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন। যেহেতু নীর অর্থাৎ জলের ওপর শোবেন বলেই তো আপনার নাম নারায়ণ!"

বিষ্ণু কথা বাড়ালেন না, নেহাত শ্রীভগবান বলেই ঘুমের মধ্যে ফোন ধরেছেন, বললেন, "আমার ঘাড়ে এমন দায়িত্ব চাপাবেন না, যা আমার নয়। নমস্কার!"

শ্রীভগবান এবার শিবের সঙ্গে কথা বলতে চান বুঝে, গণেশ বললেন, "বাবা একটু আগেই সাপের বিষের ছোবল খেয়ে নীলকণ্ঠরূপে বুঁদ হয়ে আছেন ; আপনার নির্দেশকে ফাইনাল অর্ডার ভেবে অর্ধচেতন অবস্থায় প্রলয়নৃত্য শুরু করে দিতে পারেন। আপনি নিজেই তো অবস্থা বুঝে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজে হরি ও হরকে একসঙ্গে রাখেন, অনেকেই হরিহরকে একজন ব্যক্তিত্ব বলে মনে করে।"

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীভগবান মর্তের জন্য নানা দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন। আবার ফোন করে ত্রয়ীকে আলাদা আলাদাভাবে কিছু দিনের জন্যে মর্তের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছেন। ব্রহ্মা সোজা বলেছেন, "আমি সিনিয়র বটে, কিন্তু মর্তে আমার কোনও আদর নেই, পুষ্কর হ্রদ ছাড়া কোথাও আমার পুজোও নেই।"

শ্রীভগবান : "এ কি! ব্রহ্মাবর্ত রয়েছে। ওইটাই তো গডের গ্রিনউইচের মতো আমাদের সৃষ্টির জিরো পয়েন্ট।"

ব্রহ্মা : "আই আই টি কানপুরের কাছে গঙ্গার ধারে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটের অবস্থা দেখেছেন! আমার ব্যক্তিগত রিকোয়েস্টে ডাকাতির মোটা রোজগার ছেড়ে দিয়ে রত্নাকর আশ্রমবাসী হয়ে রামায়ণ রচনা করলেন। সেই বাল্মীকি আশ্রমেরও বা অবস্থাটা কী!"

বিষ্ণুর সুর আরও চড়া। "দেখুন শ্রীভগবান, আপনি যে বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সেটা আমারই বিরুদ্ধে, কেননা আমিই স্থিতির দায়িত্বে রয়েছি। যে রক্ষক সে ভক্ষক হতে পারে না, আপনারই সার্কুলার রয়েছে।"

"আমি তো শুধু সার্কুলার সই করি, সিদ্ধান্ত তো আপনারা তিনজন নেন।" শ্রীভগবানের এই আবেদন বিষ্ণু কানে নিলেন না।

দেবাদিদেব সহস্রনাম শিব বৃষপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি মোবাইল

ফোন বন্ধ করে রেখেছেন।

অগত্যা শক্তিরূপিণী মহাদেবী দুর্গাই এখন ভরসা। বুদ্ধি করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বটা গণেশকেই দিলেন শ্রীভগবান। "সমস্যাটা তো তুমি বুঝতে পেরেছ, উনিই তো মহাশক্তি, বিদ্যুৎ, পেট্রোল, ডিজেল সবই ওঁরা আজ্ঞাবাহী।"

একটু পরেই গণেশ রিপোর্ট করলেন। "মা বেশ চটে গিয়েছেন। বললেন, কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি! অমনভাবে নিজের জীবন সংশয় করে মহিষাসুর বধ করে ঘরছাড়া দেবতাদের ভিটেমাটি ফিরিয়ে দিলাম, তারপর আমার অবস্থা ইন্দিরা গান্ধীর মতন খারাপ। নেহাত অমরত্বের অর্ডার আছে বলে প্রাণে মারতে পারেনি।"

গণেশ : "মা, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?"

দুর্গা : "বড় বড় টাইটেল, ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাজানো, কিন্তু আসলে ভাঁড়ে মা ভবানী, আমার কোনও সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই। স্বর্গরত্না টাইটেলটাও দিল না। শ্রেষ্ঠত্বের যে সার্কুলারটা বেরিয়েছে সেটা তুই দেখেছিস? দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেদ, পবিত্রের মধ্যে শিব। প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা।"

গণেশ : "তোমার নাম শ্রেষ্ঠার তালিকায় নেই?"

দুর্গা : "আছে! পতিব্রতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা! অর্থাৎ আমি একজন হাউস ওয়াইফ ছাড়া আর কিছু নই। মহিষাসুরমর্দিনী, দুর্গতিনাশিনী, দশপ্রহরণধারিণী, ওসব একবারের মতন! এখন সব ভুলে যাও। গৃহবধূ হিসেবে আমাকে ডবল প্রতিষ্ঠার জন্যে আমার মেয়েকে বিউটি কুইন করা হয়েছে, লক্ষ্মীকে বলা হয়েছে শ্রীসম্পন্নাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা!"

গণেশ : "মা, আমি শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা বললাম, শ্রেষ্ঠের এই তালিকা বহুল প্রচারিত, কিন্তু এটা সরকারি লিস্টি নয়, দেবীভাগবতম খুলে দেখ, এই তালিকা যম দিয়েছিলেন সাবিত্রীকে।"

দুর্গা : "আমি কচি খুকি নই গণেশ। সবাই জানে মর্তে পুলিশ এবং স্বর্গে যমের মাধ্যমে কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের অপ্রিয় কাজগুলো সেরে নেন, যাতে তাঁদের ভাবমূর্তিটি পরিচ্ছন্ন থাকে।"

গণেশ : "মা, যম এই তালিকা তৈরি করে, নিজের এক্তিয়ারের বাইরে কাজ করেছেন।"

দুর্গা : "রাখ! রাখ! তাই যদি হবে, তা হলে শ্রীভগবানের শ্রীদপ্তর থেকে কোনও সংশোধনী বার করা হয়নি কেন? শোন, কিছুদিন আগে শুনলাম, সি গুপ্তা বলে কে একজন...'

গণেশ : "বোধ হয় চিত্রগুপ্ত!"

দুর্গা : "আমার আটটি মাত্র সখী তাদের সম্বন্ধে গোপনে খবর সংগ্রহ করছে। জানতে চাইছে অনঙ্গরূপা, অনঙ্গমদনা, সুন্দরী, মদনাতুরা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সর্বশিশিরা, অনঙ্গবদনা এবং অনঙ্গমেখলা এদের লাইফস্টাইল কী রকম?"

নতমস্তকে গণপতি গণেশ এবার শ্রীভগবানকে বললেন, "চেষ্টা করলাম, কিছু হল না। স্বর্গে কী রকম ধারণা হয়ে যাচ্ছে যমই সি বি আই—মরণের পরে অনেক প্রাক্তন সি বি আই ওঁর অধীনে রয়েছেন।"

শ্রীভগবান আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন। দেবী দুর্গা ইচ্ছে করলেই কিছু সময় মর্তে ভাইসরয়রূপে থাকতে পারতেন, বছরে দু'মাস 'ফার্লো' কাটাতে মণিদ্বীপে বসবাস করতে পারতেন, কিন্তু তিনি ওই ষষ্ঠী থেকে দশমীর বাইরে ওখানে যাবেন না, কোনও কাজও করবেন না। উনি স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন, "যদিও আমি ভুবনেশ্বরী, কিন্তু আমার পরে নাই ভুবনের ভার।"

সমস্ত রাত্রি ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধিদাতা গণেশ আবার শ্রীভগবানের শ্রীদপ্তরে উপস্থিত হয়েছেন। সমস্যা হলে সমাধানের ভারপ্রাপ্ত দেবতা তিনি, দায়িত্ব এড়িয়ে সরে পড়াটা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাল দেখায় না।

শ্রীভগবানের মনে লেগেছে, স্বয়ং বিষ্ণু দুঃখ করলেন তিনি মৃত্যুর অধীন। এই মৃত্যুটি কে?

গণেশ খোঁজ নিয়েছেন। "শ্রীভগবান, আপনার মনে নেই। ব্রহ্মার পুত্র অধর্ম, তাঁর ছেলেই মৃত্যু। কন্যাও আছে, নাম জরা।"

"স্বর্গের সিস্টেমটা বড়ই জটিল, গণেশ। কে যে কার মাধ্যমে কাকে কনট্রোল করছে তা মর্তের কোম্পানি-আইন বিশেষজ্ঞরাও বুঝতে পারবেন না!"

গণেশের মাথায় একটা আইডিয়া মাঝরাতে খেলে গিয়েছে। সিনিয়র দেবতারা যখন মর্তের ঝামেলায় যেতে চাইছেন না, তখন যেসব

মহাপুরুষ একসময় মর্তলীলা করে আবার ফিরে এসেছেন, তাঁদেরই কাউকে সাময়িকভাবে ফেরত পাঠানো হোক।

"ইউরেকা! ইউরেকা!" শ্রীভগবান এমনই একটি যুগান্তকারী আইডিয়া চাইছিলেন। হস্তিমুণ্ড হলেও গণেশের ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এমন কাউকে পাঠানো যাক, যাঁকে পৃথিবীর মানুষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সবাই সহজেই তাঁকে গ্রহণ করবে, কাজটা চমৎকারভাবে হয়ে যাবে।

সম্ভাব্য তালিকা বিভিন্ন সূত্র থেকে খোঁজখবর নিয়ে নিতান্ত গোপনে প্রস্তুত হয়েছে! সেক্রেটারিদেরও টাইপ করতে দেওয়া হয়নি, স্বয়ং শ্রীগণেশ নিজের হাতে লিখে শ্রীভগবানের সামনে নিবেদন করেছেন।

তালিকা দেখে মুগ্ধ শ্রীভগবান। "অবিস্মরণীয় কাজ করেছ, গণেশ। এইসব অবতাবপুরুষ আমাদের কাছাকাছি রয়েছেন। অথচ আমাদের খেয়াল নেই।"

এঁদের সঙ্গে স্বর্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করা হয না, তাও জানালেন গণপতি। "এঁদের একটা করে যোগাযোগ যন্ত্রও দেওয়া হয়নি, জানেন?"

"তা হলে এঁদের সঙ্গে কথা বলব কী করে?" শ্রীভগবান স্বর্গব্যবস্থায় বেশ বিচলিত।

গণপতি একগাল হেসে জানালেন, "এমারজেন্সি ব্যবস্থা করেছি, অপ্সরা মারফত একটা মোবাইল পঞ্চেন্দ্রিয় রেখেছি., আপনি বললেই আমার সহকারিণী এঁদের হতে মোবাইল দিয়ে দেবে।"

"আপনি এস কে ঘোষের সঙ্গে কথা বলবেন? পুরো নাম শ্রীকৃষ্ণ, আদি টাইটেল ঘোষ, জাতিতে যাদব।"

"ইনিই তো কুরুক্ষেত্রের রণের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদাযদাহি কোথাও কোনও দর্মীয় গ্লানি হলে সম্ভবামি যুগে যুগে। লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া রয়েছে।"

গণেশ বললেন, "হ্যাঁ স্যর। অসুবিধা একটাই। ইনিই যে বেনামে বিষ্ণু তা বিষ্ণু বহুবার বলেছেন। ওঁকে পাঠানো মানেই বিষ্ণুকে পাঠানো। অন্য দু'জন সিনিয়র দেবতা মুখে কিছু না বললেও..."

"বুঝেছি, বুঝেছি! ওই হাঙ্গামায় গিয়ে লাভ নেই।" বললেন শ্রীভগবান।

"শঙ্করাচার্যকে কেমন মনে হয়? সামান্য ক'বছরের জন্যে মর্তে গিয়ে বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছিলেন।"

আদি শঙ্করাচার্যর বায়োডাটা দেখে মুগ্ধ শ্রীভগবান। বললেন, "এইরকম প্রাণবন্ত পুরুষেরই প্রয়োজন, কিন্তু দেখছি তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে তেমন পাত্তা দেননি, টানটা যে নিরাকারের দিকে। ফলে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী একটু নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে পারেন।"

"আর কে আছেন?" জানতে চাইছেন শ্রীভগবান।

"প্রচণ্ড ভাল একজন ক্যান্ডিডেট আছেন, পাঁচশো বছর আগেই দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ওঁর বায়োডাটা পরপর সাজানো রয়েছে সঙ্গের বইটিতে—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

ওঁকেই মোবাইলে ধরিয়ে দিলেন শ্রীগণেশ। বসে বসে একান্তে সংকীর্তন করছিলেন শ্রীচৈতন্য। সব শুনে বললেন, "মর্তের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই, এখন আমাকে কেউ মহাপ্রভু বলে কিনা জানি না। কিন্তু আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না, শ্রীভগবান। সবাই আমাকে পরমবৈষ্ণব বলে জানে, বিষ্ণু এবং বিষ্ণুপ্রিয়াই আমার সব, অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ দেবতারা আমার পুনরাগমনকে ভাল চোখে নাও দেখতে পারেন। আমি এখানে ভালই আছি, আমার কোনও উচ্চাশা অবশিষ্ট নেই।"

শ্রীভগবানের চোখেমুখে হতাশা। গণেশ বললেন, "আর একজন যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন—জি চ্যাটার্জি। অন্য নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস. কিন্তু মা কালীর পরমভক্ত, জনপ্রিয়তায় ওঁর কথামৃত এখন কলেজ স্ট্রিট বই পাড়ায় গীতার সঙ্গে সমান দাপটে কমপিট করছে।"

"জিজ্ঞেস করে দেখ একবার। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী করে কথাবার্তা বলতে হয় উনি জানেন। সহ্যশীল পরমপুরুষ, বিশ্বাস করেন যত মত তত পথ।"

কথা হল গণেশের সঙ্গে। কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন রামকৃষ্ণ, "আমি তো দেহত্যাগ করেও মুক্তি পাইনি দায়িত্ব থেকে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠার সময় আমার প্রিয় শিষ্য তো প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘই আমার শরীর। এইভাবে দেড় হাজার বছর আমাকে থাকতে হবে। দয়া করে আমাকে দ্বৈত ভূমিকায় নামাবেন

না।"

এই সময়ে গণেশের মানসদর্পণে কিছু একটা মেসেজ এল। গণেশ বুঝছেন, নতুন পরিকল্পনাটা পুরোপুরি গোপন নেই।

শ্রীভগবানের কাছে গণপতির নিবেদন : "কয়েকজন উৎসাহী প্রাক্তন দেহধারী নিজেদের মধ্যে মিটিং করে যাঁর নাম প্রস্তাব করছেন ইহজন্মে তিনি কার্ল মার্কস বলে পরিচিত ছিলেন। একসময় দুনিয়া মাতিয়েছিলেন, এখন হাতে কাজকর্ম একটু কম, অনুরোধ করলে ফিরে যেতে পারেন। আমার মায়ের প্রিয় জায়গায় অবশ্যই স্পেশাল ভালবাসা এবং আদরযত্ন পাবেন।"

"ওখানে মার্কসবাদ চালু আছে?"

"ওঁর তত্ত্ব তো রয়েছেই, কিন্তু নতুন এক মার্কসবাদ প্রচণ্ড মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, শ্রীভগবান। সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দেওয়ার পরেই বাবা মায়ের সঙ্গে সারাক্ষণ হা মার্কস, জো মার্কস করছে! মার্কস এক পয়েন্ট কম হলে জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেতে পারে।"

শ্রীভগবান রাজি হয়ে গিয়েছিলেন প্রায়। গণেশও মোবাইল ফোনে সুখবরটা দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শ্রীভগবান জিজ্ঞেস করলেন, "বায়োডাটায় নাম দেখছি কার্ল মার্কস।"

"জন্ম জার্মানিতে, উচ্চতর পড়াশোনা ইংলন্ডে।"

শ্রীভগবান বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। প্রটোকলে আটকাচ্ছে—গডের অনুমতি প্রয়োজন। গড্ হয়তো অনুমতি দেবেন, কিন্তু গণমাধ্যমে এবং স্বর্গে আমার প্রচণ্ড সমালোচনা হবে।"

"আরও একটা পয়েন্ট আছে—ওঁর চেলারা এখনও গডে কিংবা ভগবানে বিশ্বাস করেন না। মার্কসবাদীরা একেশ্বরবাদী, ওঁরা একমাত্র মার্কসেরই পূজা করেন।"

শেষ পর্যন্ত একজন মাত্র যোগ্য পুরুষকেই পাওয়া যাচ্ছে। তিনি গৌতমবুদ্ধ। দেহরক্ষার পরেও সারা বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছিলেন শত শত বৎসর ধরে। গণেশ বললেন, "নিখুঁত সৃষ্টি। এখনও স্বর্গসুখ ভোগ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন না, অথচ রাজার ছেলে। যমের দক্ষিণদ্বারের দিকে যে রাজপথ চলে গিয়েছে, যেখানে সদ্যমৃতরা

যমদূতের অত্যাচার ও তাড়নায় কান্নাকাটি করে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নীরবে আর্তজনের সেবা করেন, তাদের শুশ্রূষা করেন, ভরসা দেন। যম ওই পুরুষটিকে ঘাঁটায় না!"

শ্রীভগবানের অনুরোধ গৌতমবুদ্ধকে, "জরা শোক মৃত্যুতে কাতর বিশ্বে আপনি আর একবার পদার্পণ করুন। এবার আপনি আমার নিজস্ব দূত হয়ে গমন করুন, বিশ্ব আর একবার জানুক আপনাকে। হে করুণাঘন, একমাত্র আপনিই ধরণীকে কলঙ্কশূন্য করতে পারেন।"

গণেশ নিজেও কথা বললেন গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে। একটু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। শ্রীভগবানের নাম করেই একসময় বৌদ্ধধর্মের বিনাশ চেষ্টা হয়েছিল। গণেশ বললেন, "ওসব কথায় কান দেবেন না। আমাদের নাম করে অনেক কাজকর্ম হয় যার খবরও আমাদের কানে আসে না। আপনাকে তো অনেকেই ভগবান বুদ্ধ বলে, শ্রীভগবান কখনও প্রতিবাদ করেছেন কী?"

নিতান্তই সুখবর। মর্তে ফিরবার জন্য গৌতমবুদ্ধ প্রস্তুত হচ্ছেন। শ্রীভগবান বললেন, "হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। ওঁকে জিজ্ঞেস করে নাও, স্ত্রী-পুত্রসহ যেতে চান কিনা? ব্যবস্থার যেন কোনও ত্রুটি না থাকে।"

শ্রীগণেশ জানেন, গৌতম আগে যাবেন একলা, অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন, তারপর মনস্থির করবেন। কিন্তু গণেশের চোখেমুখে আশঙ্কার ছায়া। "শ্রীভগবান, এখনই হাঁফ ছাড়বেন না। মানসদর্পণে দেখছি স্বয়ং নারদ ওঁকে পথে আটকিয়ে কীসব গোপন কথা বলছেন।"

একটু পরেই দুঃসংবাদ এল। বুদ্ধ রাজি হলেন না। মর্তে ফিরে যাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েও ফিরে এসেছেন। বললেন, "আমার জানা ছিল না, আর এক বুদ্ধদেব মর্তের একটা বড় অংশের দায়িত্ব নিয়েছেন। নারদ বলেছেন, কোথায় যাবেন, ওখানে তো অন্য এক বৌদ্ধযুগ শুরু হয়ে গিয়েছে।" ঝগড়াঝাঁটি, দ্বন্দ্ব, হানাহানি এসব মোটেই পছন্দ করেন না গৌতমবুদ্ধ।

"এই বুদ্ধদেবটি কে?" জানতে চাইছেন শ্রীভগবান।

"এঁর দাদামশাই, আমাদের বিশেষ পরিচিত। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়—ইনিই পুরোহিত-দর্পণ সংকলন করে দেবদেবীদের অশেষ উপকার করেছিলেন। তবে তাঁর নাতি ভগবানে বিশ্বাস করেন না।"

খুব দুঃখ পেলেন শ্রীভগবান। কেউ যদি বিশ্বাস না করে তবে কী করা যাবে? তর্ক করে, জোর করে কিছু করার থেকে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা বাড়ুক।

"এখন তা হলে উপায়?" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন শ্রীভগবান।

গণেশের প্রস্তাবের উত্তরে শ্রীভগবান বললেন, "আমি কেবল নামে ভগবান। আমি কোথায় যাব? মর্তে কেউ আমাকে চিনতেও চাইবে না। আমার জন্য একটা মন্দিরও তৈরি হয়নি, আমার কনস্টিটিউয়েনসিই নেই, ভোট হলে আমার জমানত জব্দ করে দেবে, ইলেকশন কমিশন ভগবানকেও খাতির করে না।"

"না স্যর, আপনি যদি এতই দুর্বল হতেন, তা হলে সবাই ভগবান ভগবান করত না।"

শ্রীভগবান বললেন, "আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়নি, গণপতি। ওটা বিপদে পড়লে, কিংবা যমের ভয়ে কথাটা বেরিয়ে আসে অভ্যাসবশত। ওই বচনের কোনও তাৎপর্য নেই, বুঝলে, বিঘ্নেশ!"

তা হলে? যেমনভাবে চলছে সেইভাবেই চলবে? মর্ত পরিস্থিতির কোনও উন্নয়ন হবে না? শ্রীগণেশ এই মুহূর্তে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন।

শেষ পর্যন্ত বিনয়াবনত শ্রীভগবান শান্তভাবে বললেন, "স্নেহের গণেশ, তুমি তো আসন্ন শারদোৎসবে মায়ের সঙ্গে মর্তে যাচ্ছ, বিভিন্ন মণ্ডপে অনেক কমবয়সী ছেলেমেয়েকে দেখতে পাবে। এখনও পরলোকগত হননি এমন কোনও ইয়ংম্যান অথবা ইয়ং উয়োম্যানের ঘাড়েই পৃথিবীর দায়িত্ব চাপাতে হবে। স্বর্গসুখ থেকে নির্বাসিত হয়ে কেউ যখন পুনর্জন্ম নেবেন না তখন ওখান থেকেই কাউকে পিক্‌আপ করা ছাড়া সৃষ্টিরক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

গণেশ বললেন, "তথাস্তু! তাই হোক।"

[গ্রন্থাকারে
অপ্রকাশিত]

আজব টিকিট

বিভিন্ন ব্যাধির মতো এ-সংসারে ব্যাচেলর দু'রকমের। যাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম এবং বিবাহের তর সইছে না, তারা 'অ্যাকিউট' এবং বহুদিন ব্যাচেলর অবস্থায় থেকে-থেকে যাঁদের সহ্য হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহবন্ধনে এখন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, তাঁরা 'ক্রনিক' ব্যাচেলর। এই কাহিনীর নায়ক ইন্দুমাধব শ্যাম দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়েন।

ইন্দুমাধব সরকারী অফিসে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত, অফিসার না-হলেও ননগেজেটেড পে-স্কেলের সর্বোচ্চ মাইনে ড্র করছেন এবং ভাগ্য ভাল থাকলে পঞ্চাশের সীমান্তরেখা অতিক্রম করার আগেই গেজেটেড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেকটর হবেন।

ইন্দুমাধব সংসারবন্ধনে ধরা না-পড়েও বেশ সংসারী। সব কিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত। বলাবাহুল্য ইন্দুমাধবের নিজস্ব বাটী এবং ব্যাংকের সর্বোত্তম সুদে কিছু স্থায়ী আমানত আছে।

ব্যাচেলর ইন্দুমাধবের নামটা তাঁরই এক বন্ধু গোপনে জীবনলাল চ্যাটার্জিকে দিয়েছিলেন।

জীবনলাল চ্যাটার্জির বিস্তারিত পরিচয় এখন জানতে চাইবেন না। বিশেষ ব্যবসায়িক কারণে, খরচখরচা বাদ দিয়ে মাসের শেষে যাঁদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এমন কিছু সচ্ছল লোকের তালিকা ওঁর প্রয়োজন। এ-সংসারে এ ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া এখন বেশ শক্ত। মাথা চুলকে-চুলকে সাহিত্যিক নির্মোক রায় যখন কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর গৃহিণী মালিনী বললেন, "তোমার বন্ধু ইন্দুমাধব শ্যামের ঠিকানাটা দাও না!" ইন্দুমাধবকে তো ঠিক সংসারী লোক বলা চলে না—সংসারে থেকেও সে সন্ন্যাসী। কিন্তু জীবনলাল চ্যাটার্জি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এর পরে জীবন চ্যাটার্জির সঙ্গে যখন নির্মোক রায়ের দেখা হয়েছে

তখন তিনি বলেছেন, "ইন্দুমাধব শ্যাম আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। এর প্রতিদান যদি না দিই তো আমার নাম জীবন চ্যাটুজ্যে নয়।" আমার সব ভাল কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারি না। সামান্য ব্যাপার, একজন ভদ্রলোক বিজনেসের জন্যে আর একজন ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছেন—বিজনেস করবেন কিনা সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু ভদ্র নম্র ব্যবহার অবশ্যই আপনার কাছে প্রত্যাশা করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত ইন্দুমাধব শ্যাম জবরদস্ত কায়দায় জীবনলালকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছেন। জীবনলালের প্রস্তাবে তাঁর নাকি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—প্রয়োজনও নেই।

জীবনলাল তখন থেকেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন এবং তা লক্ষ্য করে সাহিত্যিক নির্মোক রায় ও তাঁর স্ত্রী মালিনী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এই ইন্দুমাধবকে আজ সকাল থেকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। ছুটির দিনে, মধ্যবিত্ত সংসারে সকালবেলায় অর্থনৈতিক কারণে নানা খিটিমিটি লাগে, পারিবারিক দুশ্চিন্তা অবশ্যই দেখা দিতে পারে, কিন্তু সংসার অরণ্যের একমাত্র সিংহ ইন্দুমাধবের মুখে কেন চিন্তার ছায়া?

চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং বহুপ্রচারিত সংবাদপত্রের কল্যাণে এখন গল্প-উপন্যাসে কেউ নায়কের সবিস্তারিত পরিচয় পাঠের ধৈর্য রাখেন না। বর্ণনা শুরু হলেই পাতা বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর অভিযোগে আক্রান্ত হন লেখক।

তবু ইন্দুমাধবের সামান্য পরিচয় বিশেষ প্রয়োজন যাতে তার ভাবমূর্তিটি পাঠকের হৃদয়ে মোটামুটি স্পষ্ট থাকে। এক নজরে ইন্দুমাধব এইরকম :

বয়স : ৪৬ (অফিস রেকর্ডে ৪৩)
রঙ : বাদামী
উচ্চতা : ৫ ফুট পাঁচ
চোখের রঙ : কালো
ওজন : ৬৭ কেজি
নাসিকা : সামান্য চাপা
কাঁধ : বেশ ঢালু

চুল : পাতলা তবে যত্নের সঙ্গে চিরুনি ব্যবহার করলে টাক এখনও ঢাকা যায়।

চামড়া : ঈষৎ তৈলাক্তভাবাপন্ন

বিশেষ লক্ষণ : অল্প উত্তেজনায় নাকের ডগা সামান্য ঘামে

চশমা : মোটা ব্রাউন শেল ফ্রেম

শরীর : মজবুত—মাঝে মাঝে সর্দিতে ভোগেন

প্রিয় খাদ্য : পার্সে মাঝের ঝোল ও সরু চালের ভাত

পছন্দ : সিনেমা ও গানের আসর

ভীতি : নারী সান্নিধ্য

স্বভাব : শান্ত, গুছনো ও সাবধানী

নিতান্ত প্রিয়জন : অতীতে মাতাঠাকুরানী, বর্তমানে কেউ নয়।

কোনোরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চান না বলেই ইন্দুমাধব দারপরিগ্রহ করেননি। ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনিবার্য হলেও কোনো পুরুষের পক্ষে তা মঙ্গলকর নয়। ইন্দুমাধবের দৃঢ় ধারণা, এদেশে পুরুষেরা স্বাধীনতা মধ্যরাতের বাসকসজ্জাতেই বারে বারে তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা হারায়।

এই ধরনের মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা সাধারণত বিশেষ মনোবলের অধিকারী হন এবং ইন্দুমাধব শ্যাম অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই দৃঢ়-চেতা ইন্দুমাধব বেশ চিন্তিত হয়ে রয়েছেন। ব্যাপারটা যতই ভাবছেন ততই তিনি দিশেহারা হয়ে পড়ছেন এবং কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

এ-অবস্থায় নির্ভরযোগ্য কারুর কাছে গোপন পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু প্রিয়বন্ধু লেখক নির্মোক রায়ের কাছে যাওয়া ঠিক কিনা ইন্দুমাধব বুঝতে পারছেন না। নির্মোক অবশ্যই সারা জীবন তাঁর বন্ধুকে সুপরামর্শ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু সমস্যা তাঁর স্ত্রী মালিনী। নির্মোক এই রমণীরত্নের কাছে কিছুই গোপন রাখেন না এবং এই বয়সে ইন্দুমাধব মধ্যবয়সিনী মহিলামহলের গবেষণা ও কৌতূহলের বিষয়বস্তু হতে একেবারেই প্রস্তুত নন।

আজকের সমস্যাটি এইরকম—প্রভাতের চা-পর্ব শেষ করে ইংরিজি পত্রিকার ষোলোটি পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করছিলেন ইন্দুমাধব,

এমন সময় ভৃত্য মধুসূদন মণ্ডল খামটি টেবিলের উপর রাখলো। গতকালই খামাট ডাকবাক্সে পড়েছিল মধুসূদন তা উদ্ধার করতে ভুলে গিয়েছিল। সাধারণত চিঠিপত্র এলে ইন্দুমাধব খুশী হন, নিজের হাতে প্রতিটি চিঠির উত্তর লেখেন সযত্নে। কিন্তু আজ মেজাজ অন্যরকম। টাইপ করা খামে ইন্দুমাধবের নাম ঠিকানা লেখা, ভিতরে কোনো চিঠি নেই—শুধু একটি ফাংশনের টিকিট।

অনুষ্ঠানটি ভাল জায়গায় হচ্ছে, শীতাতপ মণ্ডপে গীতানুষ্ঠান—বিনা পয়সায় এই টিকিট পেলে সকলেরই আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু ইন্দুমাধবের মুখমণ্ডল ক্রমশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগলো।

সৌজন্য টিকিটটি বারবার দেখতে লাগলেন ইন্দুমাধব। তারপর একবার টিকিটটি টুকরো টুকরো করে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কথাও ভাবলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজের হাতদুটিও বিদ্রোহ করলো, মনের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তারা টিকিট ক্ষতবিক্ষত করতে পারলো না।

আপনারা যারা সন্দেহ করছেন ইন্দুমাধব কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত তাঁরা অকারণে সুস্থ সতেজ ইন্দুমাধবের প্রতি অবিচার করছেন। ইন্দুমাধবের দেহে বর্তমানে কোনোরকম ব্যাধির উপস্থিতি নেই।

সামান্য একখানি ফাংশনের টিকিট—এর মধ্যে কী এমন বিপদের ইঙ্গিত থাকতে পারে? কিন্তু ভৃত্য মধুসূদন লক্ষ্য করলো, বাবুর নাকের ডগায় শিশির বিন্দুর মতো ঘাম জমতে শুরু করেছে।

ইন্দুমাধব আরও এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা শুরু করলেন। ব্যাপারটা এইরকম : সপ্তাহকয়েক আগে অফিসের ডাকে ইন্দুমাধব অকস্মাৎ একখানি টিকিট পেয়েছিলেন। ফাংশনটি খুবই আকর্ষণীয়, কাগজে যথেষ্ট বিজ্ঞাপনও হয়েছে, দেশের বাঘা বাঘা শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন। ইন্দুমাধব ভাবলেন, অফিস থেকে অনেক স্যুভিনিরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—তাদেরই কেউ দ্রুত বিল নিষ্পত্তির আশায় খোদ ইন্দুমাধবকে স্মরণে রেখেছেন।

ইন্দুমাধব সরল মনেই শহরের বিখ্যাত হলের ১৩এ সীটটি যথাসময়ে অধিকার করে বসেছিলেন।

সেদিন হলে তিল ধারণের জায়গা নেই, কিন্তু পাশের ১৩বি সীটটি তখনও খালি। সুতরাং ইন্দুমাধব তাঁর অফিস অ্যাটাচি কেসটি ওই খালি

সীটে বসিয়ে রেখেছিলেন। গান শুরু হয়ে যাবার কিছু পরে ১৩বি সীটের অধিষ্ঠাত্রী হাজির হলেন। অন্ধকারে শাড়ির রঙ তখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আকারে ঈষৎ বিপুলা এই মহিলা প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভিতরে ঢুকলেন এবং একটু রুক্ষ্ম স্বরেই ইন্দুমাধবকে ব্যাগ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। সামান্য ব্যাপার, মিষ্টি করে বললেই হতো, পৃথিবীতে কোন হলে নিজের ব্যাগ রাখবার জন্যে আর একটা খালি সীট পাওয়া যায়? কিন্তু এই মহিলার স্বরে ইন্দুমাধবের জন্য একটুও কোমলতা নেই।

স্বভাবত উগ্র মেজাজের ইন্দুমাধব একবার ভাবলেন বলেন, গান শুরু হয়ে যাবার পরে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ কেন? দেরি হলে, প্রথম বিরতি পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করাই নিয়মসঙ্গত। কিন্তু সে-কথা এই জবরদস্ত মহিলাকে শুনিয়ে কোনো লাভ হবে না।

প্রেক্ষাগৃহের নিবিড় অন্ধকারে ইন্দুমাধবের চোখ তেমন কার্যকরী না-হলেও নাসিকার মাধ্যমে তিনি বিশেষ একটি মূল্যবান সেন্টের গন্ধ পেলেন। সুগন্ধের মাত্রা নারীসান্নিধ্যে-অনভিজ্ঞ ইন্দুমাধবের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো।

সেন্টের উৎস কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্য হাঙ্গামা বাধালেন—নিজস্ব দম্ভ থলিকা থেকে পোটাটো চিপসের সুবৃহৎ প্যাকেট বার করে মুচমুচ শুরু করলেন। সুরেলা গানের সময় কোনোরকম বাড়তি আওয়াজ ইন্দুমাধবের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়। দু'একবার আড়চোখে পাশের দিকে তাকালেন ইন্দুমাধব এই আশায় যে পাশের মহিলা পরিস্থিতি বুঝে একটু সাবধান হবেন, নিজেকে সামলে নেবেন, কিন্তু ঘন অন্ধকারে ইন্দুমাধবের তীর্যকদৃষ্টি বোধহয় পাশের সীটের নজরে পড়লো না।

প্রথম বিরতি পর্যন্ত মুখ বুজে সব সহ্য করলেন ইন্দুমাধব—গানের আসরে চীনাবাদম, পপকর্ন ও পোটাটো চিপসের নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে লিখবেন তিনি। আলো জ্বলবার পরে কিন্তু মুচমুচে আলুভাজার মড়মড় শব্দ বেড়ে গেলো। বিরক্ত ইন্দুমাধব এইসময় টয়লেটের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইন্দুমাধব অদৃশ্য হওয়া মাত্রই অকুস্থলে উপস্থিত হলেন ছোটখাট সাইজের জীবনলাল চ্যাটার্জি। ১৩বি সীটের এই মহিলা যে তাঁর অপরিচিতা নয় তা বোঝাচ্ছে। কুমারী সুহাসিনী সেন—কেন্দ্রীয় অফিসে

হেড অ্যাসিসটেন্টরূপে সগৌরবে সরকারী কার্য পরিচালনা করছেন। কাজের ব্যাপারে তাঁর নাম বাঘিনী সেন। বাঘিনী সেনের ব্যক্তিগত খবরাখবর এইরকম :

পিতার নাম : স্বর্গত সুধীর সেন

উচ্চতা : পাঁচ ফুট তিন

বয়স : ৪৩ (অফিসের খাতায় ৪৩১/২)

বর্ণ : উজ্জ্বল শ্যাম

চোখ : পদ্মলোচনা

দাঁত : উজ্জ্বল মুক্তোর মতো

চশমা : সোনার ফ্রেম

ওজন : বাষট্টি কিলো

চিনে নেবার চিহ্ন : বাঁ গালে একটি টিপসাইজের তিল।

বেশবাস : হাল্কা ফিকে নীল রঙের টাঙাইল শাড়ি।

অলঙ্কার : গলায় হায়দ্রাবাদী মুক্তোর মালা। হাতে ইউনিক গোল্ডেন কাঁকন—চোরডাকাত দুষ্ট লোকের ভয় ভীষণ।

স্বভাব : মিষ্ট—কিন্তু অপমানিত হলে দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না।

ভীতি : অপরিচিত পুরুষ

পছন্দ : গানের ফাংশন

নিতান্ত প্রিয়জন : এই মুহূর্তে কেউ নয়। মাঝে-মাঝে শুধু নির্মোক রায়ের স্ত্রী মালিনীর সঙ্গে গল্প করেন।

সুহাসিনী দেবী দেখলেন একটি লোক তার খুব কাছে এসে পড়েছে। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে—একবার যেন বান্ধবী মালিনীর চিঠি নিয়ে কী একটা বীমাসংক্রান্ত ব্যবসায়িক প্রস্তাব এনেছিল।

সুহাসিনী দেবী লোকটিকে পত্রপাঠ বিদায় করেছিলেন—"ইনসিওরেন্স প্রপোজাল পাঠাবার লোক পেলেন না। তেতাল্লিশ বছরের সংসার না-করা মেয়ে—ওসব ছাইভস্ম নিয়ে আমি কী করবো? আমাদের তো ভবিষ্যৎ নেই। কে ওসব খাবে?"

লোকটা নাছোড়বান্দা, এখনও বোধহয় আশা ছাড়েনি—এখনও মাঝে-মাঝে চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছে। তার বক্তব্য, পৃথিবীতে এমন একটিও মানুষ নেই যে ভবিষ্যৎকে ডোন্টকেয়ার অর্থাৎ অবহেলা করতে পারে।

দু'জনে চোখাচোখি হতেই জীবনলাল গদগদ হয়ে সুহাসিনীর দিকে এগিয়ে এলেন। পরবর্তী সংলাপ এইরকম :

জীবনলাল : নমস্কার। আরে আপনি?

সুহাসিনী : আর বলবেন না। হঠাৎ অফিসে কে একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাঠালো। অমুক সেন আর তমুক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার ইচ্ছে হয় প্রায়ই—কিন্তু আগে এসে লাইন লাগিয়ে টিকিট কাটার হাঙ্গামা সহ্য করতে পারি না। তাই হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম, শুধু কে যে টিকিট পাঠালো এখনও বুঝলাম না।

জীবনলাল : ওটা তো সামান্য ব্যাপার—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে? আপনার অফিসের কত লোক কত প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে রয়েছে।

সুহাসিনী : আপনিও ফাংশনের ভক্ত?

জীবনলাল : ঠিক ভক্ত নয়—কিন্তু যে-লাইনে আছি তাতে এসব জায়গায় না-এসে উপায় নেই। ফিউচার খদ্দেরদের হাতের কাছে পাওয়া যায়।

সুহাসিনী (হাস্য) : আপনি এক একটা কথা যা বলেন!

জীবনলাল : গান কেমন শুনছেন? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সুহাসিনী [ফোঁস করে উঠলেন] : অসুবিধে হবার তো কথা ছিল না। এমন সুন্দর হল, এমন চমৎকার সীট, এমন নামকরা আর্টিস্ট। কিন্তু কপাল দোষে বাঁ দিকের সীটের লোকটি—যেন আমার ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস এসেছেন। দুটো পোটাটো চিপস খাচ্ছিলাম—দুপুরে টিফিন হয়নি। লোকটা এমনভাবে তাকালো যেন ক্লাশ থেকে বার করে দেবে।

জীবনলাল [খালি সীটের নম্বরটি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন] : সে কি! এরকম তো হবার কথা নয়। পাবলিক হল—এখানে যার যা খুশী তাই করবে।

সুহাসিনী : রাগের আসল কারণটা ওঁর হাত ব্যাগ—ভেবেছিলেন ব্যাগটি আমার সীটে রেখে সিংগল টিকিটে ডবল সীট উপভোগ করবেন।

জীবনলাল [সভয়ে] : আপনার সঙ্গে কোনো বচসা হয়েছে নাকি?

সুহাসিনী : হয়নি এখনও—হলে উনিই আফসোস করবেন। আমরা পাঞ্জাবের প্রবাসী বাঙালী। আমরা ভাঙি তো মচকাই না। কোনো অচেনা পুরুষকে আমি তোয়াক্কা করি না।

জীবনলাল : এ তো বেশ মুশকিলে পড়া গেলো! আপনি কী সীট বদলাবেন আমার সঙ্গে?

সুহাসিনী : মোটেই না! তা হলে তো লোকটা আরও আস্কারা পেয়ে যাবে। আমি যাই—আরও কিছু পোটাটো চিপস কিনে আনি।

সুহাসিনী দেবী ঝকঝকে টাঙ্গাইল শাড়িটি সামলে নিয়ে হলের বাইরে চলে গেলেন। আর তার পরের মিনিটেই ইন্দুমাধব নিজের সীটে ফিরে এলেন।

প্রতিশোধের আগুন মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে, তবুও ইন্দুমাধবকে দেখে জীবনলাল ব্যবসায়িক কারণে এক গাল হেসে ফেললেন।

ইন্দুমাধব : জীবনবাবু, আপনারও গানবাজনার শখ? সারাদিন বিজনেসের পিছনে ঘুরেও রসকস থাকে আপনাদের?

জীবনলাল [জিভ কেটে] ফাংশানগুলো আমাদের লক্ষ্মী—কত লোক এখনও আমাদের কোম্পানির ইনসিওরেন্স স্কীমের সুযোগ পায় নি তা চোখের সামনে দেখতে পাই, ভরসা বেড়ে যায়।...যাক, আপনার কোনো অসুবিধে...

ইন্দুমাধব : সৌজন্য টিকিটে গান শুনতে এসেছি—কোনো হাঙ্গামার কথা নয়—কিন্তু ব্যাচেলরের পোড়া কপাল—পাশের জাঁদরেল মহিলাটির স্বামীর কথা ভাবছি আমি।

জীবনলাল : স্বামীর কথা ভাববার সুযোগ নেই। আমি ওঁকে একটু চিনি— মিস সুহাসিনী সেন। কনফার্মড হেড অ্যাসিসটেন্ট, গভরমেন্ট অফ ইন্ডিয়া...এবার বোধহয় সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন...

ইন্দুমাধব : সারাক্ষণ মুড়মুড়—যেন আমাকে খাটো করবার জন্যে...

জীবনলাল : একে রোজগেরে, তায় আইবুড়ো মহিলা—একটু গোঁ হয়...আপনি বরং...। জীবনলাল এবার সীট পাল্টাবার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না।

ইন্দুমাধব জানালেন এখন সরে গেলে মহিলা ভাববেন হেরে পালিয়েছে—হেরে যাওয়াটা আমাদের বাজে-শিবপুরের শ্যামদের অভিধানে নেই।

ফাংশনের শেষে ইন্দুমাধবের দেখা মেলেনি। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডের

কাছে জীবনলাল ও সুহাসিনীর আবার দেখা হয়ে গিয়েছে। সুহাসিনীর মুখে তখন বিজয়িনীর দম্ভ—দেড় প্যাকেট পোটাটো চিপস চর্বণ করেছেন, কেউ বাধা দিতে পারেনি!

সুহাসিনী : এতো পোটাটো চিপস হোল লাইফে খাইনি! ভদ্রলোককে শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে এই যা। সেকেন্ড হাফে দু'একবার আড়চোখে তাকিয়ে ভদ্রলোক ভিতরে-ভিতরে ফুঁসতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তাই যখন কণিকার গান শুরু হলো তখন কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে পোটাটো চিপস চেবানো বন্ধ রাখলাম।

বিজয়িনী সুহাসিনী এবার হেসে ফেললেন : আজ বাড়ি গিয়ে ভদ্রলোক বউ ঝি-এর ওপর একচোট নেবেন। মেজাজখানা যা হয়ে থাকবে।

জীবনলাল : একটু ভুল হয়ে গেলো, সুহাসিনী দেবী। ওঁকে একটু চিনি আমি। উনি অফিস সুপার ইন্দুমাধব শ্যাম, চিরকুমার। অরিজিন্যাল বাজে-শিবপুরের, এখন চেতলায় নিজস্ব বাটি নির্মাণ করেছেন। সব ভাল, খুব গুছনো লোক, কিন্তু নিজের জীবন সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই—ওই ইনকাম লেভেলে মাত্র দু'হাজার টাকার জীবন বীমা ভাবা যায় না! ভাল প্রপোজাল দিতে গিয়ে বিতাড়িত হলাম—ব্যাচেলরদের নাকি লাইফ রিস্ক নেই।

বাড়িতে এসে ইন্দুমাধব প্রেক্ষাগৃহের অপ্রিয় অভিজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। "এদেশে মেয়েরা কালে কালে কী হচ্ছে?"

নির্মোকের স্ত্রী মালিনী বলেছে, "এ আপনাদের কী অন্যায়! বাইরে বেরিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো এক প্যাকেট পোটাটো চিপস খাবে মেয়েরা তাতেও আপত্তি।"

"খাবার স্থান কাল পাত্র ভেদ আছে," বলতে গেলেন বিরক্ত ইন্দুমাধব।

সাহিত্যিক নির্মোক বললেন, "অন্য দেশ হলে প্রচণ্ড রাগের পর হয়তো ওই প্যাকেট থেকে তোমাকেও চিপস ভাগ করে খেতে দেখা যেতো। কিন্তু ইন্দুমাধব, তোমাকে তো ছোটবেলা থেকে জানি ব্যাপারটা

কল্পনা করাও সম্ভব নয়।”

ইন্দুমাধব কিন্তু নরম হলেন না, পরের দিনই সংবাদপত্রে চিঠি পাঠালেন ফাংশনে সিগারেটের সঙ্গে পোটাটো চিপসের বিক্রি নিষিদ্ধ করার সাজেশন দিয়ে।

চিঠিটা যথাসময়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো এবং দু'একদিনের মধ্যে একটি তপ্ত প্রতিবাদ পত্রও প্রকাশিত হলো। পোটাটো চিপসকে সমর্থনের পর, পুরুষদের ব্যাগ নিয়ে বক্রোক্তি—ফাংশনে এখন পুরুষদের সঙ্গে প্রায়শই যা দেখা যায় তা হলো সুবিশাল ট্রাংক—অ্যাটাচি কেস নয়! ঝাড়া হাত পা হয়ে গানের আসরে এলে ক্ষতি কী? পত্রলেখিকা : সুহাসিনী সেন।

প্রসঙ্গের অবতারণা হলে নির্মোক রায় বললেন : সামান্য ব্যাপারে এতো উত্তেজিত হবার প্রয়োজন নেই। ট্রামে বাসে বা কোনো সদনে কারও পাশে পুনর্বার বসবার সম্ভাবনা ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন। সুতরাং একবার কার সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে তা নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাথা ঘামানোর মানে হয় না।

নির্মোক রায় ম্যাথামেটিকসের ছাত্র—যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। তাই কয়েক সপ্তাহ পরে ইন্দুমাধব যখন অফিস মেলে আবার একটি অনুষ্ঠানের টিকিট পেলেন তখন তিনি কোনোরকম চিন্তিত হলেন না।

এবারে অন্য সভাগার—বিষয় একটি বিখ্যাত নৃত্যনাট্য। এই নাটকটি বেশ কয়েকবার দেখেছেন ইন্দুমাধব, কিন্তু বিনামূল্যে আবার দেখবার লোভ দমন করতে পারলেন না।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান গৃহে নিজের আসনটি খুঁজে পেয়ে বসতে গিয়ে ইন্দুমাধবের মাথা ঘুরে গেলো। পাশের সীটেই কাকে দেখেছেন তিনি? সেই মহিলাটি না? যে-মহিলা সেদিন ওইভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেজাজটা নষ্ট করে দিল, ইন্দুমাধবের বক্রদৃষ্টিকে কোনোরকম তোয়াক্কা করলো না। এবার শাড়ির রঙ পাল্টেছে—আজ একখানা ময়ূরকণ্ঠী রঙের কটকী তাঁত পরেছে এই মহিলা, কিন্তু সেন্টের গন্ধ যে একই তা বুঝতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এক মুহূর্ত সময় লাগলো না।

বিরক্ত ইন্দুমাধব আড়চোখে খোঁজ করতে লাগলেন, আজও

মহিলার কোলে পোটাটো চিপসের কোনো প্যাকেট আছে কিনা। ও-পক্ষ থেকেও বোধহয় পর্যবেক্ষণ চলছিল, কারণ দুটি তীর্যক দৃষ্টি হঠাৎ মাঝপথে হেড-অন সংঘর্ষ বাধিয়ে বসলো!

স্বস্তির নিশ্বাস নিলেন ইন্দুমাধব—আজ পোটাটো চিপস বা চীনেবাদাম কিছুই নেই। তার বদলে দু' টাকা দামের একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান স্মরণিকা কটকী শাড়ির ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে।

কিন্তু ইন্দুমাধবের মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। কী করে ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন এই অঘটন ঘটলো? এর পিছনে কি কোনো রহস্য আছে? না, ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়? এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, বিভিন্ন রহস্যকাহিনী গোগ্রাসে গেলবার প্রাচীন অভ্যাস আছে ইন্দুমাধবের।

আর সুহাসিনী দেবীর অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়—কুসুমিকা কর নামক বজ্রাদপী এক মহিলা পুলিশ এস-আই-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা। কলকাতার দুষ্টু পুরুষ সমাজের নারী নিগ্রহের নানা সুপরিকল্পিত কাহিনী কুসুমিকার মাধ্যমে সুহাসিনীর সুপরিচিত।

এই মুহূর্তে সুহাসিনীর মনে একটি মাত্র প্রশ্ন : কেমনভাবে এই দুর্বিনীত পুরুষটি আজ আবার ঠিক পাশের সীটটি সংগ্রহ করলো? কুসুমিকা, তুমি এখন কোথায়? কুসুমিকা এখন কাছে থাকলে সুহাসিনী অবশ্যই একটু স্বস্তিবোধ করতেন।

হল-এ তিল ধারণের জায়গা নেই। এক হাজার লোক তো হাতের গোড়ায় রয়েছে, সুতরাং ভয় কী? নারীর আর্তস্বরে সাড়া দিতে কলকাতার নাগরিকদের তুলনা নেই—এ কথা বহুবার বহু জায়গায় লক্ষ্য করেছেন কুসুমিকা। সুতরাং কিছুতেই ভয় পেয়ে নিজেকে আরও দুর্বল করবেন না সুহাসিনী।

ইন্দুমাধব শুধু অঙ্কের দিক থেকে একই নারীর পাশে, একই মাসের মধ্যে, আসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরন্তর বিবেচনা করে চলেছেন। না, 'ল অফ প্রোব্যাবিলিটি' ছাড়াও অন্যকোনো অঘটন হয়তো কাজ করছে। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান এমন কিছু কঠিন নয়—কারণ রহস্যের অন্যপ্রান্ত তো পাশের সীটেই অবস্থান করছেন।

ইন্দুমাধব ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে, জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু যদি না মনে

করেন, এ-টিকিট আপনি কোথায় পেলেন?"

সামান্য প্রশ্নের উত্তরে এবার বিস্ফোরণের পালা। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে পুলিশ সাব-ইনসপেকটর কুসুমিকা অপরিচিত পুরুষ বিতাড়নের যে গোপন শিক্ষাটি দিয়েছেন তার প্রথম কথাই হলো : কোনোরকম পাত্তা দেবে না। প্রথম সুযোগেই রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করতে হবে।

সুহাসিনী প্রবল আক্রোশে গোলাবর্ষণ করলেন, "তাতে আপনার দরকার?" নড়েচড়ে বসতে গিয়ে তাঁর কোলের প্রোগ্রাম-পুস্তিকা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইন্দুমাধব এক মুহূর্ত অসহায়ভাবে বসে রইলেন। যা অপমান হবার তা তো হয়েছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা যেভাবে তাকাচ্ছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে বইটি পড়ে যাওয়ার জন্যে ইন্দুমাধবকেই তিনি সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করছেন।

ইন্দুমাধব এবার ঝুঁকে পড়ে বইটি সীটের তলা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে অঘটন ঘটালেন। তাঁর চশমাটি ছিটকে পড়লো। ফ্রেমটা যে এতো লুজ হয়ে পড়েছে তা খেয়াল ছিল না।

সুহাসিনীর বইটি যদিও উঠে এলো, কিন্তু ইন্দুমাধবের চশমার খোঁজ নেই। ঠিক সেই সময় প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিভে গেল।

এমন বেখাপ্পা অবস্থায় ইন্দুমাধব কখনও পড়েননি। বিরক্তিতে সমস্ত দেহ জ্বলছিল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মধুর নারীকণ্ঠ শোনা গেল, "ভাববেন না। একটু অপেক্ষা করুন, চশমা পেয়ে যাবেন।"

বেচারা ইন্দুমাধব চশমা ছাড়া সম্পূর্ণ অসহায়। "আমি যে কিছুই দেখতে পাই না।" করুণভাবে স্বীকার করলেন তিনি।

ইন্দুমাধবের কাতরোক্তিতে তৎক্ষণাৎ ফল হলো। পট করে পাশের সীটের সঙ্গিনীর হাতে ছোট্ট একটি টর্চ জ্বলে উঠলো এবং অচিরেই সেই টর্চ ইন্দুমাধবের হাতে সরে এলো এবং স্বয়ং সুহাসিনী ঝুঁকে পড়ে অক্ষত অবস্থায় ইন্দুমাধবের চশমা উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন।

চশমা ফিরে পেয়েই খুশী ইন্দুমাধব। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর কোনো অপ্রিয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে চান না তিনি।

একটু পরেই পাশের সীটে আবার হাতব্যাগ খোলার শব্দ—সেলাফেন প্যাকেটে পোটাটো চিপস-এর সরব উপস্থিতি ইন্দুমাধবকে

নিরাশায় ভরিয়ে তুললো। কিন্তু কাকে বিরক্তি দেখাবেন ইন্দুমাধব?

বিরতির সময় দ্বিগুণ আওয়াজ করে সুহাসিনীর আলুভাজা সেবন চলেছে। ইন্দুমাধব মেজাজটা হাল্কা করবার জন্যে একবার হলের বাইরে ঘুরে এলেন।

কী আশ্চর্য! আজও আবার জীবনলাল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। "আপনি কি কোনো ফাংশন বাদ দেন না?" জিজ্ঞেস করলেন ইন্দুমাধব।

বিনয়ে বিগলিত জীবনলাল বললেন, "এক একজনের এক একটা বাতিক জন্মে যায়—বুঝতেই পারছেন।"

ইন্দুমাধবের সঙ্গে পুনর্বার অন্তরঙ্গ হবার এই সুযোগটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন জীবনলাল।

"লাইফের রিস্ক সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা, মিস্টার শ্যাম।" শান্ত ও দার্শনিকভাবে প্রশ্ন করলেন জীবনলাল।

ইন্দুমাধব ঝটিতি উত্তর দিলেন, "ফোগলার যেমন দাঁত তোলার ভয় নেই, বন্ধ্যার যেমন পুত্রশোকের দুশ্চিন্তা নেই, তেমনি ব্যাচেলারের লাইফ রিস্ক নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ভগবান প্রত্যেক অভাগাকে কিছু স্পেশাল সুবিধে দিয়েছেন, বুঝলেন মিস্টার চ্যাটার্জি।"

কোনোরকম তথ্যের মধ্যে গেলেন না ঝানু সেলসম্যান জীবনলাল। "কেমন দেখলেন?" শুধু কথার কথা জিজ্ঞেস করলেন ইন্দুমাধব।

"শুধুই দেখছি, গান কানে আসছে না—শুনছি কেবল পোটাটো চিপস চিবনোর শব্দ। সভাগারে ওই জিনিসটা নিষিদ্ধ না-হলে এদেশের গানবাজনার উন্নতি হবে না!"

একখানা সিগারেট শেষ করে ইন্দুমাধব যখন নিজের সীটে ফিরলেন তখন পোটাটো চিপসের প্যাকেট শেষ। পাশের সীটে প্রায় শ্মশানের নীরবতা! চশমাটি চোখ থেকে খুলে আলোর দিকে ধরে দেখতে লাগলেন ইন্দুমাধব।

বেচারার চশমাটা ফাটলো কিনা কে জানে! একটু মায়া হচ্ছে সুহাসিনীর।

চশমা পরীক্ষায় ব্যস্ত ইন্দুমাধবের এবার বিস্মিত হবার পালা। নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। পাশের সীটের

দুর্বিনীতা মহিলা বলছেন, "আপনি যেন কী জানতে চাইছিলেন তখন?"

অভিমানহত ইন্দুমাধব চুপ করেই রইলেন। সরল মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তার উত্তরে ঝাঁঝালো কথা শুনেছেন।

প্রশ্ন রিপিট করতে হলো না। সুহাসিনী বললেন, "টিকিট কিনিনি—আপিসে ডাকে ফ্রি পেয়েছি।"

"এ্যাঁ। আমারও তো একই অবস্থা। আপিসের ঠিকানায় কমপ্লিমেন্টারি এসেছে।"

"কী আশ্চর্য! কোন আপিস?"

প্রশ্নের উত্তরে ইন্দুমাধব গড় গড় করে সব বলে গেলেন এবং তার পরিবর্তে পাশের সীট থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পেলেন।

"আপনার চশমার কিছু হয়নি তো?" সুহাসিনীর প্রশ্ন।

"হলেও কিছু এসে যায় না—পাল্টাবার সময় হয়েছে," ইন্দুমাধব তখনকার মতো পরিস্থিতি রক্ষা করলেন।

শোয়ের শেষে বাড়ি ফেরার পথে জীবনলালের মনে হলো ওঁদের দু'জনকে একই সঙ্গে বাস স্ট্যান্ডের কাছে মিনিবাসের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখলেন।

দু' সপ্তাহ যায়নি। আবার একটি বিখ্যাত হলের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ডাকে আসছে। ইন্দুমাধব এবার রীতিমত চিন্তিত।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা না-করে তিনি পারলেন না। "এ-রকম ভূতুড়ে ব্যাপারে কখনও পড়েছো? একই লোকের পাশে একবার নয় দু'বার তোমার সীট পড়ছে?"

নির্মোক রায় বাস্তববাদী গল্প লেখক। বললেন, "একটা পর্যন্ত চান্স মিটিং গল্পে বরদাস্ত করা যায়—কিন্তু তার থেকে বেশী সাক্ষাৎকার এখন হিন্দী সিনেমাতেও সাহস করছে না।"

"কিন্তু চান্স ছাড়া আর কী? পরপর দু'বার দুটো বিভিন্ন হলে দুটো আলাদা শোতে একই পার্টির পাশে আমার সীট পড়লো। ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন চান্স! কিন্তু আবার একটা টিকিট এসেছে। আবার যদি...আমার ভয় হচ্ছে..."

"অযথা বাজে ভাবনাচিন্তা করছো," সাহস দিলেন নির্মোক রায়। "স্ট্যাটিসটিকস-এর ফর্মুলা অনুযায়ী ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন এমন হতে

পারে না।”

হতে পারে না বটে, কিন্তু কেন জানি না মনোবল পাচ্ছেন না ইন্দুমাধব। ইন্দুমাধব এখন বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করবেন না। মনে সন্দেহ থাকলে টিকিটটা ছিঁড়ে ফেললেই পার্ট চুকে যায়। কিন্তু প্রাণ ধরে তাও পেরে উঠছেন না ব্যাচেলর ইন্দুমাধব। পরিবর্তে আর একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে যাচ্ছে।

সেই অনুযায়ী ইন্দুমাধব বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং রবীন্দ্রসদনের অ্যাডভান্স বুকিং কাউন্টার থেকে একখানা সিংগল টিকিট কেটে নিলেন। কমদামের এই টিকিটে সীট নাম্বার অন্য টিকিট থেকে বেশ দূরে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হলেন ইন্দুমাধব।

নির্ধারিত সন্ধ্যায় একটু দেরিতেই রবীন্দ্রসদনে এলেন ইন্দুমাধব শ্যাম। ডবল টিকিটে সিংগল প্রবেশ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে এই প্রথম—কিন্তু উপায় কী?

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন চান্স—কিন্তু ওইটুকু চান্স নেবেন না ইন্দুমাধব। পয়সা খরচ করা টিকিটে নতুন সীটে বসে ইন্দুমাধব ছটফট করছেন, ইচ্ছে একবার গিয়ে পঞ্চম রো-এর ‘ডি’ মার্কা সীটখানা দেখে আসেন—এবং লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন পাশের সীটে কে বসে আছেন।

অন্ধকার হবো-হবো। ইন্দুমাধব আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। পিছনের সীট থেকে বেরিয়ে গুটি-গুটি সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। পঞ্চম রো-তে এসে পড়েছেন ইন্দুমাধব—যা সন্দেহ করেছেন ঠিক তাই! দু’খানি সীট পাশাপাশি খালি পড়ে রয়েছে। সমস্ত সীটে লোক বোঝাই শুধু দু’খানা পাশাপাশি সীট খাঁ খাঁ করছে!

যা ভয় পেয়েছিলেন তা হলে তাই, আলাদা টিকিট কেটে তা হলে ভালই করেছেন ইন্দুমাধব। কিন্তু মনের মধ্যে তবু কীরকম একটু মুচড়ে উঠলো। ইন্দুমাধবের সীটখানা না হয় খালি থাকুক, কিন্তু পাশের সীটখানা খালি কেন?

কী হলো ওখানে? কী হতে পারে? ওই ভদ্রমহিলা কি ইচ্ছে করেই একই ভয় পেয়ে আজ এলেন না? না দ্বিতীয় আসন খালি থাকাটা নেহাতই কাকতালীয়। রহস্যসন্ধানে অপারক ইন্দুমাধব ধীরে ধীরে

নিজের অন্য আসনের দিকে ফিরে চললেন।

একটু পরে জীবনলাল চ্যাটার্জিকেও পাঁচ নম্বর সারির কাছাকাছি দেখা গেলো। যেন কিছুই জানেন না এইভাবে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। পাশাপাশি দু'খানা সীট খালি দেখে তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এমন তো কথা ছিল না। একটু আগেই তো সুহাসিনী সেনকে বেশ সাজগোজ করেই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন তিনি।

জীবনলালের মুখ শুকনো দেখে হলের অন্য প্রান্তে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? ওরকম মুখ বেজার কেন? পকেট-টকেট মারা গেল নাকি?"

বিরক্ত জীবনলাল মিনতি করলেন, "এখন জ্বালিও না ভাই—রুজি রোজগারের ব্যাপার। খুবই চিন্তায় আছি।"

জীবনলাল পঞ্চম সারি থেকে বিদায় নেবার একটু পরেই সুহাসিনী দেবী পা টিপে টিপে সেখানে হাজির হলেন। পুলিশের লেডি এস আই কুসুমিকার পরামর্শমতো সুহাসিনী অন্য একটি টিকিট কেটে অন্যত্র বসেছেন। কিন্তু কৌতূহল নিবারণে অসমর্থ হয়ে একবার পঞ্চম সারিটি দেখতে এসেছেন। সুহাসিনীর সীট খালি থাকবেই, কিন্তু পাশের সীটটাও খাঁ খাঁ করছে দেখে হঠাৎ সুহাসিনীর বুকের ভিতরটা হা-হা করে উঠলো।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। ইন্দুমাধব আজ মন দিয়েই নজরুলগীতি শুনছেন। কোথাও কোনো বাধা নেই—কিন্তু অস্বস্তি বাড়ছে ইন্দুমাধবের। মনে হচ্ছে পোটাটো চিপসের একটু আধটু ব্যাকগ্রাউন্ড আওয়াজ থাকলে খুব একটু কিছু অসুবিধে হতো না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, একটু পরে মানসকর্ণে ইন্দুমাধব শুনতে লাগলেন—কে যেন তাঁর ঠিক পাশে বসেই কুড়মুড় কুড়মুড় করে মুচমুচে আলুভাজা চিবোচ্ছে।

বিরক্তভাবে তাকাতে গিয়ে ইন্দুমাধব দেখলেন কাছাকাছি কোথাও আলুভাজা নেই—সব শ্রোতাই গানে বিভোর হয়ে রয়েছেন।

চোদ্দ নম্বর সারিতে বসে-থাকা সুহাসিনী সেন-এর বিব্রত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই আজ। দু'পাশেই দুই মধ্যবয়সিনী মহিলা—তাঁরা এক মনে গান শুনছেন। সুহাসিনী তখন মানসনেত্রে শুধু পাঁচ নম্বর সারির দু'খানা শূন্য আসন দেখতে পাচ্ছেন আর ভাবছেন, দ্বিতীয় আসনটিতে কে অনুপস্থিত আজ?

ঝোঁকের বশে ব্যাগের মধ্যে আজও এক প্যাকেট পোটাটো চিপস রেখেছিলেন সুহাসিনী—কেউ কোনো কাজে বাধা দিলে সুহাসিনীর মেজাজ ঠিক থাকে না, সেই কাজটা করবার জন্য গোঁ বেড়ে যায়। কিন্তু এখন মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠছে সুহাসিনীর—কী ভেবে পোটাটো চিপসের প্যাকেটটা টুক করে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপরও মাথাটা কেমন করছে, গানের একটা কলিও মাথায় ঢুকছে না।

এদিকে ইন্দুমাধবও শান্তিতে সীটে বসতে পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যেই পা টিপে টিপে হলের বাইরে বেরিয়ে এলেন। একটা সিগারেট ফুঁকলেন, ভেন্ডারকে দেখে হাঁক পাড়লেন। তারপর হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একুশ নম্বর সারির কাছে উপস্থিত হলেন ইন্দুমাধব। কিন্তু ওঁর পা দুটো ওই সারিতে ঢুকতেই রাজী হলো না। ইন্দুমাধব পা টিপে-টিপে অন্ধকারের মধ্যে পাঁচ নম্বর সারির দিকে এগিয়ে গেলেন—নম্বরটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ফাইভ 'ডি'। পাশের সীটে কেউ আসুক না আসুক যে কোনো সময়ে ফাইভ ডি-তে বসবার অধিকার অবশ্যই তাঁর আছে।

অন্ধকারের মধ্যে সীটটি সবেমাত্র অধিকার করেছেন ইন্দুমাধব, হঠাৎ বুঝতে পারলেন পাশের সীটটি আর খালি নেই। অন্ধকারের মধ্যে কিছু আন্দাজ করার প্রয়োজন হলো না—চেনা সেন্টের গন্ধ নাসিকারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ইতিমধ্যেই ইন্দুমাধবের মস্তিষ্কে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে।

সুহাসিনী একটু আগেই কোন এক দুর্নিবার আকর্ষণে পাঁচ নম্বর সারিতেই উঠে এসেছেন। পোটাটো চিপসের প্যাকেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

সুহাসিনীর মনে হলো, পাশের ভদ্রলোকের হাতে কী যেন মাঝে মাঝে খড় খড় করে উঠছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এবার সুহাসিনীর অবাক হবার পালা। সুহাসিনী বুঝলেন, ভদ্রলোক আপনমনে একটা পোটাটো চিপসের প্যাকেটকে অত্যন্ত সাবধানে আদর করছেন।

ওদিকে স্টেজে তখন প্রেমময় গীতিনাট্য দারুণ জমে উঠেছে। সুহাসিনী জানেন, ইন্দুমাধববাবু কিছুতেই আজ প্রথম কথা বলবেন না। ফিস ফিস করে সুহাসিনী প্রশ্ন করলেন, "এতো দেরিতে?"

মুগ্ধ ইন্দুমাধব মিষ্টি করে খুব লজ্জার সঙ্গে বললেন, "এই একটু দেরি হয়ে গেলো।" যেন দেরি করে এসে তিনি সত্যিই ভীষণ অপরাধ করেছেন।

উসখুস উসখুস করছেন ইন্দুমাধব শ্যাম। কিছু একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন। বোকার মতো তিনি একবার বলে বসলেন, "আপনার পোটাটো চিপস?"

বেশ রাগ হচ্ছে সুহাসিনীর? সত্যি কথাটা কিছুতেই তিনি প্রাণ খুলে বলতে পারবেন না। সুহাসিনী বললেন, "হাতেই ছিল, অন্ধকারে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলো।"

"পড়ে গেছে তো কী হয়েছে! এই নিন, আর একটা," এই বলে পোটাটো চিপসের নতুন প্যাকেটটা ইন্দুমাধব এগিয়ে দিলেন নির্বাক নিস্তব্ধ সুহাসিনী সেনের দিকে।

এর পরের ঘটনা অতি সামান্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দুমাধব শ্যাম ও সুহাসিনী সেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিজেদের তালিকাভুক্ত করেছেন। সব সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গিয়েছে, শুধু ওই কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের রহস্যটুকু ছাড়া।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের মতে ওটা নিতান্তই আকস্মিক—ভবিতব্যের ইচ্ছা! কিন্তু লেডি এস আই কুসুমিকা কর-এর সন্দেহ অন্য—তার ধারণা ইন্দুমাধব অবশ্যই সুহাসিনীকে অন্য কোথাও দেখেছিলেন এবং সব জেনেশুনেই এই যুগল কমপ্লিমেন্টারি সীটের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করেছিলেন।

এবিষয়ে নববিবাহিতা সহধর্মিণীর সন্দেহ যখন তুঙ্গে এবং স্বয়ং ইন্দুমাধব শ্যাম যখন নিজেই রহস্য উন্মোচনে অসমর্থ সেই সময় জীবন-বীমা প্রতিনিধি জীবনলাল চ্যাটার্জি বাড়িতে সশরীরে আবির্ভূত হলেন।

জীবনলালকে দেখে ইন্দুমাধব একটু বিরক্ত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একগাল হেসে জীবনলাল বললেন, "'লাভের সঙ্গে সারাজীবন' এই তো আমাদের কোম্পানির পলিসি।"

"মানে?" বিরক্ত ইন্দুমাধব অনাহুত অতিথির দিকে তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন।

মাথা চুলকে জীবনলাল উত্তর দিলেন, "মানে আর কি—উইথ

প্রফিট হোল লাইফ! পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে পলিসির কথা আপনার ভাবাই উচিত নয়।"

ইন্দুমাধব পত্রপাঠ জীবনলালকে বিতাড়নের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সীমন্তে মোটা সিঁদুর লাগিয়ে বসবার ঘরে সুহাসিনীর প্রবেশ। "আরে জীবনবাবু যে! সেই তো রবীন্দ্রসদনে দেখা হলো।"

কোনো কথা শুনলেন না সুহাসিনী শ্যাম। মিষ্টিমুখ না করিয়ে আজ ছাড়বেন না জীবনলালকে।

চেতলার বিখ্যাত চমচম এগিয়ে দিতে দিতে সুহাসিনী মৃদু হেসে বললেন, "আপনাকে আমার সাক্ষী হিসেবে দরকার হতে পারে। আমার বান্ধবী পুলিশের কুসুমিকা কর অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে। আমাদের সন্দেহ মিস্টার শ্যাম আগে কোথাও আমাকে দেখেছিলেন এবং তার পরেই হল-এ পাশাপাশি সীট..."

বেচারা ইন্দুমাধব দুর্বল প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কোনোরকম পাত্তা পেলেন না। জীবনলালকে সুহাসিনী শ্যাম বললেন, "কুসুমিকা হয়তো আপনার স্টেটমেন্টও নেবে।"

জীবনলাল এবার করজোড়ে রহস্য উন্মোচন করে বললেন, "মিস্টার শ্যামকে আপনি অযথা শাস্তি দেবেন না। মিস্টার শ্যাম যেদিন আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনই কাগজে পড়লাম—জাপানে বীমা কোম্পানির এজেন্টরা হেভি ইনসিওর করানোর প্রত্যাশায় গোপনে ঘটকালী করে। আমারও গোঁ চেপে গেল।...মিস্টার শ্যামের ক্ষেত্রে কোনো গোপন রহস্য নেই—পাশাপাশি সীট দেখে ফাংশনের টিকিটগুলো আমিই পাঠিয়েছি—উপায় ছিল না—বিজনেসের লোভে..."

মুখ লাল করে ইন্দুমাধব রেগেমেগে জীবনলালকে আবার বাড়ি থেকে বিদায় করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুহাসিনী শ্যাম হুঙ্কার ছাড়লেন, "ওঁর কোনো কথায় কান দেবেন না, জীবনবাবু—এ বাড়ি এখন ওঁর একার নয়। আপনি প্রপোজাল ফর্ম লিখে ফেলুন—ফিফটি থাউজেন্ড রুপিজ 'জীবনসাথী' উইথ প্রফিট হোল লাইফ।"

[গ্রন্থসূত্র
চেনা মুখ জানা মুখ]

আমার দিদিমা ও মিসেস্ জেনিংস

চাঁপার মা ও মিসেস্ উডফোর্ডের মতোই আর একটি আশ্চর্য জোড় আমার দিদিমা ও মিসেস্ জেনিংস।

আমেরিকা ভ্রমণে এসে যে ক'জন মানুষের সঙ্গে আমার দীর্ঘস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল মিসেস্ জেনিংস নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতমা। মিসেস্ জেনিংস আমাকে সিয়াট্‌ল শহর ঘুরে দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এক পলকের সেই দেখা থেকে আমরা দু'জন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। দু'জনে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ভাব হবার একটা কারণ, মিসেস্ জেনিংসকে দেখেই দিদিমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

এখন থেকে অনেকদিন আগে ১৯০৫ সালে হুগলী জেলার রঘুনাথপুর গ্রামে এবং মধ্য-পশ্চিমে আমেরিকার ওমাহাতে দুটি ফুটফুটে ফরসা মেয়ে প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। একজনের নামকরণ হয়েছিল গোলাপসুন্দরী, আরেকজনের রোজালিন্ড।

গোলাপসুন্দরী যথাসময়ে, অর্থাৎ চোদ্দবছর বয়সে, ঘটকের মাধ্যমের পাত্রস্থ হয়েছিলেন ভদ্রকালীতে। পাত্র আমার মায়ের কাকা শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদিমা ভীষণ মা-কালীর ভক্ত। তাই এখনও দুঃখ করে বলেন, "এমন কপাল করে এসেছিলুম যে চোদ্দ বছর বয়স থেকে মায়ের নাম করাও বন্ধ হলো।" কলকাতার কালীঘাটে যেতে হলে দিদিমাকে জিভ বার করে কালীঠাকুরের পোজ দেখিয়ে বলতে হতো, "অমুকের" ঘাটে যাচ্ছি।

মিসেস্ জেনিংসকে দিদিমার এই ব্যাপারটা বলেছি। মিসেস্ জেনিংস বিশ্বাস করেননি। বলেছেন, "ডোন্ট কিড্ মি। অর্থাৎ আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কোরো না। স্বামীর নামটাই বিবাহিতা মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়—সেই নাম তোমার দিদিমা বাদ দেবেন কেন?" তারপর মিসেস্

জেনিংস যা বলেছিলেন তার অর্থ হলো, "ওঁদের দাম্পত্যজীবনে তাহলে নিশ্চয় কোনো গোলমাল এসেছিল।"

এই সন্দেহের ব্যাপারটা দিদিমার কাছে রিপোর্ট করিনি। করলে কী ধরনের বিস্ফোরণ হতো তা আমার জানা আছে। কিন্তু দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছি, "স্বামীর নাম করতে আপত্তি কী?"

দিদিমা বলেছেন, "তোমাদের আর কী, বলেই খালাস। আর আমি স্বামীর নাম মুখে এনে নরকে গিয়ে ভাজা-ভাজা হই।"

আমি মিটমিট করে হেসে বলেছি, "কিন্তু দিদিমা, তুমি যে রেগে আমার দাদুকে মিন্‌সে বলো, তার বেলায়?"

দিদিমা তেড়ে-মেড়ে বিছানার ওপর উঠে বসেন। "মিন্‌সেকে হাজার বার মিন্‌সে বলবো। লজ্জা করে না? অনাথা মাগকে ফেলে কেটে পড়লি! তোর আর কী, ওখানে বলে স্বর্গসুখ ভোগ করছিস, আর আমি থান কাপড় পরে কাঁচকলা সেদ্ধ খেয়ে সংসারের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছি।"

কম বয়সে দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলে নিয়ে দিদিমা বিধবা হয়েছিলেন। দাদুর একটা ম্লান অস্পষ্ট ছবি দেওয়ালে টাঙানো আছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দিদিমা বলেন, "দাঁড়াও মিন্‌সে তোমার সুখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। একবার গিয়ে পৌঁছই, তখন হাড় ভাজা-ভাজা করে ছাড়বো।"

দিদিমার এ-গল্পও মিসেস্ জেনিংসকে বলেছি। মিসেস্ জেনিংস বুঝে উঠতে পারেননি। তখন আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, "দিদিমার বিশ্বাস, বিয়েটা জন্মজন্মান্তরের। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরজন্ম আবার গোলাপসুন্দরী খপ্পরে পড়বেন, তখন দিদিমা শোধ তুলবেন।"

মিসেস্ জেনিংসকে বলেছি, "দিদিমা থান কাপড় ছাড়া পরেন না, মাছ-মাংস-পেঁয়াজ স্পর্শ করেন না, একবেলা খান এবং ষষ্ঠী, একাদশী, অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদির নাম করে মাসের অর্ধেক দিন উপবাসী থাকেন।" মিসেস্ জেনিংস দুঃখ করে বলেছেন, "পুওর গোলাপ সুনডারি। লাইফের সাধারণ সুখ থেকে তোমার দিদিমা নিজেকে বঞ্চিত করতে গেলেন কেন?"

মিসেস্ জেনিংস নিজেকে বঞ্চিত করেননি। আঠারো বছর পর্যন্ত বয়

ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারপর বিয়ে করেছেন পছন্দসই এক ছোকরাকে। মিসেস্ জেনিংস আমার কাছে গল্প করেছেন, "তখন কিন্তু আমাদের চরিত্র বলে একটা জিনিস ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো সেক্সটাকে আমরা ডাল-ভাত করে ফেলিনি। আমার নাতনি বিশ্বাসই করে না যে, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার আগে জনের সঙ্গে আমি বিছনায় যাইনি।"

দেশে ফিরবার পরে আমার কাছে এই গল্প শুনে দিদিমা মাথা চাপড়াতে শুরু করেছেন। "ওরে আমার সতীসাধ্বী রে!" তারপর জিজ্ঞেস করেছেন, "সায়েবদের দেশে সব মেয়েমানুষই কি তাহলে বেশ্যা হয়ে গিয়েছে? কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওদেশে তো যীশুকেষ্ট নাম নিয়ে জন্মেছিলেন!"

দিদিমাকে ঠাণ্ডা করতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। বলেছি, "ছি ছি দিদিমা, সবাই বেশ্যা হতে যাবে কোন দুঃখে? বেশ্যাকে ওরা আমাদের থেকে কম ঘেন্না করে না। তবে যস্মিন দেশে যদাচার।"

"তা বলে বিয়ের আগে স্বামীর বিছানায় যাবে? কী লজ্জার কথা গো!"

"দিদিমা তোমার পবিত্র বিয়ের কথা মিসেস্ জেনিংসকে বলেছি। সমস্ত খুঁটিনাটি শুনে তাঁর তো আঁতকে উঠে ফেন্ট হবার অবস্থা।"

"কেন?" হাওড়া হাট থেকে কেনা টকটকে লাল রংয়ের গামছা পরে স্নান করে ঢুকবার মুখে দিদিমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন।

"মিসেস্ জেনিংস ভয়ে শিউরে উঠে বলেছিলেন, 'একটা অজানা অচেনা লোক, যার সঙ্গে কোনোদিন কথা পর্যন্ত বলিনি, দুচারটে মন্ত্র বলার পরই আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে সে দরজা বন্ধ করে দেবে।" কিছু মনে করো না, এটা তোমার কাছে অশ্লীল মনে হচ্ছে না? এ-দেশের কোনো মেয়ে অবসিনিটি সহ্য করবে না।"

দিদিমার উত্তর পেতে দেরি হলো না। "স্বামীর সঙ্গে ফুলশয্যা হবে, তাতে অশ্লীলতা কী? আ মলো যা!"

রোজালিণ্ড এবং গোলাপসুন্দরী দু'জনেরই জীবনে বিয়ের পর নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই এতোদিন পরে সে-সবের পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। দিদিমাও ছেলেপুলের মা হয়েছেন, মিসেস্ জেনিংসেরও

ছেলেমেয়ে হয়েছে। তফাতের মধ্যে দিদিমার একটা বিয়ে, মিসেস্ জেনিংসের দুটো। প্রথমে নাম হয়েছিল রোজালিন্ড ব্রাউন। তারপর বিধবা মিসেস্ ব্রাউন বিয়ে করলেন মিস্টার জেনিংসকে।

"একটা বিয়ের পর আবার বিয়ে! মরণ আর কি!" দিদিমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলেন।

দিদিমা যে দাদুর দ্বিতীয় পক্ষ তা কারুর অজানা নয়। বললুম, "বউ মরে গেলে দ্বিতীয় পক্ষ যদি দোষ না হয়, তা হলে বিধবা বিয়েতে আপত্তি কী?"

দিদিমার উত্তর, "সব ব্যাপারে পুরুষমানুষদের সঙ্গে মেয়েমানুষের তুলনা চলে না, ভাই। এমনিভাবে রেষারেষি করলে, কোনদিন মেয়েরা বলে বসবে, পুরুষমানুষ যখন পেটে ছেলে ধরে না, তখন আমরাই-বা গভ্যযন্তন্না ভোগ করবো কেন?"

দিদিমার বক্তব্য শুনে মিসেস্ জেনিংস লিখেছিলেন, "তোমাদের দেশের মেয়েরাও তো হিউমান বিয়িং। তুমি কি বলতে চাও স্বামীর মৃত্যুর পর তোমার দিদিমার মনে কখনও বিবাহিত জীবনের সুখ ফিরে পেতে ইচ্ছে করেনি?"

এই প্রশ্ন দিদিমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছি। দিদিমা আমাকে একটু আস্কারাও দেন। আমার প্রশ্ন শুনে বলেছেন, "বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে বৈকি। বে হবেও শিগ্‌গির। তোরা এসে কত আমোদ-আহ্লাদ করবি। ছাদে মেরাপ বাঁধা হবে। লুচির পাত পড়বে। খোকা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করবে—মাথাটা শুধু কামানো থাকবে এই যা। যমের সঙ্গে বে হবে।"

মিসেস্ জেনিংস আমাকে বলেছেন, "জীবনটাকে যতটা পেরেছি এনজয় করে নিয়েছি। কানাডা, ইয়োরোপ অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ঘুরেছি। শুধু ইন্ডিয়ার তাজমহল দেখতে পেলেই আর কোনো দুঃখ থাকতো না। সেই সঙ্গে দিল্লীর মতিমহলে তন্দুরী-চিকেন টেস্ট করার ইচ্ছে আছে।"

দিদিমাকে প্রশ্ন করেছি, "দিদিমা তুমি লাইফটা এনজয় করেছো?"

"সে আবার কি জিনিস?' লেখাপড়া-জানা ছেলেময়েরা আজকাল যে কী সব জিজ্ঞেস করে বসে, বুঝি না।"

দিদিমাকে বোঝালাম, "এনজয় মানে উপভোগ করা। প্রাণ যা চায়

সেইসব ফুর্তি করে নেওয়া। মিসেস্ জেনিংস বললেন, "এনজয় না করলে মরবার সময় আপসোস হবে। মরেও শান্তি পাওয়া যাবে না।"

দিদিমা রেগে উঠলেন। "কত পাপ করেছিলাম, তাই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে গেলাম। মরবার পরেও যাতে নরকে জ্বলে-পুড়ে মরি, তার ব্যবস্থাও করতে বলছিস? যম যদি শোনে ভাতারখাগী হয়েও সারাজীবন ফূর্তি করেছি, তা হলে আমাকে কোলে করে সগ্‌গে পৌঁছে দেবে, তাই না?"

"কিন্তু দিদিমা, তোমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

দিদিমা হিসেব করতে বসলেন। "উনি বেঁচে থাকতে কাশী দর্শন করেছিলাম। কেন মিথ্যে কথা বলবো, খোকা আমাকে গয়া, বৃন্দাবন হরিদ্বার ঘুরিয়েছে। কাছের গোড়ায় বাবা তারকেশ্বর অনেকবার দয়া করেছেন। কলকাতার 'ওমুকের'...স্থানও দেখেছি। শুধু বাবা পশুপতিনাথের মাথায় জল ঢালা হলো না। এই একটা ইচ্ছে রয়ে গেলো।"

মিসেস্ জেনিংস এবং দিদিমা কেউ কাউকে দেখেননি। আমি এঁদের মধ্যে যোগসূত্র। আমার মধ্য দিয়েই এঁরা দু'জনে দু'জনকে জানেন—যদিও কাউকে বুঝে উঠতে পারেন না।

দিদিমা আমার নিজের নয়, মায়ের কাকিমা মাত্র। কিন্তু নিজের দিদিমা অনেকদিন গত হওয়ায়, এই দিদিমার কাছেই আদর-যত্ন পেয়েছি। দিদিমার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর খোকামামা, অর্থাৎ কিরণচন্দ্র ব্যানার্জী, দিদিমাকে আগলে বেড়ান। রেলের চাকরিতে বদলি হতে হতে খোকামামা এখন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোয়ার্টার নিয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে দেখা হয় এবং দেখা হলেই দিদিমার সঙ্গে গাল-গল্প চলে।

আর আমেরিকায় না গেলে মিসেস্ জেনিংসের সঙ্গে আলাপই হতো না। সুদূর বিদেশে মিসেস্ জেনিংসের অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি। মিসেস্ জেনিংস কত সহজে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। যেন আমি সত্যিই তাঁর নাতি। সেই থেকে পত্রালাপ আছে। মিসেস্ জেনিংস বড় বড় করে চিঠি লেখেন, ছবি পাঠান, নানা খবরাখবর দেন। আমিও যতদূর সম্ভব উত্তর দিই।

দেশে ফিরে দিদিমার কাছে বোধহয় মিসেস্ জেনিংসের গল্প একটু বেশীই করেছি। কারণ দিদিমা মুখ টিপে টিপে হেসে বলেছেন, "দেখিস ভাই, প্রেমে-টেমে পড়িস নি তো?"

বললাম, "গার্ল ফ্রেন্ড বলতে এতোদিন তুমিই ছিলে, এখন আর একটা হলো।"

"তা কোন্‌টিকে বেশী মনে ধরে?" দিদিমা জিজ্ঞেস করেছেন।

"দু'জন দু'রকম," আমি উত্তর দিয়েছি। "তুমি দিনরাত ঘরের মধ্যে শুয়ে, না হয় বসে থাকো, বড়জোর একটু দরজার সামনে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াও। মিসেস্ জেনিংস দিনরাত টো টো করে ঘোরেন, বাড়িতে প্রায় সবসময় চাবি মারা।"

দিদিমা মুখ কুঁচকে বললেন, "আ মলো যা। বিধবা মাগীকে তোর মামীর মতো পাড়াবেড়ানি রোগে ধরেছে আর কী। সংসার, শাশুড়ী সব ভেসে যাক, কিন্তু তোর মামী পাড়াবেড়ানো ছাড়বে না।"

বউমা-র সমালোচনা একবার আরম্ভ হলে বিপদ। তাই দিদিমাকে অন্য আলোচনায় নিয়ে যাবার জন্য বললাম, "তুমি তো সাদা থান ছাড়া কিছুই পরো না, মিসেস্ জেনিংস কত ঝলমলে স্কার্ট পরেন।"

"কী অনাসৃষ্টি গা!" দিদিমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। "স্বামীখাগীদের জন্যে ভগবান তো সাদা কাপড়েরই ব্যবস্থা করেছেন।"

"বিয়ের দিনে মিসেস্ জেনিংস সাদা গাউন পরেছিলেন, আমি দেখেছি," দিদিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"এ্যাঁ! বে-র দিনে বিধবার সাজ। স্বামীর মুণ্ডু ওই দিনেই চিবিয়ে খায় বুঝি ওরা?" দিদিমা রেগে অস্থির।

দিদিমার জামাকাপড় নিয়েও মিসেস্ জেনিংস সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমার। এসব বিষয়ে মিসেস্ জেনিংসের ভীষণ আগ্রহ। তিনি নিজে সারাক্ষণ সভ্য-ভব্য জামাকাপড়, মোজা, জুতো মাথায় জাল ইত্যাদি পরে থাকেন। আর আমার দিদিমা তো আজকাল খালি-গায়ে থাকেন বললেই চলে। পিত্তির প্রকোপটা বেড়েছে, তাই ব্লাউজটাও অনেক সময় গায়ে রাখতে পারেন না। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার আছে—তাই দিদিমাকে দিনের অনেকটা সময় গামছা পরে কাটাতে হয়। মিসেস্ জেনিংসের স্কার্ট ও দিদিমার গামছার ঝুল প্রায় এক।

মিসেস্ জেনিংসের কাছে এসব কথা বোধহয় আমার খুলে বলা উচিত হয়নি। শুনে তো ওঁর ফেন্ট হবার অবস্থা। বললেন, "জ্ঞানগম্যি হওয়া বয়স্কা মেয়েরাই যখন তোমাদের দেশে এই কাণ্ড করছে, তখন আর আমার নাতনীদের দোষ দিই কী করে—ওরা ব্রা-লেস হয়ে ঘুরে বেড়াবেই তো!" গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন মিসেস্ জেনিংস। বলেছিলেন, "গোলাপ সুনডারি তোমার দিদিমা, সুতরাং আমার বলাটা শোভন নয়—কিন্তু কমবয়সী মেয়েদের সামনে উনি ভালো এগ্‌জামপল রাখছেন না।"

দিদিমাকে এসব কথা বলিনি। দু'জন সমবয়সিনী মহিলার মধ্যে অহেতুক ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে দেওয়াটা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়।

তবে মিসেস্ জেনিংসের সৌন্দর্যচর্চা সম্বন্ধে দিদিমাকে পুরো রিপোর্ট দিয়েছি। মার্কেটে বেরুবার আগে মিসেস্ জেনিংস পাকা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নানা রকম পাউডার, স্নো, লোশন, সেন্ট ইত্যাদির সাহায্যে নিজেকে তৈরি করেন। শুনে দিদিমা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছেন, "রাঁড়ের আবার সাজ!"

ইন্ডিয়ায় যে ভালো লিপস্টিকের দাম অনেক, তা মিসেস্ জেনিংস কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন। বিপদ বাধালেন আসবার দিনে। বললেন, "তোমার দিদিমাকে এই লিপস্টিক তিনটে দিও, উইথ মাই বেস্ট উইশেস।"

শুভেচ্ছা অবশ্যই পৌঁছে দোবো। কিন্তু লিপস্টিক দিদিমা ব্যবহার করবেন না, আমার এই রিপোর্ট পেয়ে মিসেস্ জেনিংস তো বেশ অবাক। পাছে অন্য কিছু ভেবে বসেন সেই জন্যে মিসেস্ জেনিংসকে বলতে হলো, "দিদিমাও সকালে একঘণ্টা ধরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কসমেটিক্স করেন, তবে নিজের জন্যে নয়। লর্ড কৃষ্ণ এবং রাধাকে স্নান করিয়ে, চন্দন কুমকুম ইত্যাদির দিয়ে সাজান।"

সাহেবরা আজকাল আবার লর্ড কৃষ্ণা সম্পর্কে ইন্ডিয়ানদের থেকে বেশী খবরাখবর রাখেন। এঁদের নাম শুনেই মিসেস্ জেনিংস লজ্জায় ব্লাশ করেছিলেন। "লর্ড কৃষ্ণা হচ্ছেন তোমাদের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, আমাদের ডন জুয়ান। যিনি অপরের বিবাহিত ওয়াইফ মিসেস্ রাধা ঘোষের সঙ্গে গোপনে অ্যাফেয়ার চালিয়েছিলেন। তাই না?"

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। কিছু বললেই মিসেস্ জেনিংস বই-পত্তর খুলে আমাকে রেফারেন্স দেখিয়ে বসবেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে মিসেস্ জেনিংস বললেন, "এই ধরনের চরিত্রহীনতা এবং অ্যাডালটরি তোমার দিদিমা প্রশ্রয় না দিলেই পারতেন।"

মিসেস্ জেনিংসকে জেরা করে জানতে পারলাম এর পেছনেও ভারত-বিদ্বেষী অপপ্রচার আছে। একজন পাকিস্তানি ছোকরা মিসেস্ জেনিংসকে মহাভারতের এই 'ক্লিক-বাজ চরিত্রহীন হিন্দু ভদ্রলোকটি' সম্পর্কে অনেক কনফিডেনসিয়াল খবর সাপ্লাই করেছে।

দেশে ফিরে এসে দিদিমার কাছে যেতেই একগাল হেসে তিনি বলেছেন, "কী ভাই, বুড়ী হয়েছি বলে মনে ধরে না বুঝি? সেই যে বললি, একবার তোর দাদুর ঘাট ঘুরিয়ে আনবি, এখন আর উচ্চ-বাচ্য করছিস না।"

মিসেস্ জেনিংস দু'খানা ব্যাগ হাতে একলা এরোপ্লেনে বিশ্বভ্রমণ করেন। দিদিমা বেচারা একলা কোথাও কখনও যাননি। পাশের বাড়িতে যেতে হলেও গার্জেন হিসাবে ছ'বছরের নাতিকে সঙ্গে নেন। রাস্তাঘাটও চেনেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে কালীঘাটে নিয়ে যাবো, প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় দিদিমার মেজাজ ঠাণ্ডা হলো। তখন মিসেস্ জেনিংসের কথা তুললাম, "তিনি তোমাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন।"

দিদিমা বেশ দুষ্টুমিভরা ডিটেকটিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর জেরা শুরু হলো, "বলি, ওদেশের পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঠাকুর-দেবতার খবরাখবর না দিয়ে শুধু একটা মেয়েমানুষের কথা তুলছিস কেন ভাই?"

হেসে বললুম, "মিসেস্ জেনিংস তোমারই বয়সী দিদিমা।"

"হাসলেই বোকা বনছি না ভায়া! বুড়ী মেমরা ছোকরাদের বে করতে ভালবাসে শুনেছি।"

আমি বিনা প্রতিবাদে হাসতে লাগলাম। দিদিমা বললেন, "তা আমার সতীনটি তোকে পাকড়াও করলে কী করে।"

বললাম ব্যাপারটা। দিদিমা এখানে লোকজন ছাড়া বাড়ির বাইরে এক পা বাড়াতে পারেন না ; আর ওখানে মিসেস্ জেনিংস অজানা-অচেনা লোককে শহর ঘুরিয়ে দেখান। পয়সার জন্য নয়, স্রেফ শখ।

নিজের গাড়িতে তেল এবং সময় খরচ করে বিদেশীদের শহর দেখাবার জন্যে মিসেস জেনিংস গভর্নমেন্টের খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছেন। আমাকে শহর দেখাতে গিয়ে এমন স্নেহ করে ফেললেন যে হোটেল ছাড়িয়ে নিজের বাড়িতে এনে তুললেন।

"তারপর?" দিদিমা জেরা চালালেন।

"মিসেস্ জেনিংস বললেন, 'শংকর, তুমি আমাকে রোজালিন্ড বলে ডেকো।' আমি রাজী হলুম না। বললুম, দেশে আমার এক দিদিমা আপনার বয়সী। আপনাকেও গ্র্যান্ডমা বলে ডাকবো।"

"বুড়ী নিশ্চয় খুশী নন। কারণ মেমরা ওখানে কেউ বুড়ী হতে চান না। উনি বললেন, 'বরং তুমি আমাকে 'ডিডিমা' বলে ডেকো।"

জেরার চাপে পড়ে দিদিমাকে মিসেস্ রোজালিন্ডের রঙিন ছবি দেখতে হয়েছিল। দিদিমা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফটো দেখে বললেন, 'মরণ আর কী? বিধবা না সধবা লোকে বুঝবে কী করে?"

বললুম, "সধবা বিধবা বোঝবার কোন উপায় নেই ওখানে।"

উত্তর শুনে দিদিমা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সাধে কী আর বলেছে ম্লেচ্ছ দেশ!"

দিদিমার আরও জ্বলে ওঠবার কারণ ছিল। পরে ছবিটা দেখে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েন আর কী। এই ছবিতে মিসেস্ জেনিংস একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন। দিদিমার কাতরোক্তি, "হা ভগবান, মেয়েমানুষ বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে এও আমাকে দেখতে হলো! ঘোর কলি একেই বলে!"

সিগারেটের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে করতেই দিদিমা মুখে একটু দোক্তা গুঁজলেন। আমি কিছু না বলেই ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। দিদিমা বললেন, "যতই সাহেব হোস, নাতবৌকে যেন সিগারেট ধরাস না।"

"সিগারেট ও দোক্তা তো একই জিনিস দিদিমা", আমি বিনীতভাবে নিবেদন করি।

"ওই মাগী তাই বলেছে বুঝি? ও মাগো! ভূভারতে কে শুনেছে যে বিড়ি-সিগারেট আর দোক্তা এক জিনিস? তাহলে দুধ আর তাড়িও এক জিনিস বল?"

দিদিমার সঙ্গে এরপর তর্ক করা বৃথা।

তবে দেখেছি, দিদিমা ক্রমশ মিসেস্ জেনিংসকে সহ্য করতে আরম্ভ করেছেন। আর মিসেস্ জেনিংসও প্রতি চিঠিতে দিদিমা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছেন। বলতে গেলে দু'জনে দু'জনের ফ্রেন্ড হয়ে উঠেছেন।

দিদিমার সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "তোর সেই মেমসাহেব কেমন আছে? রুজ লিপিস্টিক মেখে মাগী এখনও পাড়া বেড়াচ্ছে নিশ্চয়?"

আমি বলেছি, "সেই রকমই তো রিপোর্ট। মিসেস্ জেনিংস তোমারও খবরাখবর করেছেন, এবং একটা কোশ্চেন করতে বলেছেন। কোশ্চেনটা হলো, এখনও তোমার কী কী ডিজায়ার আছে?"

"ডিজায়ার? সে আবার কী জিনিস বাপধন?" দিদিমা প্রশ্ন করেছেন?

"মানে এখনও তোমার কী কী আকাঙ্ক্ষা আছে?" আমি বোঝাবার চেষ্টা করি।

"লিখে দিস, একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা আছে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যমের হাত ধরে ভেগে পড়ার।"

ইদানীং দিদিমার শরীরটা আরও খারাপ হয়েছে। এবং বাড়ির যা রিপোর্ট, অসুস্থতার অনুপাতেই দিদিমা খিটখিটে হয়ে উঠেছেন।

সেদিন মামার বাড়িতে যেতেই দিদিমা আমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

ইঙ্গিতে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বললেন। বুঝলাম, বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক অভিযোগ জমা হয়ে আছে।

দিদিমা বললেন, "ঘোর কলিকাল—বুড়ো বাপ-মায়ের এখন আর দাম নেই!"

"কী হলো দিদিমা!" আমি প্রশ্ন করি।

"হবে আর কী বাছা! স্ত্রীলোকের ভাতার ছাড়া কেউ নেই। তোর দাদু বেঁচে থাকলে, আজ আমাকে কি এই গাঁটের যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হতো? বিয়ের পর সেবার আমার মাথা ধরেছিল। তোর দাদু অর্ধেক রাত ধরে এমন মাথা টিপে দিয়েছিলেন যে এখনও ভুলতে পারি না। এখন বুড়ী বিধবাকে দেখে কে? একটু বাতান্তক তেল মালিশ করে দেবার সময় এ-বাড়ির কারুর নেই।"

দিদিমার মাথার গোড়ায় ওষুধের শিশি দেখতে পেয়ে বললাম, "ওই যে ওষুধের শিশি দেখছি।"

দিদিমা মুখ বাঁকালেন, "ওসব দায়-সারা। লোকলজ্জার ভয়ে বুড়ীর জন্যে সুধীর ডাক্তারের কাছ থেকে দুটো ট্যাবলেট এনে রাখলো। বড়ি খেয়ে বাতের অসুখ সারে না ভাই। এর জন্যে গরম তেল মালিশ করতে হয়। কিন্তু কে আমার দাসী-বাঁদী আছে বল?"

একটু থেমে দিদিমা বলে চললেন, "খোকার আপিস রয়েছে। বউমা সংসার আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত। নাতিদের ফুটবল খেলা আছে।"

"ডাকছি মামীমাকে", আমি বললাম। কারণ আমি জানি মামীমা যথাসাধ্য দিদিমার পরিচর্যা করেন।

দিদিমা বাধা দিলেন, "ডেকে কোন লাভ নেই। এখনই লোকদেখানো দু'মিনিট মালিশ আরম্ভ হবে। তারপর ভূভারতে সবাই জেনে যাবে, শাশুড়ীর মালিশের জন্যে রান্না দেরি হয়েছে, সোয়ামির আপিসে লেট হয়েছে, ছেলেরা মাস্টারের কাছে বকুনি খেয়েছে।"

"তুমিও ছাড়বে কেন? মামা এলে সমস্ত ফাঁস করে দিও।" আমি পরামর্শ দিই।

"বলি না কি? রোজই তো বলি, কিন্তু কে শোনে? এ-যে ঘোর কলিকাল। কলিকালে মায়ের চেয়ে মাগ বড় হবে একথা মুনি ঋষিরা অনেকদিন আগে বলে গিয়েছেন।"

"মামীর না হয় কাজকর্ম আছে। তার উপর ঝি কামাই করছে দু'দিন। নাতিকে হুকুম করবে", আমি দিদিমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।

"বয়স হোক, তখন বুঝবি ভায়া, আসলের চেয়ে ফাউ আরও পাজি! গাঁটের যন্ত্রণা যে কী জিনিস সে তোদের কী বলবো। গভ্যযন্তন্না তবু সহ্য হয়, কিন্তু এর যে কী কষ্ট! যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নাতিকে মিষ্টি করে বললাম, লক্ষ্মী দাদা আমার, একটু গাঁটগুলো টিপে দে। তা ছোঁড়া ইচ্ছে করে এমন টিপুন দিলে যে ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক দিতে হলো।"

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দিদিমা বললেন, "লোকে ভাববে বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু তুই দেখ, এখনও ফুলে রয়েছে। পুলিশে খবর দিলে ফৌজদারী কেস হয়ে যাবে।"

"মামাকে বলোনি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বলিনি আবার! কিন্তু ওই লোক-দেখানো একটু বকুনি হলো। ছেলে বললে, আমি বুঝতে পারিনি। আর বাপ তাই বিশ্বাস করে গেলো। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ!"

মুখের মধ্যে একটা ছ্যাঁচা পান পুরে দিদিমা বললেন, "সে যুগ আর নেই, যখন মাপ-মাকে ছেলেমেয়েরা দেবদেবীর থেকে বেশী ভক্তি করতো।"

সেদিন মামার বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সাধারণ গেরস্থ সংসার, সব কিছু সামলাতে মামী হিমশিম খেয়ে যান। এরই মধ্যে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে শাশুড়ির সেবা করেন। মামী জিজ্ঞেস করলেন, "কী আলোচনা হলো এতোক্ষণ?"

"বিষয়বস্তু টপ সিক্রেট!" আমি হাসি চেপে উত্তর দিলাম।

"মোটেই গোপন নয়। পাড়ার যাকে পাচ্ছেন তার কাছেই উনি রিপোর্ট করছেন। অথচ কাউকে গায়ে হাত দিতে দেবেন না। রেগে বলেছেন, পা-টেপা আর ময়দা-মাখা এক জিনিস নয়, বাছা।"

এই একই সময়ে এয়ারমেলে মিসেস্ জেনিংসের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, রিউম্যাটিক পেনটা একটু বেড়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ক্লিনিকে গিয়ে রোজ আধঘণ্টা বাতের জন্য ব্যায়াম করছেন। ভাল ফল পাচ্ছেন। ছেলের খুব প্রশংসা করে লিখেছেন, "জন এবং ডটার-ইন-ল যে-ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার তুলনা হয় না।"

দিদিমার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। এবার দিদিমার কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। দরজা বন্ধ করে আমার হাত দুটো ধরে বলেছেন, "আর যা করো ভাই, বাড়িতে হুগলী রঘুনাথপুরের মেয়ে ঢুকিয়ো না। রঘুনাথপুরে ছেলের বিয়ে দিয়ে যে কী গুখুরি করেছি।"

আমি বললাম, "সেকি দিদিমা। রঘুনাথপুরের তো তোমারও বাপের বাড়ি?"

"বাপের বাড়ি বলে সত্যি কথা বলবো না?" দিদিমা কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিলেন.

"হলো কি তোমার?" আমি সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞেস করি।

"আগে হাতে মারছিল, এখন ভাতে মারছে আমায়। বিধবা মানুষ,

ঘাস-চচ্চড়ি খেয়ে তো প্রাণধারণ করি। এখন বলে কিনা চায়ে চিনি দেবে না। দু'বেলা চার চামচ চিনি বাঁচিয়ে ওদের কী লাভ হবে বল তো?"

"ডাক্তার যে তোমাকে চিনি খেতে বারণ করেছে," আমি দিদিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"ওই কথাই ওরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢেলে লাভ নেই। বিধবার বেঁচে সুখ কী? চিনি বন্ধ ক'রে আমাকে আর বাঁচাতে হবে না।"

"মামাকে বলেছো সে কথা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বলেছি, কিন্তু কানে ঢোকে না। বউ যা বলছে তাই বেদবাক্য!"

"বউয়ের নামে কমপ্লেন করো ছেলের কাছে," আমি বুদ্ধি দিই।

"হা কপাল! সেই ছড়াটা জানিস না? যার কাছে তুই করবি নালিশ সে আমার মাথার বালিশ!"

এরপর আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করে গেলেন দিদিমা! ছেলেদের সঙ্গে এখন শুধু দেবার সম্পর্ক—গর্ভে ধরো, গু-মুত ঘেঁটে মানুষ করো, টাকা ছড়িয়ে লেখাপড়া শেখাও, তারপর হাতের মোয়াটি পরের মেয়ের হাতে তুলে দাসী-বাঁদির মতো পড়ে থাকো, খাও-দাও, বাসন মাজো।"

আমার মনে পড়ে গেলো, মিসেস্ জেনিংস কিন্তু মোটেই ছেলের নিন্দে করেন না। বরং প্রতি চিঠিতে ছেলে এবং বউমার লম্বা প্রশস্তি থাকে।

দিদিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পকেটে যেন আমার সইয়ের চিঠি?" মিসেস্ জেনিংসের ওপর রাগ কমে গিয়ে এখন দিদিমা ওঁকে সই বলে ডাকেন।

বললাম, "সইয়েরও বাতের অসুখ হয়েছিল, এখন একসাইজ করে ভাল আছেন।"

"ছেলেপুলের খবর কিছু লিখেছে নাকি?" দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

"ছেলের এবং ছেলের বউয়ের প্রশংসা করে লিখেছে, এরা খুউব ভাল, মাকে বেজায় ভালবাসে! বউমাটি খুবই মিষ্টি এবং নরম।"

"কপাল!' দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। "সন্তানভাগ্য কি সবার ভাল হয়," দিদিমা দুঃখ করলেন।

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মেম মাগীরা তো ছেলেদের জন্যে কোনো কষ্টই করে না। শুধু গভ্যে ধরে, কিন্তু বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় না, এক ঘরে শুতে দেয় না, রাত্তির জাগে না, কাঁথা কাচে না, তিন বছর বয়সে হলেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে দেয়। অথচ আমাদের কি যন্ত্রণা! কিন্তু দেখো, মেম মেয়ের কত সুখ, ছেলে এবং ছেলের বৌয়ের প্রশংসা লিখে ফুরোতে পারছে না।"

সুদূর বিদেশে মিসেস্ জেনিংসের সংসারের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মিসেস্ জেনিংসের ছেলে বিয়ের পরও মায়ের বাড়ির কাছাকাছি থাকে। ভদ্রলোক একটু চুল কাটার দোকানের মালিক।

বিরক্ত দিদিমা বললেন, "তুই তো নিজের চোখে এখানকার অবস্থা দেখছিস। এ-বাড়ির লোকজনদের একটু বলে যা, মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।"

আমি বললাম, "সত্যি দিদিমা সব সময় মিসেস্ জেনিংস বলতেন, ববের মতন ছেলে হয় না। আমি ববের জন্যে প্রাউড।"

"তার মানে, এমন ছেলে যে গভ্যধারিণী মা তার জন্যে গর্ব বোধ করে, তাই তো!" দিদিমা নিজের ভাষ্য দিলেন।

আমি বললাম, "বব যখন বাড়িতে আসতো তখন সে এক দেখবার জিনিস। ছুটে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরতো, মাকে চুমু খেতো।"

"আহা শুনলেও মনটা জুড়িয়ে যায়," দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

"আদর করা জড়িয়ে ধরা তো দূরের কথা। কেমন আছো—একবার জিজ্ঞেস করতেই তোর মামার জিভ সরে না।"

আমাক পরবর্তী বিবরণও দিতে হলো। আমি বললাম, "দিদিমা, বব আবার খালি হাতে আসে না। মায়ের জন্য ফুল আনে মাঝে মাঝে। ছেলে এবং বউ দু'জনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, মামি ডার্লিং, তুমি কেমন আছো? কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? যদি কিছু করবার থাকে এখনই বলো। কোনো রকম লজ্জা কোরো না।"

"আমাকে না বলে, এসব কথাগুলো তোর মামাকে শোনাগে যা। একাদশীর দিন দায়-সারা গোটা কয়েক ফল হাতে করে ঘরে ঢোকেন।

রোজ একবার দায়-সারা জিজ্ঞেস করবেন, গাঁটের ব্যথা কমলো কিনা। ব্যস, ওই পর্যন্ত।"

আমাকে বলতেই হলো, "ছেলের জন্যে মিসেস্ জেনিংস গর্ব বোধ করেন।"

"অমন মিষ্টি ব্যবহার পেলে আমিও করতাম," দিদিমা দুঃখ করলেন।

"কিন্তু দিদিমা, সেবারে তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলে, তখন তোমার চিকিৎসার জন্যে মামা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার করলেন। এখনও দেনা শোধ হয়নি। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়া পর্যন্ত মামীমা একদিনও বাড়ি থেকে বের হননি।"

"রাখ রাখ, ওসব লোকলজ্জার ভয়ে। বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলে সমাজে যে মুখ দেখাতে পারবে না, সেই জন্যে।" দিদিমা মুখ বেজার করে জানালেন।

তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিদিমা বললেন, "তুই সইকে লিখে দে যে তিনি অনেক কপাল করে এসেছেন, তাই অমন ছেলে এবং বউ পেয়েছেন।"

সে-কথা যে মিসেস্ জেনিংসও সেবারে স্বীকার করেছিলেন মনে পড়ে গেলো। আমি তখন ওঁর বাড়িতে অতিথি। আমাকে ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে খাওয়াতে মিসেস্ জেনিংস ববের নানা গুণের তালিকা দিচ্ছিলেন। বব কী রকম স্মার্ট, ব্যবসায়ে কী রকম উন্নতি করেছে, মাকে কত ভালবাসে ইত্যাদি।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে, ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে মিসেস্ জেনিংস আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "আমাকে আধঘণ্টার জন্যে বেরুতে হবে। ববের সেলুনে চুলকাটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মিসেস্ জেনিংস বললেন, "বব যে আমার কত ভাল ছেলে তা তোমাকে কী বলবো! এই যে আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি, কত যত্ন করে নিজে আমার চুল ছাঁটবে, কত সাবধানে মাসাজ করবে। এবং পুরো দামও নেবে না, আমাকে কুড়ি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে। আজকাল কেউ কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে? এমন ছেলে

ক'টা মেলে?"

কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ের ব্যাপারটা আমার দেহের মধ্যে বিদ্যুতের চাবুক মেরেছিল। মায়ের চুল ছেঁটে পয়সা নেয়—এ কেমন সভ্যতা? কিন্তু মিসেস্ জেনিংসকে বিব্রত করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি। দিদিমাকেও ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বলতে পারিনি। দিদিমা যখন মিসেস্ জেনিংসের সন্তান সুখের কথা বিশ্বাস করে একটু শান্তি পাচ্ছেন তখন আমি কেন বাদ সাধি?

[গ্রন্থসূত্র
যেখানে যেমন]

পুরোহিত দর্পণ

যেন শেয়ালদা স্টেশনের ফুটপাথে কোলে-বাজারের বাসি শুকনো বেগুন। হরকিঙ্কর ভটচায্যির চেহারাটা দেখলে সপ্তাহখানেকের শুকনো বেগুনের কথাই মনে পড়ে। বাইরের চামড়াটা কুঁকড়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে ভেতরের মাংসও যেন রোদে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে রয়েছে। সরু লম্বা নাকটা যেন একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন! রঙটা এককালে বেশ ফর্সা ছিল, দেখলেই বোঝা যায়—এখনও খানিকটা আছে। চোখ দুটোও বেশ বড়ো বড়ো কিন্তু এখন ঝিমিয়ে পড়েছে—যেন একশো পাওয়ারের লাইট থেকে পঁচিশ পাওয়ারের আলো বেরোচ্ছে।

খালি গায়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে হরকিঙ্কর নিজের পৈতেটা দুহাতে ধরে পিঠ চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় ডাকপিওনকে দেখে বললেন, 'হরকিঙ্কর ভটচায্যির নামে কিছু আছে নাকি?'

পিয়ন বললে, 'কোনো চিঠি নেই।'

'হরকিঙ্কর দেবশর্মাও লেখা থাকতে পারে।'

'চিঠি থাকলে কেন দেব না বলুন?'

'ওইরকম তো তোমরা বল বাপু, অথচ লোকের চিঠি তো হারাচ্ছেও। সেবার আমার যজমানের চিঠি তোমরাই তো দেরি করে দিলে। চিঠি যখন এসে পৌঁছল তখন রমেশ ঘোষালের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে যে ব্রাহ্মণের কি ক্ষতি হয়, তা তোমরা বুঝবে কী করে?'

পিওন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের বিশ্বাস না হয়, পি-এম-জিকে কমপ্লেন করুন।'

কথা আরও বাড়তো। কিন্তু দূর থেকে হরকিঙ্করের মেয়ে সুব্রতাকে দেখা গেল। সুব্রতা সকালে সরকারী দুধের দোকানে কাজ করে। সেখান থেকেই ফিরছিল। পিওনকে সে-ই সরিয়ে দিল। তারপর বাবাকে বললে, 'আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।'

হরকিঙ্কর গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, 'শুধু শুধু কি আর ব্যস্ত হচ্ছি মা। নাকতলার সুদর্শন রায় কি সত্যিই এবার দুর্গা পুজো করবে না? কিন্তু কী করে তা হয়? সুদর্শনদের পুজো কি আজকের? আমার ঠাকুর্দা ওদের বাড়িতে মায়ের অর্চনা করেছেন, আমার বাবা করেছেন, আমিও করে আসছি এই এত বছর। পাকিস্তান হবার পরও তো ওদের কাজ বন্ধ হয়নি। মাকে ওরা যশোর থেকে সোজা নাকতলায় এনেছে! ঈশ্বরের আশীর্বাদে সর্বস্ব যায়নি ওদের। এখানেও তো ক'বছর পুজো করলাম আমি। এবারই বা পুজো হবে না কেন? নিশ্চয় চিঠি হারিয়েছে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'স্বীকার করলাম, প্রথম চিঠিটা না হয় গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি যে জোড়া পোস্টকার্ড ছাড়লাম, তার উত্তর?'

সুব্রতার মুখটা এবার সত্যিই মলিন হয়ে উঠলো। 'কেন বাবা, সে-উত্তর তো কালই এসে গিয়েছে।'

'কালই এসেছে? আর আমি পিওনের সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি!'—হরকিঙ্কর রেগে উঠলেন।

'আপনি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন,' সুব্রতা উত্তর দিলে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হরকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইলেন। সুদর্শন রায়রা এবার থেকে পুজো বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পুজোটাকে বাজে খরচ মনে করছে। হরকিঙ্কর মুখ বিকৃতি করে বললেন, 'সনাতন ধর্মের কিছুই আর থাকবে না।'

সুব্রতা বললে, 'বাবা, চা খাবেন তো? জল চাপাই?'

হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ভালই হয়েছে—আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওদের বড়ো ছেলেটা কোথাকার এক বদ্যির মেয়ে বিয়ে করেছে। বাউনের ঘরে যত অনাসৃষ্টি। সে-বাড়িতে পুজো করে নিজের অমঙ্গল ডেকে না আনাই ভাল।'

সুব্রতা চা নিয়ে এল। হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ওদের কর্তা কিন্তু জানতো কেমন করে দেব-দ্বিজের সেবা করতে হয়। ওদের দেওয়া গামছাগুলোর সাইজ দেখেছিস। অন্য লোকেরা আজকাল যে গামছা দেয়, তা দিয়ে রুমালের কাজও হয় না। নামই হয়ে গিয়েছে—পুজোর গামছা!'

মেয়ে বললে, 'বাবা, চা খান।'

বাবা বললেন, 'এ-যুগে আর পুরোহিতের কাজ চলবে বলে মনে হয় না। লোকে ভাবে আমরা একটা নুইসেন্স। আমরা কিছু না করেই পয়সা আদায় করি, ভিখিরীর ভদ্র-সংস্করণ।'

মেয়ে বললে, 'বাবা, নবারুণ স্পোর্টিং খুব জাঁকিয়ে পুজো করছে এবার। ওদের সেক্রেটারি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। আজও বলছিলেন আপনার কথা।'

'কী বললি?' হরকিঙ্কর এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যেন কেউ ভারি বুটজুতোসমেত পা তাঁর পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। 'বারওয়ারি পুজো করতে হবে আমাকে এই বয়সে? কোনোদিন হয়তো কেউ বলবে...' পরের কথাগুলো হরকিঙ্কর মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হয়তো কোনোদিন আমাকে বেশ্যাবাড়িতে শীতলা পুজো করে আসবার কথাও বলবে।'

মেয়ে বললে, 'সেক্রেটারি বলছিলেন, নবারুণ স্পোর্টিং-এর পুজো করবার জন্যে পুরুতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।'

'ভাগাড়ের মড়ার জন্যেও কাড়াকাড়ি হয়। বারওয়ারি পুজোর পত্তন করেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। ও-সব জায়গায় পুরুত না এলেও কেউ খোঁজ করে না ; একটা পুরুতই তিনটে বারোয়ারি পুজো সারে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'মা মহামায়ার পুজো বলে কথা। তাঁকে তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন। দেবী দশভুজা মহিষাসুর নিধন করে দেবগণকে স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুজোর ত্রুটি হলে তাঁর রোষ থেকে কে আমাকে রক্ষে করবে?'

মেয়ে আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। হরকিঙ্কর বললেন, 'একবার মোড়ের বাসনের দোকানে যাবো। যদি কয়েকটা দানের সামগ্রী বিক্রি করতে পারি। বেটা দিনদুপুরে চৌরাস্তার মোড়ে বসে গলা কাটে। অমন সুন্দর পিতলের চাদরের ঘড়া, ছাঁকা কাঁসার থালা বলে কিনা আড়াই টাকার বেশী দেবে না। কিছুদিন ধরে রাখলে দাম উঠতো। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়?'

সুব্রতা বললে, 'দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবেন না বাবা।

জানেনই তো ওরা চোর।'

হরকিঙ্কর ভাবলেন, 'সবই ভাগ্য। মায়ের ইচ্ছা—না হলে সনাতন ধর্মের এমন সর্বনাশ হবে কেন? কেন আমাদের নিজের দেশঘর ছেড়ে এই বিদেশের বস্তিতে এসে উঠতে হবে?'

হরকিঙ্কর বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা গেল, 'সুব্রতা ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা?'

সুব্রতা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। 'আরে শুভ্রাদি! আপনি? এখানে?'

'কেন, আসতে নেই?' শুভ্রাদি হেসে বললেন।

শুভ্রাদিকে বাবার কাছে নিয়ে এসে সুব্রতা পরিচয় করিয়ে দিলে, 'বাবা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপিকা শুভ্রা রায়। ইনিই আমাকে কলেজে ফ্রীশিপ পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'ও।' নমস্কার করলেন হরকিঙ্কর। মেয়ে ততক্ষণ অতিথির দিকে একটা আসন এগিয়ে দিয়েছে। শুভ্রাদির বয়স বেশী নয়। খোঁজ করলে ওই বয়সের মেয়ে কলেজেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুভ্রাদির মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে যে, মনে হয় আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। ওঁর মুখের সঙ্গে হরকিঙ্কর নিজের মেয়ের মুখটাও মিলিয়ে নিলেন। অভাবে অযত্নে থাকলেও তাঁর মেয়ের রঙটা অনেক ফর্সা, দৈর্ঘ্যেও কয়েক ইঞ্চি বেশী হবে। এত অনটনের মধ্যে বাড়ন্ত গড়ন—দেখে কে বলবে এখনও সতেরো পুরো হয়নি!

বেশ বিব্রত হয়েই হরকিঙ্কর সুবেশা শুভ্রাদিকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটু বসতে দেবার জায়গাও নেই।'

'কী ব্যাপার, শুভ্রাদি?'

'ব্যাপার তোমার বাবার সঙ্গে। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকি, তাই প্রিন্সিপ্যাল বললেন তুমি নিজেই দেখা করে এস।'

'কেন বলুন তো?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কলেজে এবার আমরা দুর্গাপুজো করবো ঠিক করেছে।'—শুভ্রাদি জানালেন।

'কলেজে দুর্গাপুজো, তাও কিনা মেয়ে কলেজে!' হরকিঙ্কর তাঁর বিস্ময় চেপে রাখবার কোনো চেষ্টা করলেন না।

শুভ্রা রায় স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। সুব্রতা লক্ষ্য করছিল, কি সুন্দর ব্যবহার শুভ্রাদির। শুনেছে খুব বড়োলোকের মেয়ে, অথচ কেমন ভাবে কথা বলেন। শুভ্রাদি বললেন, 'অনেকেই কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন। পরিকল্পনাটা আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সুভদ্রা হালদারের। ওঁর ধারণা দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের শক্তিপুজোর দরকার হয়ে পড়েছে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা!'

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের মধ্যে যারা একটু তথাকথিত মডার্ন তারা খুব আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে মেয়েরা পুজো-মাইন্ডেড হোক—তারা পুজোর কাজকর্ম শিখুক। শেলি বায়রণ কীটস পড়ে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না।'

হরকিঙ্কর জানতে চাইলেন, 'আগে কখনও এমন পুজো হয়েছে?'

শুভ্রাদি জানালেন, 'সুভদ্রা হালদার বলেছেন, আগে কী হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। জিনিসটা যখন ভাল, তখন করতে বাধা কোথায়? মহিষমর্দিনী পুরুষমানুষ ছিলেন না। সুতরাং মেয়েরা ইচ্ছে করলেই নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'পুজোর তো আর দেরি নেই।'

শুভ্রাদি বললেন, 'ঠিক বলেছেন, মোটেই সময় নেই। অনেকে ভয় পাচ্ছিল, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব হয়ে উঠবে না। কিন্তু মিসেস হালদার বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে তাঁর নিজেরই বিয়ে হয়েছিল!'

সুব্রতা যা ভয় পাচ্ছিল এবার তাই হলো। হরকিঙ্কর দ্বিধা না করে শুভ্রাদির মুখের উপরই বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বারোয়ারি পুজোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। হাজারজন যেখানে মাতব্বর—পুজোর নাম করে যেখানে কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা আর বেলেল্লাপনা হয়—না খেয়ে মারা গেলেও আমি সেখানে পুজো করবো না।'

সুব্রতা বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহস করলে না।

শুভ্রাদি কিন্তু মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, 'মিসেস হালদার আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। উনিও চান শুদ্ধ পূজা—যেখানে ধর্মীয় ভাবটা বজায় থাকবে। মাইক, আলোকসজ্জা, প্যান্ডাল, প্রসেশন এসব

আমরা কিছুই করবো না। আমাদের প্রতিমাও শাস্ত্রসম্মত।'

'ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মুখের আদলওয়ালা আলট্রামডার্ন ফিগার চাইছেন না আপনারা?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

চিত্রতারকার কথা উঠতেই সুব্রতা কেমন চমকে উঠেছিল। কিন্তু এঁদের দুজনের কেউই তা লক্ষ্য করলেন না।

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে, সনাতন আদর্শে পুজো হোক—তবেই তো মেয়েদের মঙ্গল হবে। আমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছি। মেয়েরাই সব কিছু করছি। আমাদের সকলের অনুরোধ, পুজোটা করুন। মিসেস হালদার আপনার কথা শুনেছেন কোথাও। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে একবার সময়মতো দেখা করেন।'

হরকিঙ্কর নিজের মনকে বোঝালেন, কলেজের মেয়েদের পুজোকে বারোয়ারি পুজো বলা চলে না। শুভ্রাদিকে বললেন, 'আপনি আমার মেয়েটাকে সাহায্য করছেন অনেক, কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিন-পুরুষ ধরে আমরা রায়েদের বাড়িতেই পুজো করে এসেছি। আর কোথাও কখনও বোধন করিনি। এবার করে দেখি, মা কি বলেন। আমি আজই কলেজ যাবো'খন!'

হরকিঙ্কর শুভ্রাদিকে বসিয়ে এবার উঠে পড়লেন, বাসনওয়ালার সঙ্গে এখনই দেখা করা প্রয়োজন। বেরোবার আগে মেয়েকে বললেন, 'দিদিমণি তোমার বাড়িতে এসেছেন, একটু চা অন্তত করে দাও।'

শুভ্রাদি এবার হতশ্রী ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। 'ছাদটা ফেটে রয়েছে দেখছি। জল পড়ে?'

'জলে ভেসে যায়।' সুব্রতা উত্তর দিলে।

'কলেজ যাও না কেন?'

'অনেক দিন যাচ্ছি না। কাউকে যেন বলবেন না, শুভ্রাদি। তাহলে সকালে দুধের চাকরিটাও যাবে। স্টুডেন্ট ছাড়া গভর্নমেন্ট কাউকে রাখে না।'

ঘরের অবস্থা এবং সুব্রতার মুখ চোখ দেখে শুভ্রাদি যেন সব বুঝতে পারছেন।

লজ্জা পেয়েছে সুব্রতা। বললে, 'বাবার কথায় রাগ করবেন না, শুভ্রাদি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ওঁকে একগুঁয়ে বলতে পারেন। ওখানে

কোনোরকম শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। তাই কষ্টও পাচ্ছেন।'

'কেন?'

'অনাচার হলে যজমানের মুখের উপর যা-তা বলেন। তাতে যজমান সন্তুষ্ট থাকবে কেন? পাড়ার কিছু পুরুতের অভাব নেই। তাছাড়া আমরা বাইরের লোক, পাকিস্তানে ভিটেমাটি হারিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়েছি। স্থানীয় যজমানরা নিজেদের লোক ছেড়ে কেনই বা বাবাকে ডাকবে?'

শুভ্রাদি চুপ করে ওর কথা শুনে যেতে লাগলেন। 'বাবাকে বলি, আপনি তো লেখাপড়া জানতেন, কেন এই বাজে লাইনে এলেন। বাবা বলেন, ওঁদের পরিবারের অন্তত একটি ছেলেকে এই লাইনে আসতে হবে এই নিয়ম ছিল। তাছাড়া ওঁদের যৌবনকালে পুরোহিতের সম্মানও ছিল।'

'তোমার কে কে আছেন?' শুভ্রাদি প্রশ্ন করলেন।

'এক দাদা, বাইরে চাকরি করেন। মা নেই। এখন আমিই সংসার দেখছি।'

'তুমি কলেজ বন্ধ করলে কেন? বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি?'

সুব্রতা কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাসলো।

'আচ্ছা, এবার আসি। পুজোর ক'দিন কলেজে যেও,' বলে শুভ্রাদি বিদায় নিলেন।

সুব্রতার হাসি থেকে শুভ্রাদি কি বুঝলেন কে জানে। সুব্রতা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকলো! বিয়ে! বিয়েই বটে। ধানবাদে চাকুরে দাদা। তাই বটে গতমাস থেকে টাকা আসছে না। দাদা নাকি ওখানে কি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে রেল কলোনির কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে, ধন্য পুরুষ জাত। কি দায়িত্ববোধ! একশ টাকা মাইনের রেলবাবুর আবার প্রেম।

বাবা যতই গলা ফাটিয়ে ধর্মের জয়গান করুন, টাকা—টাকাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। বেঁচে থাকতে গেলে টাকা চাই-ই।

ড্যাল্টন কোম্পানি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি মিস্টার চ্যাটার্জি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। তিনিই সেবারে বলেছিলেন—'আপনার গলার স্বরটা খুব সুইট।'

বিরক্ত কণ্ঠে সুব্রতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক মোটেই বিব্রত না হয়ে বলেছিলেন, 'অভিনয়ের লাইনে এলে উন্নতি করতে পারতেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় অফিসে অফিসে খুব চাহিদা। আমরা হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের পার্ট করছিল কমলিনী। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে অথচ অভিনয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, স্টেজের জন্যে বুকিংও করা রয়েছে। এখন পেছোবার উপায় নেই। আসুন না। টাকা পাবেন। মেডেলও পেতে পারেন। একবার নাম হলে তখন দেখবেন বাড়িতে লোক এসে সাধাসাধি করছে।'

সুব্রতা রাজী হয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে কয়েকদিন রিহার্সাল দিয়ে এসেছে। তারপর অভিনয়ও। মেডেল পায়নি, কিন্তু টাকা পেয়েছে ষাটটা। কাজে লেগে গিয়েছে টাকাগুলো। সুব্রতা প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের অফিসে একটা চাকরি পাওয়া যায় না?'

'মেমসাহেব ছাড়া এরা রাখে না। তাছাড়া, কোন্ দুঃখে আপনি চাকরি করতে যাবেন? এ লাইনে চাকরির দশগুণ রোজগার করবেন। আর যদি একবার কোনো সিনেমা প্রোডিউসারেব নজরে পড়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই!'

কথাটা মন্দ বলেননি ভদ্রলোক। একবার নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মিস্টার চ্যাটার্জির এক বন্ধু স্টুডিওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান। তার সঙ্গে দেখাও করেছে সুব্রতা।

সে বলেছে, 'ফিগার খুব শার্প, ক্যামেরায় খুব ভাল আসবে। নায়িকা হবার সমস্ত গুণই রয়েছে আপনার। এ-লাইনে কোনো চাঁইকে ধরবার চেষ্টা করুন। ওই প্রথমবারই যা একটু ধরা-করা প্রয়োজন। তারপর যদি তেমন লাক ফেবার করে, সেই একই লোক আবার বাড়িতে গিয়ে সুটিং ডেটের জন্যে কান্নাকাটি করবে।'

লোকে হয়তো যা-তা বলতে চাইবে। কিন্তু কিছু তোয়াক্কা করে না সুব্রতা। নিজের ভবিষ্যতের জন্যে তার যা খুশি সে করবে। টাকা যখন কেউ দেবে না, তখন কারুর কথাতেই সে কান দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিতান্তই ভাল মানুষ, একমাত্র বাবাকে নিয়েই চিন্তা। এত শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নিয়েও অন্নের সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। বাবা না বুঝেই বাধা দেবেন। ওঁকে এখন কিছু না-বলাই ভাল। তবে

যখন সুব্রতার অনেক টাকা হবে, সে তখন বাবাকে একটা সুন্দর মন্দির করে দেবে। সেখানে নিজের মনে নিজের ঠাকুরকে পুজো করবেন। যজমানদের দরজায় দরজায় তখন তাঁকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

ভেবেছিল, শুভ্রাদিকে সে সব বলবে। কিন্তু বলা হয়নি কিছুই। বোধহয় ভালই হয়েছে। এখন নয়। যখন সুব্রতা ভট্টাচার্য দেশজোড়া সুনাম পাবে, সবার মুখে মুখে যখন তার নাম ফিরবে, তখন সব প্রকাশ করবে। কাগজের প্রতিনিধিরা যখন তার জীবনী লিখতে আসবে, সুব্রতা তখন শুভ্রাদির মহৎ হৃদয়ের কথাও বলবে। তাঁর জন্যেই যে বিনা মাইনেতে কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সে কথা গোপন করবে না।

তাকের ওপর টাইমপীসটার দিকে এবার নজর পড়ে গেল। বসে বসে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই একবার বেরনো প্রয়োজন।

আর তো ভাবা চলবে না। এখনই সুযোগের সন্ধানে বেরোতে হবে।

বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে পুজোর আয়োজন চলেছে।

হরকিঙ্কর গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রমতো সব যোগাড় যন্তর না করলে, শুধু আপনাদের নয় আমারও অমঙ্গল। দুর্গা পুজো বলে কথা। অনেক জিনিস লাগে—সিঁদুর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাঠা, তীর, পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, ডালিম ডাল, অশোক ডাল...'

তালিকা আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু শুভ্রা বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা সব গুছিয়ে যোগাড় করে রাখবো। আপনি শুধু পুরো ফর্দটা আমাকে দিয়ে যান।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'তুমি মা বোধহয় কখনও পুজোর যোগাড় করোনি।'

শুভ্রা সলজ্জ ভাবে বললেন, 'শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বাড়িতে পুজো হতো। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। এবার কিন্তু আপনার কাছে সব শিখে নেবো।'

হরকিঙ্কর অনেকদিন এমন মধুর ব্যবহার পাননি। অন্তত পাঁচভূতের রাজত্বে এমন নিষ্ঠাবতীর সন্ধান পাবেন আশাই করেননি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই মা, এবার আমি সব শিখিয়ে দেবো। আমাদের

মায়েদের জন্যই তো সনাতন ধর্ম আজও কোনোরকমে টিকে আছে। লেখাপড়া জানা মায়েরা যদি আবার আগ্রহ নিয়ে সব শিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কিসের ভয়?'

শুভ্রা নম্রভাবে বললেন, 'নিজের দেশের নিজের ধর্মের নিয়মকানুন জানবো না, এটা তো গর্বের কথা নয়। এর মধ্যেই তো আমাদের দেশের সভ্যতার এবং সমাজের যুগ-যুগান্তের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।'

'কিন্তু সে কথা কে বোঝে মা? বারোয়ারি পুজো আমি করি না ; লোকে বলে গোঁড়া পুরুত ; কেউ কেউ পাগলও বলে। কিন্তু মা ওখানে পুজোর প-ও থাকে না। কেউ জিজ্ঞেস করে না পুজোর সব উপকরণ ফর্দ অনুযায়ী এলো কিনা। যদি কোনো কিছু না থাকে, বলবে যা এসেছে তাই দিয়ে সেরে নাও। কিন্তু মা, সেরে নেবার মালিক কি পুরোহিত? তার পিতৃপুরুষেরও জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে এ-সব কাগজে কলমে লেখা হয়ে গিয়েছে।'

শুভ্রা বললেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, যদি পুজো করতে হয় ভালভাবে করো, না হলে কোরো না।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'ফর্দ আমার মুখস্থ। বলে যাচ্ছি, টপাটপ লিখে নিন। প্রথমে নবপত্রিকার দ্রব্যাদি, নিয়ম হচ্ছে প্রতিপদ থেকে দেওয়া। প্রথম দিন—মাথাঘসা, ফুলের তেল, আতর, চিরুণী, গোলাপজল। দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধবার পটি, তৃতীয়াতে তর্পণ, সিঁদুর আলতা। চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাঁসার বাটি, তিল, চন্দন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার।'

হরকিঙ্কর একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'বরং পুজোর ফর্দটাই আগে লিখুন—বোধনের দ্রব্যাদি...'

আমন্ত্রণের জিনিস, অধিবাসের ডালার তালিকা শেষ করে হরকিঙ্কর সপ্তমী পুজোর ফর্দ শুরু করলেন—'নারায়ণবরণ, গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, ব্রহ্মবরণ, সদস্যবরণ, হোতৃবরণ আচার্যবরণ, বরণাঙ্গুরীয়, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা...'

ছাত্রীজীবনে শুভ্রা অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। কিন্তু পুরুতমশায়ের গতির কাছে তাকে হার মানতে হলো।

হরকিঙ্কর হেসে ফেললেন। বললেন, 'দরকার নেই ; আমিই লিখে দিচ্ছি মা। অনেকে লিষ্টিও নেয় না, দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে সোজা গিয়ে সাপ ব্যাঙ যা পায় তাই কিনে নিয়ে আসে। আগেকার সে সব দশকর্মা ভাণ্ডারও নেই—বেশীর ভাগই জোচ্চোর। যা-তা জিনিস দিয়ে দেয়।'

শুভ্রা এবার হরকিঙ্করের দিকে কাগজ এগিয়ে দিলেন। ফর্দ লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'যে কোনো ফর্দের প্রথমে লিখতে হয়—সিদ্ধি ; সিদ্ধিদাতা গণেশ তবেই তো সিদ্ধি দেবেন।'

শুভ্রা পণ্ডিতমশায়ের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মহাস্নানের জিনিসগুলো একটু সাবধানে যোগাড় করতে বলবেন মা। দোকানে যা দেয় তা প্রায়ই ভেজাল।'

'শুভ্রা, কাজ কেমন এগোচ্ছে?' সুভদ্রা হালদার প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভাল। পুরুতমশাইটি চমৎকার—একটু রাগী বটে, কিন্তু নিষ্ঠাবান।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আজকাল খুবই অভাব। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমাদের কাছে আজকাল পুরুতঠাকুরও যা, রাঁধুনীঠাকুরও তাই।'

কলেজের সর্বত্র এখন পুজো পুজো ভাব। বেশ হৈ চৈ চলেছে। কাজের বাড়ির চাপে প্রিন্সিপ্যালও তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যের মুখোসটা খুলে রেখেছেন। সেই সুযোগ নিয়েই টিচারস্-রুমে অর্থনীতির অধ্যাপিকা শিপ্রা মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'একথা বলছেন কেন মিসেস হালদার?'

'জানি বলেই বলছি। আমাদেরও বলতে গেলে পুরোহিতের বংশ। কিন্তু আয় নেই বলে কেউ আর ও লাইনে যায়নি। আজকাল যার লেখাপড়া হয় না সে-ই যাজক হচ্ছে—কিন্তু শিক্ষিত না হলে, সে কী করে শাস্ত্র পাঠ করবে?'

প্রিন্সিপ্যালের কথায় অনেক অধ্যাপিকা সায় দিলেন। মিসেস হালদার বললেন, 'এ যুগে মুড়ি মিছরির একদর—একটাই দুঃখ। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একখানা সুরেন ভট্‌চায্যির পুরোহিত দর্পণ ছিল।

তাতে দেখেছি তিনি দুঃখ করছেন, সূপকার ষষ্ঠীপুজো করলে যা পাবে, একজন জ্ঞানী পুরুষও সেই পাবে। এই জন্যেই ভাল লোক ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে।'

'সূপকার মানে কি, দিদিমণি?' স্বেচ্ছাসেবিকাদের লিডার ও ছাত্রী ইউনিয়নের সেক্রেটারি রমলা প্রশ্ন করলো।

সুভদ্রাদি বললেন, 'শুভ্রা, আজকাল তোমরা কি যে বাংলা শেখাচ্ছো। আমাদের সময় বাংলার কোশ্চেনও ইংরিজিতে হতো—তবু আমরা অনেক কথা জানতাম। এখন তোমরা শুধু নাটক নভেল পড়াচ্ছ—তাও আধুনিক। তাই ছাত্রীরা সূপকার মানে জানে না।'

দিদিমণির কথায় রমলা লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রা হালদার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই। না-জেনে পণ্ডিত সেজে থাকার চেয়ে, বোকার মতো প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অনেক ভাল। সূপকার মানে রাঁধুনি—আজকাল নভেলে যাদের বাবুর্চি বলে।'

অধ্যাপিকাদের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা হালদার বললেন, 'আপনারা অনেকে হয়তো এইভাবে পুজোর ব্যবস্থা করায় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন—ভাবছেন আমি সময় এবং অর্থ অপব্যয় করেছি। কিন্তু একটা দুর্গাপুজো হাতে কলমে করলে, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মেয়েরা যে জ্ঞান লাভ করবে, তা দেড় ডজন টেক্স্টবুক থেকেও পাবে না।'

একবার ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'কত অদ্ভুত সব জিনিস লাগে, আমি পুরুত-বাড়ির মেয়ে হয়েও খোঁজ রাখতাম না। যদি চোখ কান খুলে রেখে, ওগুলোর মধ্যে একটু ঢোকা যায়, তাহলে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের জীবন-যাপন সম্বন্ধে আমরা কত কি জানতে পারি।'

সুভদ্রাদি বললেন, 'এই মহাস্নানের কথাই ধরুন না কেন। সপ্তমীর দিনে দর্পণ স্নান—শুভ্রা, তোমার হাতেই তো লিস্ট রয়েছে, পড় না।'

শুভ্রা পড়তে লাগলেন, 'শোধিত পঞ্চগব্য—অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। শিশির, আখের রস, সাগরোদক, গজদন্ত মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা,—' এবার হঠাৎ শুভ্রা থমকে দাঁড়ালেন।

'কী, থামলে কেন? পড়ে যাও,' সুভদ্রাদি বললেন।

কিন্তু শুভ্রা আর পড়তে পারছে না। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

'কী হলো?' বলে শিপ্রা মিত্র এবার একটু সরে এসে তালিকার দিকে তাকালেন। তাঁরও মুখটা যেন কেমন অপ্রস্তুত দেখালো। 'কী আছে, শিপ্রাদি?' দু'জন ছাত্রী একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

'না, কিছু নয়, ও-নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' শিপ্রাদি উত্তর দিলেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে, প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'হাতে অনেক কাজ রয়েছে—এখন এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। পড়ে যাও।' শিপ্রা বললেন, 'ওটা বাদ দিয়েই না হয় পড়ে যা।'

বাদ দেবার কথা উঠতেই সবার কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা এবার শুভ্রার কাছে উঠে এসে ফর্দর দিকে তাকালেন। তাঁদের মুখের অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে শুরু করলো।

একজন বললেন, 'সত্যি নাকি? ও-সব লাগে, তা কখনও শুনিনি, এতো পুজোয় গিয়েছি!'

আর একজন বললেন, 'লাগে নিশ্চয়, না হলে পুরুতমশায় লিখে দেবেন কেন?'

ছাত্রীরা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বললে 'কী দিদিমণি? পুজোতে কী লাগে?'

অধ্যাপিকারা এবার সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। শুভ্রাদি কোনোরকমে বললেন, 'না কিছু নয়।' তিনি এবার সেই বিশেষ জিনিসটি বাদ দিয়ে পড়া শুরু করবার চেষ্টা করলেন—'মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম...' কিন্তু বাদ দেওয়া চললো না। সবার দৃষ্টি যেন বাদ দেওয়া জায়গাতেই আটকে গিয়েছে। সুভদ্রা হালদার বললেন, 'কী ব্যাপার?'

শুভ্রা অগত্যা এবার নিজের চেয়ার থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে উঠে এসে তালিকাটি দেখালো। এবার তাঁর চোখেও বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে ক'জন ছাত্রী আছে তিনি দেখে নিলেন। মাত্র দু'জন। তাদের বললেন, 'তোমরা এবার ফল-টলের ব্যবস্থাগুলো দেখো। আর তো সময় নেই।'

মেয়েরা বুঝলে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তারা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল এবার

বললেন, 'হুঁ—জানতাম না।'

শিপ্রা মিত্র বললেন, 'মোস্ট এমব্যারাসিং। কম বয়সের কুমারী মেয়েরা রয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে পুজোতে কিনা বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা লাগে!'

'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দিয়ে কী হবে?' আর একজন অধ্যাপিকা প্রশ্ন করলেন।

'হরকিঙ্করবাবুর তালিকা অনুযায়ী ওই দিয়ে সপ্তমীর দিনে মহাস্নান হবে,' শুভ্রা বললেন।

ইতিমধ্যে আর সবাই লজ্জায় এমনই লাল হয়ে উঠেছেন যে, কথা বলতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বীকার করছি জিনিসটা এমব্যারাসিং—বিশেষ করে আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে যা হয়ে আসছে তার উপায় কি?'

'ওইটুকু বাদ দিলেই হয়', একজন প্রস্তাব করলেন।

সুভদ্রাদি বললেন, 'তার উপায় কোথায়? বাদ দিলে সমস্ত পুজোটাই বাদ দিতে হয়।'

সুভদ্রাদি এবার সমাজনীতির অধ্যাপিকা তন্দ্রা রায়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? শুভকাজে এই সব নোংরামী কি করে ঢুকতে দেওয়া হলো?'

অধ্যাপিকা রায় সদ্য ডক্টরেট প্রাপ্তা। বললেন, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকসটা খুঁজে দেখলে হয়। কিছু পাওয়া যেতেও পারে। তবে আমার মনে হয়, দুটো কারণ হতে পারে।'

'কী কারণ?'

তন্দ্রা রায় বললেন, 'আমাদের দেশের বিশ্বাস পতিতাগৃহে প্রবেশের পূর্বে পুরুষ তার সমস্ত সদ্‌গুণ দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায়। হয়তো সেইজন্যেই এই মৃত্তিকা বিশেষভাবে গুণান্বিত।'

কারুর মুখেই তখন কথা নেই। সবাই, এমন কি শিপ্রা মিত্রও, তন্দ্রা রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা রায় বললেন, 'আর একটা হতে পারে, হিন্দু ঋষিরা দুর্গোৎসবে উচ্চনীচ সবার সহযোগিতা কামনা করতেন। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে বলতে পারেন।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। তবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে এ-সব আলোচনা না করাই ভাল। আপনারা এখন যে-যার কাজগুলো সেরে ফেলুন।'

হরকিঙ্কর সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা কিলবিল করছে। ছেলেটা মনের মতো হয়নি। অমানুষ জানোয়ারও বলা চলতে পারে। না হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শূদ্রা রমণীর অঙ্কশায়িনী হয়ে, ধানবাদে সে কী করে পড়ে রয়েছে? কেন এমন হয়? ছেলেটা জন্মাবার আগে তিনি তো কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় আচরণের ত্রুটি করেননি। যথাসময়ে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠী, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন—শাস্ত্রীয় কোনো পুজোতেই কোনো অনাচার হয়নি। তবুও ছেলেটা শেষ পর্যন্ত কেন এমন হলো স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। এবার মহাশক্তির বোধনের সময় মার কাছে তিনি সব দুঃখের কথা নিবেদন করবেন।

কারা যেন কড়া নাড়ছে। কারা আবার এই সময় জ্বালাতন আরম্ভ করলে? বাড়িটা সত্যিই যেন ভূতের হাট হয়ে উঠেছে। ওরা কারা কে জানে? মেয়েটা ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মনে হচ্ছে। বলছে, 'শোভনবাবু, আসুন আসুন। কতদিন খবর পাই না। শেষ পর্যন্ত মনে পড়লো তাহলে?

লোকটা যেন অভিনয় সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে। সুব্রতাকে বলছে, 'তুমি চিন্তা করছো কেন, তোমাকে একটা ভাল রোল দেবই।'

'সে তো কতদিন হয়ে গেল, শোভনবাবু। এই অ্যামেচার থিয়েটারী অসহ্য হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের দিনটা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই রিহার্সেলটাই আর পারি না। আগে তবু দু'তিনদিন রিহার্সেল হলেই চলতো। এখন চৌদ্দদিন হলে বাবুরা খুশী হন। তাও ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান না।

হরকিঙ্করের কানে শব্দগুলো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা লাঠি নিয়ে তিনি দরজার দিকে তেড়ে যান। কিন্তু যেন পক্ষাঘাতের রোগী তিনি। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাঁর।

হরকিঙ্কর শুনলেন, মেয়ে চলচ্চিত্রে নামবার জন্যে পাগল। লোকটা

বলছে, 'সাইড পার্ট থেকে শুরু করো। তারপর আস্তে আস্তে উঠবে।'

মেয়ে বলছে, 'শোভনবাবু, তা হয় না। আপনি তো এ লাইনে অনেকদিন রয়েছেন। যে হিরোইন হয়, সে প্রথম দিন থেকেই হয়। সাইডগার্ল যে, সে চিরকাল সাইডগার্লই থেকে যায়।'

মেয়ে যেন শোভনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। বলছে, 'না শোভনবাবু, আপনার 'একস্ট্রা' যোগাড় করবার কনট্রাক্ট—আপনি যোগাড় করুন, সাপ্লাই করুন। কিন্তু আমাকে ভাল একটা প্রোডিউসার ধরিয়ে দিন। সুযোগ যদি পাই, দেখিয়ে দেবো কোথায় লাগে আপনাদের...'

শোভনবাবুর গলা যেন এবারে নীচু খাদে নেমে এল। ফিসফিস করে কি বলছে মেয়েটাকে। বাড়িটা হলো কি? এতো বড়ো আস্পর্ধা, বাড়ির কর্তা কি মারা গিয়েছে? কিন্তু প্যারালিসিসটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে—আঙুল নাড়াবার শক্তিও নেই হরকিঙ্করের।

হরকিঙ্করের মনে পড়লো বাড়িভাড়া বাকি। মালিক উকিলের চিঠি দিয়েছে, ছাড়তেই হবে বাড়ি। ওরা বলেছে বাড়ি ভেঙে ফেলবে। কিচ্ছু নেই বাড়িটার। অন্য বাড়ি দেখেছেন হরকিঙ্কর। অনেক ভাড়া চায়। তিন মাসের আগাম। এখানেও সাত মাস বাকি। টাকা চাই—অনেক টাকা। তবে যদি বাঁচা সম্ভব হয়। টাকাটাই যেন বিষ হয়ে গলে গলে দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—যেন তারই ক্রিয়ায় স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে প্যারালিসিসের সূচনা করেছে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। হরকিঙ্কর চোখ বুজে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন—ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি।...

আবার যেন বল ফিরে পাচ্ছেন হরকিঙ্কর। তিনি এবার আসন থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলছে, 'আচ্ছা, তাই ঠিক রইল। কোনো অসুবিধে হবে না।'

ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন হরকিঙ্কর। যেন তাঁর চোখ কান সব বিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট পেট নিয়ে এক সর্বভুক হরকিঙ্কর যেন শুধু বেঁচে রয়েছেন।

মেয়ে এবার বাবার দিকে তাকাল। 'বেরোচ্ছিস নাকি তুই?'

'হ্যাঁ বাবা, একটু কাজ আছে।'

বাবা চুপ করে রইলেন, মেয়ে বললে, 'একটা বাড়ির খবরও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। মেয়ে বললে, 'বাবা, কী এতো ভাবেন বলুন তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হরকিঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশকর্মা ভাণ্ডারে গিয়েছেন। পুজোর জিনিসগুলো কেনবার দায়িত্ব শুভ্রা শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপিয়েছেন। পৃথিবীর যত উদ্ভট জিনিস সব ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ফর্দ মিলিয়ে কিনতে শুরু করেছেন হরকিঙ্কর। 'আপনারা সব আসল জিনিস দেন তো? না পুজোর জিনিসেও ভেজাল ঢুকেছে আজকাল?'

দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলেছে : 'কেন বলুন তো?'

হরকিঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মায়ের পুজোয় আজকাল তেমন ফল হয় না কেন? হয়তো ভেজালের জন্যেই।'

দোকানদার গুম হয়ে থেকেছে। 'ভরসন্ধেবেলায় এমন কথা শুনিয়ে গেলেন?'

জিনিস মেলাতে মেলাতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মৃত্তিকা কই? বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথায়?'

'নেই।'

'রাখেন না?'

'ভেজাল। এমনি মাটি তুলে পুরিয়া করে বিক্রি করি আমরা', দোকানদার উত্তর দিয়েছে।

'তাহলে চাইনে।' মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে হরকিঙ্কর সোজা কলেজে চলে এসেছেন। সেখানে তখন পুরোদস্তুর হৈ-চৈ চলছে। রাত পেরোলেই পুজো। ঢাকি আসবে এখনই। আর ঢাকের বাদ্যি শুরু হলেই তো পুজো আরম্ভ হয়ে গেল।

হরকিঙ্কর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মা মহাশক্তির পুজো করবে? করুক না, করতে আপত্তি কি, তিনি নিজের মনেই বললেন।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জিনিস পেয়েছেন তো হরকিঙ্করবাবু?'

'একটা বাকি আছে, এখনই আনছি', হরকিঙ্কর উত্তর দিলেন।

আবার পথে বেরিয়েছেন হরকিঙ্কর। কি যেন খুঁজছেন তিনি। জায়গাটা কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও পল্লীটা আছে। ছোটবেলায় ওঁদের দেশের পল্লীটা চিনতেন। গ্রামের এককোণে, কয়েকখানা মেটে বাড়ি। আমোদিনী দাসী বলে একটা বুড়ি ও-লাইন ছেড়ে দুধের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার তার বাড়িতেও গিয়েছিলেন হরকিঙ্কর।

কিন্তু এখানে পাড়াটা কোথায়? খবর রাখেন না কোনো কিছুরই তিনি। রাস্তার মোড়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি বে-আইনী হয়ে গিয়েছে। সত্যি যদি কোনোদিন পতিতাবৃত্তি উঠে যায়, তাহলে পুজোর সময় বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু কাগজেই তিনি পড়েছেন, আইন করে কিছুই হয়নি—ব্যবসা পুরো দস্তুর চলেছে। সুতরাং এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী লাভ?

পানের দোকানে খোঁজ নেওয়াই বোধ হয় ভাল, ওরা নিশ্চয় খবর রাখে। সোজা গিয়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করেছিলেন। ওরা ফিকফিক করে হেসেছে। 'এই বয়সেও! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে, এখনও!'

একজন বললে, 'তোর অত গার্জেনগিরিতে দরকার কি? জিজ্ঞেস করছেন রাস্তাটা বলে দে।'

পানে চুল লাগাতে লাগাতে দোকানদার বলেছে, 'জরুর। বহুত আদমীই খবর নেয়। কিন্তু ঠিক এই সময় নয়, আর কিছুক্ষণ পরে।'

তারপর হরকিঙ্করকে আর একবার ভালভাবে দেখে, মুখ-টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নতুন শখ হয়েছে বুঝি? বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। মিনিট পাঁচেক পরে ডানদিকের পাকা রাস্তাটা ধরবেন। ওইখানেই সিনেমা হল। হলের পিছন দিকেই গোটা কয়েক গলি—ওইখানেই যা চাইছেন, তা পাবেন!'

আর সময় নষ্ট না করে হরকিঙ্কর এগোতে শুরু করেছেন। সিনেমা হলের কাছে আরেকটা দোকানে জিজ্ঞেস করতে হলো। তারাও মুচকি হাসলে। বললে, 'শরাব চাই নাকি বাবু? ভাল জিনিস পাবেন।'

দাঁতে দাঁত চেপে হরকিঙ্কর গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েকটা দরজার কাছে কারা যেন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরকিঙ্কর একবার থমকে দাঁড়ালেন। গ্যাসপোস্টের আলোয় মেয়েগুলোও তাঁকে ভাল করে দেখে নিলে। এমন নামাবলী গায়ে সদ্‌ব্রাহ্মণ অতিথি তারা বড়ো একটা পায় না। তাই আহ্বান জানালে, 'আসবেন নাকি ঠাকুর?'

হরকিঙ্কর ওদের দরজার দিকে তাকালেন। লাল সিঁদুরে কি যেন লেখা—শ্রীশ্রীদুর্গামা সহায়। পাশের দরজায় তাই লেখা। ব্যাপার কী?

এগিয়ে গেলেন হরকিঙ্কর। এখানে লেখা—'ভদ্রলোকের বাড়ি।' হরকিঙ্করের দেহটা যেন ঘুলিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হবে।

এইখানটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। দরজার মাথায় মায়ের নামও রয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা এখনও বেরিয়ে আসেনি। হয়তো এখনও সাজপোশাক করছে, কিংবা ওদের হয়তো বাইরে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। এইখানকার মৃত্তিকাতেই কাজ চলে যাবে। উবু হয়ে বসে মাটি সংগ্রহ করতে বসলেন হরকিঙ্কর। এমন সময় কে যেন নারীকণ্ঠে বললে 'ও-মাগো, লোকটা ওখানে বসে কী করছে?'

হৈ হৈ করে ভিতর থেকে আরও দুটো-তিনটে মেয়ে এসে হরকিঙ্করের হাত চেপে ধরলো। 'এই মিন্‌সে, এখানে কী করছিস্?'

হরকিঙ্কর ঘাবড়ে গিয়েছেন। 'না মা, কিছু করছি না।'

'মুয়ে আগুন মিন্‌সের, ঢঙ দেখলে মরে যাই। উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!'

'সত্যি বলছি মা', হরকিঙ্কর কাতর আবেদন করলেন।

'ওর হাতে কী রয়েছে, দেখ তো?' একজন বললে, আর একজন জোর করে হরকিঙ্করের মুঠোটা খুলে ফেললো। 'এক মুঠো ধুলো নিয়ে বুড়ো কী করছিল গা?'

আর একজন মেয়ে প্রসাধন অর্ধসমাপ্ত রেখেই বোধ হয় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। গা দিয়ে সস্তা স্নো-এর গন্ধ বেরোচ্ছে! সে এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। 'সর্বনাশ করেছে, কাপালিক নিশ্চয়, তুক করছিল।'

'না না, আমি পুরুত মানুষ, তুক করবো কেন?' হরকিঙ্কর একটু ভয়

পেয়েই বললেন।

মেয়েদের গলার স্বরে একটা মোটকা লোকও কোথা থেকে হাজির হয়েছে। 'ঘেঁটুবাবু, দেখুন না, লোকটা এখানে বসে মাটি তুলছিল। কি তুক-তাক করে গেল কে জানে।'

ঘেঁটুবাবু এবার হরকিঙ্করের গলার চাদরটাকে টেনে ধরলো, অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, 'তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কেবল এখানকার মৃত্তিকা নিতে এসেছি দুর্গাপুজোর জন্যে।'

ঘেঁটুবাবু হরকিঙ্করের হাতে আচমকা একটা থাপ্পড় দিলে। সমস্ত মাটিটা ঝরে পড়ে গেল। মেয়েরা বললে, 'কী সর্বনাশ গা, এত বাড়ি থাকতে আমাদের দরজা থেকে মাটি তোলা। মরণ আর কি! গতর বেচে করে খাচ্ছি, তাও সহ্য হচ্ছে না মিন্‌সের।'

ঘেঁটুবাবু বললে, 'যা শ্লা! আর খবরদার মাটি নিতে আসিস না এখানে। তাহলে জান লিয়ে লেবো।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছেন হরকিঙ্কর। উত্তেজনায় দেহটা কাঁপছে! সামান্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে এসে এ কি বিপত্তি! কেন বাপু, সামান্য একটু মাটি নিলে কী তোমাদের ক্ষতি হতো?

হরকিঙ্করের দেহটা ঘিনঘিন করছে। যেন কয়েকটা নর্দমার ধেড়ে ইঁদুর তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। স্নান করতে হবে তাঁকে। গঙ্গাজলে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

কিন্তু মাকে কী দিয়ে স্নান করাবেন তিনি? মহাস্নানের সময় এই মৃত্তিকা আসবে কোথা থেকে? পাগল নাকি তিনি? এত ভাববার কী আছে? হাজার হাজার পুজো তো দশকর্মা-ভাণ্ডারের ভেজাল মাটি দিয়েই হচ্ছে। আরেকটা হবে।

একটা রিকশা ডাকবেন নাকি হরকিঙ্কর? কিন্তু এই অবস্থায় রিকশায় চড়লে লোকে মাতাল ভাববে। হাঁটছেন হরকিঙ্কর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন হরকিঙ্কর। ক্যাঁচ করে একটা মোটর এসে প্রায় ঘাড়ের কাছে থামল।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পেটটা বেশ মোটা, গলায় হার ঝুলছে। 'সুব্রতা দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?

ক্লাবে ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়?'

হরকিঙ্কর বিরক্তভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। 'সুব্রতা দেবীর বাড়িতে এত রাত্রে দেখা হয় না।'

লোকটা এবার নেশার ঘোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'মাইরি আর কি? গোঁসাই বাড়ির মেয়ে বুঝি।'

'যা বলছি, তাই শুনুন। সুব্রতা এমন সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না।'

'আহা-হা, চু চু! তাহলে সব বলবো নাকি? কিন্তু কে হে তুমি বাবার ঠাকুর?'

'মুখ সামলে কথা বলুন বলছি।'

'ওরে বাপরে, মানে মানে কেটে পড় বাছাধন, নইলে, স্রেফ ট্রেনে কাটা পড়বে।'

'এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, যদি বেশী কিছু করেন।'—হরকিঙ্করের দেহে শক্তি থাকলে লোকটার গালে একটা থাপ্পড় মারতেন।

'ও বাবা! সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, কবে থেকে উনি ভদ্দরলোকদের পাড়ায় উঠে এসেছেন!'

দু'জনেই এবার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছেন।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হরকিঙ্কর! হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির উপরের দিকটা ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটার সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে। এক ঝটকায় সে হরকিঙ্করকে মাটিতে ফেলে দিলে। 'শালা, আমি ভাবছিলাম আমিই শুধু মাতাল হয়েছি। দেখছি তুমিও মাল টেনেছো।'

লোকটা হয়তো এবার হরকিঙ্করের বুকের উপর চেপে বসতো। হরকিঙ্করও গড়াতে গড়াতে লোকটার পা ধরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো সর্বনাশ কিছু একটা ঘটতো। কিন্তু গোলমাল শুনে সুব্রতা এসে দরজা খুলে থমকে দাঁড়াল।

'এই যে সুব্রতা দেবী। একটু আগে আপনি বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন। কিন্তু আপনি চলে আসবার পর দেখলাম হাতে কাজ নেই। আপনাকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন হুহু করতে লাগল।'

হরকিঙ্কর মাটি থেকে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মা, তুই ভিতরে চলে যা। কোথাকার মাতাল এসে পাড়ায় ঢুকেছে। কোত্থেকে

তোর নাম জেনেছে। আমি ওর দেখাচ্ছি মজা।’

কিন্তু এ কি হলো? এখনও মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

লোকটা বললে, ‘কোথাকার এই বুড়োটাকে আপনার বাড়ির খোঁজ জিজ্ঞেস করে ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি নিয়ে এসেছি।’

সুব্রতা তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছ। সে আস্তে আস্তে বললে, ‘আপনি এখন যান। আমি যাবো না।’

‘কেন, কী হলো আপনার? এই তো কিছুক্ষণ আগে হোটেল থেকে এলেন। ডার্করুমে টেস্ট দিলেন। এর মধ্যেই ক্যারাকটার পাল্টিয়ে গেল? বইতে নাবার ইচ্ছে নেই বুঝি!’

‘কী?’ হরকিঙ্কর আবার লোকটার দিকে তেড়ে গেলেন।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর, যা-বলছি ঠিক তাই।’ লোকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

সুব্রতা এবার চিৎকার করে উঠলো, ‘যান বলছি। না হলে এখনই লোক ডাকবো। চাই না আপনার বইতে পার্ট নিতে।’ সুব্রতা এবার ঠকঠক করে কাঁপছে।

লোকটা বুঝলো কোথাও আজ একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বললে, ‘ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি।’ তারপর হরকিঙ্করকে শুনিয়েই যেন বললে, ‘অন্য কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নিশ্চয়।’

দরজা বন্ধ করে দিলেন হরকিঙ্কর। ঘামে নেয়ে উঠেছে তাঁর দেহটা। সুব্রতা হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে। কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন হরকিঙ্কর। মেয়ে বললে, ‘বাবা!’

বাবা চুপ করে রইলেন।

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ‘বাবা, লোকটা সপ্তমীর দিনে আমার সঙ্গে ফিল্মের কন্ট্রাক্ট সই করবে বলেছিল। এই একবারই—ঢোকবার সময় কেবল ওদের কাছে ছোট হতে হয়। তারপর নাম হয়—সব ঠিক হয়ে যায়।’

বাবা পাথরের মতো চুপ করে রইলেন।

মেয়ে ডাকল, ‘বাবা!’

বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

এখন রাত অনেক। ওরা শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুব্রতার ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা যেন খোলা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো, খোলাই রয়েছে। বাবার বিছানাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুব্রতা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, বিছানায় তো কেউ নেই।

তড়াং করে সভয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রতা। 'বাবা বাবা, আপনি কোথায় গেলেন?'

বাবা দরজার বাইরে রয়েছে। 'বাবা, এখনও জেগে রয়েছেন আপনি? কাল ভোরবেলাতেই না পুজো।'

দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হরকিঙ্কর কী যেন করছিলেন। হরকিঙ্কর এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো রাত্রের অন্ধকারে কাপালিকের চোখের মতো জ্বলছে।

'ওখান থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন বাবা?'

হরকিঙ্করের চোখ দুটো থেকে এবার যেন সত্যিই আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মাটি।'

সুব্রতা বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবু কাছে গিয়ে পরম স্নেহে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাটি কী করবেন বাবা?'

বাবা প্রথমে নির্বাক রইলেন। মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর ঠোঁট দুটো এবার কাঁপতে শুরু করলো। 'পুজোয় লাগবে', এই বলে রাত্রের অন্ধকারে পুরোহিত হরকিঙ্কর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

[গ্রন্থসূত্র
মানচিত্র]

জীপ দুর্ঘটনা

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, এক-এ চন্দ্র। গুরুমশায় বুঝিয়েছিলেন, প্রথম জনকে হতে হবে চন্দ্রের মতো। মেঘমুক্ত গৌরবের আকাশে সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে সে একা জ্বলজ্বল করবে। তার কোনো জুড়ি থাকবে না। সে হবে এক এবং অদ্বিতীয়।

এই কাহিনীও তাই নীলিমাকে দিয়েই শুরু করতে হবে। গতানুগতিকতার তারাভরা আমার স্মৃতির আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো কেউ যদি আজও ভাস্বর হয়ে থাকে, তার নাম নিশ্চয় নীলিমা।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় নীলিমার সঙ্গে আমার কখনও পরিচয় হয়নি, এমনকি ওর একটা ছবি পর্যন্ত আমি দেখিনি। অবশ্য নীলিমার মুখটা কেমন ছিল তা আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে অবিনাশবাবুকে আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, "ওঁর কোনো ছবি আপনার কাছে নেই?"

"না নেই," অবিনাশবাবু বলেছিলেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ-কথাও বলেছিলেন, "ছবিতে কী বুঝবেন? জলজ্যান্ত মানুষটাকে অতদিন ধরে চোখের সামনে রোজ দেখেও আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।"

অবিনাশবাবুর সঙ্গেও আমার দেখা হওয়ার কথা নয়। কোথায় তিনি পড়ে রয়েছেন আর কোথায় থাকি আমি। কেউ কাউকে চিনি না, জানি না। কিন্তু কার্যসূত্রে সেবার আমাদের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

সংবাদপত্র জগতে আমার এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আছেন। সময়ে অসময়ে আমাকে ছোটাছুটি করিয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকেন। শারদীয়া সংখ্যার কাজকর্ম শেষ করে সেবার নিশ্চিন্ত মনে সামান্য বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিলাম। কিন্তু আমার কর্মবীর সম্পাদক বন্ধুর তা কিছুতেই সহ্য হলো না। ট্রেনের টিকিট কেটে দিয়ে, জোর করে

কলকাতা থেকে চারশ' মাইল দূরে রানীবেড়াতে রিপোর্টিং-এর কাজে পাঠালেন।

রানীবেড়াতে একটা পাহাড়ী নদীর ধারে আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও ডজন-খানেক রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারও ঐখানে জমা হয়েছিলেন।

ভৌগোলিক মতে রানীবেড়া একটি মালভূমি। সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত থেকে পূর্ব ভারতের এই অরণ্যসংকুল পার্বত্য অঞ্চলটি লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছিল। ধনলোভী শক, হূন, পাঠান, কিংবা লুণ্ঠনকারী মোগলদের কোনো পাষাণহৃদয় সেনাপতিও এই নির্জন ভূখণ্ডের নীরবতা ভঙ্গ করেনি। এমনকি ঐশ্বর্যলোভী বণিক ইংরাজও তার কলুষিত হস্তে এই যুবতী মালভূমির কুমারী অঙ্গ স্পর্শ করতে সাহসী হয়নি।

কিন্তু পরাধীনতার হাজার বছরেও যা হয়নি, স্বাধীনতার এক দশকেই তাই হলো। অনুসন্ধানী ভূতত্ত্ববিদরা নানাপ্রকারের জটিল যন্ত্রের সাহায্যে অনুসন্ধান করে ঘোষণা করলেন যে, এই আপাত কঠিন কুমারীটির বক্ষদেশ নিতান্তই কোমল ; এবং সেখানেও বহু খনিজ সম্পদ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে! ভূমস্থনের এই অমৃতে ভাগ বাসাবার জন্য রাজস্থানের শেঠজী, পাঞ্জাবের সর্দারজী, বোম্বাই-এর গুজরাটীভাই এবং বাংলার সায়েবসুবোরা হৈ হৈ করে এই অখ্যাত দেশে ছুটে এলেন। মাটির গভীরে এতোদিন যা ঘুমিয়ে ছিল, তাকে উপরে তুলে এনে এবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাতে হবে। সুতরাং রেল-লাইন পাতার হুকুম হলো। রানীবেড়ার রঙ্গমঞ্চে এবার যাঁরা আবির্ভূত হলেন তাঁরা টেরিলিনের বুশশার্ট ও গ্যাবার্ডিনের প্যান্টপরা কন্ট্রাক্টর, সাদা ড্রিলের হাফ্‌প্যান্টধারী ওভারসীয়র, এবং খাকি জিনের প্যান্টপরা এ-ই-এন। তাঁদের পিছনে পিছনে এলো কৌপীনধারী কুলির দল।

তাদেরই অনেকদিনের রক্তজল-করা পরিশ্রমে রানীবেড়ার অসমতল ভূমি ক্রমশ সমতল হলো। তারপর অরণ্যের অর্ধ-উলঙ্গ আদিবাসীরা একদিন অবাক হয়ে দেখলো টুপিওয়ালা 'খাকি-সাহেব' সেই সমতল ভূমির উপর ইস্পাতের রেল-লাইন বসাচ্ছে। সেই নতুন রেলপথের উদ্বোধন করতেই হাজার মাইল দূর থেকে প্রধানমন্ত্রী জেটচারী হয়ে

রানীবেড়াতে আসছেন এবং তাঁর জন্যই আমাদের আসা।

সেই ভোর থেকে দূর দূরান্তের গ্রামবাসীরা তাদের 'বড়ে রাজা'কে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য নদীর ধারে জমায়েত হচ্ছিল। আদিবাসীদের রঙীন শোভাযাত্রার একটা ছোট্ট বর্ণনা সকালের দিকেই তারযোগে কলকাতা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অপরাহ্ণে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা। বক্তৃতার মধ্যে হাততালি দিয়ে অন্য লোকেরা যখন তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আমরা তখন ওঁর বক্তব্য দ্রুতবেগে নোটবুকে লিখে যাচ্ছি। অবশেষে যখন প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঐ পাহাড়ী নদীটার নতুন ব্রীজের উপর দিয়ে একটা জনবহুল প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলতে আরম্ভ করলো, তখন আমরা দ্রুতবেগে ক্যাম্পে ফিরে এসে টাইপরাইটারে নিজেদের ডেসপ্যাচ তৈরি করতে আরম্ভ করেছি।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। ক্যাম্প পোস্টাপিস থেকে আমাদের খবর পাঠানোর উত্তেজনা অনেক কমে গিয়েছে। সেই সময় ডি-ই-এন মিস্টার হালদার এলেন। ওঁর পুরো নাম অবিনাশ হালদার, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করছেন।

এক গাল হেসে অবিনাশ হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

বললাম, "না না। অসুবিধে আবার কী?"

অবিনাশবাবু বললেন, "আমি আরও আগে আসতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম, আপনারা যখন লেখালেখি করবেন তখন শুধু ডিসটার্ব না করাই ভালো।"

বললাম, "মিস্টার হালদার, আপনি যে খবরের কাগজের অফিসে কোনোদিন যাননি, আপনার কথা থেকেই বুঝতে পারলাম। দিনের পর দিন গোলমালের মধ্যে কাজ করে করে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে গোলমাল না হলে আমাদের অনেকের কলম দিয়ে লেখাই বেরোয় না।"

উনি এবার হা-হা করে হেসে ফেললেন। বললেন, "না মশাই, মাদার সরস্বতীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা বিশেষ মধুর নয়। তাই লেখা-পড়ার কাজ যেসব জায়গায় হয়, সেখান থেকে আমি সব সময় সেফ্ ডিসট্যান্সে থাকি! দেখুন না, পেন-এ উইক বলেই তো হেড আপিস

থেকে চারশ' মাইল দূরে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পড়ে রয়েছি। লেখাপড়ার কোনো বালাই নেই, শুধু কুলি ঠ্যাঙাও, মাটি ফেলো, আর লাইন পেতে যাও।"

কতক্ষণেরই বা পরিচয়, কিন্তু কেন জানি না অবিনাশবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল। ওঁর চালচলন, কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা ঘরোয়া ভাব আছে যে বেশীক্ষণ পর হয়ে থাকা যায় না।

শ'চারেক শব্দ টেলিপ্রিন্টারে ফাইল করেছি, আরও কিছু পাঠানো প্রয়োজন কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে অবিনাশবাবু চুপি চুপি বললেন, "সঙ্গে জীপ রয়েছে, চলুন না একটু ঘুরে আসি।"

আমার পক্ষে সুবর্ণ-সুযোগ। এঁরা প্রোজেক্টের লোক, একলা পেলে হয়তো কোনো স্কুপ-খবরও আদায় হয়ে যেতে পারে। এবং সেই লোভেই এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। বললাম, 'চমৎকার আইডিয়া, মিস্টার হালদার। ক্যাম্প পোস্টাপিসে বসে কাগজওয়ালাদের উঁচু উঁচু নাকগুলো দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। চলুন, ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে চোখ দুটোকে তবু একটু স্বাধীনতা দেওয়া যাবে।"

পোস্টাপিস থেকে বেরিয়ে এসে, মিস্টার হালদার নিজেই জীপ গাড়ির স্টিয়ারিং ধরলেন। ঠিক ওঁর পাশে বসে, আমিও একবার ওঁকে ভালভাবে দেখে নিলাম। মোটাসোটা ভদ্রলোকটি, টিপিক্যাল গোবেচারী বাঙালী চেহারা। বয়স হয়েছে, এবং রিটায়ার করতে যে বেশী দেরী নেই তা মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে মিস্টার হালদার বললেন, "রানীবেড়াতেই যখন এলেন, তখন গরীবের বাড়িতে একবার পদধূলি দেবেন চলুন। কলির রামচন্দ্র আমরা, বিনা অপরাধে কেমন বনবাস যন্ত্রণা ভোগ করছি তা নিজের চোখে দেখে আসবেন।"

"আবার কেন আপনাকে কষ্ট দেওয়া," আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু উনি শুনলেন না। বললেন, "এ-বয়সে আমাদের কপালে দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কী থাকতে পাবে স্যার?" তারপর একটু থেমে বললেন, "এখান থেকে বেশী দূর নয়। মাত্র মাইল পনেরো ; আপনার কোনো

অসুবিধে হবে না। পাকা রাস্তা আছে, হুস করে পৌঁছে যাবো।"

এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ পেরিয়ে, ডানদিকে মোড় ফিরে জীপটা এবারে একটা বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তাটা সত্যি সুন্দর। বিরাট ক্যানভাসের উপর আর্টস্কুলের সোনার মেডেল-পাওয়া কোনো ছাত্র যেন পথের ছবি এঁকে দিয়েছে—কোথাও কোন খুঁত নেই। চওড়া, সোজা রাস্তা, গাড়িরও তেমন ভিড় নেই। আমাদের জীপটাও যে খুব পুরনো নয়, তা মোটর কোম্পানীর লেবেল থেকেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু মিস্টার হালদারের হাতে স্পীডোমিটারের কাঁটা মাত্র দশ থেকে পনেরোর মধ্যে নাচানাচি করছে।

হুসহুস করে গোটা দশেক মোটর আর স্টেশন ওয়াগন আমাদের পিছনে ফেলে রেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমি নিজে কিছুই বলিনি। কিন্তু হালদার সায়েব আমার মুখের ভাব দেখেই যেন মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। তাই নিজে থেকেই বললেন, "যে যাচ্ছে তাকে যেতে দিন। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর মধ্যে আমি নেই।"

দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঐ দিকে আঙুল দেখিয়ে উনি বললেন, "ঐ পাহাড়ের ঠিক ওধারেই আমার বাড়ি—সেকসন ফোর এরিয়া। দশটা সেকসনের চার্জ ছিল আমার ওপর। দু'জন মাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এই চল্লিশ মাইল লম্বা রেল লাইন পেতেছি আমরা। দু'বছরে দশ কোটি কিউবিক ফুট শুধু মাটিই কাটা হয়েছে।"

কিউবিক ফুটে আমার আগ্রহ নেই, আমার মন তখন অন্য জায়গায় পড়ে রয়েছে। বললাম, "মিঃ হালদার, টেলিপ্রিন্টারে সারাদিন তো শুধু শুকনো বক্তৃতা পাঠালাম ; কোনো হিউম্যান স্টোরি থাকলে বলুন।"

আমাদের খবরের-কাগজী ভাষা ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "স্টোরি তো আপনিই লেখেন শুনলাম। আমার মশাই ওসব একদম আসে না।"

বললাম, 'না না, ছোটো গল্প নয়, হিউম্যান স্টোরি। যেমন মাটি খুঁড়তে গিয়ে হয়তো অনেক সাপ বেরিয়েছে। হয়তো বাঘেরা ক্যাম্প আক্রমণ করেছে। কিংবা হাতীরা হয়তো দলবেঁধে লাইন তৈরির কাজে

বাধা দিয়েছে।"

"তার মানে এনিম্যালদের স্টোরি বলুন।"

"আজ্ঞে, এই সব ঘটনাকেই খবরের কাগজে হিউম্যান স্টোরি বলে।"

মিঃ হালদার মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, আমি দুঃখিত। কাজ করতে গিয়ে কাউকে এখানে সাপে কামড়ায়নি, বা বাঘে ধরে নিয়ে যায়নি। কেউ এখানে মরেনি। কেবল একজন..." স্টিয়ারিংটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন, পরমুহূর্তে বললেন, "না মশাই, তার সঙ্গে এই রেললাইনের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"বাইরের কেউ এখানে প্রাণ হারিয়েছে নাকি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু মিঃ হালদার আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।

নতুন তৈরি রেললাইনটা বাঁদিকে রেখে আমাদের জীপ এগিয়ে চলল। রেললাইনটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে মিঃ হালদার বললেন, "ছোকরার কাজকর্ম খুব ভাল ছিল। সময়-মতো ও বড়ো হতে পারতো।"

কথার ফাঁকে ফাঁকে কোন্ সময় আমরা মিঃ হালদারের কোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছি।

কোয়ার্টার মানে একটু বড় আকারের তাঁবু। তাঁবুর পর্দাটা হাতে তুলে ধরে মিস্টার হালদার বিনীতভাবে বললেন, "আসুন, আসুন, এই আমার বাকিংহ্যাম প্যালেস।"

প্রচুর খাতির করে মিঃ হালদার আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার একটু কষ্ট হবে। এখানকার সব কিছু অগোছাল। বেদেদের মতো আমাদের জীবনের সবটাই তো তাঁবুতে কেটে গেল, সভ্য হওয়ার সুযোগই পেলাম না।"

নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে উনি হঠাৎ আঁতকে উঠলেন। বললেন, "জঙ্গলে থেকে থেকে একেবারে জানোয়ার বনে গিয়েছি। আমার জামাকাপড় যে এতো ময়লা হয়েছে খেয়ালই ছিল না।"

অতি অমায়িক মানুষ মিস্টার হালদার। নিজের হাতে ট্রে সাজিয়ে কাপ ডিস নিয়ে এলেন। কফি তৈরি করলেন। তারপর বললেন, "আঠারো বছর বয়সে কাজে ঢুকেছি। কত জায়গায় তো লাইন, আর

ব্রীজ তৈরি করে এলাম, কিন্তু রানীবেড়ায় এই কাজটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

একটু থামলেন মিঃ হালদার। তারপর বললেন, "আপনি তো মশাই সাহিত্যিক লোক। সাধারণ মানুষ আপনাদের কথাটথা তবু শোনে। আপনার লেখার মধ্য দিয়ে একটা কথা তাদের বলবেন—"

"কী কথা?" আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

"তারা যেন গাড়িটাড়িগুলি একটু সাবধানে চালায়। পৃথিবীতে সব কিছু সাবধানে করা দরকার। একজনের ছোটো ভুলের জন্যে এই সংসারে অনেককে বহু বড়ো মূল্য দিতে হয়।"

বললাম, "আমাকে বেশ বিপদে ফেললেন, মিঃ হালদার। আমাদের লেখা যাঁরা ভালোবাসেন এবং পড়ে আনন্দ পান, তাঁরা সাধারণ মানুষ; তাঁদের ক'জনেরই বা গাড়ি আছে বলুন? তাছাড়া সাবধানে ড্রাইভ করে দুর্ঘটনা এড়ানোর আবেদন ট্রাফিক পুলিশ আর অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন তো বহুদিন থেকেই প্রচার করে আসছেন।"

আমার বক্তব্য মিস্টার হালদারের মনে কোনো রেখাপাত করলো না তা সহজেই বুঝতে পারলাম। চামচ দিয়ে গরম কফি নাড়তে নাড়তে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট। কিন্তু আপনারা পণ্ডিত লোক, অনেক বই-টই পড়েছেন, অনেক চিন্তা করেছেন। অনেকদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও একটা প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। হয়তো কোনো দর্শনের বইতে এর উত্তর লেখা আছে, আমি জানি না। আপনারা মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন ; হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আচ্ছা, বলতে পারেন, মেয়েদের যতোগুলো গুণ বা ভার্চু আছে তার মধ্যে সতীত্বের স্থান কত নম্বরে?"

বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। বললাম, "মিঃ হালদার, পাশ্চাত্যের চিন্তানায়করা সাহসকে পুরুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে স্থির করেছেন। কিন্তু মেয়েদের ভার্চু সম্বন্ধে সেরকম কিছু তো পড়িনি।"

মিঃ হালদার বললেন, "আপনার বা আমার স্ত্রীকে এ-প্রশ্ন করে লাভ নেই—আমাদের এই আলোচনা কানে গেলে তাঁরা তো ঝাঁটা হাতে তেড়ে আসবেন। কিন্তু এই জঙ্গলে বসে চোখের সামনে যা দেখলাম, তাতে আমার মতো গোঁড়া ধর্মভীরু লোককেও বেশ চিন্তায় পড়তে

হয়েছে।"

মিঃ হালদার একটা চুরুট ধরালেন। আমাকে বললেন, "ঐভাবে চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে না থেকে, জুতোটা খুলে আমার ক্যাম্পখাটটায় পা তুলে বসুন।" তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার তো আর ক্যাম্পে ফিরবার তাড়াতাড়ি নেই। বিদেশের এই নিঃসঙ্গ বাঙালী বৃদ্ধকে না হয় একটু সঙ্গ দিলেন।"

বললাম, "কোনো আপত্তি নেই। আসলে রাত্রের অন্ধকারে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়ে ক্যাম্পে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করতে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছি।"

উনি চুরুটটাতে একটা লম্বা টান দিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "আপনার কাছে সমস্ত অপরাধটা অকপটে স্বীকার করলে তবু একটু শান্তি পাবো। হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না, হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে, একলা চুপচাপ ক্যাম্প-চেয়ারে বসে থাকি, তখন হারিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। আমার ভয় হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি ব্যাপারটায় আমার দায়িত্বও কম ছিল না।

"সত্যিকথা বলতে কি, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আসবার বিশেষ ইচ্ছে ছেলেটার ছিল না। কেন জানি না আমার মনের মধ্যে দুষ্টুমি বুদ্ধিটা হঠাৎ জেগে উঠলো ; তখন আমিই ওকে তাতালাম।" অবিনাশবাবু একটু থামলেন।

"ছেলেটি কে।" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ওহো, তাই তো আপনাকে বলা হয়নি" অবিনাশ হালদার পিঠটা সোজা করলেন।

বললেন, "ওর নাম কোহিনূর মিত্র। এই লাইনে মাটি ফেলার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই ছেলেটি এখানে বদলি হয়ে এলো। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার। বছর পঁচিশেক বয়স। শিবপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে, রেলের আই-আর-এস-ই পরীক্ষা দিয়েছিল। যাকে বলে কিনা বর্ণ অফিসার—কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছে, আমাদের মতো প্রমোটেড্ মাল নয়। আমরা তো সেই ওভারসীয়ার হয়ে ঢুকেছিলাম, তারপর প্রমোশনের তেল-মাখানো বাঁশ বেয়ে এক গাঁট এক

গাঁট করে উঠতে উঠতে মরণকালে যেখানে মাচা বেঁধেছি, ওদের সেইখান থেকেই শুরু। কিন্তু কেন মিথ্যে বলবো, ভারি ভালো ছেলে। আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। কাজে ভুল করলে কতবার রাগের মাথায় বকুনিও দিয়েছি, কিন্তু ছোকরা কোনোদিন মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেনি।

"কনষ্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের ডি-ই-এন আমি অবিনাশ হালদার সেই থেকেই মজে গেলাম। জীপে করে প্রায়ই পাহাড়ের এদিকে কোহিনূর মিত্রের তাঁবুতে এসে বসতাম। বলতাম, মিস্টার মিত্র, মাঠে ঘাটে কাজের সুযোগটা আপনাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। কমবয়সে ঢুকেছেন, দুদিন পরেই আমার পোস্টে বসবেন—তারপর ডেপুটি, তারপর চীফ, তারপর জি-এম। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা একটু মুখ তুলে চাইলে বোর্ডের মেম্বার হয়েই যে রিটায়ার করবেন না এ-কথা কে বলতে পারে?" অবিনাশ হালদার একটু থামলেন।

"তারপর?"

অবিনাশ হালদার আবার আরম্ভ করলেন—

"তারপর একদিন খবর পেলাম কোহিনূর মিত্র বিবাহিত। ছোকরাকে চেপে ধরলাম—'হ্যাঁ মশায়, আপনি যে রিসেন্টলি ম্যারেড, তা তো কখনও বলেননি?"

কোহিনূর সলজ্জ হেসে বলেছে, তা আর বলবো কী?

"তা সত্যি। আপনার ক্যাম্পখাটের পাশে টিপয়ে রাখা ফটোটা দেখে আমারই বোঝা উচিত ছিল!" আমি হা-হা করে হেসে ফেলেছি। বলেছি, 'তবে মশাই আপনাদের এই বিচ্ছেদটা আমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ বাল্মীকির সেই ব্যাধের মতো আমরাও নিশ্চয় বিরহিণী সতীসাধ্বীর অভিশাপ কুড়োচ্ছি! দিন দশেকের ছুটি দিয়ে যে আপনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো, তারও উপায় নেই। লাইন পাতার কাজ কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে—সামনেই, জি-এম-এর ইন্সপেকশন।'

তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোহিনূর মিত্র কানের পাতা দুটো লাল করে বসলো। জোর গলায় বললে, "না না, কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু ছুটি নিয়ে কী করবো?"

"আমি মশাই সহজ সরল মানুষ, মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ নেই। ওর কথা শুনে বেজায় চটে উঠলাম। বললাম, প্রয়োজন নেই, বললেই হলো? আমাদেরও মশাই একদিন আপনাদের বয়স গিয়েছে। সে সব দিনের কথা এখনও ভুলিনি। আমি তখন রাজগীরে সার্ভে করছি। মাস কয়েক হলো বিয়ে হয়েছে। শ্রীমতী পড়ে রয়েছেন কলকাতায়। সেখান থেকে অভিমান করে তিনি তো একখানা চিঠি ছাড়লেন। আর নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েদের অভিমান যে কি ডেঞ্জারাস তা তো আপনি এখনও জানেন না। চিঠিখানা পেয়ে মেজাজটা এমন খারাপ হয়ে গেল যে, ছুটি না নিয়েই পালিয়ে এলাম। আপিস থেকে টেলিগ্রাম পাঠালো মেডিক্যাল অফিসারের সামনে এপিয়ার হও। আমার অবস্থাটা তখন বুঝুন। বৌকে খুশী করতে গিয়ে চাকরিটা যায় আর কি! কিন্তু মশাই, তখন দিনকাল আলাদা ছিল। সি-এম-ও বুকে পিঠে ষ্টেথো লাগিয়ে বললে, "বাবু, তোমার যা ফিটনেশ তাতে তোমাকে এভারেস্ট এক্সপিডিশনে পাঠানো যেতে পারে। তা রাজগীর থেকে পালিয়ে এলে কেন?" লজ্জার মাথা খেয়ে তখন আসল ব্যাপারটা বললাম। শুনে সায়েব পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "আই সি। মোস্ট-সার্টেনলি, নিশ্চয় ছুটি পাবে। আমি যতোক্ষণ আছি কোনো চিন্তা নেই, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" খস খস করে লিখে দিলে—নার্ভাস রোগ। এক মাসের পুরো বিশ্রাম!"—অবিনাশবাবু এবার একটু থামলেন।

আমি বললাম, "আপনাদের সি-এম-ও তো বেশ রসিক সায়েব ছিলেন।"

অবিনাশবাবু বললেন, "এখন বলতে লজ্জা নেই, রাজগীর থাকতে আমি এইভাবে তিনবার পালিয়েছিলাম।"

একটু থেমে অবিনাশবাবু আবার বললেন, "তবে তখন কাজে আমাদের এত দায়িত্ব ছিল না। এখন এই এক ফোঁটা বয়সেই বিরাট দায়িত্ব,—পাঁচটা সেকশনের রেসপন্‌সিবিলিটি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

হালদার সায়েব বললেন, "সেদিনকার মতো প্রসঙ্গটা বন্ধ হলেও সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর একদিন জীপ থেকে নেমে প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে কোহিনূরকে বললাম, "বুদ্ধি বেরিয়ে

গিয়েছে। আমাদের বৌমাকে এখানে নিয়ে আসুন।"

"কোথায়? এই তাঁবুতে? যার আট মাইলের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই?" কোহিনূর যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করেছিল।

আমি বললাম, "হ্যাঁ। বিয়ের একসপ্তাহের মধ্যে আপনি এখানে চলে এসেছেন। ভাবুন এইখানেই আপনাদের হনিমুন। আমি তো যতো দূর জানি, হনিমুনের জন্যে সায়েবরা এই রকম নির্জন জায়গাই পছন্দ করে।" কথা না বাড়িয়ে আমি কোহিনূরের তাঁবুটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। শেষে বললাম, "এই তাঁবুতে হবে না। আমার তাঁবুটা অনেক বড়ো, কালই ওটা পাঠিয়ে দিয়ে এইটা নিয়ে যাবো।"

"সে কি! তা হয় না। মিসেস হালদার যদি কখনও আসেন?" কোহিনূর বলেছিল।

আমি বলেছিলাম, "সে গুড়ে বালি! তিনি এখন বড়োমেয়ের সাধ, মেজছেলের পরীক্ষা, ছোটছেলের আমাশা ইত্যাদি নিয়ে বেজায় ব্যস্ত আছেন। এখানে আসবার একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর।"

মুখে আপত্তি জানালেও প্রস্তাবটা কোহিনূরের বেশ ভাল লেগেছিল। তার উপর আমি নিজেই হৈ চৈ করে, কোহিনূরের লজ্জা বাঁচিয়ে ওর বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম।

বৌমা সত্যই একদিন আসছেন শোনা গেল। নাম নীলিমা। ট্রেন থেকে তাকে নামতে দেখেই চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে গেল। চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা আজও যেন দেখতে পাচ্ছি। কলকাতার এক্সপ্রেস গাড়িখানা স্টেশনে এসে থামতেই ফার্স্টক্লাস কামরার দরজাটা খুলে গেল। আর সেইখানে দেখা গেল হালকা খয়েরী রঙের ছাপানো বাঙালোর সিল্কের শাড়ী-পরা কুড়ি-একুশ বছরের এক তন্বী যুবতীকে। পায়ে সবুজ রঙের হাওয়াই স্যান্ডেলের মধ্য দিয়ে আলতায় লাল নখগুলোর দিকেও আমার নজর পড়েছিল। হাত দুটো সরু সরু হলেও, ঠিক যেন ওর চটুল দেহের অন্য অংশের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তৈরি করা। আর মুখটি দেখলেই বোঝা যায়, অভিজাত গৃহের নিষ্পাপ সরল মেয়ে। এদের যেন জাতই আলাদা, আমার মনে হয়েছিল।

কুলিরা এসে কামরা থেকে হোল্ড-অল, সুটকেশ আর ব্ল্যাক জাপান

রঙের ট্রাঙ্কটা নামিয়ে রাখলো। কোহিনূর পরিচয় করিয়ে দিতেই সে আমাকে আলগোছা অথচ মিষ্টি একটি নমস্কার জানালো।

জীপে ওদের দুজনকে তুলে দিয়ে, আমি নিজের ক্যাম্পে যাবার জন্য অন্য এক গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোহিনূর বাধা দিলে, বললে, "তা হয় না, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত আমার বাড়ি থেকে ঘুরে যেতে হবে।"

"ও বাবা, বৌমা মাটিতে পা দিতে না দিতেই তোমার তাঁবুটা বুঝি বাড়ি হয়ে গেল! বাঃ, চমৎকার।" আমি হা-হা করে হেসে ফেললাম।

ক্যাম্পে যাবার পথে একটু প্রাণ খুলে গল্প করার সুবিধের জন্য জীপ ড্রাইভারকে আমরা চলে যেতে বললাম। কোহিনূর বললে, "আপনি বসুন, আমিই চালাচ্ছি।"

আমি রাজী হলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?"

"লাইসেন্স না থাকলেও অনেক পাকা ড্রাইভারকে আমি গাড়ি চালানো শেখাতে পারি। একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিলেই হয়, শুধু কুড়েমি করেই লাইসেন্সটা নেওয়া হচ্ছে না।"

কেন জানিনে আমার মনে হলো, কোহিনূর যেন নববধূকে শুনিয়ে শুনিয়েই কথাগুলো বললে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, "বৌমার, একা একা ট্রেনে আসতে কোনো..."

"না, বিয়ের আগে তো টো টো করে একলা সমস্ত কলকাতা শহর চষে বেড়াতো", কোহিনূর উত্তর দিলে।

"একদম বাজে কথা, কে বলেছে?' নীলিমা এমনভাবে প্রতিবাদ করলো যেন ওদের কতদিনের পরিচয়।

ওদের কথাবার্তা শুনে আমি হঠাৎ একটু দার্শনিক হয়ে পড়লাম। মনে মনে ভেবে অবাক হলাম যে, মাত্র দু'মাস আগেও এরা কেউ কাউকে চিনতো না। আর এই দু'মাসের মধ্যেও মাত্র সাতদিন ওরা পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়েছে!

আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে কোহিনূরের স্ত্রীকে বললাম, 'কোহিনূরের মুখে শুনেছি তোমার পদ্যটদ্য লেখার

অভ্যাস আছে। তা হলে তো এই পাহাড়, এই ঝর্ণা, এই খোলামেলা মাঠ তোমার কাজে লেগে যাবে। রবিঠাকুর তো এই সব জায়গা নিয়ে বই লিখতে ভালোবাসতেন।”

“এ-সব দু'এক দিনই ভালো লাগে। তারপর এই জনহীন মরুভূমিতে কলকাতার মডার্ন গার্লদের প্রাণ আইঢাই করে উঠবে।” কোহিনূর একটু যেন কৌতুক করেই বললো।

তাতে আমি রেগে উঠলাম। বললাম, ‘আমরা নদী, পাথর, মাটি, ব্রীজ, পয়েন্টস্ এবং ক্রসিং সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু মেয়েদের মন সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ছাঁচটা আলাদা আলাদা হলেও, পৃথিবীর সব মেয়েদের মন ভগবান এই মেটিরিয়ল দিয়ে তৈরি করেছেন। সেই জন্য আসল জায়গায় গাঁয়ের মেয়ে, শহরের মেয়ে, কলেজে-পড়া মেয়ে, সই করতে-না-পারা মেয়ে সবই এক। সীতা যদি স্বামীর জন্য অযোধ্যা ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে পারেন, তা হলে কলকাতার যে কোনো মেয়েই স্বামীর জন্য এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের কনষ্ট্রাকশন ক্যাম্পে এসে থাকতে পারবে।”

ওদের দু'জনের কেউই কোনো কথা বললো না। যেন দুটো প্রায় অপরিচিত ছেলে মেয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই জন্যই সংসারে দেওর, জা, ননদ, শাশুড়ী থাকা দরকার। হৈ-হৈ হট্টগোল করে আড়ষ্ট সম্পর্কটা তারাই অনেক সহজ করে দেয়।

অবশেষে আমরা ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। ওদের দু'জনকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, চাকরকে চা তৈরি করতে বলে আমি আর একবার নিজের জীপের কাছে গেলাম। মাইল দশেক দূর থেকে কিছু দেশী মিষ্টি আনিয়ে রেখেছিলাম। মিষ্টির প্যাকেটটা ওদের সামনে খুলে দিলাম। অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে নীলিমা এবার মুখ তুললো।

আমি বললাম, “কই ? খাচ্ছ না তো। এ তো তোমারই সংসার। তুমিই তো আমাদের বলবে, এটা খান, ওটা খান, না হলে মাথা খান।” রসিকতাটা করেই কিন্তু একটু সঙ্কোচ হলো। কলকাতার শিক্ষিত মেয়েরা এই ধরণের রসিকতা বরদাস্ত করে কিনা কে জানে।

নীলিমা অবশ্য কিছুই বলেনি। চুপচাপ খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি তখন নীলিমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করেছি। ওর বাবা জেলা জজ

ছিলেন শুনে, কোন্ কোন্ জেলায় ওরা বেড়াতে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করেছি। এইটুকু মেয়ে ইতিহাসে এম-এ পাশ করেছে শুনে আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি। দেখলে তো কিছুই বুঝতে পারা যায় না!

কোহিনূর মিত্রও যেন এই এক ঘণ্টার মধ্যেই কেমন পালটিয়ে গিয়েছে। লজ্জার রাঙা পরশ যেন ওর ওপরেও এসে পড়েছে।

ওদের দু'জনকে ঐ অবস্থায় রেখে আমি আবার নিজের ক্যাম্পে ফিরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। নির্জন এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের মধ্য দিয়ে জীপ চালাতে চালাতে অনেক অদ্ভুত চিন্তা মাথার মধ্যে এসেছে। ভেবেছি, আমরা সারাদিনই তো কাজ নিয়ে পড়ে থাকবো। ঝড়, জল, যাই হোক না কেন এই কুড়ি মাইল এলাকার কাজ কোহিনূরকে দেখতেই হবে। কাজের নেশায়, সারাদিনটাই ক্যাম্পের বাইরে যে কী ভাবে কেটে যাবে, তার খেয়াল থাকবে না। তখন ওই কাজল-পরা টানা টানা চোখের নিঃসঙ্গ মোমের পুতুলটা কী করবে?

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাকা রাস্তার উপর গাড়িটা আনতে হঠাৎ মনে হলো, আমি বড়ো বেশী ভাবছি। ভাবতে হলে তো আরও হাজার হাজার লোকের কথা আমার ভাবা উচিত ছিল—যে সব মেয়েরা সারাদিন মাটি কেটে রাত্রে গাছের তলায় ঘুমিয়ে থাকে ; বৃষ্টি হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া যাদের কোনো গত্যন্তর থাকে না।

পরের দিন ভোরে জীপ গাড়িটা চালিয়ে আমি এই দিকেই কাজে আসছিলাম। এই শিশির-ধোয়া ভোরবেলাটা আমার মতো অরসিকেরও অদ্ভুত ভালো লাগে। ক্যাম্পের বাইরে পাহাড় থেকে আরম্ভ করে ঘাসগুলো পর্যন্ত সবাই যেন ভিজে ভিজে। সকাল বেলায় পাহাড়টার দিকে তাকালে মনে হয় যেন ওর বয়সটাও অনেক কমে গিয়েছে। বনের মধ্যেও এবার লাল লাল এক ধরণের ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে।

কোহিনূর মিত্রের কাম্পে এসে দেখলাম ওরা নেই।

বেয়ারা বললে, সায়েব মেমসাহেব দু'জনেই নাকি ভালো করে ভোর হবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন। আমার এবার মনে হলো তাই তো গাড়িতে আসবার পথে মাঠের মধ্যে কাদের যেন একটা পাথরের ঢিবির ওপর বসে থাকতে দেখলাম। কিন্তু আমি ওদিকেই নজরই দিইনি। যারা কাল সন্ধ্যাবেলাতেও লজ্জায় কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছিল

না, তারাই যে আজ এই ভোরে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যেতে পারে তা আমার কল্পনাতেই আসেনি।

হাতের কাগজপত্রগুলো টেবিলের উপর রেখে, ক্যাম্পের মধ্যে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। কিছু আলোচনা করবারও আছে। তিন নম্বর সেক্সনে রেলপাতার কাজ একটু পিছিয়ে রয়েছে—ঠিকাদারদের টাইট দেওয়া দরকার। জি-এম-এর ইন্সপেকশনের আগে লিংকিং শেষ করতেই হবে।

কতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ মনে হলো, এমন সময় আমার আসা উচিত হয়নি। এই ভোরবেলায় নববিবাহিত দম্পতির প্রাইভেসিকে ডিসটার্ব করবার কোনো অধিকারই আমার নেই।

ক্যাম্প থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু রাস্তার মোড় ফিরতেই দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখতে পেলাম। কোহিনূরকে যেন খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো, আরও কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাফপ্যান্টপরা একটা লোক মনে হচ্ছে।

আরও একটু এগিয়ে এসে মনে হলো ব্যাপারটা একেবারে স্বাভাবিক নয়। নীলিমা যেন কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে। কোহিনূরকে বলছে, 'চলো, ফিরে যাই।'

কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে কোহিনূর চিৎকার করে লোকটাকে বলছে, "কোথায় থাকো তুমি? আজই তোমাকে এই এরিয়া থেকে পুলিশ দিয়ে দূর করে দেবো।"

লোকটা বলছে, "সাব, এবারের মতো আমায় মাপ করুন। ভুল হয়ে গিয়েছে। হুজুর, আপনারা মা-বাপ, আপনারা না দেখলে...।"

লোকটা এবার কোহিনূরের পা জড়িয়ে ধরতে গেল। তাই দেখে কোহিনূর মিত্র রবারের গামবুট পরা ডান পাটা এমন জোরে নাড়লো যে, লোকটা ভয়ে পেছিয়ে গেল, এবং সেই সুযোগে নীলিমার হাতটা টেনে ধরে কোহিনূর হন হন করে এগিয়ে এলো। লোকটা হয়তো ছুটে এসে আবার ওর পা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতো। কিন্তু আমি তখন কাছে এসে পড়েছি এবং সশরীরে ডি-ই-এন সায়েবকে চোখের সামনে দেখেই লোকটা আরও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

আমাকে সামনে দেখে কোহিনূর মিত্র আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল,

যেন কিছু হয়নি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ছোটোছেলের মতো চিৎকার করে বললে, 'আরে, কখন এলেন? চলুন, চলুন।"

কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে ওদের সঙ্গে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। নীলিমা তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে এলো। ক্যাম্পের ভিতর চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ব্যাপার?"

"আর বলবেন না। সেই ড্রাইভারটা! হরিয়া না কি নাম!" কোহিনূর উত্তর দিলো।

"কী নাম বললে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কোহিনূর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, "স্কাউন্ড্রেলটা বহুদিন থেকেই চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করছে। অতি বদ লোক। ওর লাইসেন্স আমি দেখেছি—বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য তিন মাস লাইসেন্স সাসপেন্ডেড ছিল। তাও হয়তো ওর কেসটা বিবেচনা করা যেতো, হাজার হোক ব্যাটা এই এলাকার পথঘাট সব চেনে। কিন্তু ইডিয়টটার সাহস এত বেড়ে গিয়েছে যে, আমাদের প্রাইভেসিকে পর্যন্ত রেসপেক্ট করে না। আমরা যেখানে গিয়ে সকালে বসেছি, সোজা সেইখানে গিয়ে বলে কিনা, আমার চাকরির কী হলো?"—ইংরিজি এবং বাংলার জগাখিচুড়ি করে কোহিনূর মিত্র অনেকগুলো গরম গরম কথা একসঙ্গে বলে গেল।

আমি বললাম, "লোকটাকে আমি দেখেছি বটে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল দুটো চুপসে গিয়ে চোয়ালটা বেরিয়ে পড়েছে। সর্বদা ময়লা খাকি শার্ট আর প্যান্ট পরে থাকে। কাজের জন্য আমার কাছেও কয়েকবার গিয়েছিল। লোকটার কী জাত বলো তো?"

"ব্যাটা অদ্ভুত টাইপের বাংলা বলে। আমার ড্রাইভারের কাছে শুনেছি যে..." হঠাৎ নীলিমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কোহিনূর থমকে গেল। বললে, "সে আপনাকে পরে বলবো।"

নীলিমাও কিন্তু এতোক্ষণ গম্ভীর মুখে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে বললে, "আমার সামনে বলতে অসুবিধা থাকলে আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।"

আমি বাধা দিলাম। "না না, কোনো দরকার নেই।"

মুখটা কুঁচকে কেহিনূর বললে, "এমন কিছু গোপনীয় কথা নয়।

শুনেছি, কোন আয়ার ছেলে, হাফ বাঙালী, হাফ নেপালী বা ঐ জাতীয় কিছু।”

আমি এতোক্ষণ নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। কোহিনূরের কুলি তাড়ানো ব্যবহার দেখে এবং আমাদের কথাবার্তা শুনে বেচারা একদম ঘাবড়ে গিয়েছে। তাই কৈফিয়তের সুরে বললাম, “বৌমা, এদের সঙ্গে ভালো করে কথা বললে এরা একেবারে মাথায় উঠে বসে। এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যে পুজোর যে নৈবেদ্য আর কি। বাবা বাছা বলো, ওরা গতর নাড়বে না! অথচ চোখ রাঙিয়ে খারাপ গালাগালি করে তেড়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে কাজ পেয়ে যাবে।”

নীলিমা বোধ হয় সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেননা কথার উত্তর না দিয়ে সে ভয়ে ভয়ে শুধু আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কতদূর গিয়েছিলে?”

শুনলাম হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেক দূরে চলে গিযেছিল! সারারাত শিশিরে-ভেজা কম বয়সের নরম নরম ঘাসগুলোকে নীলিমার এতো ভালো লেগেছিল যে, চটিটাকে সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে খালি পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। কোহিনূর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে বলেছিল, “খুব সাবধান। শেষে পা ফুটো করে হুকওয়ার্ম ঢুকবে। আর ওই জিনিস একবার দেহে ঢুকলে পেটটা ক্রমশ মোটা হবে, এবং শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছুই থাকবে না।”

“তা তো বুঝলাম। কিন্তু চটিটা কুড়িয়ে আনলো কে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রথমে প্রকাশ করতে রাজী হয়নি, কিন্তু জেরার চাপে কোহিনূরকে স্বীকার করতেই হলো, সে-ই চটিটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে শ্রীমতীর পায়ে পরিয়ে দিয়েছে। লজ্জায় রাঙা হয়ে নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁবু-ফাটানো হাসিতে ভেঙে পড়ে আমি বললাম, “এতে লজ্জার কিছু নেই। চিরকালই এই হয়ে এসেছে, এই তো আইন।”

লজ্জাবিধুরা নববধূর আরও অনেক কীর্তি কাহিনীর বিবরণ তখন

আমি শুনলাম।

লাল-ফুলে-ঢাকা পাহাড়ের কোল দেখে নীলিমা নাকি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল—'ঠিক যেন দূর পাহাড়ের গায়ে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

ছোট্ট মেয়ের মতো সে পাহাড়ের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত কোহিনূরকে বোঝাতে হয়েছিল, ঐ পাহাড়টা কাছে মনে হলেও, আসলে অনেক দূরে।

চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কোহিনূর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, ঐ পাহাড়টা আঠারো মাইল দূরে নয়? ও আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ বৌমা, পাক্কা আঠারো মাইল। ওইখানেই তো কোহিনূরের এলাকা শেষ হলো। ওর ওধারেও আমাদের লাইন তৈরি হচ্ছে।"

এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "পাহাড়টা, বৌমা অপূর্ব। জায়গাটা আমাদেরই যখন ভালো লাগে, তখন তোমরা যারা কবিতাটবিতা লেখো তাদের নিশ্চয় আরও ভালো লাগবে।"

কোহিনূরকে বললাম, "বৌমাকে একদিন ওখানে নিয়ে যেও। গাড়ির তো আমাদের অভাব নেই।"

তারপর আবার বৌমাকে বললাম, "কনস্ট্রাকশনের কাজে ঐ একটা সুবিধে। জীপ চাইলেই পাওয়া যায়। যতো ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও, অডিটের সাধ্য নেই ট্যাঁ ফোঁ করে।"—অবিনাশবাবু এবার চুপ করলেন।

অবিনাশ হালদার ডি-ই-এন-এর গল্প অনেকক্ষণ ধরেই শুনে যাচ্ছিলাম। গল্পের ঝোঁকে কত সময় যে কেটে গিয়েছে খেয়াল করিনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু আমাকে বললেন, "বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে গরীবের এখানেই রাত্রের খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিন না। আপনাদের ফিরে যাবার ট্রেন তো আগামী কাল সকাল এগারোটায়।"

আমি আপত্তি করলাম না। বেয়ারাকে প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে উনি আবার আরম্ভ করলেন।

বললেন, "ঐ যে ওদের পাহাড়ের গোড়ায় বেড়াতে যেতে বললাম, সেইটাই আমার ভুল হয়েছিল। ওটা না বলতে হয়তো আজকে আপনাকেও এ-সব শুনতে হতো না।"

আরাম কেদারায় সোজা হয়ে বসে উনি হঠাৎ মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে অবিনাশবাবু বললেন, "আসলে আমার কী মনে হয় জানেন? বিয়ে করার পর পুরুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি কিছুদিনের জন্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তার উপর স্ত্রী যদি নীলিমার মতো মিষ্টি মেয়ে হয় তাহলে তো কথাই নেই! তখন মোরগদের মতো মাথার ঝুঁটি নাচিয়ে আর গলা ফুলিয়ে নিজের বাহাদুরী দেখাবার একটা অদম্য খেয়াল মাথায় চেপে বসে।"

একটু ভেবে নিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, "সপ্তাহখানেক পরের কথা। একদিন বেলা দুটোর সময় তিন নম্বর ব্রীজের কাছে কাজ হচ্ছিল। মাপ-জোখের যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা দু'জনে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোহিনুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তারপরই ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাইলে। কাগজপত্র গুটিয়ে যাবার সময় বললে, "আজ আর ফিরবো না।"

ওর ক্যাম্পে ফিরে যাবার ব্যস্ততা দেখে রসিকতা করে বললাম, "কী? উনি কি অভিমান করেছেন? যাও যাও, তাড়াতাড়ি মান ভাঙাতে না পারলে মুশকিল হতে পারে!"

"মুচকি হেসে শ্রীমান তো বিদায় নিলেন। কিন্তু তখনও যদি বলতো আমায়।" অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"কী বলতো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তাই তো বলছি। ওর ড্রাইভার দু'দিনের ছুটি নিয়ে গেছে। তা আমায় বললেই তো আমার ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু তা নয়। ড্রাইভার থাকলে যে নিজেদের কথাবার্তার অসুবিধে হবে। কোহিনুর নিজেই গাড়ি চালিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিল, এই রেল কোম্পানির রাজত্বে কোন পুলিশ আর রেলের গেজেটেড্ অফিসারের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, ঠিক সেখানেই সন্ধ্যা হয়।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

অবিনাশবাবু আবার বলতে শুরু করলেন। "পাহাড় পর্যন্ত জীপ চালিয়ে গিয়ে ওরা দু'জনে কতক্ষণ ঝর্ণার ধারে বসেছিল জানি না। কখন যে সূর্য অস্ত গিয়েছে তাও ওরা খেয়াল করেনি। স্বামীর কোলে মাথা রেখে নীলিমা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল! আর চোখ বুজে কোহিনূর তা শুনছিল। এদিকে সমস্ত আকাশ যে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে সেদিকে কারুরই নজর পড়েনি। খেয়াল হলো যখন হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো।

এ সবের কিছুই অবশ্য আমি জানতাম না। সাড়ে সাতটা নাগাদ ক্যাম্পের ভিতর গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে বসে আছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় হ্যারিকেন-হাতে একটা লোক এসে হাজির। প্রশ্ন করলাম, "কী ব্যাপার?"

বললে, "থানায় খবর দিতে যাচ্ছি, আর সেই পথে আপনাকেও জানিয়ে দিয়ে যাই ভাবলাম।"

"কী হয়েছে?"

তার উত্তরে যা শুনলাম, তাতে আমার বুকটা ছাঁত করে উঠলো। "অ্যাক্সিডেন্ট। রানীবেড়ার ছোটো ইঞ্জিনীয়ার সায়েবের জীপ উল্টিয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার সায়েবের চোট লেগেছে। লোক খুন হয়েছে।"

"আর মেমসাব?" আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"ওঁর কিছু হয়নি। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছেন।"

বৃষ্টি আরও জোরে নেমেছে। বাইরের শোঁ শোঁ করে আওয়াজ দিয়ে ঝড়ও বইছে। বর্ষাতি পরে, তারই মধ্যে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওরা প্রাণে বেঁচেছে শুনে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি ভয়ও পেয়েছি—যদি কোহিনূর নিজে গাড়ি চালিয়ে থাকে তবে কী হবে! আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হবে—আমার ভাবতেও ভয় করতে লাগল। চোখের সামনে যেন উল্টে পড়া জীপ গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি। একটা লোক চাকার তলায় চেপ্টে মরে পড়ে রয়েছে। তারপর বিনা লাইসেন্সে সরকারী জীপ চালানোর অপরাধে কোহিনূর মিত্রের গ্রেপ্তার। আমার দেহের সমস্ত লোমগুলো যেন অজানা আশঙ্কায় খাড়া হয়ে উঠলো। কোর্টের শাস্তিতেই অপরাধের শেষ হবে না। চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যে রিটায়ার করবার স্বপ্ন দেখছিল, তাকে জেলখানা

থেকেই সোজা বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আদালতে শাস্তি হলে সরকারি চাকরি থাকে না।

যখন ক্যাম্পে পৌঁছুলাম, তখন বাইরে দু-চারটে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তার এসে কোহিনুরকে ইঞ্জেকশনে অচৈতন্য করে রেখে চলে গিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক পরে আবার আসবেন বলে গিয়েছেন। কিন্তু মেমসায়েব? মেমসায়েব কই?

শুনলাম অনেকক্ষণ আগে বৃষ্টির মধ্যে মেমসায়েব বেরিয়ে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন, কেউ জানে না। কীভাবে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, লোকগুলো তাও বলতে পারলো না। শুধু শুনেছে গাড়িটা বৃষ্টির জলে পিছলে একটা কুঁড়েঘরকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়। ভিতরে একটা লোক ও তার মেয়ে ছিল—দু'জনেই শেষ।

এমন বিপদে আমি কখনও পড়িনি। তাহলে মেমসায়েব কী ঐ জীপের কাছে ফিরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন নাকি? লোকগুলো খবরই রাখে না। এদিকে পুলিশ এসে পড়তেও বেশী দেরী নেই। বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

কিছুদূর যেতেই মনে হলো জল ভেঙে ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ করতে করতে কে যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। টর্চের আলো ফেলেই আমি চমকে উঠলাম। একি! নীলিমা। ওর সমস্ত দেহটা জলে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। শাড়িটাও যেন ছিঁড়ে গিয়েছে মনে হলো।

আমাকে দেখে নীলিমা একটু ভরসা পেলো বোধ হয়। কোনোরকমে বললে, "আপনি এসেছেন!" তারপর প্রায় জ্ঞানহীন হয়ে আমার বুকের উপর আছড়ে পড়লো।

ওর ঐ ভিজে শরীরটাকে কোনোরকমে সোজা করে বললাম, "নীলিমা, এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। তোমাকে অনেক শক্ত হতে হবে। সামনে আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে।"

নীলিমা ফুঁপিয়ে উঠলো। "তা জানি, উনি জ্ঞান হারাবার আগে সেই কথাই কয়েকবার বিড়বিড় করে বললেন।"

ওকে প্রায় কোলে করেই আমি আবার জীপের মধ্যে নিয়ে এলাম। কিছু জরুরী কথাবার্তা সেরে নিতে হবে। কিন্তু ওর সর্ব শরীর তখন কাঁপছে। উত্তেজনার ওর বুকটা হাপরের মতো উঠছে আর নামছে।

বললাম, "কোথায় গিয়েছিলে?"

উত্তরে ও যা বললে, তা আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

"কলকাতায় ওদের গাড়ি আছে। চাপা দিলে অনেক সময় আসল ড্রাইভারকে পাচার করে দিয়ে অন্য ড্রাইভারকে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। একদল লাইসেন্সওলা ড্রাইভার আছে যাদের পেশাই হলো অপরের দোষ স্বীকার করে জেলে যাওয়া। নীলিমা অসাধ্য সাধন করেছে। এই জনমানবহীন এলাকায় একটা ড্রাইভারকে জোগাড় করেছে। সেই আধা-বাঙালী আধা-নেপালী লোকটা—হরিয়া। সে এখনই আসছে। সে-ই বলবে, সে গাড়ি চালাচ্ছিল"—অবিনাশবাবু আবার একটু দম নিলেন।

আমি বললাম, "তারপর?"

"তারপর আর বলবেন না। ওদিকে জ্ঞানহীন রোগী পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে আপিসে এসে হাজির হলাম।

ইতিমধ্যে হরিয়াও এসে পড়লো। লোকটা খিল খিল করে হাসছে। যে লোকটা আমাকে দেখলে ভয়ে পালাতো, সেই আজ বুক ফুলিয়ে আমার সামনে চেয়ারে এসে বসলো।"

বললে, "একটা সিগারেট দিন।"

সিগারেট দিলুম। তারপর তিন-চার দিনের আগের তারিখে ওকে ড্রাইভারের চাকরিতে ভর্তি করে, হাজরি খাতায় সই করিয়ে নিলাম। লোকটার কিন্তু কোনো দিকেই খেয়াল নেই। বেপরোয়া ভাবে তিন-চারটে সই করে দিয়ে, আমারই সামনে পকেট থেকে ধেনো মদের বোতল বার করে গিলতে লাগল।

উত্তেজনায় আমারও মাথার ঠিক ছিল না। বুদ্ধিসুদ্ধি যেন একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। অথচ মন্ত্রের মতো কাজ করে গেলাম। এরই মধ্যে পুলিশ এলো, অনুসন্ধান করলো, তাদের অন্যান্য কাজ শেষ করলো। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়েছে হরিয়া যদি বেঁকে বসে। হঠাৎ যদি বলে বসে, আমি এর মধ্যে ছিলাম না।

লোকটা কিন্তু ঘরের এক কোণে ডালকুত্তার মতো বসে রইল। খাতির করে আস্তে আস্তে হরিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছি, কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। লোকটা তখনও হাসছে! গোল গোল চোখ দুটো ঘুরিয়ে বললে, "তার কুচ্ছু দরকার নেই। যা দরকার ছিল সব লিয়ে লিয়েছি।"

অন্য লোকের সামনে জিজ্ঞাসা করা যায় না। কিন্তু ভাবে বুঝলাম, ব্যাটা অনেক টাকা নিয়েছে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে পুলিশ যখন হরিয়াকে গ্রেপ্তার করে চলে গেল, তখন যেন স্বাভাবিক সম্বিত ফিরে পেলাম। নীলিমা তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ মোমের পুতুলটার মধ্যে এতো শক্তিও ছিল; আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

অন্য লোকজন চলে যেতে, আস্তে আস্তে বললাম, "ড্রাইভারটাকে যোগাড় না করতে পারলে আজ যে কী হতো! ধন্য মেয়ে তুমি মা।"

দেখলাম উত্তেজনায় ওর দেহটা থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ আগেই অবশ্য তা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার কর্তব্য করতে হবে, কোহিনুর এখন অসুস্থ! বললাম, "লোকটাকে রাজী করালে কী করে? কত লাগল? আমার কাছে টাকা আছে, চাইতে লজ্জা কোরো না।"

কিন্তু কী যে হলো, ওর দেহটা হঠাৎ জ্ঞানহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি অবশ্য অবাক হইনি। যে কোনো মেয়েই এই অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়তো। সব সহ্য করে এতোক্ষণ যে স্বাভাবিক অবস্থায় সে দাঁড়িয়েছিল এটাই আশ্চর্য।

মুখে চোখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই নীলিমা আবার উঠে বসলো। বললাম, "যাও মা, একটু বিশ্রাম করগে যাও।"—অবিনাশবাবুও, অনেকটা কথা বলে এবার একটু বিশ্রামের জন্য নীরব হলেন।

অবিনাশবাবুর বর্ণনা শুনে আমার মানসপটে নীলিমা মিত্রের একটা উজ্জ্বল ছবি ভেসে উঠলো! লম্বা ছিপছিপে টকটকে ফর্সা, সংসার-অনভিজ্ঞা একটি কাঁচা বয়সের মেয়ে স্বামীকে রক্ষা করে অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

অবিনাশবাবু আবার আরম্ভ করলেন। বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনারা চিন্তাশীল লোক, বলুন তো স্ত্রী অর্থাৎ সহধর্মিণী, এর থেকে স্বামীর আর কী উপকার করতে পারে?"

"এই জন্যই তো আজকাল ছেলেরা দায়িত্ববোধসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চায়," আমি বললাম।

অবিনাশবাবু বললেন, "পরের দিন ওদের খবর নিতে এসে দেখলাম, তাঁবুর বাইরে ভিজে চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে নীলিমা উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মনটা যেন দেহের মধ্যেই ছিল না। আমার ডাকে চমকে উঠে ভিতরে এলো।"

কিন্তু কোহিনূরের কাছে মেয়েটা কিছুতেই যেতে চাইল না। বললে, "আমার ভয় করছে, আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।"

"আমি তো অবাক। যে মেয়ে দেড় মাইল পথ জলে ভিজে আধঘণ্টার মধ্যে একটা আসামী পালটিয়ে দিলো, তার এখনও ভয় লাগছে!"

একটু পরেই আবার পুলিশ এলো। আমার আর নীলিমার সঙ্গে গল্প করতে করতে দারোগা বললো, "ব্যাটাকে কিছু মারধোর দিয়েছি। আজই চালান করে দেবো। তবে মিঃ হালদার, ঐ ব্যাটার যা রেকর্ড দেখলাম, অতি লক্কড় ড্রাইভার। আপনাদের তো সুবিধে রয়েছে, হেড আপিস থেকে একটা ভালো ড্রাইভার আনিয়ে নিন। ভাবুন তো, আর একটু এদিক ওদিক হলেই মিষ্টার অ্যান্ড মিসেস মিত্রের কী অবস্থা হতো!"

নীলিমা সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ হাত কেঁপে খানিকটা চা চক্ষে পড়ে গেল। আমি বললাম, "ভগবান ওঁদের রক্ষে করেছেন।"

সাব-ইন্সপেক্টর নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনার জন্য আমরা সত্যিই দুঃখিত। দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে এমন ফ্যাসাদে পড়লেন।"

"না না, ভগবানই আমাদের রক্ষা করেছেন।" নীলিমা কোনোরকমে বলেছিল।

"সাব-ইন্সপেক্টর বিদায় নিতে, দেখলাম ওই ঠাণ্ডাতেও নীলিমা ঘামছে, ওর ব্লাউজের হাতা দুটোর প্রায় সবখানিই ভিজে কালো হয়ে উঠেছে।"

অবিনাশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোহিনূরের তখন অবস্থা কেমন?"

বললেন, "ওর তো এমন কিছু লাগেনি। দু'একদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই থেকে মেয়েটার যে কী হলো। একেবারে যেন

পালটিয়ে গেল। সারাক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরেও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কোহিনূরকে পর্যন্ত ভয় পায়। ওর কাছে যেতে চায় না।"

"অমন সাহসী মেয়ের যে কেন হঠাৎ এমন পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারলাম না।"

কিছুদিন পরে এসে নীলিমাকে প্রায় চিনতে পারি না। এমন সুন্দর গোলাপী রঙের ওপর কে যেন আলকাতরা মাখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেদিন লোকটার জেল হয়ে যাবার খবর নিয়ে এসেছিলাম। সঙ্গে করে মিষ্টি এনেছিলাম—জাগ্রত কালীর প্রসাদ। বললাম, "এতোদিনে বাঁচা গেল। আর কোনো ভয় নেই।"

কোহিনূরও তখন আবার সেই পুরনো যুগে ফিরে গিয়েছে। খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরে কাজে যাবে ভাবছিল। বললে, "সত্যি, নীলিমা, আমাকে যে কীভাবে রক্ষা করলে তুমি। ভাগ্যিস তুমি এই ক্যাম্পে এসেছিলে।"

নীলিমা চুপ করে রইল।

কোহিনূর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "জানেন, বাড়িতে অতো টাকা ছিল না। নীলিমা লোকটাকে নিজের বালাজোড়া খুলে দিয়ে এসেছে। পাথরবসানো বালা—ওর বাবা দিয়েছিলেন। অন্তত বার শ টাকা দাম।"

আমি বললাম, "বার শ টাকা! তবে দুঃখ করবার কিছু নেই, চাকরিটা থাকলে অনেক অনেক বার শ টাকা তুমি রোজগার করবে।"

কোহিনূর বললে, "আজই আমি ডাকে কলকাতায় আর একজোড়া বালার অর্ডার দিচ্ছি—ঠিক ঐ রকম দেখতে। ওর থেকেও দামী পাথর বসানো।"

নীলিমা কোনোরকমে বললে, "না না, কিচ্ছু দরকার নেই।"

"তা হয় না। তাছাড়া বালাজোড়া না থাকলে ওর হাত দুটো বড্ডো ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। তাই না মিঃ হালদার?"

বালাশূন্য হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজের মতামত দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নীলিমা হঠাৎ যেন তীব্র যন্ত্রণায় ওর মাথাটাকে চেপে ধরলো। শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কোহিনূর জোর করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, "পুরো বিশ্রাম নাও। চলো, কালই বরং তোমাকে কলকাতায় রেখে আসি। ওখানে কিছুদিন থাকলেই শরীরটা ভালো হয়ে যাবে।"

সেদিনের মতো বিদায় নিলাম। তারপর কয়েক দিন বেজায় কাজের চাপ। ট্রায়াল ট্রেন চালানো আরম্ভ হয়েছে নতুন লাইনের উপর দিয়ে। এখন কয়েকদিন কয়েক রাত ভারী ভারী মালবোঝাই লম্বা লম্বা মালগাড়িকে এই লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

সে এক অদ্ভুত আনন্দ। আমাদের এতোদিনের পরিশ্রমের পর হাজার হাজার বছরের নীরবতা ভঙ্গ করে এই মালভূমিতে প্রথম ইঞ্জিনের বাঁশী বেজে উঠলো।

কোহিনূরের সঙ্গে দেখা হতে নীলিমার খবর জিজ্ঞাসা করলাম। কোহিনূর অস্বস্তির সঙ্গে বললে, "নীলিমার কী যে হলো বুঝতে পারছি না। কিছুতেই কলকাতায় যাবে না। শরীরটাও যেন...?"

আমি মুচকি হেসে বললাম, "তুমি অযথা চিন্তা করছো। এবারের শরীর খারাপের সঙ্গে জীপ অ্যাক্সিডেন্টের হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই। বৌমার বাচ্চাটাচ্চা হবার কোনো সম্ভাবনা...?"

কোহিনূর গম্ভীর হয়ে গেল। বোধহয় আমার ঐ ধরণের ইঙ্গিতে লজ্জাও পেলো। বললে, "না, সে রকম কোনো সুযোগ তো আমরা নিইনি।"

"বৌমার মনের জোর তো খুব, ভাই। ও মেয়ে তো ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়।" আমি বললাম।

"কিন্তু কি যে হয়েছে। আমাকে দেখলে আরও ভয় পেয়ে যায়। সারাক্ষণ ক্যাম্পের বাইরে বসে বসে ব্রীজের উপর দিয়ে নতুন রেলগাড়ি চলা দেখে।"

"তা দেখুক। রেলের লোকেরাই শুধু রেলগাড়ি দেখে আনন্দ পায় না, তা ছাড়া আর সবার কাছেই ওটা একটা আশ্চর্য জিনিস।" আমি বললাম।

অবিনাশ হালদার আবার একটু থামলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না! গল্প, নাটক, উপন্যাসে চরিত্রের হাবভাব, চালচলন, ব্যবহার থেকে আমরা তার

ভবিষ্যৎটা সহজেই আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু সংসারে আমরা কখনই সে বিদ্যাটা কেন খাটাই না।"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো?"

"যদি খাটাতে পারতাম তা হলে হয়তো একটা গুণবতী মেয়ের জীবন রক্ষা হতো। ওর মনের অবস্থা দেখে আমার একবারও সন্দেহ হয়নি যে নীলিমা আত্মহত্যা করবে। রেলের চাকার তলায় পড়ে এমন ভাবে দামী জীবনটা নষ্ট করবে।"

"শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলো?" আমি চমকে উঠেছিলাম।

"দাঁড়ান। আপনি হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। আমাদের যে অতো সাহিত্য-টাহিত্য আসে না," বলে অবিনাশবাবু হঠাৎ উঠে পড়লেন। ক্যাম্পের এক কোণের বাক্স থেকে একটা দলাপাকানো কাগজের বাণ্ডিল বার করলেন।

চেয়ারে বসে বললেন, "মশাই, আমি সংসারী লোক, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করি। এ-চিঠিটা লুকিয়ে রাখবার জন্য আজও হয়তো পুলিশ আমাকে ধরতে পারে। কিন্তু মশাই, কেমন যেন মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। ওর মুখটা মনে পড়লে আজও আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতো।"

বাণ্ডিলটা সোজা করতে করতে অবিনাশবাবু বললেন, "বৌমা অতো বুঝতো, অতো জ্ঞান ছিল, আর মা আমার এইটুকু বুঝলে না। আমাকে বললে না কেন? আমি সব ঠিক করে দিতাম।"

কান্নায় অবিনাশবাবুর গলাটা বোধহয় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "সেদিনও সন্ধের সময় সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু গল্প করবার জন্য কোহিনুরের টেন্টে যাচ্ছিলাম। সেই সময়েই খবর পেলাম। সর্বনাশ হয়েছে—ছোট ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বৌ ট্রেনে কাটা পড়েছেন।

ছুটতে ছুটতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখি কোহিনুর বসে রয়েছে। ওর সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে। হাতে এই চিঠিটা।"

চিঠিটা আমার দিকে অবিনাশবাবু এগিয়ে দিলেন। লাইন টানা নীল চিঠির কাগজের গোটা গোটা অক্ষরে পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা।

...আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। গতরাতে আমাকে আদর করে

জড়িয়ে ধরে তুমি যখন বললে, 'তুমি আমার লক্ষ্মী বৌ, আমার সোনা বৌ', তখনই আমার বলা উচিত ছিল, আমি মিথ্যেবাদী, আমি খুব খারাপ। আমি তোমার সোনা বৌ হয়তো একদিন ছিলাম, এখন আর নেই। কিন্তু বলবার সাহস হয়নি।

মনে আছে প্রথম যেদিন ভোরে এখানে আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম? দূরের পাহাড়, বন, কুলীদের হোগলার চালা দেখিয়ে তুমি বলেছিলে, এ সবেরই কর্তা তুমি। তুমি বলেছিলে, ইচ্ছে করলে ঐ পাহাড়টার আধখানাও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারো তুমি। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে, তোমার দুটি হাত চেপে ধরে বলেছিলাম, "না লক্ষ্মীটি।"

তুমি হেসে ফেলেছিলে। তারপর আমার গালে একটা টুসকি দিয়ে বলেছিলে, "মোমের পুতুল, তোমরা কোনোদিন ইঞ্জিনীয়ার হতে পারবে না।"

আমার রাগ হয়েছিল। তোমার হাতে একটা আলতো চিমটি কেটে বলতে যাচ্ছিলাম, 'মোমের পুতুল ছাড়া ইঞ্জিনীয়াররা তো আর কিছুই বিয়ে করতে চায় না!'

কিন্তু বলা হয়নি। কিন্তু সেই সময়ই তো সজারুর মতো দাড়িওয়ালা সেই লোকটা এসে তোমার কাছে ড্রাইভারের চাকরির উমেদারি করলো। যে-তুমি একটু আগেই গাইছিলে, কবিতা পড়ছিলে, সে-ই তুমি হঠাৎ যেন পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলে। লোকটা আমাদের সেই মিষ্টি সকালটুকুতে বাধা দিয়েছিলো বলে, তুমি যেন কেউটে সাপের মতো ছোবল মারলে। তারপর তোমার পায়ে পড়ে সে যাত্রা কি ভাবে সে রক্ষা পেলো তাও মনে আছে।

লোকটাকে দেখলেই ভয়ঙ্কর মনে হতো। দুনিয়ার ওর যে কেউ কোথাও নেই সে-কথা তোমাদের জীপ ড্রাইভারই পরে আমাকে বলেছিল। কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার আমার কাছে দরবার করতে এসেছে সে। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি প্রতিবার—কিন্তু প্রতিবারই সে বলেছে, "রাণীমা, আমি খারাপ ড্রাইভার নই। টাকা নিয়ে অন্য সায়েবের হয়ে জেল খেটেছি—সেই জন্য লাইসেন্স সাসপেন্ড ছিল।"

আমি তবুও ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি। লোকটাকে দেখলেই আমার

যেন কেমন ভয় ভয় করতো। আমাদের ড্রাইভারের কাছে শুনেছিলাম লোকটা মাতাল, লোকটা গুণ্ডা। যাবার আগে লোকটা একদিন বলেছিল, "তুই রাণীমা না ছাই! লোকের দুঃখ যে বোঝে না সে আবার রাণী সেজেছে!"

এ-সব তোমাকে বলিনি, কারণ শুনলে তুমি যে কী কাণ্ড করতে তা তো আমার জানা আছে। ভোরবেলায় হাত ধরাধরি করে আমরা যখন বেড়াতে গিয়েছি, আমি দেখেছি লোকটা ওর ঘরের জানলা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাও তোমাকে বলিনি।

যে দিন বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছিলে, সে-দিন তুমি ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে, বাঁ হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে। আমার লজ্জা করছিল। তুমি বলেছিলে, "লজ্জা কি? সায়েবরা তো এইভাবেই ড্রাইভ করে।"

তুমি আরও মনে করিয়ে দিয়েছিলে—আমি ক্লাশ ওয়ান অফিসারের বৌ। আমার হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়েই তুমি একে-একে ডি-ই-এন, ডেপুটি, চীফ, জি-এম, রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার আরও কত কি হবে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, ঠিক সেই সময়েই জীপটা যেন কিসের বিরুদ্ধে ধাক্কা মারলো। কী যে হলো, ঠিক প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু আবিষ্কার করলাম আমি অক্ষত আছি, আর তুমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছ। কিন্তু তার মধ্যেও তুমি ভোলোনি তোমার গাড়ি চালানোর লাইসেন্স নেই। জ্ঞান হারাবার আগে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা তোমার মনে থাকার কথা নয়। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিলে, "নীলিমা, আমাদের সর্বনাশ হলো।"

সেই মুহূর্তে শুধু আমার নিজের নয়, আরও অনেকগুলো মুখ চোখের সামনে দপ করে ভেসে উঠেছিল—তোমার বৃদ্ধ স্কুলমাস্টার বাবা—যিনি অনেক কষ্টে তোমাকে শিবপুর থেকে বি-ই পাশ করিয়েছেন ; তোমার কলেজে পড়া ভাই, তোমার আইবুড়ো বোন, সবাই তোমার উপর ভরসা করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা মুখও ভেসে উঠলো—ডালকুত্তার মতো মুখওয়ালা বেঁটে যে লোকটা ড্রাইভারীর জন্যে উমেদারি করতো।

কোথা থেকে তখন যে অতো শক্তি পেয়েছিলাম জানি না। লোক দিয়ে তোমার দেহটা ক্যাম্পে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়েই যে আমি

আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম, তা তুমি জান। কিন্তু জান না তারপরই—।

হরিয়া ঘরেতে একলাই বসেছিল। আমাকে দেখেই লোকটা যেন পাগলের মতো হাসতে লাগল। তোমার জীপ দুর্ঘটনার খবর ও আগেই পেয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির জলে আমার দেহ তখন ভিজে জবজব করছে। আমার সেই অবস্থা দেখে ওর উল্লাস যেন ভয়ংকর বেড়ে গেল।

"যাও যাও, দেখা হবেনি," বলে ও আমার মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বার করে ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললো, "যাওগে যাও, সুন্দরী, সোয়ামীর কোলে বসে হাওয়া খাওগে যাও!"

আমি তখন ঠকঠক করে শীতে কাঁপছি। আমার উপায় নেই, আমাকে এখানেই শেষ চেষ্টা করতে হবে।

লোকটা কী ভেবে আবার দরজা খুললে। ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল—ডালকুত্তা যেন মাংসের একটা বড়ো টুকরো শুঁকে শুঁকে দেখছে। লোকটাকে এতো কাছ থেকে কখনও দেখিনি। গায়ে অসহ্য দুর্গন্ধ। হলদে রঙের চামড়ার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো পড়েছে। বুকের গেঞ্জিটা প্রায় সবটা ছেঁড়া, আর সেই ছেঁড়া জায়গা দিয়ে উলকির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

আমার হাতের চুড়ি ও বালা, গলার হার, কানের দুল, ঘড়ি সব খুলে ওর পায়ের গোড়ায় রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলেছি, "আমাকে দয়া করো। একটা সংসার রক্ষে করো।"

লোকটা সেদিকে নজর না দিয়েই, গাঁজার কল্কেটা বার করে আগুন ধরালো। ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা দশ টাকার নোট ছিল, সেগুলোও ওর পায়ের কাছে রাখলাম।

ও আবার হা হা করে হেসে উঠলো। আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। হঠাৎ চাপা-গলায় ও চিৎকার করে উঠলো। অশ্লীল গালি দিয়ে আমার হার, বালা, চুড়িগুলো ফেরত দিয়ে বললে, "পরে ফেল্ বলছি, না হলে এখনই খুন করবো।"

আমি ভয়ে ভয়ে ওগুলো পরে ফেলে, কাঁদতে লাগলাম। বললাম, "এখুনি পুলিশ এসে পড়বে। দয়া করো, তুমি যা চাইবে তাই দেবো।"

লোকটা এবার আমার আরও কাছে এগিয়ে এলো। বললে, "টাকায়

হবে না। গতবারে যখন কলকাতার মুখার্জি সায়েব রাঁচী রোডে লোক চাপা দিলেন, তখন ওঁর বিবির কাছে অনেক টাকা নিয়েছি। এবার ওতে হবে না। এবাব অন্য জিনিস চাই...”

তারপর...? আমাকে আর জিজ্ঞাসা কোরো না। আমার উপায় ছিল না! আমাকে না পুড়িয়ে, তোমাকে, তোমাদের সংসারকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো পথই খোলা ছিল না। ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখারও সময় ছিল না। আর একটু সময় নিলে সবই হযতো দেরি হয়ে যেতো।

আমার বিধ্বস্ত দেহটা বোধ হয কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কেননা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার চোখেমুখে কে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। চোখ খুলতে বললে, “জলদি বেবিয়ে যা। আমি লাইসেন্স নিয়ে যাচ্ছি। শালা সাহেবটা এ-যাত্রা বেঁচে গেল।”

তখনও বোধহয় নেশার ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কোথা দিয়ে যে কত সময় কেটে গেল খেয়াল করিনি। যখন শুনলাম তুমি ভালো আছো, তোমার বদলে ঐ লোকটাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে, তখন যেন হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি কি করেছি।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে তুমি যখন শুনলে তোমাকে জেলে যেতে হবে না, তখন তোমার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, তাতেই আমার সব দুঃখ ঘুচে গিয়েছিল। মনে মনে ঈশ্বরকে প্রণাম করেছিলাম।

কিন্তু তারপরেই যখন তুমি জিজ্ঞাসা করলে, “লোকটাকে কত দিতে হলো?”

তখনই আমার বুকের মধ্যে আবার হাতুড়ি পেটানো শুরু হলো। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছিলে, কাজের অছিলায় আমি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে, কী বলবো ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ হাতের দামী বালা দুটোর দিকে নজর পড়লো। একটু হেঁটে গিয়ে নদীর জলের মধ্যে ও দুটো ফেলে দিয়ে এলেই চলতো। কিন্তু কেন জানি না, পারলাম না। তাড়াতাড়ি বাগানের মধ্যে গিয়ে, মাটির তলায় ও দুটো পুঁতে রেখে ফিরে এলাম।

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, “এতো দেরি?” আমি বললাম, “বাথরুমে গিয়েছিলাম।”

তারপর তুমি যখন শুনলে তোমার ভবিষ্যৎ, তেমার মর্যাদা, তোমার

সম্মান নিজের হাতের বালা দুটো দিয়ে আমি রক্ষা করেছি, তখন তুমি আমাকে কত আদর করলে। অবিনাশবাবু শুনে বললেন, "আমি নাকি সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী।"

আমার ভয় হচ্ছিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল—তুমি যেন আমার বুকের মধ্যে দু'খানা জ্বলন্ত টিকে জোর করে চেপে ধরেছো। অথচ কে যেন আমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে, চেষ্টা করেও চিৎকার করতে পারছি না।

তুমি যখন বললে, কলকাতাতে আমার জন্য বালার অর্ডার দিয়েছো, তখন তোমাকে বারবার বারণ করেছিলাম, তুমি শুনলে না।

আজ সকালে, চা খাওয়ার পরই যে তোমার বাগান করবার শখ চাপবে তা কে জানতো। আর ফুলের বাগানে মাটি খুঁড়তে গিয়েই যে জিনিসটা তোমার হাতে উঠলো, সেটা আমারই একটা বালা। তুমি আমার বালা চেনো। অনেক রাত আমার বালাপরা হাত দুটো নিয়ে তুমি খেলা করেছো। তুমি তো কিছুই বুঝতে পারছিলে না। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমার মুখের দিকে তাকালে। কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলে।

কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, "এখন নয়, সন্ধ্যাবেলায় বলবো।"

তুমি হয়তো তখনই শোনবার জন্য পেড়াপীড়ি করতে ; যদি না ঠিক সেই সময়েই ঠিকাদারদের লোক নিয়ে অবিনাশবাবু এসে পড়তেন। তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

অনেক ভেবে দেখলাম। বাঁচতে ইচ্ছে করছে বড়ো, কিন্তু বোধ হয় কোনো উপায় নেই। সন্ধ্যাবেলায় তুমি যখন ফিরবে, তখন হয়তো নতুন একটা কিছু গল্প বানিয়ে বলা যেতো। বলা যেতো লোকটা ওইখানেই বালাদুটো পুঁতে রেখে গিয়েছিল, জেল থেকে ফিরে এসে নেবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, হঠাৎ মনে হচ্ছে, এ কি করছি আমি!

তোমাকে মুখ ফুটে সব বলে, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! আর এ-সব চাপাও থাকবে না। বালা সম্বন্ধে বানানো গল্পটা হয়তো তুমি আজ বিশ্বাস করবে। কিন্তু দু'মাস পরে ঐ ডালকুত্তার মতো মুখওয়ালা লোকটা জেলখানা থেকে ফিরে আসবে। সে ছাড়বে না। যে-সায়েব তাকে অপমান করেছিল, তার উপর সে যে চরম প্রতিশোধ নিয়েছে, এ-কথা

সে জোর করে বলে বেড়াবেই।

তাও হয়তো তুমি তোমার সরকারী ক্ষমতায় বন্ধ করতে পারবে। কিন্তু আরও বড়ো সাক্ষ্যের ইঙ্গিত রয়েছে আমার দেহে। প্রথমে সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন বুঝেছি একবিন্দু সাক্ষ্যই আমার দেহে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে। তাকে তুমি বা আমি কেউ চেপে ধরে রাখতে পারব না।

তার থেকে এই ভাল। তোমাদের নতুন লাইনে যখন মালগাড়ি চলতে শুরু করেছে তখন আর চিন্তা কী?—ইতি।"

পড়া শেষ করে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই উনি চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। বললেন, "দেখুন, যে অর্থে লোককে সৎ বলা হয়, আমি তা নই। আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্যে আমি পাপ করি। তাদের জন্যে আমি নরকে যেতেও রাজী আছি। এ-চিঠিটাও আমি পুলিশের হাতে দিইনি। কোহিনূরও কাছে রাখেনি তখন—বলা যায় না, কোনোদিন হয়তো খানাতল্লাশ হতে পারে।

পুলিশের রিপোর্টে লিখিয়ে দিয়েছি অসাবধানে লাইন পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনা। বান-ওভার কেস, সুতরাং হেড আপিসে রিপোর্ট পাঠাতে হলো। সেখান থেকে হুকুম এলো—"দুর্ঘটনার জায়গায় নোটিশ বোর্ড টাঙিয়ে দাও।"

অনেক রাত্রে আমাদের প্রেস ক্যাম্পে ফিরবার পথে, লাইনের ধারে এক জায়গায় জীপটা থামিয়ে মিঃ হালদাব গম্ভীরভাবে একটা বড়ো সাইনবোর্ড দেখালেন। সেখানে লেখা—সাবধান! যে কেহ এই বিপজ্জনক স্থানে রেলপথ অতিক্রম কবিলে, তাহা সম্পূর্ণ নিজদায়িত্বে করিবেন।"

মিঃ হালদার গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে নিজের মনেই বললেন, "এ-কথা লেখার কোনো মানে হয় না। জীবনে সব পথই যে নিজদায়িত্বে অতিক্রম করতে হয় তা আমার বৌমা ভালভাবেই জানতেন।"

[গ্রন্থসূত্র
এক দুই তিন]

নিউ ইয়র্কের দুধ

মিসেস সুষমা চক্রবর্তীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কেই দেখা হয়ে গেলো। এবং বিদেশে বাঙালিদের যা বদভ্যাস, জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "জানি বড়ো হোটেলে অনেক আমেরিকান কেষ্টবিষ্টু তোমাকে লাঞ্চ ডিনার খাওয়াবে! কিন্তু মাঝে-মাঝে দেশের লোকদের জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আজকের রাতের খাওয়াটা আমাদের ওখানেই সারতে হবে!"

আমি তখনও গাঁই-গুঁই করছিলুম। মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "এটা মনে রেখো, সম্পর্কে আমি তোমার মাসিমা হই। বিদেশে তোমার গতিবিধির ওপর নজর রাখার নৈতিক দায়িত্ব আমার রয়েছে! এখানে উড়ে বেড়াচ্ছো কিনা সেটা জেরা করে বার করে নিতে হবে ; আর যদি না যাও তাহলে আমার যেরকম ইচ্ছে সেরকম একটা রিপোর্ট দিদির কাছে পাঠাতে হবে।"

অগত্যা রাজী হয়ে যেতে হলো। এই যুগে ব্ল্যাকমেলে কে না ভয় পায় বলুন? ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামেও কিছু রটলে তা বিশ্বাস করবার জন্যে বেশ কিছু লোক উঁচিয়ে আছে। আর আত্মীয়স্বজন? তাঁরা তো এক-একটি বারুদের ঢিবি। একটি গুজবের স্ফুলিঙ্গ পেলেই হলো।

সম্পর্কে মাসিমা হলেও সুষমা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। দেশে যখন দেখা হতো তখন অনেক রসের কথা বলতেন। এই ধরনের রসিক মহিলা বাংলাদেশ থেকে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংসার এঁদের অভাবে এখন আরও নিরানন্দ হয়ে উঠছে। সৃষ্টির মুল কথা যেমন আনন্দ, তেমনি বেঁচে থাকার গোড়ার কথাই হলো মজা। জীবনে যদি মজাই না রইলো, তাহলে বেঁচে সুখ কী? বাংলার নবযুগের তরুণ-তরুণীরা, সংসারের চাপে পড়ে এই সার সত্যটি ভুলবেন না।

মিসেস চক্রবর্তী আমাকে ওঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন! বললাম,

"বাঃ, বেশ ভাল ফ্ল্যাটখানা যোগাড় করেছেন তো!"

"তোমার কিছু হবে না," ধমক লাগালেন মিসেস চক্রবর্তী। "ফ্ল্যাট নয় অ্যাপার্টমেন্ট। বিলেতের তাঁবেদারিতে দুশো বছর থেকে তোমরা খাঁটি ইংরেজ হয়ে গেছো।"

আমাকে মিসেস চক্রবর্তী মনে করিয়ে দিলেন, মার্কিন দেশে ফ্ল্যাটের ইংরিজি হলো অ্যাপার্টমেন্ট, পেট্রল হলো গ্যাস, সেডিউল হলো স্কেডিউল। আর গেরস্থ বাঙালিদের খুব সুবিধে। "ফাস্ট ফ্লোর বলতে যে দোতলা বোঝায় তা না জানার জন্যে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছি। এখানে বিলিত ভড়ং নেই, সেকেন্ড ফ্লোর মানে দোতলা, তিনতলা নয়।"

আমি মনে মনে মিসেস চক্রবর্তীর পুরনো দিনের কথা ভাবছিলাম। মিসেস চক্রবর্তী বুঝলেন, আমার মনের মধ্যে কিছু একটা তোলাপাড়া খাচ্ছে। বললেন, "কি ভাবছো? শিল্পী মানুষদের নিয়ে এই এক বিপদ! দেখো বাপু, এখানকার রাস্তাঘাটে, যা গাড়ি, অন্যমনস্ক হয়ে বিপদ বাধিয়ে বোসো না।"

বললাম, "সুষমা মাসি, আপনার কথাই ভাবছি। মনে আছে, আপনি একা রাস্তায় বেরোতে সাহস করতেন না। হাওড়া থেকে আপনার বৌবাজারে বাপের বাড়ি যাবার দরকার হলে আমাকে এসকর্ট রাখতেন। কতবার আপনাকে বৌবাজারে পৌঁছে দিয়ে এসেছি এবং সিনেমা হাউসের দরজা থেকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।"

মিষ্টি হাসলেন সুষমা মাসি। বললেন, "দেখো বাপু দেশে গিয়ে যেন বদনাম ছড়িও না। এখন একা একা নিউ ইয়র্ক শহর চষে বেড়াচ্ছি। মনের সুখে চড়বড় করে ইংরেজি চালিয়ে যাচ্ছি। কার সাধ্যি ভুল ধরে? অথচ একবার তোমার মেসোকে পাবলিক ফোন থেকে কলকাতার অফিসে কল করতে গিয়ে ঘেমে উঠেছিলাম। ওদিক থেকে টেলিফোন অপারেটার মেমসায়েব যখন উত্তর দিলে, আমার মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না!"

মিসেস চক্রবর্তী একটু থেমে বললেন, "এখানে বাপু শুধু শখের বাজার করতে যাই না, দরকার হলে ময়লার ড্রাম পর্যন্ত কাঁধে চড়িয়ে কর্পোরেশনের গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আগে হাওড়ার বাড়িতে দুটো ঝি ছিল। একদিন মোক্ষদা না এলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে

আসতো। অথচ এখন কেউ নেই। একাই একশ হয়ে উঠেছি—আমিই মোক্ষদা, আমিই বাউনদিদি, আমিই কালুয়া জমাদার, আমিই তোমার মেসোর সেক্রেটারি, গার্ল ফ্রেন্ড, ওয়াইফ সবকিছু।"

মিসেস চক্রবর্তীর কথা আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি। সত্যি এই সামান্য কিছুদিনে সুষমা মাসি দশভুজা হয়ে উঠেছেন। রুচিও অনেক উন্নত হয়েছে। সুষমা মাসির বাড়িতে আমি তো কতবার গিয়েছি—চারদিকে ধুলো থাকতো, দড়িতে আধময়লা গামছা, শাড়ি, ফ্রক, লুঙ্গি ঝুলতো চাতালে, এঁটো বাসনে মাছি ভনভন করতো। এখন কেমন ঝকঝকে তকতকে সংসার পরিচালনা করছেন সুষমা মাসি।

সুষমা মাসি বললেন, "এ-জি অফিসের কর্মচারীর বউ হয়ে যে কোনোদিন আমেরিকায় আসতে পারবো তা তো কল্পনা করিনি। যখন আমার বিয়ে হলো তখন তো উনি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। মিঠু হওয়ার সময় আপার ডিভিশন হলেন। তারপর আমার খেঁচা-খেঁচিতে তিতিবিরক্ত হয়ে এস এ এস পরীক্ষায় বসলেন। ও ছাই আবার এমন পরীক্ষা যে একেবারে পাশ করে কার সাধ্যি? প্রথমবারে না পেরে উনি তো হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন। আমার চাপে পড়ে আবার দিয়ে কয়েকটা পার্ট পাশ করলেন। এবং শেষে সুপারিনটেনডেন্ট হলেন। আমরা তো জানতাম না, এইসব লোকও বিদেশে পোস্টেড হতে পারে। এগুলো দিল্লীর স্টাফরাই এতোদিন ম্যানেজ করতো—ধরাধরি করে নিজেরাই চলে যেতো বিদেশে। এখন অন্য অন্য সরকারী অফিসেও মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমি ওঁকে অ্যাপ্লাই করতে বললাম—ওঁর রেকর্ড ভাল। তাছাড়া ছোটবেলায় এক গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল, তোমার সমুদ্রযাত্রা আছে।"

সুরসিকা সুষমা মাসি বললেন, "দেখো, ফললো তো?"

বললুম, "দিন না গণৎকারের ঠিকানাটা। আমিও ফিরে গিয়ে হাতটা দেখাবো।"

"তখন কি আর অত চালাক ছিলাম, তাহলে নিজেই টুকে রাখতাম। একবার মিঠুর হাতটাও দেখিয়ে নিতাম।"

"মিঠু কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মিঠু আর মিঠু নেই। এখন মিস লীনা চক্রবর্তী—এখানকার এক

অপিসে চাকরি করছে। জানো, মাইনে কত আমাদের মিস লীনা চক্রবর্তীর? আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলুম—ছ-সাত শ কিছু একটা পেলে বর্তে যাবো—দেশে তো উনিও অত টাকার মুখ দেখেননি। কিন্তু লীনাকেই দিচ্ছে ওরা ২২০০ টাকা। বারো দিয়ে গুণ করলে, বছরে ২৬,৪০০ টাকা।

আমি বললাম, "অত গুণটুন করবেন না, আমার মাথা ঘুরছে। আমাদের মিঠু ওই টাকা পাচ্ছে, আপনি না বললে আমি বিশ্বাস করতাম না।"

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "এখানে প্রথমে এসে হাঘরের অবস্থা। আঙ্গুর, আপেল আর মুরগী খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেলো! জানো, এমন আজব দেশ যে মাছের মুড়ো কুকুরে খাবে বললে ফ্রি পাওয়া যায়। আপেলের থেকে অনেক বেশি দাম টমাটোর। মুরগী হলো গরীবের খাদ্য। যারা নিজেদের দারিদ্র্য বোঝাতে চায়, তারা বলে জানো, আমার এমন অবস্থা যে শুধু মুরগী খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছে। আর দুধ তো ভেসে যাচ্ছে। একেবারে খাঁটি দুধ আমার বাড়িতে, সব সময় রসগোল্লা সন্দেশ তৈরি করে ফ্রিজে রাখি। ওই যে ফ্রিজ দেখছো, ভেবো না গাঁটের পয়সা খরচা করে কিনেছি। বাড়ি ভাড়ার সঙ্গেই ওভেন, ফ্রিজ এসব পাওয়া যায়। আর বাইরে যত শীতই হোক, গায়ে কম্বল চাপাবার দরকার নেই—ফাউ সেন্ট্রাল হিটিং রয়েছে। রেগুলেটার ঘুরিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো গরম করে নাও। কল টিপলেই গরম জল। ঠাণ্ডা জলও রয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতেই টেলিফোন। আমরা টেলিভিশনও নিয়েছি। ওঁর গাড়ি হয়েছে একটা—যে গাড়ি দেশে রাজা মহারাজা এবং ফিল্মস্টাররা চড়ে। সুতরাং সুখের শেষ নেই।"

বললাম, "কুষ্ঠিতে ছিল, ভোগ করছেন। মেসোকে বলুন যাতে বেশিদিন থাকা যায় তার চেষ্টা করতে।"

"আমাদের দু'বছর হলো, এই টার্মে আর এক বছর। কিন্তু রক্ষে করো বাপু, আর একটি বছর নমোনমো করে কাটিয়ে ঘরে ফিরলে বাঁচি।"

সুষমা মাসিকে মৃদু বকুনি লাগালাম। "এটা কি অকৃতজ্ঞতা হলো না। এই সোনার দেশ, এখানে এতো সুখ পাচ্ছেন। তবু আপনারা সন্তুষ্ট নন!"

সুষমা মাসি বললেন, "দেশে খাবার নেই, জিনিসের দাম বাড়ছে।

রেশন কার্ড হাতে করে প্রত্যেক সপ্তাহে লাইনে দাঁড়াতে হবে, দুধে ভেজাল—সব সত্যি। কিন্তু আমি ফিরতে পারলে বাঁচি।”

বললাম, “মাসি, ইস্কুলে পড়েছিলাম—স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত, বিদেশেতে অধিবাস যার।”

সুষমা মাসি বললেন, “আমি বাপু দেশপ্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি না। দেশের জন্য দেশে ফিরতে চাই না। নিজের ঘরসংসারের কথা ভেবেই আমাকে দেশে ফিরতে হবে।”

মদকে সুষমা মাসির খুব ভয় জানতাম। বললাম, “কেন? মেসো এই দারুণ শীতে একটু মদিরা পান করছেন নাকি?”

দেখলুম, মাসিমা এই দু'বছরেই অনেক উদার মতাবলম্বিনী হয়েছেন! বললেন, “ড্রিংকস তো আমরা বাড়িতে রেখেছি। যদিও উনি খান না—তবে বন্ধুবান্ধব এলে অফার করতে হয়। মদ খাওয়াটা এমন কিছু খারাপ নয়, খারাপ মাতাল হওয়াটা!

“যেমন কাটলেট। খাওয়াটা খারাপ নয়, কিন্তু তা বলে বেশি খেয়ে পেট খারাপ করা ঠিক নয়,” আমি মন্তব্য করলাম।

মাসি বললেন, “তোমরা তো আর্টিস্ট মানুষ! তোমাদের লাইনে তো ওসব চলে। যদি খেতে চাও একটু নিতে পারো।”

বললাম, “মদ খেতে অতি বিশ্রী লাগে, তাই খাই না। আমি শিবরাম চক্রবর্তীর দলে। উনি বলেছিলেন, নেশা যদি করতেই হয় রাবড়ির নেশা করো।”

হেসে ফেললেন মাসিমা। “সত্যি, শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা আমার খুব ভাল লাগে। মিঠুও ওঁর খুব ভক্ত।”

শিবরাম চক্রবর্তীর খবরাখবর দিলাম মাসিমাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার এদেশে কেন অরুচি হলো?”

একটু চিন্তা করলেন মাসিমা। তারপর বললেন, “হাজার হোক তুমি গল্প-টল্প লেখো, সুতরাং তোমাকে আর ছোট ভাবা ঠিক নয়। তোমাকে সব বলা যায়। আমার একটা ঘটনার কথা বলি, তার থেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছি।”

মাসিমা আরম্ভ করলেন—

এখানে একা থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। টেলিফোনে দু'একজন বাঙালির সঙ্গে গল্প-টল্প করি, ন'মাসে ছ'মাসে দেখাও হয়। কিন্তু তাতে দিন চলে না। তাই এই বাড়ির আমেরিকান গিন্নীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে হয়েছে।

লক্ষ্মী পুজোর দিনে আমাদের বাড়িতে কিছু রান্না করেছিলাম। সেগুলো নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে মিসেস ডসন-এর ওখানে হাজির হলাম। মিসেস ডসনকে বললাম, "আমাদের দেশে এই রীতি। পুজোর প্রসাদ প্রতিবেশীকে দিতে হয়।" উনি আনন্দ করে নিলেন। বললেন, "খুব খুশী হলাম।" সেই থেকে ভাব হয়ে গেলো। উনি সময় পেলে আমাদের এখানে আসেন। আমার কাছ থেকে ইন্ডিয়ান কারি আর পরোটা করা শিখেছেন।

মিস্টার ডসন মোটামুটি ভাল কাজকর্ম করেন। দু'খানা গাড়ি আছে। তবু ছেলেটা সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করে। বয়স এগারো-বার বছর। এই দারুণ শীতেও ভোরবেলায় উঠে সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর আমেরিকার কাগজ দেখেছো তো—রবিবারে দুশো আড়াইশো পাতা থাকে। এখানে যদি পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি হতো তাহলে বড়লোক হয়ে যেতাম। এই গন্ধমাদন পর্বত বাড়ি-বাড়ি দিয়ে আসা সোজা কাজ নয়। একদিন ছেলেটার অসুখ হলো, মিস্টার ডসন নিজেই দেখলাম ছেলের কাগজ বিক্রি করতে চলে গেলেন। একটুও লজ্জা নেই। শুনলাম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নাকি ছেলেবেলায় এমন কাগজের হকার ছিলেন। ভগবান জানেন!

ওদের মেয়ের নাম এলিজাবেথ। লিজা বলে ডাকে। বয়েস চোদ্দ পনের। মেয়েটা দেখতে শুনতে বেশ। এরা ছোটবেলা থেকে খায়-দায় ভাল—তাই কাঠামোটা খুব মজবুত। হুড় হুড় করে বেড়ে ওঠে। সমস্ত জাতটাই নাকি ক্রমশ লম্বা হচ্ছে।

লিজা প্রায়ই খুকুর কাছে আসে। বাড়িতে তার অবাধ স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশ, তাই ছেলেমেয়েরাও সংসারে অনেক স্বাধীন। তবে স্বাবলম্বীও বটে। আমাদের বাড়ির ছেলেরা যেমন এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায় না, তাদের জামাকাপড়ের খোঁজও মাকে রাখতে হয়, এখানে তা নয়। সবারই নিজের নিজের রুচি। ছোট ছেলেমেয়েদের মায়েরা বলে, ইট ইজ ইয়োর ডল।

সুতরাং পুতুলকে ঠিকভাবে রাখার দায়িত্ব তোমার। যত তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো তার চেষ্টা করো, এই হচ্ছে বক্তব্য।

লিজা একলা স্কুলে যায়। হৈ চৈ করে, সাইকেল চালিয়ে বেড়াতে বেরোয়। একেবারে স্বাধীন বলতে যা বোঝায়।

মিসেস চক্রবর্তীর গল্পে এবার বাধা পড়লো। বাইরে বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দিতেই মিঠুর প্রবেশ। মিঠুকে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। এখন অনেক পাল্টে গিয়েছে। মাসি বললেন, "এই হচ্ছে আমাদের কুমারী লীনা চক্রবর্তী।" মিঠুকে বললেন, "তোর শংকরদাকে মনে পড়ে? যখন হাওড়ার বাসায় থাকতিস তখন প্রায়ই আসতেন। তোকে শুঁটকী বলে রাগাতো।"

লীনা হেসে ফেললো। বললো, "সব মনে আছে। আমাকে যারা যারা ভুগিয়েছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবো!"

বললুম, "দেখো বাবা, টেকো বলে এখন বদলা নিও না।"

"তোমার এমন কিছু টাক পড়েনি।" সান্ত্বনা দিলেন মাসি।

"আর তা ছাড়া লেখকের টাক হলে কদর বাড়বে। লোকে বলবে প্রবীণ অভিজ্ঞ লেখক।" লীনা মন্তব্য করলো।

বললুম, "মাসি, আপনার মেয়ে আপনার মতোই সুরসিকা হচ্ছে। কথাবার্তায় আপনাকে একদিন হারিয়ে দেবে।"

"অনেক ব্যাপারেই হারিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে মোটর চালাবার লাইসেন্স নিয়েছে। আমার তো যা ভয় লাগে! আমি বলে দিয়েছি, লাইসেন্স করেছো করেছো, কিন্তু তা বলে গাড়ি চালাতে দিচ্ছি না।"

লীনা দেখলাম নাইলনের শাড়ি পরেছে? লম্বায় সে মাকে ছড়িয়ে গিয়েছে। বেশ লাবণ্যময়ী। যদিও রংটা মায়ের তুলনায় সামান্য চাপা। কিন্তু টানা-টানা চোখে রূপসী বাংলার শ্যামশ্রী ছড়িয়ে রয়েছে। মার্কিন প্রাচুর্যের পরিবেশে শরীরটাও বেশ সুন্দর হয়েছে।

"কেমন লাগছে অফিসের চাকরি?" জিজ্ঞেস করি লীনাকে।

"বড্ড খাটিয়ে নেয়, কিন্তু মাসে ২২০০ টাকা ভাবলেই আর খারাপ লাগে না।"

"আজকে এলি কী করে?" মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন।

"টিউবেই চলে এলাম।"

"অফিসের সেই আমেরিকান ছেলেটা আবার লিফট দেবার কথা বলেনি তো?" মায়ের ব্যাকুল প্রশ্ন।

"বললেই শুনছে কে?" উত্তর দিল লীনা। লীনা বললো, "আজকে আপনার কাছে অনেক গল্প শুনবো, শংকরদা। পালাবেন না যেন। আমি স্নান সেরে আসি।"

লীনা চলে যেতে মাসি বললেন, "মেয়ের আমার সব ভাল, শুধু, যদি আর একটু ফর্সা হতো। তোমরা তো অনেককে চেনো—একটু ভাল ছেলেটেলের খোঁজ দিও।"

"পাত্রী আমেরিকায় চাকরি করছে শুনলে আই-এ-এস, কভেনেন্টেড অফিসার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট সবাই সুড়সুড় করে এসে জড়ো হবে।" আমি আশ্বাস দিই।

"তুমি তো জানো আমাদের আশ্রয় বলে কিছু ছিল না। এখানে এসে লীনা যা জমাচ্ছে তাতেই বিয়েটা হয়ে যাবে। কী বলো?"

"আলবৎ," আমি বলি।

আমার চাকরি-বাকরি করতে দেবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। যা কাঁচাখেগো ছোঁড়াদের দেশ। কিন্তু বাড়িতে বসে থেকেই বা করবে কী। এখানে সব মেয়েই তো বয় ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ডেট করছে।"

মাসিমা জানালেন, "আমার মেয়েকে অন্যভাবে মানুষ করেছি। মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলতে পারে। আর ওর শাড়িই হয়েছে কাল। যেখানে যায় নজরে পড়ে যায়। শাড়ির জন্য এখানকার লোকরা পাগল!"

নতুন জামা কাপড় হাতে আমাদের সামনে দিয়েই লীনা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

মাসিমা বললেন, "মিঠু বেরোবার আগে তোমাকে মিসেস ডসনের ব্যাপারটা যা বলেছিলাম শেষ করে ফেলি। ওঁর মেয়ের চুল সোনালী। চোখগুলে কটা। ইস্কুল থেকে ফিরেই হৈ-হুল্লোড় করছে। ওর নিজের একটা ঘর আছে। সেখানে বসে ছবি আঁকে।"

সেদিন বিকেলে ওদের ঘরে বসেই গল্প করছিলাম। মিস্টার ডসন ট্যুরে গিয়েছেন। গিন্নী হাফ প্যান্ট পরে ঘরদোর পরিষ্কার করলেন। তারপর আমাকে টেবিলে বসিয়ে দু'কাপ কফি তৈরি করলেন। মেয়ে

এদিকে ঘরের মধ্যে ড্রেস করছিল।

বললাম, "আজ লিজা যে ড্রেসে অনেক সময় নিচ্ছে?"

মিসেস ডসন বললেন, "আজ ওদের পার্টি আছে। ওদের এক বন্ধুর জন্মদিন। তাই অনেক রাত ধরে নাচগান হবে।" মিসেস ডসন আরও জানালেন, মেয়ে তাঁর নৃত্যপটিয়সী! খুব ভাল কথাও বলে। তাই ওর ডেট পাবার জন্য ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি।"

আমি বললাম, "আমার মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা।" মিসেস ডসন আমার কথার উল্টো মানে বুঝলেন। বললেন, "চিন্তারই কথা। এতো বয়স হলো এখনও তোমার মেয়ের বয়ফ্রেন্ড হলো না। ডেট নেই।" আমি বললাম, "আমাদের দেশে ডেটিং নেই। বিয়ে দেওয়াটা বাবা-মায়ের দায়িত্ব।" মিসেস ডসন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, বললেন, "আমার মেয়ে কাকে বিয়ে করবে তার মধ্যে আমি নাক গলাতে যাবো কেন?"

লিজা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখের মেকআপটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা মাকে দেখিয়ে নেবার জন্যে। মা আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞ জহুরীর মতো অনেকক্ষণ মেয়ের মুখ দেখলেন। তারপর বললেন, এয়ার ব্রাশটা একবার হাল্কাভাবে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে।

এরপর আঁটসাট জামা পরে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশবাস করে কিশোরী কন্যা যখন বেরিয়ে এলো নিজের ঘর থেকে, তখন মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠলো। বললেন, "তোমাকে ঠিক পরীর মতো দেখাচ্ছে সোনা।"

কন্যার গণ্ড একটু ব্লাস করলো। মেয়েকে এবার খাবার টেবিলে বসিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করো, আজকে কোন্ ছেলেটিকে ডেট দিয়েছো তুমি?"

"ডেভিডকে। খুব ভাল ছেলে। আমার থেকে একবছরের ছোট। খুব ভাল ফুটবল খেলে। সামনের বছর নিশ্চয় স্কুলটীমের ক্যাপ্টেন হবে।"

মা বললেন, "তাই নাকি? তাহলে খুবই গর্বের কথা। ওর বাবা-মা তো মুদিখানার দোকানটা চালান। তাই না?"

"ঠিক ধরেছো মা। ডেভিড তো এখনই আসবে, দেখো কী রকম হ্যান্ডসাম। শুধু ওর সামনের ক'টা এবড়ো-খেবড়ো দাঁত আমার বিশ্রী লাগে। ডেভিড ওর মাকে বলেছে। সামনের সপ্তাহে ডেনটিস্টের কাছে

যাবে। আজকাল ডেনটিস্টরা তো যে কোনো দাঁতকে সোজা করে দিচ্ছে।

মেয়ের জন্যে সামান্য খাবার নিয়ে এলেন মিসেস ডসন। মেয়ে খেতে আরম্ভ করলে আলতোভাবে। মা বললেন, "এখনও সময় রয়েছে। খাওয়া শেষ করে চোখের চুলগুলো পাল্টে ফেলো। ঠিক ম্যাচ করছে না। ঠোঁটে আর একুট লিপস্টিক দিয়ে নাও।" মিসেস ডসন আমাকে বললেন, "এক মিনিট।"

ভিতরে গিয়ে দু' একমিনিট কী খুটখাট করলেন। তারপর এক গেলাস দুধ নিয়ে ফিরলেন। গেলাসটি টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "বাছা, এইটা এবার খেয়ে নাও।"

"দুধ?" মেয়ে যেন আঁতকে উঠলো।

"তুমি পাগল হয়েছো মা, এখন আমি দুধ খাবো?" মেয়ে বেশ রেগে উঠলো।

"সোনা মেয়ে, সকালে আজ দুধ খেতে ভুলে গিয়েছো, এখন খাও।"

মেয়ে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলো। "সকালে দুধ খাইনি বলে এখন খেতে হবে তেমন কোনো আইন নেই।"

'না বাছা, দুধ তোমাদের বয়সে খাওয়া উচিত।" মা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

মেয়ে বললে, "মা তুমি কি চাও তোমার মেয়ে একটা কুমড়াপটাস হয়? আমি এই মাত্র ওজন নিলাম। আমার একপাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে।"

"সে তো ভাল কথা, বাছা।"

"নিজে তো কেমন ছিপছিপে সুন্দরীটি রয়েছো। আমার জামাকাপড় সব এত টাইট হয়ে গিয়েছে যে বলবার নয়।"

মা আবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "দুধ খাও বাছা। তোমাদের তো এখন বাড়বারই বয়স। শরীর এখন ক্রমশ নারীত্বের সৌন্দর্যকে ডেকে আনবে।"

"ওসব বাজে কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। এই বাড়তি একপাউন্ডটা আমার হিপে জমা হয়েছে। এটা মোটেই ভাল নয়।"

মা বললেন, "বাছা, এই দুধে ক্যালরি তেমন নেই। তুমি লক্ষ্মী

মেয়ের মতো খেয়ে নাও।" মেয়ের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মা তখন বললেন, "ক্যালরির জন্যে যদি এতো চিন্তা, তাহলে পেস্ট্রি থাক, তার বদলে দুধ খাও।"

মেয়ে পেস্ট্রিটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, "দুধ আর পেস্ট্রি এক জিনিস না মা। পেস্ট্রি আমি খাবোই।"

মিসেস ডসন যে দুধ খাওয়াবার জন্যে কেন এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন ভগবান জানেন। আর তেমনি হয়েছে মেয়েটা। মাকে পাত্তাই দিলো না।

ইতিমধ্যে ডেভিড নামক বালক স্যুট পরে হাজির হলো। মাথার চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা। এইটুকু ছেলে এই মেয়ের সঙ্গে ডেটিং-এ বেরোচ্ছে ভাবতে আমার হাসি লাগছিল। কিন্তু তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মিসেস ডসন জিজ্ঞেস করলেন, সে কিছু খাবে নাকি। ডেভিড রাজী হলো না।

লিজা এবার টেবিল থেকে উঠে ঘরে চলে গেলো আই ল্যাশ পাল্টাতে। যাবার আগে বললে, "ডেভিড, আমি এক মিনিটের বেশি সময় নেবো না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিজা বেরিয়ে এলো। মিসেস ডসনের মাথায় তখন যেন ভূত চেপেছে। দরজা পর্যন্ত দুধটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "লিজা, আমার কথা শুনে দুধটা খেয়ে নাও।"

মেয়ে রাজী হলো না। তখন হতাশ হয়ে মা তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য করলেন। বললেন, "হ্যাভ এ গুড টাইম। সব কিছু এনজয় করো। আর যদি পারো রাত বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এসো। তুমি না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম আসবে না।"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমার কাছে তো ফ্ল্যাটের চাবি রইলো।" এই কথা বলে লিজা বালক-বন্ধু ডেভিডের হাত ধরে বেরিয়ে গেলো।

বিরস বদনে মিসেস ডসন তখন দুধের গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইলেন. আমি আর ওঁর দুধ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারছিলাম না।

বললাম, "সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো বিব্রত হচ্ছেন কেন?"

"সামান্য মোটেই নয়।" একটা সিগারেট ধরালেন মিসেস ডসন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আপনার গ্রোন আপ মেয়ে রয়েছে। আজকাল ডেটিং-এ কি হয় কিছুই ঠিক নেই। ওদের এখনও বিচার-বুদ্ধি হয়নি। তাই প্রতিদিন লুকিয়ে দুধের সঙ্গে একটা বার্থ কন্ট্রোল পিল গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিই। এই সব পিল জানেন তো নিয়মিত না খেলে কোনো কাজেই লাগে না। এই বয়সে একটা কেলেঙ্কারী হলে কী ফ্যাসাদ বলুন তো? জানাশোনা তিনটে মেয়ে পনেরো বছরের মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়েছে। তাদের বাপ-মায়ের অবস্থা ভাবুন।"

সুষমা মাসিমা এইবার থামলেন। আমাকে বললেন, "মিসেস ডসনের কথা শুনে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছে। রক্ষে করো বাপু। মাথায় থাকুন ডলার। আমি মেয়েটাকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

লীনা এবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, "শংকরদা আর পাঁচ মিনিট।"

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তোর দুধ গরম করি?"

মেয়ে বললে, "করো।"

লীনা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে মাসিমা বললেন, "মেয়ে আমার খুবই ভাল এখনও। দেশে গিয়ে জল মেশানো ভেজাল দুধই খাবে। মাথায় থাকুক পিল মেশানো খাঁটি দুধের দেশ।"

[গ্রন্থসূত্র
এপার বাংলা ওপার বাংলা]

এডিথ, আমোদিনী ও পটলদা

বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে প্রথম সুযোগেই যে বিদেশিনীর খোঁজখবর করবো ঠিক করেছিলাম তার নাম এডিথ। কিন্তু পটলদার কথা না বললে এডিথকে একটুও বোঝা যাবে না। তেহেরান বিমান বন্দরে আমাদের প্লেন অনেকক্ষণ থেমেছিল। ওই সময় পটলদার ব্যাপারটা ডায়রিতে নোট করে নিয়েছিলাম।

পটলদা মানে শ্রীপটলকুমার হাজরা।

পটলদা কোনোদিন বিলেতে যাবেন এবং মেম বিয়ে করবেন স্বয়ং ভৃগুও যদি একথা পটলদার ছাত্রাবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তাহলে আমাদের ইস্কুলের সহপাঠীদের অর্ধেক হাসতে হাসতে মারা যেতো! ক্লাসের পিছিয়ে পড়া ছেলেদের অন্যতম পটলদার গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ছাড়া আর কিছু মূলধন ছিল না। ইস্কুলে ইংরিজির মাস্টারমশায় হরনাথবাবু বলতেন, "আমি কোন ছার! পঞ্চতন্ত্রের বিষ্ণুশর্মা এবং স্বয়ং নেসফিল্ড সায়েব দু'জনে একসঙ্গে চেষ্টা করলেও পটলকে ইংরিজি শেখাতে পারবেন না।"

সকলের সামনে এই ধরনের অপমানকর মন্তব্য শুনেও পটলদার কোনো লজ্জা হতো না, মাথাও নিচু করতেন না। বরং ঠোঁট টিপে হাসতেন। মাস্টারমশায় আরো রেগে উঠে বলতেন, "বেহায়া এখনও হাসছিস!" পটলদা তবুও একগাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে রাখতেন।

পড়াশোনার লোকসানটা পটলদা দুষ্টুমিতে পুষিয়ে নিতেন। সে বিষয়ে তিনি বলতে গেলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চুপচাপ দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না পটলদা। সব সময় নিজের শক্তি পরীক্ষা করতেন হয় কোনো সহপাঠী ছাত্রের ওপর অথবা ইস্কুলের কোনো সম্পত্তির ওপর। মাংসপেশীর ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে পটলদা একবার ইস্কুলবাড়ির বারান্দার দুখানা রেলিং উপড়ে ফেললেন। তখন পটলদা ক্লাস সেভেনের

ছাত্র। আর বেঞ্চি? সে-প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। এ-বিষয়ে তাঁর সুনাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছিল যে কোনো ক্লাসে ভাঙা বেঞ্চি বেরোলেই আমাদের গজু বেয়ারা প্রথমেই পটলদার নামে রিপোর্ট করতো।

অফিস ম্যানেজার সনাতনবাবু তখন পটলদাকে ডেকে বলতেন, "পটলা, ঠিক করে বল, ক্লাস ফাইভে গতকাল যে-দুখানা বেঞ্চির পা ভাঙা পাওয়া গিয়েছে সেটি কার কর্ম?"

পটলদা কিন্তু খুব সত্যবাদী ছিলেন। পিটুনি খাবার ভয়ে মিথ্যে কথা বলে বেরিয়ে আসতেন না। দোষ করে থাকলে স্বীকার করতেন। সনাতনবাবুকে বলতেন, "স্যার, একেবারে পক্কা কাঠ। কিল কমপিটিশনে ফার্স্ট হতে গিয়ে বেঞ্চিটা মট করে ভেঙে গেলো।"

"বেঞ্চির ওপর ছুরি দিয়ে ছবি এঁকেছে কে?" সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করতেন।

না, ওই কাজটা পটলদা একদম করতেন না। দেওয়ালে পেন্সিলের দাগ কাটা, ছুরি দিয়ে বেঞ্চিতে নাম খোদাই করা, ওসব ছিঁচকে নোংরামির মধ্যে পটলদা কখনো থাকতেন না। তবে ঝেঁকি নন্দীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে বেচারার হাতটাই ভেঙে দিয়েছিলেন পটলদা। ঝেঁকি নন্দী পরের দিন প্লাস্টার-করা হাত নিয়ে ইস্কুলে এসেছিল। যথারীতি শাস্তি দেবার আগে হেডমাস্টারমশায় বলেছিলেন, "পটল, তোমাকে যে শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে যেতে হবে।"

পটলদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর লজ্জা পেয়ে সেই বিখ্যাত হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল পটল-হাসি। অর্থাৎ এই হাসির মালিক অনুতপ্ত, না উদ্ধতভাবে অপরাধের পুনরাবৃত্তির ফন্দি আঁটছে তা মুখ দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। হেড মাস্টারমশায় আড়ালে বলতেন, "পটলাকে বেত মেরেই বা লাভ কী? ও নড়েও না, চড়েও না, কাঁদেও না, যন্ত্রণায় মুখও বেঁকায় না। ওর অপমানজ্ঞানও নেই।"

আর পুলিশের ভয়? সে দেখিয়ে লাভ নেই। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় পটলদার বীরত্ব আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ডালমিয়া পার্কে ছাত্রদের মিটিং হচ্ছিল। আমরাও গিয়েছিলাম ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে। এমন সময় পুলিশ এসে পড়লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে

যে যেদিকে পারলো দৌড় মারলো। জনতা ছত্রভঙ্গ। কিন্তু পটলদা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় পেয়ে লেজ তুলে দৌড়নো তাঁর কোষ্ঠিতে নেই।

দুপুরবেলাতেই খবর রটে গেলো পটলদা গ্রেপ্তার। সেই সঙ্গে আমাদের ক্লাসের দ্বিজপদ বেচারাও পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

পরের দিন পটলদার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘট করবো ভাবছি। ওমা! পটলদা ঠিক সময়ে গম্ভীরমুখে ইস্কুলে এসে হাজির। আমরা আশঙ্কা করলাম, পটলদা হয়তো পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়ে খালাস পেয়েছে। পটলদাকে জিজ্ঞেস করতে গম্ভীরভাবে বললেন, "মোটেই না। ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। হেড কনস্টেবল রামলক্ষ্মণ সিং নাক-কান মলেছে যে পটল হাজরাকে আর কোনোদিন অ্যারেস্ট করবে না।

ব্যাপারটা যে মিথ্যে নয় তা দ্বিজপদর কাছেই জানা গেল। সে বললো, "আমাদের লক-আপে তো পুরলো। কিন্তু একটু পরেই পটলদা দাবি করলো দুপুরের খাওয়া কই? বাড়ি থেকে না-খেয়ে বেরিয়েছি। পুলিশ ওই সময় ভাতটাত কোথায় পাবে? সিপাই কিছু কচুরি এনে দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে পটলদা আবার ডাকাডাকি শুরু করলো—সিপাইজী বৃহৎ খিদে পাতা হ্যায়। ছোট ছেলে দেখে সিপাইজী আবার কোথা থেকে খাবার নিয়ে এলেন। পটলদার খাবার পছন্দ নয়—বললেন, বোঁদে কই? এই সময় বোঁদে না খেলে শরীর খারাপ করে আমার। এরপর পটলদা অন্য ছেলেদের নিয়ে জেলখানার মধ্যে স্লোগান তুলেছিলেন : বোঁদে না খেয়ে মাথা গরম।"

সিপাইজী ভাবলেন, স্বদেশীরা বন্দেমাতরম্ আওয়াজ তুলছে। ছুটে গিয়ে দারোগাবাবুকে ডেকে নিয়ে এলেন। পটলদা তাঁকে বললেন, "না স্যার, আমরা আওয়াজ তুলেছি, বোঁদে-না-খেয়ে-মাথা-গরম। বিশ্বাস না হয় আবার স্লোগান তুলছি, আপনি শুনুন।" সন্ধে সাতটা পর্যন্ত পটলদার খাওয়ার দাবিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দারোগাবাবু ওদের সবাইকে ছেড়ে দিলেন। মুখ বেঁকিয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এইরকম কিছু বিশ্বপেটুক হাজতে থাকলে আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে!"

এই পটলদা শেষপর্যন্ত ফেল করে আমার সহপাঠী হয়ে গেলেন। বছরের প্রথম দিনেইস্কুলে এসে বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। উঁচু ক্লাসে

পড়ার জন্যে ওঁকে এতোদিন 'দাদা' এবং 'আপনি' বলে এসেছি। অনেক ছেলে নির্দয়ভাবে প্রথম সুযোগেই ওঁকে পটল বলে ডাকতে শুরু করে দিলো। আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। পটলদাই আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "তুই কেন দাদা বলিস? তুই নিয়মিত পাশ করে, আর আমি নিয়মিত ফেল করে সমান হয়ে গেছি। এখন আমার দম্ভ থাকা উচিত নয়। আমাকে নাম ধরে ডাকবি।"

কেন জানি না, আমার বড্ড মায়া হয়েছিল। সুযোগটা নিতে পারিনি! পটলদা নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন। কেননা আমাকে ওরই মধ্যে একটু বেশী ভালবাসতেন, কখনও ইয়ারকি করে গাঁট্টা মারেননি বা পেটের চামড়া টেনে ধরেননি—শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির নাম ছিল মধু-খামচি!

পটলদার মামার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই রাস্তার ধারে বাসনপত্তর মেরামতির এবং ঝালাইয়ের দোকান ছিল তাঁর। পটলদার মামা বাজারের থলিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে, আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "পটল হাজরা কেমন পড়াশোনা করছে গো?"

আমি কী বলবো? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মামা বললেন, "ওর মায়ের জন্য ভগবান আরও কত দুঃখ তুলে রেখেছেন কে জানে? এক বছরের এই ছেলেকে নিয়ে দিদি বিধবা হলো। বাড়িতে দেখবারও কেউ নেই। অথচ ছেলেটার মানুষ হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

পটলদা থাকতেন চৌধুরীবাগানে আমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি নবকুমার নন্দী সেকেন্ড বাই লেন। কালীবাবুর বাজারের পিছনে হাওড়ার এই অঞ্চলটা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের একবার দেখে আসা উচিত। আণবিক যুগের সুসভ্য ভারতে আমরা এখনও কী রকম নরক জিইয়ে রেখেছি তা নিজের চোখে না দেখলে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

পটলদার মার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে আমার। মামা বলেছিলেন, "যেও না একবার আমার বাড়িতে। দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

জটপাকানো সুতোর মতো সরু গলির মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে বাগেদের মাঠের কাছে এসেছি। সেখানে বিরাট এক খোলা নর্দমা। তার ওপর বাঁশের সাঁকোটাও নড়বড় করছে। সেইটা পেরিয়ে গেলেই রাস্তার

ওপর পর পর তিনখানা খাটা-পায়খানার পিছন-দরজা নজরে পড়বে। সেগুলো ছাড়িয়ে কয়েক হাত এগোলেই একটা ছোট্ট কিন্তু বেজায় পুরোনো একতলা বাড়ি দেখা যায়। প্রায় পড়ো-পড়ো। এখানেই থাকেন পটলদা। বাড়ির পিছনেই উঠোন। উঠোনের ওপরে একই ধরনের আর একটা বাড়ি। সেখানে মামা থাকেন।

নর্দমার ধারে উবু হয়ে মামা বিড়ি খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দিদির জন্যে হাঁক পাড়লেন। ভাই-এর ডাকে এদিকে আসতে গিয়েই অজানা পুরুষমানুষ দেখে দ্রুত ঘোমটা দিলেন। মামা বললেন, "ওকে দেখে ঘোমটা দিতে হবে না। পটলার সঙ্গে পড়ে—ওদের ফার্স্ট বয়।"

আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। জানালুম আমি মোটে ফার্স্ট বয় নই, আমার ওপরে তিন-চার জন ছাত্র আছে। পটলদার মামা বিড়িটা নামিয়ে বললেন, "ওই হলো। গুড বয়।"

দিদির সামনে মামা বললেন, "পটলার কোনো লজ্জা-শরম নেই। উইডোর অনলি চাইল্ড, কোথায় তুই মায়ের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করবি, তা না ড্যাংগুলি খেলে বেড়াচ্ছিস। আমি তো শ্লা বিধবার একমাত্র ছেলে হলে ইস্কুলের বই থেকে চোখ তুলতাম না।"

পটলদার মা শান্তভাবে এবং বেশ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোমটার আড়াল থেকে ভাইকে বললেন, "সামনের মাসেই তো তের বছর শেষ হচ্ছে—এবার হবে। ওই ছেলেই সংসারের মুখ রাখবে।"

বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিয়ে মামা বললেন, "তোকে আর কী বলবো দিদি। কম বয়সে উইডো হয়েছিস, বাবা বারবার বলে গিয়েছেন— আমোদিনীর মনে কখনও কষ্ট দিস না। তবু তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল। ওই যে তোর ছেলের কোষ্ঠি করিয়ে গিয়েছেন বাবা, ওতেও ভেজাল। তের বছরেও যে-ছেলের কিসসু হলো না, সে-কী করে চোদ্দতে পড়ে আশু মুখুজ্জে বনে যাবে?"

আমাকে আবার আসতে বলে আমোদিনী দেবী এবার ভিতরে চলে গেলেন।

আর মামা একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, "পড়াশোনা চুলোয় যাক, পটলাকে শেষ পর্যন্ত আমার ওই রাঙঝালের দোকানেই ঢুকতে হবে।

তা শোনো," এই বলে মামা বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলেন। তারপর অনুরোধ করলেন, "পটলা পড়াশোনায় যাই হোক, ওর ক্যারাকটারের দিকে তোমরা নজর রেখো।"

আমার বয়স কম, ক্যারাকটার কাকে বলে তখন জানতাম না। তাই ফ্যালফ্যাল করে মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এতোদিন শুধু লেখাপড়া সম্বন্ধে ভেবে এসেছো। এবার ক্যারাকটার সম্বন্ধে সাবধান হবার বয়স হয়েছে তোমারও। বিড়ি খাওয়া, রাস্তায় সমত্থ মেয়েছেলের দিকে তাকিয়ে থাকা, টিটকিরি করা এইসব হলো ব্যাড ক্যারাকটারের লক্ষণ।"

আমি একেবারে তাজ্জব! কারণ মনটা তখনও বয়সের অনুপাতে একটু কাঁচাই ছিল। মামা বলেছিলেন, "আমি শ্লা ইস্কুল লাইফ থেকে বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছি—কিন্তু আমার বাপের তখন টুপাইস ছিল। পটলার বাপ তো হাড়ির হাল করে গিয়েছে। মায়ের বাপ না থাকলে পটলাকে তো দরজায় দরজায় ভিক্ষে করতে হতো।" দাদুই যে দয়া করে মাথা গোঁজবার মতো দুখানা ঘর পটলদার মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন সে-কথাও মামার কাছে শুনেছিলাম।

কিন্তু পড়াশোনায় পটলদার কোনো উৎসাহ নেই। ইংরিজিটা ক্রমশই বেচারার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। মাস্টারমশায় ক্লাসে বলতেন, "পটল, কোনো সায়েব তোর ইংরিজি শুনলে এখনই ঘেন্নায় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে! বানান, গ্রামার, ইডিয়ম, টেন্স কিছুই তোর মাথায় ঢুকলো না।"

পটলদা সেই আগেকার মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর ফিকফিক করে হাসতেন। কেউ কেউ পটলদার হাসিকে অবজ্ঞার নিদর্শন বলে ভুল করতেন। কিন্তু আসলে পটলদা ওই হাসি দিয়েই নিজের অপমান এবং কান্নাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

আমাদের ইস্কুলে তখন প্রবল আদর্শবাদ। ছেলেরা যাতে মানুষ হয়, সমাজের সেরা হয় সেদিকে মাস্টারমশায়দের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ছাত্ররাও অনেক কিছু জানতো। তারা জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা পছন্দ করতো না, দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ আছেন বিশ্বাস করতো, পড়াশোনায় ভাল ফল দেখিয়ে দেশের এবং দশের কাজে লাগবার জন্যে তারা

উদ্‌গ্রীব ছিল। ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যতে কারা কারা সমাজের গর্ব হবে তা আমরা ছোটবেলা থেকেই আন্দাজ করতাম। কিন্তু আমাদের সেই তালিকায় পটলদার নাম ছিল না।

সেই পটলদা শেষ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ম্যাট্রিক পাস করলেন। নগেনবাবু স্যার বলেছিলেন, "তাজমহলটা ছিল পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ; আর পটলের পাস করাটা হলো নবম আশ্চর্য। ভাগ্যে ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।" স্বাধীনতার পরেই প্রথম যে ছাত্রদল ম্যাট্রিক পাস করে পটলদা ও আমি তার মধ্যে ছিলাম।

পটলদা আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিনা প্রতিবাদে হেসেছে এবং মাস্টারমশায়ের পায়ের ধুলো নিয়েছে।

সেই পটলদার মধ্যেও উচ্চাশার বীজ লুকিয়েছিল। পৃথিবীর দুটো লোকের তখনও তাঁর সম্বন্ধে ভরসা নষ্ট হয়নি। একজন পটলদার মা আমোদিনী দেবী আর আরেকজন পটলদা স্বয়ং। মামার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "কী বলবো তোমায়। উচ্চশিক্ষা তোমাদের মতো ছেলেদের জন্যে, পটলার জন্যে নয়। কিন্তু ওর মা পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে রয়েছে। যেহেতু স্বামী মরবার সময় বউ-এর হাত ধরে বলেছিল, পটলাকে দেখো, ওকে খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠিও, সেহেতু তিনি এখনও স্বপ্ন দেখছে।" .

পটলদাও যে গোপনে গোপনে বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখেন এ খবর ইস্কুলে প্রচারিত হলে ছেলেদের মধ্যে কী রকম প্রতিক্রিয়া হতো ভেবে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। মামা দুঃখ করে বললেন, "বাবা নিষেধ করে গিয়েছেন তাই, নাহলে বোনকে ছ্যাড় ছ্যাড় করে শুনিয়ে দিতাম। বলতুম, জামাইদার অতই যদি ছেলেকে বিলেত পাঠাবার শখ ছিল, তাহলে বউকে বাপের বাড়ি ফেলে বাঁশতলা ঘাটে গেলেন কেন?"

পটলদার সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমার দেখা হয়েছে। ওসব কথা তুলে তাঁকে আমি অবশ্য লজ্জা দিইনি। বাড়িতে পটলদা বড্ড আদুরে। মা নিজে না-খেয়েও পটলদার জন্য ভালমন্দ খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। আজকাল গহনা বেচে ছেলেকে নিয়মিত দুধ খাওয়াচ্ছেন। কোথায় ভদ্রমহিলা শুনেছেন, দুধ খেলে ছেলেদের মাথা খোলে। পটলদা নিজেও বলেছেন, "মা এখন দুঃখ করেন, ইস্কুলে পড়ার সময় পটলের দুধ বন্ধ

ছিল। সুতরাং ছেলের মাথায় কী করে ইংরিজি ঢুকবে?”

মামা আমাকে বলেছেন, “মা-বেটার কাণ্ডকারখানা দেখি আর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। আমার ছেলে হলে ব্যাকে রানিং কিক্‌ দিতুম। তারপর কান ধরে বাড়ি থেকে বার করে এনে দোকানে বসিয়ে দিতুম। বলতুম, লেখাপড়ায় খুব কেরামতি দেখিয়েছিস, এবার ছেঁড়া গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে ফুটো ডালডার কৌটোয় রাঙঝাল লাগা।”

আমি কিছু বলিনি। মামার কাছেই শুনলাম, এই বুড়োধাড়ি গোঁফদাড়ি গজানো পটল নিজের মায়ের কাছে কচি ছেলের বেহদ্দ ব্যবহার করে। রাত্রে মায়ের কাছে ছাড়া শোবে না, মা পিঠে হাত বুলিয়ে দেবেন তবে ঘুম আসবে। কলেজ যাবার সময় মাকে পেন্নাম করবে, মা আবার আদর করে চুমু খাবেন।

মামা বলেন, “জানো, রাগ হয় খুবই। বিধবার শিবরাত্রির সলতের মতো একটা ছেলে, যা বোঝে করুক। দিদির জন্যই দুঃখ আমার—ছেলের মুখ চেয়ে পড়ে আছে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে মায়ের চোখের জল মোছাবে।”

পটলদাও নাকি মাকে ভরসা দিতেন। বলতেন, “ইস্কুলে যতোই খারাপ করে থাকি, দেখো এবার মেক-আপ করে নেবো।” পটলদার মা তাই বিশ্বাস করেন, কারণ ছেলের কোষ্ঠিতে ওইরকম লেখা আছে।

পটলদা ইনঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু ওই তো রেজাল্ট। ওই তো ইংরিজি জ্ঞান! হাওড়ার বাসে মাঝে মাঝে পটলদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেট-স্কোয়ার হাতে পটলদা কোথায় চলেছেন। বৌবাজারের কাছে কি এক বেসরকারী কারিগরী ইস্কুল আছে। সেখানে মোটা টাকা খরচ করে পটলদা ঢুকেছেন। পটলদার মামা আমার কাছে দুঃখ করেছেন, “মা ও ছেলে দুজনেই ভেসে যাচ্ছে। গয়না বেচে কেউ ওইসব জোচ্চোর ইস্কুলে অত টাকা ঘুষ দিয়ে ঢোকে? আর তাও যদি পাস করতে পারতিস। ছেলেটাই দিদির শনি—কলসীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ করে এনেছে পটলা। গয়না-গাঁটিও গেলো, এবার দিদি পথে বসবে।”

পটলদা কিন্তু মুখে সেই আত্মভোলা হাসি ফুটিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।

এই পটলদাই একদিন হাওড়া থেকে উধাও হলেন। আমাদের

ক্লাসের একজন ছেলে খবর দিলো, "শুনেছিস, পটলা বিলেত গিয়েছে—ফর হায়ার এডুকেশন।'

পটলদার মামার দোকানে খোঁজখবর নিয়েছি। একটা ফুটো টিনের কৌটো মেরামত করতে করতে মামা বললেন, "আমাকে আর ওসব খবর জিজ্ঞেস কোরো না। যাবার আগে বাড়িটাও বন্ধক দিয়ে গিয়েছে। কি আর বলব বলো? দিদির দোষ কম নয়—ছেলেকে একবারও বারণ করলো না!"

পটলদার মায়ের সঙ্গেও আমার একটু-আধটু সংযোগ ছিল। অত্যন্ত লাজুক মহিলা। ছেলের বন্ধুদের সামনেও ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ব্যস্ত—মুখে কোনো কথা নেই। আমোদিনী দেবী বোধ হয় ভাবলেন অন্য সবার মতো আমিও আবার পটলদার বিলেত ভ্রমণের সমালোচনা করে দেখাবো যে পটল একটি আস্ত গাধা। কিন্তু আমি ওসবের মধ্যে কেন যাবো? পটলদার জন্য সব সময় আমার দুঃখ হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।" আমোদিনী দেবীর বিষণ্ণ মুখে আশার আলো ফুটে উঠলো। বললেন, "ক'টা মাস আর? তারপর তো খোকা ফিরে আসবে। মায়ের যে আর কেউ নেই সে-কথা খোকা বোঝে।"

কয়েক মাস কেন, কয়েক্ বছরের মধ্যে পটলদার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন হলো না। পটলদার মামা দুঃখের সঙ্গে আমার কাছে খবর নিয়েছেন, "পটলা তোমার কাছে চিঠিপত্তর লেখে নাকি? যদি কখনও চিঠি পাও দিদিকে একটু খবর দিয়ে এসো। দিদি বেচারা দিনরাত চোখের জল ফেলে আর ডাকপিওনের জন্যে অপেক্ষা করে দরজার গোড়ায় বসে থাকে। চিঠি এলে সেটা অন্তত দেড়শ দুশবার পড়ে।"

আমার চিন্তা, ইংরেজির সীমিত বিদ্যা নিয়ে খোদ ইংরেজদের দেশে পটলদা কীভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন? তিনি ওখানে করছেনই বা কী? পটলদার মামা বলেছেন, "ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। চিঠিতে বিশেষ কোনো খবর থাকে না। 'নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিও,' ইত্যাদি। কিন্তু নিজের যত্ন মা কোথা থেকে নেবে? বন্ধকী পাকা বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলো। দিদি এখন ছোট্ট টিনের ঘরে থাকে। বিধবা মানুষ

এমনিই তো অর্ধেক দিন উপোস, বাকি ক'টা দিনের খাবারও যে কী ভাবে জুটছে ভগবান জানেন।"

আরও বছর খানেক পরে শুনেছি পটলদা কিছু কিছু টাকা মাকে পাঠাচ্ছেন। মামাও স্বীকার করেছেন, "দিদির দুঃখ বোধ হয় এবার ঘুচলো—ছেলে প্রতি মাসেই এম-ও পাঠাচ্ছে। প্রথম বারের পুরো টাকাটাই তো দিদি সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এলো। ছেলের মঙ্গলের জন্যে প্রতি মাসে দিদি এখন বাড়িতেও পুরুত আনিয়ে পুজো করাচ্ছে। প্রতি শনিবারে একজন বাউনের পা ধুয়ে সেবা করছে, যাতে ছেলে রাজা হয়ে ফিরে আসে।"

আমাদের ইস্কুলের সুরজিতের চিঠি থেকে পটলদার আরও খবরাখবর পাওয়া গেলো। চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসি পড়তে সুরজিত বিলেত যাচ্ছিল। হেড্‌মাস্টারমশায় বলেছিলেন, 'আমাদের ইস্কুলের পটলও বিলেতে আছে। কোন অসুবিধে হলে ওর খবর করো।' সুরজিত আমাকে চিঠি লিখেছিল, 'সে এক অবিশ্বাস ব্যাপার। পটলদা চিঠি পেয়ে নিজে জাহাজঘাটে হাজির ছিলেন। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অজানা দেশ, সায়েবদের ইংরিজি বুঝতে পারি না, এমন অবস্থায় পটলদা উদ্ধার না করলে মুশকিলে পড়ে যেতাম।' হেডমাস্টারমশায়কেও পটলদা প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন—'স্যর, আপনার নির্দেশ মতো সুরজিতের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ সুরজিতের জন্যে চিন্তা করবেন না।'

এরপর ইস্কুল মহলে কেমন জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে বিলেতে পৌঁছতে পারলে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, স্বয়ং পটলদা ওখানে রয়েছেন। কাজে-অকাজে যারাই বিলেতে পাড়ি দিয়েছে তারাই হেডমাস্টারমশাই কিংবা পটলদার মার কাছ থেকে চিঠি নিয়েছে: 'অমুক লন্ডন যাইতেছে। ফরেন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তাহার উপর বিদেশি মুদ্রার অভাব। সুতরাং যতটা পারো দেখিও।'

সাধ্যের অতীত দেখাশোনা করতেন পটলদা। বিলেতফেরত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার পরিচয় হলো। পটল হাজরাকে আমি জানি শুনে ভদ্রলোক বললেন, "সে-এক পিকুলিয়র লোক মশাই। দুনিয়ার যত বাঙালি ছোকরা তাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়,

আজ এয়ারপোর্টে, কাল রেল স্টেশনে, পরশু জাহাজঘাটে মিস্টার হাজরা যাচ্ছেন নতুন কোনো দেশোয়ালীকে নামাতে। আমরা তো মিস্টার হাজরাকে বলতাম, আপনি মশাই ট্রাভেল এজেনসির ব্যবসার নামুন। কাস্টমস থেকে লোক ছাড়ানো, অজানা লোকের ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করা, ছেলে-ছোকরাদের জামিনদার হওয়া এসব আপনার যেরকম সড়গড় হয়েছে, ব্যবসা খুবই ভাল চলবে।"

ভদ্রলোকের মুখেই শুনলাম, বন্ধুবান্ধবদের এইসব সমালোচনার কোনো উত্তর পটলদা দেন না, শুধু হাসেন। নিতান্ত চাপ দিলে বলেন, "মায়ের চিঠি নিয়ে আসে, বুঝতেই পারছেন।" বন্ধুরা বলেছে, "মাকে খবর দেবেন অত চিঠি না লিখতে। হাজার হোক আপনারও চাকরি আছে, সন্ধেবেলায় পড়াশোনা আছে।" পটলদা বলেছেন, "যাই বলুন, বিদেশে প্রথম পা দিয়ে একটা চেনা-জানা লোক পেলে খুব আনন্দ হয়।"

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী মারফত পটলদা সম্পর্কে আরও খবরাখবর পেয়েছি। ভদ্রলোক বলেছেন, "মিস্টার পটল হাজরা খুব আদর্শবাদী লোক। আপনাদের ইস্কুল সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি। ইস্কুলের প্রত্যেকটি মাস্টারকে ভদ্রলোক যেভাবে শ্রদ্ধা করেন তা এযুগে বিরল। ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় খুব ভালবাসা পেয়েছেন, না-হলে তো পরবর্তী জীবনে এতো শ্রদ্ধা থাকে না।" আমি চুপচাপ শুনে গিয়েছি, কোনো মন্তব্য করিনি।

এইসময় আমার জানাশোনা রমেনবাবু একবার দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের মন মেজাজ খুব খারাপ—জামাইকে নিজের খরচে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠিয়েছিলেন, এখন বিশেষ খোঁজখবর পাচ্ছেন না। ছোকরা নতুন কোনো নেশায় পড়েছে নিশ্চয়, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত চিঠি-পত্তর তেমন লেখে না। সঙ্গে সঙ্গে পটলদার কথা মনে পড়ে গেলো। বললাম, "আমোদিনী দেবীর কাছে চলে যান, উনি একটা চিঠি লিখলে, পটলবাবু আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।"

তারপর অনেকদিন খোঁজখবর ছিল না। রমেনবাবু নিজেই একদিন দেখা করতে এলেন। দুটো হাত ধরে জানালেন, "আপনার বন্ধু পটলবাবু আমাদের কী উপকার যে করলেন, সে ভাষায় বোঝাতে পারবো না। জামাই-এর কাছে মেয়েকে যে ফেরত পাঠাতে পারলাম সে একমাত্র ওঁর জন্যেই। ভদ্রলোক আমার জামাই-এর পিছনে তিন মাস ডিটেকটিভের

মতো লেগেছিলেন। ছোকরাকে বুঝিয়েছেন, আড়ালে ছোকরার বালিকা বান্ধবীদের সাবধান করে দিয়েছেন, তারপর আমাকে খবর দিয়েছেন, মেয়েকে এখনই পাঠিয়ে দিন। কোনো চিন্তা করবেন না, জামাই যদি কোনো গোলমাল বাধায় তাহলে আমি রইলাম।"

রমেনবাবুর মেয়ে লিখেছে : "বিলেতের বাঙালি মহলে পটলদার মতো ছেলে বিরল। মুখে বড় বড় কথা বলেন না। কিন্তু কাজে এবং চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত ভক্ত। সিগারেট খান না, মদ খান না, মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন না, শুধু নিজের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের চাকরি এবং পরীক্ষার পড়াশোনা নিয়ে আছেন। ভদ্রলোক প্রতি সপ্তাহে মাকে চিঠি লেখেন। মাকে এমন ভালবাসতেও আজকাল দেখা যায় না!"

রমেনবাবুর মেয়ে এখন স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘরসংসার করছে। পটলদার কথা সে আবার লিখেছে : "দেশ থেকে নতুন-আসা ছেলেরা পটলদাকে বড় বিরক্ত করে। পটলদার মা বোধ হয় অন্নপূর্ণার মতো চিঠি বিলিয়ে যাচ্ছেন—যে আসে তারই সঙ্গে মায়ের চিঠি থাকে। পটলদা বেচারা এইসব ছেলের জন্যে বাড়ি খুঁজতে, সপ্তাহখানেক খাওয়াতে পরাতে, লন্ডন ঘুরিয়ে দেখাতে হিমসিম খেয়ে যান। টাকারও শ্রাদ্ধ হয়। এতো বছর হয়ে গেলো পটলদা একবারও দেশে বেড়াতে যাননি। কিন্তু যাবেন কী করে? টাকা তো বাঁচাতে পারেন না।"

এই পটলদাই শেষ পর্যন্ত বিলেতে মেমসায়েব বিয়ে করে বসলেন। মা আশা করেছিলেন, ছেলে লেখাপড়া শিখে এবার দেশে ফিরে কোনো চাকরিবাকরি করবে। কিন্তু...

খবরটা শুনে আমাদের বন্ধুবান্ধব মহলে হাসাহাসি হয়েছে। কেউ বলেছে, "এতো লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত পটল হাজরা মেম বিয়ে করে বিলেতে থাকবে, এ-কথা আমাদের ইস্কুলে কেউ কি কল্পনা করতে পারতো? তাছাড়া বিলেতে দশ বছর আদর্শ সাধুসন্তের জীবনযাপন করে এবং অনেক বাঙালি ছোকরার মেম বিয়েতে বাধা দিয়ে পটলদা নিজেই শেষ পর্যন্ত এই কাজ করে বসলেন তাও অবিশ্বাস্য।

এই সব কথা যখন কানে আসছে, সেই সময় আমার বিদেশে যাবার সুযোগ এলো। কোথায় ইন্ডিয়া আর কোথায় আমেরিকা—একলাফে

সেখানে হাজির হতে হলে শরীর এবং মনের ওপর যথেষ্ট ধকল হয়। তাই ভাবছিলাম, পথে ইংলন্ডে ব্রেক জার্নি করবো। সেই খবর শুনে আমাদের হেডমাস্টারমশায় বললেন, "যদি পারো বিলেতে পটলের সঙ্গে দেখা কোরো।"

জননী জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে প্রথমে পা দিয়েই যে-অভিজ্ঞতা হলো তা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। হিথরো বিমানবন্দরে ব্রিটিশ সিংহের সেবক সায়েবটি আমার পাসপোর্টে সারনাথের তিনটি সিংহকে দেখেই অবহেলাভরে ছাড়পত্রটি পাশে সরিয়ে রাখলেন। আমার পেছনে যে সব ভাগ্যবান অস্ট্রেলিয়ান এবং জাপানী ছিলেন তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

ইস্কুলে লাস্ট বয়ের মতো আমাকে ডেকে সায়েবটি এবার প্রশ্ন করলেন, "তাহলে ইন্ডিয়া থেকে আসা হচ্ছে? তা মহাশয় হঠাৎ ইংলন্ডে কেন?"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠলেও জানালুম, চলেছি আটলানটিকের ওপারে মার্কিন দেশে। পথে এই ভাঙা যাত্রা। সঙ্গে এরোপ্লেনের পাকা টিকিট, যথেষ্ট ডলার এবং ভারতস্থ ব্রিটিশ দূতের অনুমতিপত্র রয়েছে। কাগজপত্তর সমস্ত খুঁটিয়ে দেখেও বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ইংরাজনন্দন। মন্তব্য করলেন, তাঁদের ভারতস্থ প্রতিনিধির এই প্রবেশপত্র দেওয়া ঠিক হয়নি। বললুম, "এই অপরাধে আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে অবিলম্বে বরখাস্ত করবেন কি না, তা আপনারা ভেবে দেখুন। তবে বিদেশীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা হয় জানলে আমি অবশ্যই এই দেশে পদার্পণ করতাম না।"

বিমানবন্দরে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে কয়েকজন লন্ডন-প্রবাসী বন্ধু বলেছিলেন, "স্বভাবভদ্র ইংরেজ সাধারণ বিদেশীদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করেন—ব্যতিক্রম কেবল ভারতীয়দের বেলায়। কারণ এ-দেশে তারা যথেষ্ট বদনাম কিনেছে। যে আসে সে যেতে চায় না, আসবার পদ্ধতিটাও সব সময় আইনসঙ্গত নয়। সুতরাং সারনাথের তিনটি সিংহকে পাসপোর্টের ওপর একত্রিত দেখলেই দ্বীপপুঞ্জের দ্বাররক্ষী সন্দিহান হয়ে ওঠেন এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন।"

বিদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম ডেমক্র্যাসির যে এমন একটা ভাবমূর্তি

থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি বিদেশে আসবার প্রথম আনন্দটুকুই নষ্ট হয়ে গেলো। এরপর লন্ডনের হোটেলে ভারতীয় বলেই চাপা অবহেলা অনুভব করেছি : রাতের অন্ধকারে আমার বাদামী রংয়ের বাঙালি চামড়া রাজপথে অহেতুক বিপদ ডেকে আনতে পারে এমন সাবধান বাণী শুনেছি। রাগে ফেটে পড়বার ইচ্ছে হয়েছে, পরমুহূর্তেই মনকে বুঝিয়েছি রাগ দেখালে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে। আমাদের মনে রাখতে হবে কয়েক লক্ষ ভারতীয় এই দ্বীপপুঞ্জে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন।

ভাবলুম, হাজার হোক পুরনো মনিব—এদের পক্ষে সাম্রাজ্য হারানোর দুঃখ মাত্র বিশ-পঁচিশ বছরে ভোলা সম্ভব নয়।

বিরক্ত মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর পটলদার খোঁজ করলাম। ফোন পাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পটলদা গাড়ি ড্রাইভ করে আমার হোটেলে হাজির হলেন। বললেন, "কোনো কথা শুনছি না, চল্ আমার সঙ্গে।"

চৌধুরীবাগানের পটলদা লন্ডনের রাস্তায় যেরকম হুড়হুড় করে ইংরিজি বলে যাচ্ছেন তা দেখে আমি তাজ্জব। ছাত্রাবস্থায় নেসফিল্ডের গ্রামার আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্থ করেছিলাম। একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ইংরেজের সান্নিধ্যেও কিছুদিন কাটিয়েছি। তবু খোদ লন্ডনের সায়েবসুবোদের অর্ধেক কথা বুঝতে পারছি না। কিন্তু লক্ষ্য করলুম পটলদার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। অনর্গল কি সুন্দর ইংরিজি বলছেন। পটলদা আমাকে সমস্ত লন্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখালেন, তারপর বাড়িতে নিয়ে যাবার পথে বললেন, "চল। এডিথের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হবি তুই। ও তোর মতোই পড়াশোনা নিয়ে থাকে, ইন্ডিয়া সম্বন্ধে খুব আগ্রহ।"

আমি চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছি। পটলদা নিজেই বললেন, "হ্যাঁরে আমি মেম বিয়ে করেছি বলে দেশে নাকি খুব সমালোচনা হয়েছে? লোকে বলেছে, বিধমা মা ওখানে একলা পড়ে রইলো, আর ছেলে বিলেতে মেমসায়েব নিয়ে ফুর্তি করছে।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "দেশের লোক অনেকরকম কথা বলে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী পটলদা?"

"হাজার হোক দেশ তো?" পটলদা দুঃখের সঙ্গে বললেন। তারপর

নিজেই মন্তব্য করলেন, "তুই তো জানিস কেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলাম। মায়ের গয়নাগাঁটি সব শেষ করে দিয়ে যখন চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, তখন ঠিক করলাম, মায়ের মুখ রক্ষের জন্যে শেষ চেষ্টা করা যাক। বাড়িটা বন্ধক রেখে সেই টাকা নিয়ে বিলেতে পালিয়ে এসেছিলাম। এখানেও কি কম কষ্ট পেয়েছি? পড়াশোনায় তো ভাল ছিলাম না, তাই ডবল পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষে কারখানার চাকরিতে ঢুকেছি। দিনে চাকরি, রাতে পড়াশোনা করে, মাকে টাকা ক'টা পাঠিয়ে, কোনোদিনই কিছু জমাতে পারিনি। মায়ের মান রক্ষে করবার মতো বিদ্যে না হওয়া পর্যন্ত হাওড়ায় মুখ দেখাবো না পণ করেছিলাম। ঠাকুরের আশীর্বাদে এতোদিনে সেরকম বিদ্যে হয়েছে।"

পটলদা জানালেন, "এর মধ্যে বিয়ে-থা করবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বারোটা বছর তো কেটে গিয়েছে। শেষে হঠাৎ একদিন লাইব্রেরিতে এডিথের সঙ্গে আলাপ হলো। এডিথ পড়াশোনার পোকা। আমি পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে বাধ্য হয়ে লাইব্রেরিতে বই পড়ি।"

এডিথ বড় শান্ত। পটলদার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথাবার্তা বলেছে। পটলদা সরল মানুষ। অন্য অনেক বাঙালি ছোকরার মতো এডিথকে নিজের বংশ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেননি। বরং জানিয়েছেন নিজের দুঃখিনী মায়ের কথা। নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখার বিপদের কথা। এডিথ কিন্তু সে সব জেনে পিছিয়ে যায়নি। এটাই পশ্চিমী মেয়েদের প্রশংসনীয় দিক। আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় ওরা অনেক বেশী স্বাধীন। নিরাপত্তা আর অর্থকৌলিন্যের লোভে জীবনসঙ্গী পছন্দের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে তারা মোটেই রাজী নয়। পটলদাকে এডিথ বলেছে, "আমি পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমিও কিন্তু লর্ড ফ্যামিলির মেয়ে নই। তবে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে আমি অনেক শুনেছি। আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ইন্ডিয়াতে ছিলেন—ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে তিনি চাকরি করতেন। আমাদের বাড়িতে জামালপুর ওয়ার্কশপের একটা ছবি আছে—আমার দাদামশায়ের বাবা নিজের স্মৃতি থেকে এঁকেছিলেন।"

পটলদা বুঝতে পেরেছেন তিনি ক্রমশ প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছেন। ঠিক যে ইচ্ছে করে তা নয়, আবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একথাও

বলা যায় না। পটলদার খেয়াল হচ্ছে, তাঁরও বয়স চল্লিশের কাছে এসে পড়েছে এবং বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। এডিথকে পটলদা সোজাসুজি বলেছেন, "আমি যে এ-দেশে চিরকাল থাকবো, তার কোনো কথা নেই। বরং প্রথম সুযোগেই আমি চৌধুরীবাগানে ফিরে যেতে চাই।" সেই সব কথা শুনে এডিথ কিন্তু পিছিয়ে যায়নি। বরং পটলদার বাড়ির লোকের খবরাখবর নিয়েছে। বলেছে, "ইন্ডিয়া তো সুন্দর জায়গা—আমার দাদামশায়ের বাবা তো সেখানেই সারাজীবন কাটিয়েছেন।"

পটলদা আমাকে বললেন, "লুকিয়ে আমি কখনও কিছু করিনি। এডিথের সঙ্গে যে মিশেছি সে-কথা মাকে লিখেছিলাম।"

পটলদার মা সে-খবর পেয়ে কী করেছিলেন আমার জানবার লোভ হলো। পটলদা বললেন, "তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু পরের চিঠিতেই মা আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, তোমার বাবার স্মৃতির অসম্মান হয় এমন কিছু যে তুমি করবে না তা আমি জানি।"

একটু থেমে পটলদা বললেন, "অনুমতিটা মা প্রাণ থেকে দিয়েছিলেন, না উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করেছিলেন তা তুই বলতে পারবি। মাকে তো আমি অনেকদিন দেখিনি।"

লন্ডনের শহরতলিতে একটা ছোট্ট বাড়িতে এডিথের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভদ্রমহিলা আন্তরিকতার সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "তোমাদের যদি বাংলায় গল্প করতে ইচ্ছে করে, চালিয়ে যাও। আমার জন্যে লজ্জা পেও না।'

এডিথকে আমি বললাম, "বিনা নোটিশে হুট করে অতিথি আনা পটলদার উচিত নয়।"

এডিথ একমত হলো না। বললো, "সব সমাজের লোককে পশ্চিমের অনুকরণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি বইতে পড়েছি, যৌথ পরিবারের কালচার এখনও তোমাদের দেশে প্রবল, সুতরাং সেখানে অতিথিসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন আলাদা হবেই।"

পটলদা বললেন, "এডিথ আমাকে ইন্ডিয়ানদের মতো থাকতে উৎসাহ দেয়। মার নাম করে কেউ এসে হাজির হলে মোটেই রাগ করে

না। আমরা দুজনেই চাকরি করি, সুতরাং কোনো অতিথি বাড়িতে থাকলে বেশ অসুবিধে ; কিন্তু তবুও এডিথ আপত্তি করে না।"

সেদিন তো এক অচেনা ছোকরা বললো, "আপনার মায়ের খবর জানি আমি। ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আনতে পারতাম ; কিন্তু তাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠেনি।" পটলদাকে তিনদিন ভুগিয়ে কিছু পাউন্ড আদায় করে সে বিদায় হয়েছে। পটলদা মাকে লিখতে যাচ্ছিলেন, "অনেকে তোমার নাম করে আমাদের ভোগায়। তুমি যাকে পাঠাচ্ছ তার হাতে অন্তত একটুকরো চিঠি পাঠিও, তাহলে সুবিধে হয়।" এডিথ কিন্তু লিখতে দেয়নি। বলেছে, "পনেরো বছর ধরে যা চলছে, এখনও তা চলবে। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে কিছু পাল্টে যাক তা আমি চাই না।"

ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেবে, হোটেলে ফিরবার পথে পটলদা বলেছেন, "এডিথ জানে মার জন্যে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। তাই সেখানে কোনোরকম হাত দেয় না। বরং প্রতি সপ্তাহে আমাকে চিঠি লেখার কথা মনে করিয়ে দেয় ; মার কাছে টাকা পাঠালাম কিনা খোঁজ করে। ওর খুব ইচ্ছে, মা এখানে চলে আসেন। আমি লিখেছি—কিন্তু মা কোনো জবাব দেন না।"

আমোদিনী দেবীর ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। একবর্ণ ইংরিজি জানেন না, দুলাইন বাংলা লিখতেও কষ্ট হয়। মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না, একবেলা ভাত খান। প্রতিদিনই পুজো রয়েছে—ঠাকুরের সেবাযত্ন করতে করতেই সময় কেটে যায়। সেই মানুষ হাওড়া ছেড়ে এই ইংলন্ডে এসে কতখানি মানিয়ে নিতে পারবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। তার ওপর বিদেশিনী বউ।

পটলদা বললেন, "সব তো নিজের চোখে দেখে গেলি, মাকে রিপোর্ট দিস।"

"আপনি নিজে একবার দেশ ঘুরে আসবেন না?" আমি জিজ্ঞেস করেছি।

পটলদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আমার কী আর যেতে সাধ হয় না? প্রথম দিকে পয়সার জন্যে সম্ভব হয়নি। তারপর পয়সা যদি যোগাড় করা যেতো, কারখানার ছুটি নেই। পরীক্ষা দিতে দিতেই ছুটি ফুরিয়ে যেতো—আর তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মায়ের মুখ রক্ষে

করার মতো বিদ্যে না নিয়ে দেশে যাবো না।"

"সেরকম বিদ্যে তো এখন হয়েছে," আমি মনে করিয়ে দিয়েছি পটলদাকে।

পটলদা বলেছেন, "হ্যাঁ। তাছাড়া নতুন যে চাকরিটা নিয়েছি তাতে মাসখানেক ছুটি পাওয়া শক্ত নয়। ভাবছি মাকে এবার বৌমা দেখিয়ে আনবো। এডিথ নিজেও আমাকে জ্বালাচ্ছে। বলছে, তোমাদের দেশে যখন নিয়ম পুত্রবধূকে মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয়, তখন দেরি করছো কেন?"

পটলদার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পালা চুকিয়ে আমি বার্মিংহামে গিয়েছি। সেখানকার রাজপথেই একদিন কেমন করে আমি পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রেমে পড়ি তা বিস্তারিতভাবে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইতে লিখেছি। লন্ডনে ফিরে এসে আরও দু'দিন পটলদা ও এডিথের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আমি একদিনের জন্যে ফরাসিদেশে পাড়ি দিয়েছি। সস্ত্রীক পটলদা আমাকে হিথরো বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

ইংলন্ডে ভারতীয়দের যে-অবস্থাই হোক, ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্মভূমি ফরাসিদেশে ভারতীয়রা যথাযোগ্য সম্মান পাবে এমন একটা আশা মনের মধ্যে ছিল, প্যারিসের নতরদাম চার্চের কাছে এক বৃদ্ধ ফরাসি আমার বাদামী চেহারার দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে দিলেন। অপরিচিত বিদেশির কাছে অবশেষে স্বতঃপ্রণোদিত ভালবাসা পেয়েছি এ আনন্দে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি আমাকে একগোছা নিষিদ্ধ 'প্যারিস পিকচার' গছাবার চেষ্টা করলেন। বিব্রত আমি গম্ভীর হয়ে তাঁর প্রস্তাব না শোনার ভান করলাম। ফরাসি পিতামহ ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে আমাকে লোভ দেখালেন "বিউটিফুল নেকেড্ লেডিজ"। এবার ঈষৎ বিরক্তভাবে জানিয়ে দিলুম, বর্তমানে আমি শুধু নতরদাম গীর্জা দেখতে আগ্রহী। বৃদ্ধ বিক্রেতা সঙ্গে সঙ্গে চটে উঠলেন, "তুমি নিশ্চয় ইন্ডিয়ান। উলঙ্গ মেয়েদের ছবি দেখার টনটনে ইচ্ছে আছে, কিন্তু পকেটে পয়সা নেই।"

এখানেও রোষ সংবরণ করতে হলো। একজন প্রবাসী ভারতীয় বললেন, বৃদ্ধ ফরাসি বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই ভারতীয়দের সম্বন্ধে

এই ধারণা করেছেন।

স্বদেশ সম্বন্ধে বিদেশে কীরকম ধারণা রয়েছে তার নমুনা পেয়ে মনটা বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। প্যারিস থেকে সোজা আটলান্টিক পেরিয়ে লক্ষ্যস্থল আমেরিকায় চললাম। কিন্তু আমার মার্কিনি অধ্যায় শুরুর আগে পটলদা পর্বটা শেষ করে ফেলাই ভাল।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করে হাওড়ায় ফিরে আমি পটলদার মা আমোদিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পায়ের ধুলো নিয়ে খবর দিয়েছি, "আপনার ছেলে এবং বউ বেশ ভাল আছে। বৌমাটি খুবই শান্ত এবং লক্ষ্মীমন্ত হয়েছে।"

পটলদার মা হ্যাঁ না কিছুই উত্তর দিলেন না। মামা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাগ্নে সম্পর্কে এখন তাঁর মতামত পাল্টাচ্ছে—হাজার হোক বিলেতে ভাল চাকরি করে, তার ওপর মেমসায়েব বউ। মামার মন্তব্য, "দিশি বউদের হালচাল তো দেখছি। ফুলশয্যার রাত্তির থেকে শাশুড়িকে হেনস্থা করবার ফন্দি আঁটছে। সেদিক দিয়ে মেমরা অত কুচক্রী হবে না। ওদের পেটে এক মুখে আর এক হবে না।"

বিনা প্রতিবাদেই এসব কথা শুনলেন আমোদিনী দেবী, কিন্তু তাঁর নিজস্ব মতামত কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বললেন, "পটলকে যত্ন করে খেতেটেতে দেয় তো?"

"পটল তো দূরের কথা, আপনার বউমা আমাকেই এতো খাওয়ালো যে প্রাণ আইঢাই করছিল", আমি জানালাম।

অনেকদিন পরে আমোদিনী দেবীকে দেখলাম। ভগবানের আশীর্বাদে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। মামা বললেন, "তোর আর কি দিদি। কম বয়সটায় কষ্ট পেয়েছিস। জামাইবাবুর অসুখ। তারপর উইডো হলি—সবাই ভাবলো ছেলেটা মানুষ হলো না। তা ভগবান এখন তোর দিকে তাকিয়েছেন। ইচ্ছে করলে এককথায় বিলেত পর্যন্ত যেতে পারিস—এ-পাড়ায় কোন মেয়েছেলের সে সুযোগ আছে বল? এখন তো তোরই দিন।"

আমোদিনী দেবী এ-বারেও কোনো উত্তর দিলেন না। পাড়াতে গিন্নীমহলেও এখন পটলদার মায়ের প্রতিপত্তি বেড়েছে। যে মায়ের ছেলে বিলেতে থাকে, বিলাতি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যাঁর নামে প্রতি মাসে টাকা

আসে, তাঁর সামাজিক প্রেস্টিজ অনেক উঁচু। যাঁরা একদিন আমোদিনী দেবীর নামে মুখ বেঁকাতো তারাই এখন তাঁকে হিংসে করছে। আমোদিনী দেবীকে আমি বললাম, "পটলদা এবং আপনার বৌমার খুব ইচ্ছে আপনি বিলেত যান। ঘুরে আসুন না একবার, পছন্দ না হলে ফিরে আসবেন।"

আমোদিনী কোনো উত্তর দিলেন না। মামা ফিসফিস করে বললেন, "বাবার খুব আদুরে মেয়ে ছিল তো। তখন থেকেই অভিমানিনী। নিজে যা-খুশী তাই করবে— কারও কথা শুনবে না।"

কিছুদিন পরেই খবর পেলাম সস্ত্রীক পটলদা স্বদেশ ভ্রমণে আসছেন। মামার খুব আনন্দ এবং আগ্রহ। খবরটা রটতেই পাড়ায় তাঁর প্রেস্টিজ বেড়েছে। হাফ প্যান্ট পরে ডাঁটের মাথায় আজকাল রাঙঝালের দোকানে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক কোনো কথা উঠলে মামার মতামত পাড়ার লোকেরা এবং দোকানদাররা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বলে, "বেশি বাক্‌তাল্লা মারিস না। তোদের তো খবরের কাগজ-পড়া বিদ্যে, আর নগেনদার নিজের ভাগ্নে বিলেতে থাকে।"

নতুন যারা পাড়ায় এসেছে তারা অবাক হয়ে যায়। অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। মামা তাদের দিকে অবহেলা ভরে তাকিয়ে থাকেন। অন্য লোকরা বলে, "কোথায় খাপ খুলছো? ইংরেজের সঙ্গে কুটুম্বিতে রয়েছে দাদার। বেয়াই-বেয়ান সব তো সায়েব।" মামার সগর্ব গাম্ভীর্য লোককে বুঝিয়ে দেয় কথাগুলো মিথ্যে নয়।

পটলদার আসন্ন ভ্রমণ সম্পর্কে খবরটা রটবার পর ন্যাপা দাস জানতে চাইলো, "ওরে নগেন, তোর মেমসায়েব ভাগ্নী-বৌ এলে করবি কী?"

বিড়িতে টান দিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মামা উত্তর দিয়েছেন, "আমার তো সায়েবদের সঙ্গে ইংরিজি বলার অভ্যাস রয়েছে। বার্ন কোম্পানির ফেটিস সায়েবদের কাছে একবার চাকরির জন্য ইনটারভিউ দিয়েছিলাম। চাকরি পাইনি বটে, কিন্তু শ্লা সায়েবের সঙ্গে পাঁচ মিনিট হুড় হুড় করে ইংরিজিটা প্র্যাকটিশ করে নিয়েছিলাম। মুশকিল আমার দিদির। বাবার আদর পেয়ে ফার্স্টবুকটা পর্যন্ত শেষ করেনি। এখন আমাকেই হেপা সামলাতে হবে। দিদিকে বার বার বলছি, দু'চারটে

ইংরিজি কথা অভ্যেস কর, কিন্তু দিদির সময় হচ্ছে না!"

মামা ইতিমধ্যেই কারণে-অকারণে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার শুরু করেছেন। সে সব অপপ্রয়োগ নিয়ে আবার অনেকে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। মামা হাপর দিয়ে হাওয়া করতে করতে দোকানের কর্মচারী ভজা এবং চাঁদুকে বলেছেন, "খাস সায়েবরা ব্লাডি কথাটা খুব ব্যবহার করে, বুঝলি। ফেটিস সায়েবের সঙ্গে আমার পাঁচ মিনিট কথা হয়েছিল। তার মধ্যেই দশ-এগারোবার ব্লাডি কথাটা বলেছিলেন। আর আমাদের বাঙালিবাবুদের ইংরিজি শোনো, যেন মিওনো পাঁপড়। বোতল থেকে সোডা ঢালার মতো সায়েবদের ইংরিজি বক বক বেরিয়ে আসে—তাতে কত তেজ থাকে!"

নগেন চোংদার আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। বললেন, "বৌমা তো আসছেন, কিন্তু কোথায় রাখা হবে? আমরা কী হোটেল ভাড়া করবো?"

"হোটেলে কি থাকতে চাইবে?" আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। "তাছাড়া ইংরেজদের রাখবার মতো হোটেল এ-অঞ্চলে কোথায়?" আমি বুদ্ধি দিলাম, "বরং বড় রাস্তার ওপর একটা ছোটখাট পাকা বাড়ি যদি পেয়ে যান তাই ভাড়া করে রাখুন।"

কিন্তু পরে খবর পেলুম ঘর ভাড়া হয়নি। পটলদার মতামত চেয়ে মামা চিঠি লিখেছিলেন, তিনি বউ-এর পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং এডিথ সোজা জানিয়ে দিয়েছে, "তুমি যে-বাড়িতে জন্মেছো এবং বড় হয়েছো, যেখানে তোমার মা রয়েছেন আমি সেখানেই থাকবো।"

পটলদাও আমাকে লিখেছেন, "হাওড়ায় হাজির হবার জন্যে এডিথের ভীষণ আগ্রহ। আমি বোঝাচ্ছি—জায়গাটা নোংরা, বাড়িঘরদোর পুরোনো। কিন্তু সে ওসব মানতে চাইছে না। বলছে, তোমার মাকে আনন্দ দেওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ।"

পটলদার মার প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। মামা আগে মাঝে মাঝে দিদির সমালোচনা করতেন, এখন কিছু বলেন না। বাড়িতে সাজ সাজ রব উঠেছে। ঘরের ভিতর মামার নিজস্ব খাটখানা ভাগ্নে এবং বউ-এর জন্যে রাখা হয়েছে। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেদের মামা ঘন ঘন উপদেশ দিচ্ছেন, কখন কী করতে হবে।

দুটি গোপন ব্যাপারে মামা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। একটি বংশের নারায়ণ সম্পর্কে। হাজার হোক সাহেবরা গোরু খায়—সুতরাং ঠাকুরঘরে ঢুকতে দিলে পাড়ায় কথা উঠবে। ইতিমধ্যেই দু'চারজন বৃদ্ধ এ-বিষয়ে খোঁজখবর করতে এসেছেন। মামা ঠিক করেছেন, নারায়ণকে চিলেকোঠার ঘরে চালান করে তালা দিয়ে রাখবেন। তার বদলে কালীঘাট থেকে ঠাকুর-দেবতার ছবি কয়েকটা কিনে এনে ঠাকুরঘরে রাখবেন, তাহলে নতুন বউমা কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি বললাম, "ভাল ব্যবস্থা।" দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও গোপনীয়। টয়লেট পেপার সংক্রান্ত। সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করাই সঙ্গত।

এর পরবর্তী অধ্যায় আমি নানা সূত্র থেকে, এমনকি পটলদার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

এডিথ বিলেত থেকে বেরুবার আগে কয়েকমাস ধরে বাঙালিদের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করেছে। শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর করেছে। এডিথ ঠিক করেছে, স্বামীর মাকে সে অবাক করে দেবে। এমনকি আব্দার করেছে, এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পর্যন্ত সে খালি পায়ে যাবে, যেমনভাবে নববধূরা প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসে।

পটলদা খুব উৎসাহ দেখাননি। বলেছেন, "ওখানে মানুষের জীবন বড় কষ্টের। রাস্তায় তোমার পা কেটে যেতে পারে।" এডিথ কথা কানে তোলেনি, বলেছে, "কষ্টকে আমি অত ভয় পাই না। সবরকম কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি।" পনেরো বছর আগেকার চৌধুরীবাগান এবং সেখানকার অবস্থা পটলদার চোখে সামনে ভেসে উঠেছে। তবে আশা করেছেন, এতোদিনে নিশ্চয় অনেক উন্নতি হয়েছে। এডিথ অতটা খারাপ অবস্থা দেখবে না।

এডিথ পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করা শিখেছে। বাঙালি পরিবারে গিয়ে মাথায় সিঁদুর পরা অভ্যাস করেছে। বলেছে, কলকাতা এয়ারপোর্টে নেমেই আমাকে এক্‌জোড়া শাঁখা কিনে দেবে। শাড়ি তো এখান থেকেই নিয়ে যাচ্ছি। বিব্রত বোধ করেছেন পটলদা। কিন্তু এডিথ এটাকে নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের মতো নিয়েছে—সে স্বামীকে এবং তার মাকে

অবাক করে দিতে চায়।

এডিথ জিজ্ঞেস করেছে, "অন্য দেশের মেয়ে বিয়ে করলে, তোমাদের দেশের মায়েরা কষ্ট পান কেন?" পটলদা কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

পটলদার চোখের সামনে বিধবা মায়ের বিষণ্ণ ছবিটা ভেসে উঠেছে। পনেরো বছর পরে আবার দেখা হবে। এতোদিনে মায়ের কত না পরিবর্তন হয়েছে। মায়ের প্রতি স্বামীর দুর্বলতার কথা এডিথের অজানা নয়—এর জন্যে এডিথ রাগ করে না, বরং পটলদাকে শ্রদ্ধা করে। পটলদা সে সম্বন্ধে মাথা ঘামান না, তবে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে করেন। মায়ের জন্যে যা তাঁর করা উচিত ছিল তা যে পারেননি বা করেননি, সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মায়ের একমাত্র সন্তান না হলেই যেন ভাল হতো, মনে হয় পটলদার।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য এবং কলকাতা শহরের অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এডিথ শুনেছে। কিন্তু এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বেচারার স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। দমদম থেকে বেরিয়ে হাওড়ায় আসতে আসতেই বেচারা ক্রমশ সিঁটকে উঠছিল। যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়ের উল্টো হাঁটতে হাঁটতে সে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে এসেছে। বিরাট বিরাট খে নর্দমা দেখে এডিথ চমকে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল ভেনিসের মতো খাল, কিন্তু বুঝতে পেরে আঁতকে উঠেছিল। পৃথিবীতে এখনও যে এমন নর্দমা থাকতে পারে তা তার কল্পনাতীত।

পটলদাব আশা ভঙ্গ হচ্ছে। সেই যে তিনি চলে গিয়েছিলেন, তারপর এই পনেরো বছর ধরে এদেশের কেউ বোধ হয় একবারও বাড়িতে রঙ লাগায়নি, এমনকি দরজা-জানলার ধুলো ঝাড়েনি। পটলদার মনে হলো, এর জন্য দারিদ্র্যকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। কারণ এইসব নোংরা বাড়ি থেকে দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছে। রাস্তার জঞ্জাল সাফ করবার জন্যে তো বিদেশি মুদ্রার দরকার হয় না। বেকার লোকেরও তো অভাব নেই।

নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পটলদাকে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হলো। এবার হাঁটার পালা, কারণ সরু গলিতে ঢোকবার উপায় নেই। খালি পায়ে বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন পটলদা। এডিথও রাস্তার অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো।

এডিথ এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল, এবার সে ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। বিরাট নর্দমার ধারে বসে ছোট ছেলেরা প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। তার পাশেই দুটো তিনটে ঘেয়ো কুকুর গা চুলকোচ্ছে। বাড়িগুলোর পাঁজরা বার করা দেওয়ালের বালি খসে পড়ে বীভৎস নোনাধরা ইটগুলো দেখা যাচ্ছে। অদূরেই ঘোষের খাটাল। সেখানে গোয়ালারা মশা তাড়াবার জন্যে ভিজে খড়ের ধোঁয়া দিচ্ছে। খাটা পায়খানার পিছন-দরজা খোলা রয়েছে। সেখানে মাছি ভনভন করছে।

পটলদা বুঝতে পেরেছেন, এডিথ চাইলেও বেচারাকে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু এডিথ তখনও মুখে সাহস দেখাচ্ছে।

পাড়ায় ইতিমধ্যে খবরটা প্রচারিত হয়েছে। গোটা পঞ্চাশেক ছেলে এবং বউ তখন পটলের মায়ের বউকে দেখবার জন্যে বিদেশিনীর পেছনে পেছনে চলতে আরম্ভ করেছে। ভয় পেয়েছিল এডিথ—কিন্তু পটলদা সাহস দিলেন, "কোনো ভয় নেই, এরা নতুন বউ এলে এভাবেই কৌতূহল দেখায়।" "তোমাদের দেশে বউরা তো মুখ দেখায় না," এডিথ জিজ্ঞেস করেছে। পটলদা বললেন, "পর্দার দেশেও নববধূর আব্রু নেই, সবাই তাকে দেখতে পারে।"

কাদা প্যাচপেচে এবড়ো-খেবড়ো সরু গলির মধ্যে দিয়ে আরও কয়েকটা পাক খেয়ে পটলদা নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পটলদার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। এডিথকে আঙুল দিয়ে দেখালেন, "ওই বাড়িতেই তোমার স্বামী জন্মেছিল। জরাজীর্ণ বাড়িটা যারা কিনেছে তারাও রং করেনি।" পটলদা সরল মানুষ কোনো কিছু চেপে রাখেন না। বললেন, "এই বাড়ি বন্ধক দিয়ে আমি বিলেতের টিকিট কিনেছিলাম।"

বাড়িটার পাশেই একখানা টিনের ঘর রয়েছে। সেই ঘরে পটলদার মা থাকেন। এই সম্পত্তিটুকুই পটলদা শুধু নষ্ট করে যাননি।

মা কিন্তু আজও বেরিয়ে এলেন না। ঘরের কোণে আগের মতোই ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "মা," এই বলে পটলদা সজল চোখে এগিয়ে গেলেন। মামা বললেন, "দেখছিস কি দিদি? বউমাকে বরণ করে তুলে নে।"

দুধে-আলতা রংয়ের ফুটফুটে বউ দেখে পাড়ার সবাই অবাক। মেয়েরা তখনই বলেছে, "আহা কি রকম পাতলা চামড়া দেখো। মনে

হচ্ছে এখনই যেন ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুবে। চুলগুলি অমন সোনালী কেন? মেমদের চুল অমন হয় বুঝি!" এর আগে এ-পাড়ার কেউ জলজ্যান্ত মেম দেখেনি। মামা ক্যালেন্ডারে মেমদের ছবি দেখেছেন, এবার ভাগ্নে-বউ দেখে বুঝলেন ছবিতে যা কিছু দেখা যায় তা মিথ্যে নয়।

মামা দুজনকে আশীর্বাদ করে এডিথকে ইংরেজি বললেন, "এই তোমার মা।"

'ইয়োর মাদার' কথাটা শুনে এডিথ ঠিক বুঝতে পারছিল না। পটলদা ফিসফিস করে বললেন, "শাশুড়িকে এখানে মা বলে।"

এডিথের তাতে মোটেই আপত্তি নেই। মাথা নিচু করে সে পটলদার মায়ের দিকে এগিয়ে গেলো। মা বহুদিন পরে হারানিধি ফিরে পেয়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

এরপর হঠাৎ মায়ের শরীর খারাপ হলো। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। মেঝেতে শুয়ে পড়তেই মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাড়ার দর্শনার্থীরা তখন বাড়ির উঠোন বোঝাই করে ফেলেছে। ঘরের মধ্যেও কয়েকজন ঢুকে পড়েছে।

মামা চিৎকার করে উঠলেন, "তোমরা এখন যাও দিকি বাপু। মেম-বউমা কিন্তু আজকেই হাওড়া ছেড়ে বিলেত চলে যাচ্ছে না। অনেকদিন থাকবে।"

শাশুড়িকে অচৈতন্য হয়ে পড়তে দেখে এডিথ দ্রুত মেঝেতে বসে পড়লো। তারপর তাঁর সেবা আরম্ভ করলো। ব্যাগ থেকে কী সব শিশি বার করে মায়ের সামনে রাখলো।

মা এবার চোখ মেলে তাকালেন। তিনি আবার উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এডিথ সস্নেহে তাঁকে বাধা দিলো। দুজনে কেউ কারো কথা বোঝে না। কিন্তু মুখের ভাবেই পরস্পরকে বুঝতে পারছে তারা। মা পরম স্নেহে তাঁর একমাত্র সন্তানের বধূকে দু'চোখ দিয়ে দেখছেন। আর এডিথ এই অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধ পরিবেশের কথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আছে যিনি অনেকদিন আগে তার প্রিয়তমকে পৃথিবীতে এনেছিলেন এবং প্রবাসী সন্তানের প্রতীক্ষায় যিনি পনেরো বছর অপেক্ষা করছেন।

এডিথ এবার পরম স্নেহে আমোদিনীর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কাপড়ে সামান্য অডিকোলন ঢেলে নিলো। তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সমস্ত পাড়াতে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। লোকে ভেবেছিল, মেম-বউমা নাক বেঁকিয়ে থাকবে, শাশুড়ির দিকে ফিরেও তাকাবে না, স্বামী বেশী মাতৃপ্রেম দেখালে তার লাগাম ধরে টান দেবে। কিন্তু তা তো নয়ই, বরং মেম-বউ মেঝেতে বসে শাশুড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো।

আমোদিনীর সমবয়সিনীরা পরের দিন ভোরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

রাতারাতি পটলদার মা বিশেষ সম্মানের পাত্রী হয়ে উঠেছেন। আগে যখন জল আনবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কলের সামনে তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন অন্য বধূরা পাত্তাই দিতো না। এখন সবাই তাঁকে বেশ একটু হিংসে করতে আরম্ভ করেছে।

গবার মা এসে আমোদিনীকে বললেন, "ঠাকুরকে এতো ডেকেছিস, তা কখনো মিথ্যে যায়? তোর ভাগ্য, এমন সোনার চাঁদ ছেলে পেটে ধরেছিস। আর বউ! এ তো গল্প-কথার মতো। জাত গোত্তর কোষ্ঠী মিলিয়ে, বংশ দেখে বউ তো এনেছিনু আমি—এখন সে-মাগীর পা টিপলে ভাল হয়। আর খাঁটি মেমসায়েব বউ তোর পা টিপছে—এ-দৃশ্য বাইসকোপে তুলে লোককে দেখালেও বিশ্বেস করবে না।"

মামা বললেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন বেঁচেবর্তে থাকুক।"

এরপর দর্শনার্থীদের লাইন পড়ে গেলো। তারা একবার শুধু নিজের চোখে দেখতে চায়, মেমসায়েব বউ শাশুড়ির পদসেবা করছে।

আমোদিনী দেবী তবু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছেন না। কথা ক্ষমতা তিনি যেন সারাজীবনের মতো হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি শুধু একভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে।

মামার বাড়িটা পটলদা খুঁটিয়ে দেখেছেন। খাটা পায়খানার একটা দরজা পর্যন্ত নেই। সেখানে আব্রুরক্ষার জন্যে একটা চটের থলে টাঙানো রয়েছে। বিরক্তিতে মন ভরে উঠলো পটলদার, এরা একটু পাল্টালো না।

এরা কী করে পশুর মতো জীবনযাপন করছে? পটলদার লজ্জা লাগছে, এডিথের কাছে তিনি অকারণে ছোট হয়ে যাচ্ছেন। মামা বড় বড় কথা বলছেন, মাছ মাংস আনাচ্ছেন, বাড়িতে রেডিও বাজাচ্ছেন—কিন্তু খাটা পায়খানার একটা দরজা লাগাবার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু পরমুহূর্তেই পটলদার মনে পড়ে গিয়েছে, মামা তবু এতোদিন মাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই ভাঙা পায়খানা এবং বে-আব্রু কলঘর ব্যবহার করেই পটলদা জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়েছেন। মামা তবু বোনকে দেখছেন, কিন্তু পটলদা তো এদের জন্যে কিছুই করেননি, বরং বাড়ি বন্ধক-দেওয়া টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়েছেন।

রাত্রে শোবার ঘরে স্বামীকে একলা পেয়ে এডিথ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। এমন পরিবেশে মানুষ বছরের পর বছর বিনা প্রতিবাদে বিনা বিপ্লবে থাকতে পারে তা তার অকল্পনীয় ছিল। সে হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু স্বামীর মনোকষ্টের কথা ভেবে সাহস পাচ্ছে না।

এডিথের পক্ষে এখানে থাকা যে অসম্ভব তা বুঝতে পারছেন পটলদা। তাঁকে কিছু করতেই হবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলছে, তোমার মাকে এই পরিবেশে এতদিন ফেলে রাখতে তোমার তো দ্বিধা হয়নি।

কী বলবেন পটলদা?

"এডিথ, তুমি কি সকালেই চলে যেতে চাও?" পটলদা জিজ্ঞেস করলেন।

এডিথ কিছু বলে না। শুধু কাঁদছে। মানুষ যে এমন পরিবেশে থাকতে পারে, স্বামী যে নিজের মাকে এমন পরিবেশে এতোদিন রেখেছে তা সে ভাবতে পারছে না।

"এডিথ, চুপ করে রইলে কেন? কথা বলো।"

স্বামীর গায়ে হাত রেখে এডিথ বললো, "তোমার মা কষ্ট পান এমন কিছুই আমি করতে চাই না।"

মা কিন্তু চরম অভিমানেই যেন এই ভয়াবহ পূতিগন্ধ পরিবেশে পড়ে রয়েছেন। পটল হাজরাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই চৌধুরীবাগানের এই অঞ্চলটা যেন এখনও পৃথিবীর বুকে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

পটলদা নিজের অজান্তে মহা বিপদে পড়লেন। একদিকে মা, অন্যদিকে এডিথ—এদের মধ্যে সাত সমুদ্রের দূরত্ব। যেখানে যেমন, সেখানে তেমনভাবে পটলদা মানিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এরা দু'জন কেবল পটলদার মুখ চেয়ে কি কাছাকাছি আসতে পারবে?

পরের দিন এডিথের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মশার কামড়ে সমস্ত দেহে লাল-লাল ডুমো-ডুমো দাগ বেরিয়েছে। আমোদিনী ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি পুত্রবধূর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। এই পরিবেশ বিদেশি বধূর যে সহ্য হচ্ছে না তা তিনি আন্দাজ করতে পারছেন।

পটলদা পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে এডিথকে বললেন, "এক সময় মায়ের পাশে না শুলে আমার ঘুম আসতো না। মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।"

এডিথের মনে হলো পটলদা তার অনুমতি ভিক্ষা করছেন। বললেন, "তুমি মায়ের কাছে গিয়ে অবশ্যই শুতে পারো।"

রাত্রে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে পটলদা ডাকলেন, "মা।"

"কে? খোকা?" মা একবার তাকিয়ে বললেন। "বউমা একলা থাকতে ভয় পাবে না?" ছেলেকে ফিরে যেতে বললেন আমোদিনী।

পটলদা বললেন, "ওদেশের মেয়েরা অনেক শক্ত হয়, মা।"

মা কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু পটলদার মনে হলো, কথাটা বোধ হয় সত্যি নয়—তাঁর মায়ের মতো নীরবে এতো কষ্ট সহ্য করবার মতো শক্ত মেয়ে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে জন্মায় না।

"মা, তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে না?" পটলদা মায়ের খুব কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন, "তোর মনে আছে? আমি পিঠে হাত না বুলিয়ে দিলে তোর ঘুম হতো না?"

"মা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?" পটলদা একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছু বলবি?" মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"এই নোংরা ভাঙা বাড়িতে এই অবস্থায় তোমাকে রাখতে আমার

একটুও ইচ্ছে করছে না।"

পটলদার কথা মা বুঝতে পারলেন না। এই পরিবেশ তাঁর কাছে তো অসহ্য হয়ে ওঠেনি—এইখানেই তো জীবন কাটলো। এর থেকে ভাল কিছুর সঙ্গে তাঁর তো পরিচয় নেই।

"মা কিছু বলো," পটলদা কাতরভাবে অনুরোধ করলেন।

"বেশ তো আছি। কোন অভাব নেই। তুই টাকা পাঠাচ্ছিস।" মা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বললেন। কোনো কিছুর বিরুদ্ধে মায়ের যেন অভিযোগ নেই। ছেলেবেলায় স্বামী হারিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে যাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, যার কাছে আশা করেছিলেন—সে ফিরে আসেনি। মায়ের কথাতে তবু কোনো দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছে না।

"মা, আমি ঘুমোই?" পটলদা জিজ্ঞেস করলেন।

মাঝরাতে একবার যখন ঘুম ভাঙলো পটলদা দেখলেন, মা তখনও হাতপাখা নেড়ে চলেছে একভাবে, আর ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

পটলদা বললেন, "মা ঘুমোওনি?"

"এবার ঘুমবো," মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন।

পটলদার ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এই নরককুণ্ডে মায়ের জীবনটা তিনি নষ্ট হতে দিয়েছেন। মাকে তিনি সুখ দিতে পারেননি, কাছাকাছি থেকে দুঃখও ভাগ করে নিতে পারেননি। পটলদা ভাবছেন মাকে বলবেন, "বিশ্বাস করো মা, তোমার কথা একদিনের জন্যে, একমুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি। কিন্তু সুযোগ পাইনি। এখানে চাকরি নেই। ওখানে এতোদিন সংগ্রাম ছিল, এখন ততটা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি হাজার হাজার মাইল উড়ে চলে আসতে পারি না।"

এডিথকে দিয়ে পটলদা মাকে বলিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যেতে। মা কোনো উত্তর দেননি, শুধু হেসেছেন। এ-হাসির কী অর্থ এডিথ বুঝতে পারেনি। কিন্তু পটলদা একটা অর্থ করেছেন। পটলদার মনে হলো, মা জানতে চাইছেন, পটল এখন কার? তাঁর? না বিদেশি একটা মেয়ের? যার ঘরে-ফেরার জন্যে পনেরো বছর ধরে তিনি অপেক্ষা করেছেন, তাকে হারিয়েও মনের দুঃখ প্রকাশ করতে চাইছেন না চিরদুঃখিনী মা।

পরের দিন অবস্থা আরও ঘোরতর হলো। এডিথের প্রবল জ্বর এসেছে। মশা-কামড়ানো ডুমোগুলা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। জ্বরের

ঘোরে এডিথ ভুল বকছে, যার ভাষা এ-বাড়ির কেউ বুঝতে পারছে না। এডিথ স্বামীকে বলছে, "এ-আমায় কোথায় নিয়ে এলে তুমি?"

ডাক্তার এলো। তিনি বললেন, "এখানে রাখবেন না। সোজা বিলেত থেকে এনে এইখানে তুললেন কী করে আপনি?"

নিজের অজান্তে ডাক্তার একটা অস্বস্তিকর সমস্যার সহজ সমাধান করে দিলেন। পটলদা বুঝলেন এপার ওপার দু'পারকে একসঙ্গে ভালবাসা তাঁর মতো অভাগার পক্ষে বিলাসিতা।

লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদলেন পটলদা। তারপর মাকে বললেন, "মা, তুমি তা হলে যাবে না?"

নিস্তব্ধতার মাধ্যমেই মা জানিয়ে দিলেন তিনি যেতে পারবেন না। আমোদিনী, বোধহয় বুঝতে পারছেন, পুত্রবধূ তাঁকে স্বীকার করলেও স্বামীর অতীতকে গ্রহণ করতে পারছে না।

"মা, কিছু বলো," পটলদা আবার কাতর অনুনয় করলেন।

মা মেঝের ওপর শুয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিছুই বললেন না। এডিথ নিজেও কত অনুনয় করলো, আমোদিনী কোনো উত্তর দিলেন না।

মায়ের পদধূলি নিয়ে পটলদা বললেন, "ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো। এডিথ এখানে থাকলে শক্ত রোগে পড়ে যেতে পারে।"

মা ছেলের সঙ্গে একমত হলেন। ছেলেকে বললেন, "ডাক্তারের অবাধ্য হতে নেই। সবার সব পরিবেশ সহ্য হয় না, খোকা।"

"মা আশীর্বাদ করো। এবার তবে আসি," পটলদা ও এডিথ দু'জনে বিদায় নেবার আগে মাকে প্রণাম করলো।

পটলদা ভেবেছিলেন, তাঁর জন্মদুঃখিনী মা এবার অন্তত সন্তানকে কিছু বলবেন। অনেকক্ষণ নীরবতার পরে মা শুধু বললেন, "এসো।"

আমোদিনীকে শান্ত দেখাচ্ছে—তাঁর চোখে জল নেই। কিন্তু পটলদা জানেন, এখন থেকে জীবনের শেষ ক'টা দিন প্রত্যেক রাত্রে মা অনেকক্ষণ ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবেন।

[গ্রন্থসূত্র
যেখানে যেমন]

সুবর্ণরেখার স্বামী

প্রাণের এতো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পটলদা কেন এডিথ ও আমোদিনীকে কাছাকাছি রাখতে পারলেন না? কেউ কেউ বলেছে, স্রেফ স্বার্থপরতা। এডিথ মুখে যতই মিষ্টি কথা বলুক, শাশুড়িকে সে ভারতীয় পদ্ধতিতে ভালবাসবে কেন? আমার পরিচিত এক বন্ধু বলেছিলেন, "স্রেফ স্যানিটারি কারণেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভব হলো না। ইন্ডিয়ানদের নোংরামিই এর জন্যে দায়ী।"

সত্যি কথা বলতে কি ইস্ট ইজ ইস্ট ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট এবং পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দিন মিলন হবে না—এই কথাটা পটলদার কোনোদিনই ভাল লাগেনি। পটলদার মতো লিন্ডসে মিল্‌নারও একই স্বপ্ন দেখতো। তার সঙ্গে আমার দেখা যদিও মার্কিন মুলুক থেকে ফেরার পরে হয়েছিল, তবু ঘটনাটা এখানেই বলে রাখা ভাল।

মার্কিন দেশ থেকে ফেরবার বেশ কিছুদিন পরেই লিন্ডসে বাবাজীবনের নাটকীয় সংবাদ আমার কাছে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছিল।

আমার শ্রদ্ধেয়া তাজুদির কিছু কিছু খবর 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'য় বলেছি, কিন্তু পিসতুতো দিদি ফুলির কথা লেখা হয়নি। ফুলিদি অর্থাৎ মিসেস ফুল্লরা মুখার্জী, আমার পিসিমার একমাত্র কন্যা, বর্তমান বয়স সাতচল্লিশ। এই কয়েকদিন আগে শুভেন্দুদার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে।

রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ফুলুদি আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়ালেন। আমার পাতে দই পরিবেশন করতে করতে সুরসিকা ফুলিদি বলেছিলেন, "খুব তো লেখক হয়েছিস, ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প বানিয়ে তাজুদিকে তো ফেমাস করে দিলি। তা আজকের জন্যে কিছু একটা

বিবৃতি দে!"

দ্বিতীয়বার দই চাইতে চাইতে বললাম, "১৯৪৭ সালে আমাদের জীবনে দুটো বড় ঘটনা ঘটেছিল—তোমার বিয়ে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। এই পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা আদৌ ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে, কিন্তু শুভেন্দুদা ও তোমার বিবাহ যে ফলপ্রসূ হয়েছে সে-সম্বন্ধে কোনো মতদ্বৈধ নেই—আমরা তিনটি হীরের টুকরো ভাগ্নে-ভাগ্নী লাভ করেছি!"

শুভেন্দুদা চাকরিজীবনে তেমন কেষ্টবিষ্টু না হতে পারলেও নিজের ছেলেমেয়েদের ভালভাবে মানুষ করেছেন। বড় ভাগ্নে অনিমেষ এখন জার্মানিতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কোম্পানি সরকারী খরচে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। মেজ সুবর্ণরেখা এতো সাবজেক্ট থাকতে ইংরিজি পড়বার জন্যে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে। বাবা-মায়ের চোখের সামনে থাকবার মধ্যে ছোট কন্যা রূপসী—এখন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। পড়াশোনায় তিনজনেই চৌকস। অজস্র ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত করে নির্লজ্জভাবে এরা এতো পদক, পুরস্কার এবং স্কলারশিপ বাড়িতে এনেছে যে, মনোপলি কমিশনের কাছে এই পরিবারের নামে অভিযোগ আনা যায়।

রজতজয়ন্তীর দিনেই ফুলিদিকে আমি বলেছি, "পিসিমার কাছে যতদূর শুনেছি, লেখাপড়ায় তোমার তেমন নজর ছিল না। কিন্তু ছেলেপুলেদের কীভাবে এমন তৈরি করলে?"

"তুই আর চালাকি করিস না। ছেলেমেয়েদের খবরদারি করতে গিয়েই তো হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেলো! এবার যদি একটু হাত-পা ছাড়া হয়ে শান্তি পাই।"

ফুলিদিকে বলেছি, "গভর্নমেন্টের উচিত তোমাকে কোনো কলেজ-হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট করে দেওয়া। নিজের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হলো, এবার পরের ছেলে মানুষ করো।"

এহেন ফুলিদি হঠাৎ আমার কাছে এস-ও-এস পাঠিয়েছেন। রূপসী আমাকে ফোনে জানালো, "মা বলেছে, খুব জরুরী—তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে।"

ফুলিদির সঙ্গে দেখা হলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, ওঁর রান্না

জলখাবার বেশ লোভনীয়।

ফুলিদির ওখানে হাজির হতেই দেখলাম, দিদির মুখ বেজায় শুকনো। সোফার এক কোণে দিদি চুপচাপ বসে আছেন। কোলের ওপর বোনার কাঠি ও উল পড়ে আছে, কিন্তু হাত নড়ছে না। ফুলিদিকে বেকার বসে থাকতে কখনও দেখিনি, সবসময় হাত চলছে, হয় পশম, না হয সেলাই। তাই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

ফুলিদি আমাকে দেখে বললেন, "এলি তাহলে। মায়ের পেটের ভাই নেই, তোরাও যদি না দেখিস।"

ফুলিদির নিজের ভাই নেই বলে চিরকালই একটু দুঃখ। কিন্তু আমরা ফুলিদিকে অ্যাজ-গুড-অ্যাজ নিজের বোন বলেই ব্যবহার করে এসেছি, ভাইফোঁটার দিনে কোনোরকম দয়ামায়া দেখাইনি।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হলো তোমার? গল ব্লাডারের ব্যথাটা আবার চাগালো নাকি? মেডিক্যাল কলেজে জানাশোনা সার্জেন রয়েছে। কতদিন বলছি, চলো দেখিয়ে দিই। দরকার হলে কাটিয়ে নাও।"

ফুলিদি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "যাবো ওখানে, তবে চিকিৎসাব জন্যে নয়, ডেথ সার্টিফিকেট লেখাবার জন্যে।"

হাবভাবে বুঝলাম, ফুলিদির শরীর বেশ ভালই রযেছে, যা খারাপ হয়েছে তার নাম মন।

হুম! অবস্থা সুবিধের নয়। ঘোর দাম্পত্য কলহ তাহলে।

"কবে আমার মুক্তি হবে বলতে পারিস?" ফুলিদি এবার প্রায় সজল চোখে কিন্তু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন।

পরিস্থিতি সংকটজনক। "কিন্তু এতো ঘটা করে বিয়ের সিলভার জুবিলী পালনের পর তো তার ডাইভোর্স করা যায় না। বরং আমার ওখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকো। শুভেন্দুদা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পারবে হাউ মেনি প্যাডিতে হাউ মেনি রাইস!"

ফুলিদি এবার একটু রাঙা হয়ে উঠে আমাকে বকুনি লাগালেন। "তোর মাথায় সব সময় গল্পের প্লট ঘুরছে, পঁচিশ বছর বিয়ের পর ডাইভোর্স হয়ে গেলেই ছোটখাটো বাংলা নবেল হয়ে যায়! তোর জামাইবাবু শুনলে খুব কষ্ট পাবেন। উনি তো সাতেও থাকেন, না, পাঁচেও থাকেন না।"

"তাহলে?" বিব্রত হয়ে আমি এবার নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করি।

সোফায় হেলান না দিয়ে ফুলিদি এবার উঠে বসলেন। নিজের কপালে হাত রেখে বললেন, "কপাল। সন্তান মানেই অশান্তি, এই কথাটা তোর নবেলের কোথাও বড় বড় টাইপে ছাপিয়ে দিস। বাঁজা হওয়া অনেক সুখের, তাদের মুখ পুড়োবার কেউ থাকে না।"

আমার মন অচিরেই জার্মান-প্রবাসী যুবক ভাগ্নে অনিমেষের কাছে চলে গেলো। জার্মান যুবতীরা যে কৃষ্ণবর্ণ ইন্ডিয়ান ছোকরাদের ওপর বেশি প্রসন্ন সে-কথা শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর বইতে পড়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে বহুবার শুনেছি। কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীমান ভাগিনেয় নিজের যে-ছবি পাঠিয়েছে তার এক কোণে নাকি স-সারমেয় এক বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ফুলিদি যে ভয় পেয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের জন্যে পাশের বাড়ি থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস চেয়ে আনিয়েছিলেন সে-খবরও আমার কানে ছোট ভাগ্নী মারফত এসেছিল।

অনিমেষের ব্যাপারটায় আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বললাম, "ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কি খণ্ডাতে পারবে ফুলিদি?"

ফুলিদি যেন একটু চাঙ্গা হলেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "তা সত্যি। ইস্কুল ম্যাগাজিনে লেখার জন্যে মামা তোর কান মলে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভবিতব্য কি আটকানো গেলো? বাপের অতো বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তুই নবেল-নাটকের লাইনেই তো চলে গেলি। আমার ভাগ্যেও যা আছে তাই হবে। কি বল?"

আমি যে ক্রমশ ভুল পথে যাচ্ছি, তখনও না বুঝে আমি বললাম, "অনেকে বলছে, এই মহাকাশচারীদের যুগে সায়েব-মেমসায়েব বাঙালি-অবাঙালি এসব পার্থক্য আর থাকবে না। অনেকদিন আগেই তো কবি আন্দাজ করে লিখেছিলেন, জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

"রাখ রাখ," মুখ ঝামটা দিলেন ফুলিদি। "নাটক-নবেল আর সংসার এক জিনিস নয়। দুনিয়াটা দো-আঁশলায় ভরে যাবে এটা কিছু শুভ সংবাদ নয়।"

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, "অনেক ইন্ডিয়ান যুবক

স্বদেশী যুগে মেম বিয়ে করবার পবিত্র শপথ নিয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, সাদা চামড়া আমাদের ওপর অনেক প্রভুত্ব করেছে, আমাদের দাস বানিয়ে রেখেছে—ঠিক হ্যায়, আমরাও প্রতিশোধ নিচ্ছি, মেম বিয়ে করে তাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাবো।"

"সে তো তবু ভাল ছিল!" কাঁদো কাঁদো হয়ে ফুলিদি বললেন, "পুরুষমানুষ যা করে তাই মানিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েদের সব মানায় না।"

"কী হলো তোমার?" আমি ফুলিদিকে একটু ঠেলা দিলাম।

চোখের জল ফেলে ফুলিদি বললেন, "তোর আদরের ভাগ্নী, অত বই ঘেঁটেঘুঁটে যার নাম রেখেছিলি সুবর্ণরেখা, সে-ই এবার বংশের মুখ ডোবাতে বসেছে। ম্লেচ্ছ বিয়ে করে সে এবার সায়েবের এঁটো বাসন মাজবে।"

বেশ একটু ধাক্কা খেয়েও ফুলিদিকে বলতে গেলাম, "বিদেশে এখন দিন কাল পাল্টেছে, বউদের আর বাসন মাজতে হয় না, এ কাজটা স্বামীরাই সেরে নেয়।" কিন্তু ফুলিদির শোচনীয় মানসিক অবস্থা দেখে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

পরবর্তী খবরাখবর যা পাওয়া গেলো তা সংক্ষেপ করলে এইরকম দাঁড়ায় : সুবর্ণরেখা যাঁকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে তিনি এক আমেরিকান অধ্যাপক। সুবর্ণরেখারই মাস্টারমহাশয়... লিন্ডসে মিল্‌নার। যে মেয়ে এতো শান্ত ও গম্ভীর ছিল, সেক্সপীয়র ও মিল্টন ছাড়া যার মাথায় কিছুই ঢুকতো না, সে-ই যে প্রজাপতির শরনিক্ষেপ করে সায়েব মাস্টারের মাথা ঘুরিয়ে দেবে এটা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না।

চোখের জল মুছতে মুছতে ফুলিদি আমার জলখাবার তৈরি করবার জন্যে রান্নাঘরে চলে গেলেন। যাদবপুরের হবু ইঞ্জিনীয়ার রূপসী মুখার্জী এবার বয়লার সুট পরে কলেজ থেকে ফিরলো।

"এ কি ড্রেস তোর!" আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

"মামা, একটু প্র্যাকটিক্যাল হও। শাড়ি পরে ওয়ার্কশপে কাজ করা চলে না," রূপসী চ্যাটাং চ্যাটাং করে শুনিয়ে দিলো।

"তোর দেখছি আমার ওপর বেজায় রাগ।" আমি অভিযোগ করি।

"রাগ হবে না? না হয় বানিয়ে বানিয়ে গাঁজাখুরী গল্প লেখো, তা বলে ঐরকম একটা বিদিকিশ্রী নাম আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে?"

"নামটা খারাপ হলো! তুই হবার পরে, পুরো দুদিন আমি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান ঘেঁটে নামটা পছন্দ করেছিলাম!"

"কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!" রূপসী তড়বড় করে উঠলো।

"কোন ছোঁড়া বলেরে—?" আমি চ্যালেঞ্জ করি।

"ক্লাসের ছেলেরা আড়ালে যা বলে তা শুনলে তুমি ছেলেমেয়েদের নাম বিলোনো ছেড়ে দেবে। বুঝলে মামা? তারা আমাকে ডাকে, উপোসী!"

আমি উত্তর দিই, "তাই বল—একটু রোগা বলে রসিকতা করে। হাজার হোক যাদবপুর এখনও মফস্বল। ওরা জানে না রোগা স্লিম মেয়ে ছাড়া আজকাল বিলেত আমেরিকায় কেউ বিয়ে করতে চায় না।"

"মামা, তুমি আমাকে স্তোকবাক্য দিও না। যা বলছো তা যদি সত্যি হতো তা হলে বিদেশে দিদির বিয়ের কথাই উঠতো না।"

সুবর্ণরেখা দেহ এবং স্বভাবে একটু স্নেহময়ী, বিদেশে খাঁটি দুধ মাখনের কল্যাণে একটু ভারাতুর হয়েছে।

দিদির প্রসঙ্গে মায়ের দুঃখের কথা তুলতেই রূপসী সঙ্গে সঙ্গে বোনের পক্ষে সওয়াল শুরু করলো, "বেশ করেছে দিদি। রং যখন কালো, তখন কোনো গুণবান বাঙালি ছোকরার গার্জেন দিদিকে বিয়ে পরীক্ষায় পাস করাতো না।"

"আঃ রূপসী, বাঙালি জাতের সবাই খারাপ নয়," আমি স্বজাতি প্রীতি দেখাই।

"রেখে দাও মামা। তোমরা সাউথ-আফ্রিকানদের থেকেও বর্ণবিদ্বেষী! চেষ্টা করেনি মা? দিদির বিদেশে যাবার আগে তো লুকিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল, আত্মীয়স্বজন সবাইকে পাত্রের কথা বলেছিল। অমন গুণের মেয়ে, ইংলিশে অমন রেজাল্ট, অমন ফ্যামিলি, কিন্তু পেরেছিল সুপাত্র যোগাড় করতে? চামড়া সাদা না হলে বাঙালি মেয়েদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বুঝলে মামা।"

"তোর আর ভাবনা কী? তুই ফরসা," আমি অবস্থা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করি।

রূপসী সে-কথায় কান না দিয়ে বললো, "আমি তো বলবো, দিদি একটা কাজের কাজ করেছে। যেসব ছোকরা এখানে বরফ-সাদা

মেয়েমানুষ চায় তাদের চোখ খুলুক!"

আমি ফুলিদির দিকটা ভাগ্নীর কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। "আমার দিদির দুঃখের কথাটা তোরা ভেবে দেখছিস না। প্রথম মেয়ে বিয়ে দিয়ে মনের মতো জামাই আনবার সাধ থাকবে না?"

"সাধ তো থাকে, কিন্তু মুরোদ কই?" রূপসীর কড়া কথা।

"কিন্তু তা বলে যার-তার সঙ্গে!"

"যা-তা পাত্র তো দিদি পছন্দ করেনি। ভদ্রলোক হারভার্ডের এম. এ, আগে আমেরিকার সেরা ইস্কুলে পড়েছেন। বংশ ভাল, বাবা ডাক্তার, মা জজের মেয়ে—আর কী চাও তোমরা?"

আমি বললাম, "সবই স্বীকার করছি। কিন্তু আমার দিদির দুঃখ তোমাদের বোঝাতে পারবো না। মেয়ে দেওয়া মানেই হেরে যাওয়া—আমাদের কালচারের একটা ক্ষতি। বাইরের কালচার থেকে মেয়ে আমদানি হলে আমাদের লাভ, কিন্তু আমাদের মেয়ে এক্সপোর্ট হয়ে গেলে পুরো লোকসান।"

রূপসী ইঞ্জিনীয়ারিং না পড়ে তর্কশাস্ত্রের ছাত্রী হলে ভাল করতো। একটুও না ভেবে সে উত্তর দিলো, "এসব তুমি পুরনো যুগের কথা বলছো, মামা। এখন মেয়েরা যেখানে যায় সেখানেই কালচারাল কংকোয়েস্ট হয় ; তুমিই লিখেছিলে, লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য প্রাণ দিয়েও যে-আমেরিকাকে হারাতে পারেনি, কয়েক হাজার জাপানী মেয়ে হাসি এবং চোখের ইশারাতে সেই অসাধ্য সাধন করেছে। বিশ্বযুদ্ধ জিতবার ঠিক পরেই অনেক জাত ব্যাটল অফ বেড-এ (বিছানা যুদ্ধে) গোহারান হেরে যায়!"

ফুলিদি জলখাবার হাতে প্রবেশ করলেন। আমাকে বললেন, "তুই আমাকে সুইসাইড এনে দে। খেয়ে আমি সব জ্বালা থেকে বাঁচি।"

"ওকি আনবার জিনিস, দিদি? ওটা করবার জিনিস। তার মালমসলা যোগাড় করে দিলে তুমি বাঁচবে সত্যি, কিন্তু আমরা মারা পড়বো। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে শুভেন্দুদা প্রথমেই আমাকে হাজতে ঢোকাবে।"

আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে ফুলিদি বললেন, "আমার কোষ্ঠী বিচার করে রথীন পণ্ডিত বহুদিন আগেই বলেছিল—সন্তানদের হাতে

এ-মেয়ে অনেক দুঃখ পাবে।”

“কবে বলেছিল?” আমি জানতে চাই।

“কবে আবার? বিয়ের আগে, বাবা যখন কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিলেন, তখন।”

ভাবলাম একবার বলি, জেনেশুনে সেক্ষেত্রে বিয়ে না করাই উচিত ছিল। কিন্তু ফুলিদির যা মনের অবস্থা তাতে টিপ্পনী কাটতে সাহস হলো না।

ভেবেচিন্তে সান্ত্বনা দিলাম, “দুঃখ দেবার জন্যেই তো সন্তান, ফুলিদি। না হলে অত যন্ত্রণা সহ্য করে মাকে ছেলেপুলের জন্ম দিতে হয়?”

ফুলিদি বললেন, “ওসব কথা থাক। সায়েবের গলায় মালা দেবার কী কী বিপদ তুই আমাকে বল তো। মেয়েকে শেষবারের মতো লিখে দেখি।”

আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। বললাম, “মেমসায়েব বিয়ে করার কী বিপদ তা তোমাকে গড়গড় করে বলে দিতে পারি, অন্তত আধডজন অভিযোগ আমার কানে এসেছে। যেমন—প্রতিটি বউ এক-একটি শ্বেত হস্তিনী। ভীষণ কুঁড়ে, ইন্ডিয়ার গরম সহ্য করতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়িদের মুখ দর্শন করতে রাজী নয়, কম পয়সায় সংসার চালাতে পারে না। ঘন ঘন হোম লিভে যাবার জন্যে ব্যস্ত। দুর্জনেরা বলে, বেশির ভাগ মেমের মুখে গন্ধ... কমবয়সে বুড়ি হয়ে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেশী মেয়ের সায়েব জামাই সম্বন্ধে তো কোনো খবরাখবর নেই।”

“আমাকে আর কত জ্বালাবি? মামা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই যেতাম,” ফুলিদি একেবারে কাঁদো কাঁদো।

অগত্যা মাথা চুলকে বললাম, “যে-কোনো পুরুষমানুষকে বিয়ে করবার মধ্যে যে স্বাভাবিক বিপদগুলো রয়েছে সেগুলো সায়েব-স্বামী হওয়ার মধ্যেও নিশ্চয় আছে—যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হওয়া, ছেলেপুলে হয়ে সংসারের খুঁটিতে বেঁধে মার খাওয়া, পয়সাকড়ি নিয়ে খিটিমিটি...”

আরও বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ফুলিদি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, “পঁচিশ বছর স্বামীর ঘর করছি—ওগুলো তোর থেকে একটু বেশিই জানি। তুই শুধু সায়েবদের ব্যাপারগুলো বল।”

বললাম, “তুমি আমার অপরাধ নিও না ফুলিদি, সায়েবরা গোরু খায়,

মদ খায়, পরের বউকে নিয়ে নাচে, মেয়েদের বেশি জামাকাপড় পরা পছন্দ করে না, আর,...” এবার আমি নিজেই একটু সঙ্কোচ বোধ করলাম।

“থামলি কেন? বল।”

“সায়েবরা বিশ্বাস করে না বিয়েটা জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাপার। তাই একটু বেগড়-বাঁই হলে ডাইভোর্স করে দেয়।”

ফুলিদি আঁতকে উঠলেন।

দিদিকে শান্ত করবার জন্যে বললাম, “সায়েব জামাই হলে তোমার হাঙ্গামা অনেক কম। বিয়েতে পাঁচডজন নমস্কারি শাড়ি দিতে হবে না।”

রূপসী হঠাৎ ফোড়ন দিয়ে বসলো, “হিপি জামাই হলে একটা গাঁজার কলকে দিয়ে জামাইষষ্ঠীর দায় সারা যাবে।”

ফুলিদির সঙ্গে এখন রসিকতার সময় নয়। বকুনি দিয়ে রূপসীকে বিদায় করলাম। দিদিকে বললাম, “সায়েব জামাই হলে তোমার খুব সুবিধে। যখন খুশি মেয়ের বাড়িতে উঠে শাশুড়ি-আদর ভোগ করবার অধিকার থাকবে তোমার।”

ফুলিদির এসব কথা ভাল লাগলো না। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেয়ের বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে ফুলিদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তান্ত্রিক জ্যোতিষীর সিঁদুর লাগানো এয়ার লেটার ফর্মে মেয়েকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। মনের মতো ছোকরাটিকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্যে সুবর্ণরেখা যে পুরোপুরি বেঁকে বসেছে সে খবর রূপসীর কাছেই পেয়েছিলাম এবং এসব ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত যা হয় তাই হয়েছিল। সুবর্ণরেখা তাঁর মুখার্জি পদবি হাডসন নদীর জলে ভাসিয়ে মিসেস মিল্‌নার হয়েছিল।

এহেন ভাগ্নীকে যখন আমরা সকলে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছিলাম, তখন রূপসী বেচারার খুব মন খারাপ। মুখে যতই দিদির পক্ষ নেক, দিদি যে শেষপর্যন্ত বাবা মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করার মানসিক দুঃসাহস দেখাতে পারবে তা সে আশা করেনি।

রূপসী আমার কাছে এলে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোর এতো দুঃখ কেন?”

“সে আর তুমি বুঝবে কী করে, মামা। দিদির বরদের নিয়ে আজকাল

বোনেরা কীরকম হৈ-হৈ করে সে খবর তো রাখো না। বাঙালি মেয়েদের জীবনে ওইটুকুই তো রোমান্স।”

তা সত্যি। বেচারা রূপসী কোথায় কোনো রঞ্জিতদা বা সঞ্জীবদার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করবে, সিনেমায় যাবে, রেস্তোরাঁয় খাবে, থিয়েটার দেখবে, তা না দিদি গাঁটছড়া বাঁধলো এক সায়েবের নেকটাইয়ের সঙ্গে।

“হ্যাঁ মামা, বিলেত আমেরিকায় শালীদের কীরকম পোজিসন?” রূপসী জিজ্ঞেস করলো।

“এক কথায় শোচনীয়।”

“শ্যালিকা কী বস্তু তা ওরা বোঝে না?” রূপসী প্রশ্ন করেছে।

“মোটেই নয়। স্ত্রীর সঙ্গে যত মাখামাখি হাসাহাসি করো, দহরম মহরম রাখো—কিন্তু শ্যালিকা নৈব নৈব চ! লোক নিন্দে করবে, স্ত্রীর ভগ্নীকে থিয়েটারে নিয়ে গেলে নানা কথা উঠবে।”

“বা রে! শ্যালিকারা বুঝি মানুষ নয়, তাদের বুঝি জামাইবাবুদের সঙ্গে আউটিং করতে ইচ্ছে হয় না?” বেজায় রেগে উঠলো রূপসী।

“মানুষ তো বটেই—কিন্তু মেয়েমানুষ ; সেইটাই তো যত নষ্টের কারণ।” আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি।

রূপসীর মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে ওঠায় আমাকে উদাহরণ দিতে হলো। বললাম, “অমন-যে-অমন বাঘা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স—শ্যালিকাপ্রীতি ছিল বলে বেচারাকে কত ভুগতে হয়েছিল। কানেকটিকট না কোথায় এই সেদিন পর্যন্ত আইন ছিল, স্ত্রী দেহরক্ষা করলেও স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ চলবে না।”

রূপসী মুষড়ে পড়লো। আমি সহানুভূতি জানিয়ে বলি, “ইন্ডিয়া ছাড়া কোনো দেশের লোক শালীর মূল্য বোঝে না। না হলে পৃথিবীতে এতো দেশ থাকতে শালিবাহন রাজারা ভারতবর্ষে কেন রাজত্ব করতে এসেছিলেন?”

রূপসী যে কিছু ভাবছে তা আন্দাজ করতে পারছি। অগত্যা জানতে চাইলাম, “তুই কি বিদেশে যাবার ফন্দি আঁটছিস? তাহলে দিদির বাড়িতে উঠতে পারবি না। মেয়েদের কোনো ডরমিটরিতে থাকিস, আর একবার ওদের ওখানে সৌজন্য-সাক্ষাৎ বা কার্টসি-কল করিস। তারপর দিদি যদি তোকে কোনোদিন ডিনারে ডাকে, সে আলাদা থাক।”

রূপসী এবার আসল খবরটা ভাঙলো। "দিদি ওই সায়েব ভদ্রলোককে নিয়ে কলকাতায় আসছে।"

"সায়েব ভদ্রলোক নয়, তোমার জামাইবাবু," আমি মনে করিয়ে দিলাম।

"সায়েবকে জামাইবাবু বলা যায় না, মামা," রূপসীর উত্তর।

"তাহলে তোর মা'র অবস্থাটা ভাব। খোদ ইংরেজকে বাবাজীবন বলে বরণ করতে হবে। আদর করে জড়িয়ে ধরে ললাটে স্নেহচুম্বন দিতে হবে।"

ব্যাপারটা আর রসিকতার পর্যায়ে রইলো না। ফুলিদি এতোদিনে শান্ত হয়েছেন। কপালে যখন সায়েব-জামাই হয়েছে তখন কী আর করা যাবে? আমাকে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ হলো। বাড়িতে এখন সাজ-সাজ রব। শোবার ঘরে নতুন ডিজাইনের খাট বিছানা এলো। সেই সঙ্গে কাঁচের থালাবাসন, কাঁটা চামচ ডিস কাপ। সায়েব-জামাইয়ের পান থেকে চুন খসলে যে বিরাট কিছু ঘটবে সবাই তা ধরে নিয়েছে।

আমি আর কী নতুন পরামর্শ দেবো? ফুলিদি জিজ্ঞেস করলেন, "ওদেশে কী ভাবে জামাই আদর করে, বল না বাপু।"

বললুম, "শাশুড়ি-জামাই সম্পর্ক নিয়ে অনেক রসিকতা পড়লেও স্বচক্ষে একটা কেসই দেখেছিলুম। তখন আমি ওমাহার কাছে এক গ্রামে মিসেস ফেনারের বাড়িতে ছিলাম। মিসেস ফেনার একদিন টেলিফোন পেয়ে কার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে, মুখ বেজার করে বললেন, 'আজ আমার জামাই ডিনারে আসছে।' জামাই আপ্যায়নের জন্যে ভদ্রমহিলা এবার উঠে পড়ে লাগবেন ভাবলাম। ও মা, কিছুই করলেন, না, শুধু গুদোম থেকে বাড়তি কয়েকটা আলু এনে সিদ্ধ করতে দিলেন। টেবিলে জিনিসপত্তর সাজাতে সাজাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিসেস ফেনার বললেন, 'আমার জামাই-এর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ডিনার টেবিলে বসে যথেষ্ট খাবার প্রথমেই নিজের প্লেটে তুলে নিও। ছোকরার এতোই লোভ এবং ব্যাড ম্যানার্স যে টেবিলের বারো আনা আলু নিজের প্লেটে তুলে নেবে।'

"আমি তো তাজ্জব। জামাই দুটো আলু খাবে তাতেও শাশুড়ির বিরক্তি। আর আমাদের দেশে 'এটা খাও, ওটা খাও, না হলে মাথা খাও'

বলে শাশুড়িদের কী মিনতি।"

ফুলিদি বললেন, "বাজে বকিস না। সায়েবরা যে সব খাবার খায় সে সব তো রাঁধতেও জানি না। তুই কি হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে দিবি!"

আমি বললাম, "কি বিপদ বল দিকি। ছোকরা ঠিক জামাইষষ্ঠীর দিনেই কলকাতায় অ্যারাইভ করছে!"

ফুলিদি অগত্যা জামাইষষ্ঠীর ব্যবস্থা পাকা করে রাখছেন। শুধু বললেন, "হোটেল থেকে আর যা-ই আনিস, দয়া করে গোরুর মাংসটি নয়। খুকি যে আমাকে কী বিপদে ফেললো।"

রূপসী মুখে যতই তড়বড় করুক, এবার একটু ঘাবড়ে গেলো। আমাকে আড়ালে ডেকে বললো, "একে তো হুড়হুড় করে ইংরিজি বলতে অভ্যস্ত নই, তারপর মা বলছে, আদর আপ্যায়নের ভারটা পুরো আমাকেই নিতে হবে!"

ফুলিদির জামাই যেদিন কলকাতায় পৌঁছলো সেদিন বিশেষ কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়েছিল। দিন পাঁচেক পরে হাওড়ায় ফিরে এসেই ছুটলাম ফুলিদির বাড়িতে। আমাকে দেখেই সহাস্য রূপসী চিৎকার করে উঠলো, "মামা, তুমি এসে গিয়েছো। লিন্ডসেদাকে রোজই তোমার কথা বলছি।"

"বেজায় খুশি-খুশি ভাব দেখছি, ব্যাপার কী?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"দিদির বরটি ভারি ভালমানুষ। নিজেই বলেছেন, লিন্ডসেদা বলে ডাকো।"

জামাই দেখে আমি তাজ্জব। একটি সাদা ধবধবে বিনয়ী ছোকরা, পাঞ্জাবি এবং পাজামা পরে আমাদের ঘরে ঢুকলো। আমি করমর্দন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোকরা ডনবৈঠকের স্টাইলে ঘটাং করে মেঝেতে বসে পরে আমার পদধূলি নিলো।

লিন্ডসে মিল্‌নার মানসনেত্রে যে সায়েবনন্দনের ছবি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে ফুলিদির জামাই-এর একটুও মিল হলো না। অত্যন্ত সৌম্য চেহারা। চোখ দুটি শান্ত—কথাবার্তাও বেশ নম্র। দোষের মধ্যে মাথায় সামান্য একটু টাকের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। আমাদের ভাগ্নীর তুলনায় জামাইয়ের চেহারা কার্তিকের মতো।

জামাই বললো, "আপনাকে যেভাবে শ্রদ্ধা জানালাম তা ঠিক হয়েছে তো।"

"শতকরা ১১০ ভাগ ঠিক হয়েছে," আমি জানাই। "অনেক দিন পরে প্রণাম পেলাম, আজকালকার ছেলেরা ও-পাট তুলে দিয়েছে। বাবা-মা কাউকে প্রণামের হুকুম করলেও বিপদে পড়ে যান ; কারণ আধুনিক ছেলেরা যা টাইট চোঙা প্যান্ট পরে—পনেরো ডিগ্রী বেঁকতে গেলে পিছনের সেলাই কেটে যাবে।"

লিন্ডসে এমনভাবে হাসলো যে বুঝলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করছে না। সে বললো, "ইন্ডিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে ট্রাডিশন একইভাবে চলেছে।"

বেচারাকে কে বলবে, হাজার বছর তো দূরের কথা, দু-তিন মাস অন্তর আজকাল স্টাইলের কায়দাকানুন পাল্টাচ্ছে।

রূপসী এবার আমাকে বিপদে ফেললো। জামাইবাবুকে বললো, "আপনার কোশ্চেনটা করুন। মামা টপ করে উত্তর দিয়ে দেবেন।"

আমার প্রেস্টিজ পাংচার হবার অবস্থা। ছোকরা নোটবই খুলে জানতে চাইলো, সাষ্টাঙ্গ প্রণামের আটটি অঙ্গ কী কী?

এ নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি। আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের এ-বিষয়ে কোনো কৌতূহল নেই। ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতাম বটে ; তবে ঠিক মনে করতে পারছি না।"

রূপসীকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোদের বাড়িতে পুরোহিত দর্পণ, পাঁজি ইত্যাদি কিছু আছে?"

ওসবের বালাই আজকাল কোনো বাড়িতেই থাকে না। মান রক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত অগতির গতি আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আধার খবরের কাগজ আপিসের রেফারেন্স-অফিসার নকুল চাটুজ্যেকে ফোন করলাম।

নকুলবাবু চটপট বললেন, "আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ হলো—শল্য, শলাকা, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণ। আপনি তো গল্প লাইনের লোক? নিশ্চয় অষ্টাঙ্গ মৈথুনের ডিটেল জানতে চান। লিখে নিন—স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি।"

"না নকুলবাবু, এখন আমি গল্প লিখছি না। আমার জামাই-এর একটা

প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে?"

নকুলবাবু হা-হা করে হেসে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন, "জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য এবং দৃষ্টি—এই অষ্টাঙ্গ দিয়ে একসঙ্গে প্রণামের নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।"

লিন্ডসে বললো, "ওয়ান্ডারফুল। একটি প্রণাম মানে সমস্ত দেহ এবং মনের সিমফনি। সাষ্টাঙ্গেব মধ্যে বাক্য, বুদ্ধি এবং দৃষ্টিও রয়েছে।"

আমার কথাগুলো দ্রুত নোটবুকে লিখে নিয়ে সে বললো, "আপনারা সহজেই যা স্মরণ রাখতে পারেন আমি তা ভুলে যাই, কিছু মনে করবেন না।"

রূপসী বললো, "লিন্ডসে দাদাকে একবার সুনীতি চাটুজ্যের কাছে নিয়ে যাবেন? দাদা জানতে চান, এই লিন্ডসে কথাটা বাংলাদেশে বহু ব্যবহারের পর কেমন দাঁড়াবে?"

বললাম, "তোর যদি উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়. লিনড়ুদা বলে ডাক। সুনীতিবাবু এখন কলকাতাব বাইরে ফরেন ট্যুবে রয়েছেন।"

জামাই নিয়ে মাতামাতি করছি, কিন্তু মেয়ের দেখা নেই। রূপসী বললো, "দিদি ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে হেয়ার-ড়ু কবছে অর্থাৎ চুল ছাঁটতে গেছে।"

চুল ছেঁটে সুবর্ণরেখা এবার হাজির হলো। আমদের ভাগ্নীর গায়ের বং যে কতটা কালো তা লিন্ডসে বাবাজীর পাশাপাশি দেখে বুঝতে পারলাম।

নাইলনের টাইট প্যান্ট পরা একটা অদ্ভুত ড্রেস করেছে সুবর্ণরেখা। চুল ছেঁটে পুরোপুরি মেমসায়েব হবার চেষ্টা করছে সে।

সুবর্ণরেখা বললো, "কলকাতার দোকানগুলো একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে, মামা। ফেসিয়াল মাসাজ কাকে বলে জানেই না—চীনে মেয়েটা আমার মুখ খামচিয়ে দিলো।"

রূপসী বললো, "জানো মামা, কালকে যা হলো, গ্রেট! আমরা পার্ক স্ট্রীটের ম্যাড হাউসে গিয়েছিলাম। ডিসকোথেক-এ দিদির সঙ্গে লিন্ডসেদাকে দেখে ওখানকার বহু দিশি তো ট্যারা! গান না শুনে আড়চোখে শুধু লিন্ডসেদার দিকে তাকাচ্ছে—একেবারে লালা পড়ছে যাকে বলে! দিদিকে ওরা যে কী হিংসে করছিল তোমায় কী বলবো।"

সুবর্ণরেখা মিটমিট করে হাসলো। "সত্যি মামা, পার্ক স্ট্রীট পাড়ার ইন্ডিয়ান মেয়েগুলো সায়েবদের জন্যে পাগল। লন্ডনের কুলি পেলেও বিয়ে করে ফেলতে পারে!"

রূপসী বললো, "আরও কিছুক্ষণ থেকে মজাটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লিন্ডসেদার ওসব নাচগান ভাল লাগে না। আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।"

"ওর কথা ছেড়ে দাও, সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। বলে কিনা, জেনুইন সায়েবী চালচলন নাকি এখন ক্যালকাটা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না!"

হাজার হোক সম্পর্কে শ্বশুর, তাই সায়েব-জামাইকে শ্যালিকার হাতে সমর্পণ করে আমি ফুলিদির কাছে এলাম। রান্নাঘরে বসে ফুলিদি তখন গলদঘর্ম হচ্ছেন।

"তোমার তো হোটেল থেকে খাবার আনবার কথা ছিল?" ফুলিদিকে আমি জিজ্ঞেস করি।

একগাল হেসে ফুলিদি বললেন, "এ-জামাই আগের জন্মে ভাটপাড়ার বাউন ছিল। পেঁয়াজ পর্যন্ত খায় না। আমাকে দু'বার করে রাঁধতে হচ্ছে। আমার মেয়েদুটির তো পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মুখে কিছুই রোচে না! সারাজন্ম ওদের টেবিল চেয়ারে খাওয়া অভ্যেস, এখন জামায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী সবাইকে মেঝেতে বসে সাবেকী কায়দায় খেতে হচ্ছে। বাছা আমার কোত্থেকে আচমন পর্যন্ত শিখে এসেছে।"

এরপরে দিদির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। দিদি যে জামাই-এর ব্যবহারে মুগ্ধ তা তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারি।

ফুলিদি আজকে বলেই ফেললেন, "প্রথমে বড্ড ভয় হয়েছিল, কিন্তু খুকি ছেলে পছন্দ ভালই করেছে। বড় বিনয়ী, আমার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলা ছাড়া কথাই বলবে না। দুজনের যে বেশ মনের মিল রয়েছে তাও বুঝতে পারি। খুকির কথার অবাধ্য হয় না। কোথায় কোন শ্লোকে পড়েছে—যে-গৃহে মেয়েদের কথা চলে সেখানে লক্ষ্মী বিরাজ করেন।"

রূপসী বললো, "দিদির তো আজকাল শাড়ি পরতে অসুবিধে হয়—সব সময় স্ল্যাক্স পরে। জামাইবাবু কিন্তু সুটের ধারে কাছে যান

না—পাজামা পাঞ্জাবি এবং চপ্পল পরে বসে থাকেন।”

সুবর্ণরেখা বললো, “এখানে আসবার আগে ও দিনরাত এদেশের সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে। যত বলি, এসব আজকাল ইন্ডিয়াতে চালু নেই, বিশ্বাস করে না। আমাকে জ্বালিয়ে মারে, হাজার রকম প্রশ্ন করে।”

রূপসী বললো, “এপাড়ার অনেক মেয়ে ভাবছে, সায়েব-বর বাগাবার লোভে দিদি নিজে গায়ে-পড়ে অজানা ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে। মোটেই তা নয়। লিন্ডসেদাই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে দিদির কাছে খবারখবর নিতেন। এর আগে কোনো ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়নি।”

জামাই যে ইতিমধ্যেই কিছুটা সংস্কৃত শিখেছে এবং রীতিমতো বাংলা পড়তে আরম্ভ করেছে জেনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ আমার সংস্কৃত বিদ্যে তেমন সুবিধের নয় এবং জামাইয়ের কাছে কোন মামাশ্বশুর বেইজ্জত হতে চায়?

জামাই কিন্তু আমাকে অন্য ব্যাপারেও লজ্জা দিলো। বললো, “একটা মতবাদ আছে যে-নাটক উপন্যাস ছাড়া আর কোথাও দেশের মানুষদের প্রকৃত ছবি পাওয়া যায় না। অধ্যাত্মিক দেশ এই ভারতবর্ষ, যুগযুগান্ত ধরে কত রকমের সাধনা এখানে হয়ে চলেছে। এই কিছুদিন আগেই তো শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ। কয়েকখানা বাংলা উপন্যাসের নাম করুন যেগুলো পড়লে এই স্পিরিচুয়াল ভারত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবো।”

ভেবেচিন্তে খবর দেবো এই বলে আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম। কারণ অধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ কোনো ভালো উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। আজকাল প্রায় সব গল্প-উপন্যাসে স্পিরিটের কথা আছে, কিন্তু সে হলো বোতলের স্পিরিট—দিশি ধেনো থেকে আরম্ভ করে স্কচ হুইস্কি পর্যন্ত। শুধু অধ্যাত্মবাদ কেন, ট্রাডিশনাল ভারতের দর্শন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় না।

লিন্ডসের সঙ্গে যতই আলোচনা করেছি, ততই আমার দুশ্চিন্তা বেড়েছে। বেচারা যে-ভারতবর্ষের খোঁজ করছে কোথায় পাবো তারে? আমরা যে-পরিবেশে জীবন কাটাই সেখানে ওসবের নাম শোনেনি কেউ। ফুলিদি কিন্তু বেজায় খুশি। শুধু মাঝে মাঝে ভয় পান, জামাইয়ের

যা হাবভাব, শেষ পর্যন্ত বিবাগী না হয়ে যায়।

ফুলিদি একদিন টেলিফোন করে বললেন, "শংকর, তুই শুনে খুশি হবি, খুকির বর এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি পাচ্ছে। খুকিও কিছু-একটা যোগাড় করে নিতে পারবে। তাহলে আমার আর দুশ্চিন্তা থাকে না। আমেরিকা কি এখানে! অনেক দূর।"

আমিও আনন্দ প্রকাশ করলাম। কিন্তু তারপর মনে পড়ে গেলো, এর খারাপ দিকও রয়েছে। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, লিন্ডসে বাবাজীবন ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাজারে গেলে লোকে আড়চোখে দেখে, অনেকে সন্দেহ করে। সায়েবরা কুলীর মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করবে, থলি হাতে গড়িয়াহাটায় কেন? পাড়ার চায়ের দোকানে লিন্ডসেকে বসতে দেখলেও লোকে ঘাবড়ে যায়। কারপো এবং ফ্লুরি ছাড়া নাকি সায়েবদের মানায় না। সায়েবরা মোটর না চালিয়ে সাইকেল চড়বে এ-দৃশ্য সুশিক্ষিত ইন্ডিয়ানদের কাছেও অসহ্য। লিন্ডসে যখন সাইকেল চালিয়ে কলেজে যায় তখন পাবলিক ভাবে লোকটা হয় পাগল না হয় স্পাই।

মাঝে মাঝে বারওয়েল সায়েবের কথা মনে পড়ে যায়। সহজভাবে সাধারণের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তিনিও বেশ ধাক্কা খেয়েছেন। উলঙ্গ ভিখিরির ছেলেকে রাস্তায় কাঁদতে দেখে সাযেব একবার তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সেই দেখে রাস্তার অনেকে মন্তব্য করেছিল, সায়েবটা পাগল।

সায়েবের কাছে কয়েকজন ভারতপ্রেমিক বিদেশি আসতেন তাঁদের অবস্থা দেখেও আমার মনে হতো, যে-সব বিদেশি আমাদের জুতোর তলায় রাখে তাদেরই আমরা বেশী সম্মান করি। শ্বেতাঙ্গকে প্রভু ছাড়া অন্য কোন রূপে আমরা এখনও দেখতে শিখিনি। যাঁরা আমাদের সঙ্গে সমভাবে মিশতে চেয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে গিয়েছেন, তাঁরা বিপদে পড়েছেন। নির্লজ্জভাবে আমরা সেইসব উদারপ্রাণ বিদেশীদের কাছে গ্রহণ করেছি এবং প্রতিদানে দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই তাঁদের দিইনি। ডেভিড হেয়ার, সিস্টার নিবেদিতা, দীনবন্ধু এন্ডরুজ থেকে আরম্ভ করে বারওয়েল সায়েব পর্যন্ত অসংখ্য প্রমাণ দাখিল করা যায়। বিদেশে স্বজাতি বড়সায়েবদের সান্নিধ্য হারিয়ে

এবং দরিদ্র ও দারিদ্র্য পরিবৃত হয়ে এঁরা এমন এক বিচিত্র নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন যা সত্যি বেদনাময়। অথচ এঁরা মুখ ফুটে কখনও তা স্বীকার করেননি ; বরং হাসিমুখে স্বজাতির অপকর্মের পাপস্খলনের চেষ্টা করেছেন।

ম্যাক্সমুলার যদি ইন্ডিয়ায় আসতেন তাহলে কত ভোগান্তি তাঁকে সহ্য করতে হতো কে জানে। ইদানীংকালে হিপিদের সম্বন্ধেও আমাদের ঘেন্না, যেহেতু তারা খালি পায়ে নোংরা জামা পরে আমাদেব দেশের কোটি কোটি লোকের মতো অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা যদি অনেক টাকা খরচ করতো, বিরাট বিরাট গাড়িতে ঘুরে বেড়াতো, গ্র্যান্ড গ্রেট ইস্টার্নের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বোতল বোতল হুইস্কি ওড়াতো, তাহলে আমাদের মোটেই আপত্তি থাকতো না। যে-সায়েব রিক্‌শা চড়ে, নিজের মোট নিজে বয়, পাইস হোটেলে ভাত খায় তাদেব সম্বন্ধে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই, তাদের আমরা পছন্দ করি না। কলোনিয়াল যুগে তৈরি সায়েবের ভাবমূর্তির সঙ্গে তারা মেলে না। শ্বেতাঙ্গকে হয় প্রভু না-হয় দেবতা ছাড়া আমরা কল্পনা করতে পারি না।

আমাদের এই অভাগা দেশকে নীরবে ভালবেসে কয়েকজন বিদেশি কীভাবে স্বজাতির বিদ্রূপ এবং আমাদের অবহেলার পাত্র হয়েছেন তা লিপিবদ্ধ করলে মহাভারত হয়ে যাবে। প্রমাণ হবে যে এখনও আমরা সমানভাবে মিশতে শিখিনি।

লিন্ডসে মিল্‌নার সম্বন্ধেও আমার ঐরকম একটা দুশ্চিন্তা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য অধ্যাপনা করে তাকে মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতে হবে। সে নিজে তা বরদাস্ত করলেও, আমরা তা পারবো না। সে আমাদের যত ভালবাসবে আমরা তাকে তত অবহেলা করবো। কিন্তু মুখের ওপর এসব কিছু বলিনি। প্রাণ যা চায় তা করবার স্বাধীনতা ইউরোপ আমেরিকার নাগরিকরা এখনও উপভোগ করেন ; অথচ আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের যথেষ্ট সন্ন্যাসী পাওয়া যায় না। আমাদের ডাক্তাররা বাড়তি টাকার লোভে মার্কিন মুলুকে কিংবা কানাডায় ছোটে, আর কুষ্ঠরোগীর ক্ষত মুছিয়ে দেবার জন্য পুরুলিয়ার হাসপাতালে সায়েব ডাক্তার ও নার্সের অভাব হয় না। পশ্চিমী সভ্যতার এই অন্তর্নিহিত শক্তির দিকটা আমাকে বিস্মিত

করে। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

লিন্ডসে মিল্‌নার এখানে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। ছাত্ররা ওকে নিয়ে রসিকতা করতো। কারণ 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম' কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর ছাত্ররা দিতে না পারলে সে রীতিমতো দুঃখ পেতো। ক্লাসে সে বলতো, "তোমরা নিজেদের আবিষ্কার করো ; আত্মবিস্মৃত জাতি কখনও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে না।"

সৌভাগ্যক্রমে জামাই সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাস কয়েক পরেই শুনলাম, লিন্ডসে মিল্‌নার কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রূপসী টেলিফোনে বললো, "লিন্ডসেদার মোটেই যাবার ইচ্ছে ছিল না। এখানকার বাসে-ট্রামে যা ভিড়, রাস্তাঘাটে যা ময়লা, খাবারে যা ভেজাল তা দিদির পক্ষে বরদাস্ত করা আর সম্ভব নয়। লিন্ডসেদাকে জোর করে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিদি শ্বশুরবাড়ির দেশ নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে।"

[গ্রন্থসূত্র
যেখানে যেমন]

সুচিত্রার সমস্যা

টি-ডবলু-এ বিমানে প্যারিস থেকে প্রায় সাড়ে-আট ঘণ্টা অবিরাম বিমানচারণা করে নিউইয়র্কে পৌছনো গেলো। নিউইয়র্কে কেবল এরোপ্লেন বদল এবং কাষ্টমসের ঝামেলা চুকনোর পালা। আমার গন্তব্যস্থল ওয়াশিংটন, ডিসি।

লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যে-দুর্ব্যবহার পেয়েছিলাম ঠিক তার উল্‌টো পেলাম নিউইয়র্কে। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবরকম বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে মার্কিন মুলুকে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা পাওয়া গেলো। সরকারী অফিসারটি সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শুধু প্রশ্ন করেছিল, আমার কাছে কোনো ড্রাগ আছে কিনা। সঙ্গে কয়েকটা মাথাধরার বড়ি ছিল। সেকথা জানাতে অফিসারটি হেসে ফেললো। বললো, ওগুলো ড্রাগ নয়—মেডিসিন। ড্রাগ বলতে ওখানে গাঁজা সিদ্ধি ইত্যাদি নেশাভাঙের জিনিস বোঝানো হয়ে থাকে।

অফিসারটি আমাকে বুঝিয়ে দিলো কোথায় ওয়াশিংটনের পরবর্তী প্লেন পাওয়া যাবে এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, হ্যাভ এ গুড টাইম ইন আওয়ার কানট্রি!

এই 'গুড টাইম' কথাটা ওয়াশিংটনের প্লেনে চড়েও আমার মাথায় ভন ভন করে ঘুরছিল। মনের খুশীতে সময় কাটাবার উপদেশ বিদেশ যাত্রার আগে মাও আমাকে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, "বেড়াতে বেরিয়ে ঘরের কথা ভেবে মন খারাপ করিস না। যেখানে যেমন দেখবি সব মনে করে রাখবি—তুই ফিরে এলে গল্প শুনবো।"

কিন্তু নদী, পর্বত, সাগর, মহাসাগর পেরিয়ে যতদুরে যাই, ঘরের কথা—দেশের আপনজনদের কথা ভোলা সম্ভব হয় না। ওয়াশিংটনের হোটেলে আমার গৃহিণীর মাসীমা সুনয়না দেবীর চিঠি অপেক্ষা করে

ছিল। কাজের চাপে এবং দেশ দেখার নেশায় আমি পাছে ভুলে যাই তাই মাসীমা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমাকে সুচিত্রার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। বলাবাহুল্য সুচিত্রা আমার প্রিয় শ্যালিকা ও মাসীমার একমাত্র কন্যা।

মার্কিন রাজধানীতে কয়েকদিন সময় কাটিয়ে বাস যোগে নর্থ ক্যারোলিনা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিমানযোগে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এসেছি। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরী নিউইয়র্ক সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড আগ্রহ। বাড়তি আকর্ষণ কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণি নাগের সান্নিধ্য। ওঁর বাড়িতেই কয়েকদিন মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল।

সুচিত্রার ব্যাপারটা যে এতো সিরিয়াস তা আন্দাজ করতে পারিনি। সুদীর্ঘ পত্রে মাসীমা লিখেছিলেন, "জানি বিদেশে তোমার সময়ের অনেক দাম, নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছো। তবু যদি মাসীমাব মুখ চেয়ে সুচিত্রার খবরাখবর নিয়ে না আসো তাহলে আমি বাঁচবো না—হয়তো স্ট্রোকে মারা যাবো।"

ডক্টর নাগ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "ইন্ডিয়ানদের এই দিকটা সঙ্গতভাবেই সায়েবরা পছন্দ করেন না। কয়েক সপ্তাহের জন্যে এখানে এসে সমস্ত সময়টা যদি ভাগ্না, ভাগ্নী, মাসীমা, কাকীমা, শ্যালিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই কেটে যায়, তাহলে মার্কিনীদের সঙ্গে মিশবেন কখন? তাদের আবিষ্কার করবেন কীভাবে?"

অধ্যাপক নাগ যা বলেছেন, তা নির্জলা সত্য। কিন্তু আমি কি করি? সুনয়নাদেবী কাতরভাবে লিখেছেন, "মেয়ের চিঠিতে জানলাম রাতে তার ঘুম নেই। সেই খবর পেয়ে আমাকেও ঘুমের বড়ি খেতে হচ্ছে। সংসারে মেয়েদের অনেক কিছু হতে পারে যা বাবা-মাকেও লিখে জানানো যায় না।"

আমার মন খারাপ হয়ে গেলো, মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আধুনিক এই যুগে ঘরে-ঘরে এমন ঘটনা ঘটছে যা টেলিফোনে বলা যায় না, কানে শোনা যায় না, চোখে দেখার কথাই ওঠে না।

অধ্যাপক নাগ পেশায় নৃতত্ত্ববিদ—সুতরাং প্রায় মুক্তপুরুষ। নর-

নারীর কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধেই ওঁদের লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ওঁকে আমাদের মতো সাধারণ লোকের চক্ষুলজ্জার কথা বলে লাভ নেই।

নিউইয়র্কে আমাদের ঘরে আর একজন জাঁদরেল বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, "রচেস্টার দর্শনে আপনি যদি বদ্ধপরিকর হন, তাহলে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। এখন আমাদের যে-আলোচনা চলছিল চলুক।"

সুচিত্রা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমি নিউইয়র্কের রবিবাসরীয় আড্ডায় ছন্দপতন ঘটিয়েছি। এখানে সকলের সময়ের দামও প্রচণ্ড। আড্ডার টাইমে অন্য কিছু ভেবে সময় অপচয় করলে বন্ধুরা বিরক্ত হন।

বন্ধুদের আলোচনার বিষয় ইন্টারেস্টিং—জাত হিসেবে ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য। মিস্টার সেনগুপ্তর কাছেই শুনলাম, প্রত্যেক দেশ অন্য দেশের মানুষদের চারিত্রিক শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে একটা মতামত তৈরি করে রাখে। এসিয়া-বিশেষজ্ঞ সেনগুপ্ত জানালেন, "যেমন এবারের ইন্ডিয়া ট্যুরে গিয়ে ডেল্লিতে একটা ভ্যালুয়েবল শ্লোক শুনে এলাম। হুজুগে বাঙালী—হিকমতে চীনে।"

উক্তির ভাষ্য দিতে গিয়ে সেনগুপ্ত বললেন, "এর অর্থ হলো বাঙালীরা হুজুগ পেলে আর কিছুই চায় না ; আর চীনেরা চরম দুর্দশায় পড়লেও হিকমত দেখিয়ে দেয়। কলকাতায় বাঙালীও থাকে, চীনেও থাকে। গরীব বাঙালী হুজুগ তুলছে আর গরীব চীনে কলকাতার রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে তার থেকে পুতুল তৈরি করে বেচছে।"

সেনগুপ্ত আমার মতামত জানতে চাইলেন। কিন্তু তখন আমার মাথায় শুধু সুচিত্রার কথা ঘুরছে। তাই ওইসব তর্কাতর্কির মধ্যে ঢুকলুম না।

অধ্যাপক নাগ বললেন, "চীনে-ফিনে জানি না, তবে ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে এখানে কিছু কিছু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। এইসব রিপোর্ট সরকারী মহলেও পড়া হয়ে থাকে শুনি। অন্তত যেসব এদেশীয় ভারতবর্ষে যান তাঁরা নিশ্চয় পড়েন।"

তাতে কী থাকে জানবার জন্য সেনগুপ্ত সাংবাদিক-সুলভ কৌতূহল প্রকাশ করলেন। অধ্যাপক নাগ বললেন, "কনসেনসাস কথাটা ইংরিজিতে শুনে থাকবেন, এর ঠিক বাংলা জানি না। পণ্ডিতরা বলেছেন,

হাজার হাজার বছর ধরে এই কনসেনসাস-প্রবণতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়। নানারকম পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষ চেষ্টা করে কীভাবে একটা মোটামুটি মতৈক্যে পৌঁছনো যায়। কেউ পুরোপুরি হারলো না, দু-পক্ষই একটু-আধটু করে ছাড়লো।"

মার্কিনীদের প্রশংসা করে সেনগুপ্ত বললেন, "শ্যামচাচা তো আমাদের সম্পর্কে ডেনজারাস পয়েন্ট খুঁজে বার করেছেন।"

অধ্যাপক নাগ বললেন, "এরা বলছে, বিভেদের মধ্যে ঐক্য খুঁজে বার করবার কাজে ইন্ডিয়ার জুড়ি নেই। ভারতবর্ষে তাই বড় বড় চিন্তার বিপ্লব এসেছে, কিন্তু কখনও নতুনের সঙ্গে পুরনোর লাঠালাঠি হয়নি।"

"মানে?" সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ধরুন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মর কথা। এক ধর্ম এসে অন্য ধর্মকে নির্বংশ করতে পারলো না। বরং দুটো মতের মধ্যে কোথা থেকে একটা সমঝোতা খুঁজে পাওয়া গেলো। হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বলে মেনে নিলো, আর বৌদ্ধদের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই হিন্দুত্বের অনেক গ্লানি ঢুকে গেলো, যার বিরুদ্ধে বুদ্ধ একদা বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কনসেনসাসের জয় হলো।"

সেনগুপ্ত বললেন, "এটা মোটেই ভাল কথা নয়। এই জন্যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু একই সঙ্গে আমাদের পোড়া দেশে সহ-অবস্থান করছে, অথচ কোনো সমস্যার ফয়সালা হচ্ছে না।"

অধ্যাপক নাগ বললেন, "ভাল মন্দর প্রশ্ন উঠছে না, আমরা যা তাই। এই মানিয়ে-গুছিয়ে চলাটাই আমাদের শক্তি এবং আমাদের দুর্বলতা। আমাদের যৌথ পরিবারগুলো দেখুন। এ-সম্বন্ধে বিদেশী সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের প্রচণ্ড আগ্রহ। তাঁরা বলছেন, একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা বা গিন্নী কখনও কঠোর হাতে শাসন করেন না। তাঁরা সব সময় পরিবারের নানা লোকের মধ্যে একটা কনসেনসাস খুঁজে বার করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী?" আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম।

মৃদু হেসে অধ্যাপক নাগ উত্তর দিলেন, "দাঁড়াচ্ছে এই যে, পণ্ডিতদের মতে মানিয়ে-গুছিয়ে চলার জাত হিসাবে আমাদের জুড়ি নেই। দুটো মতবাদ, চিন্তাধারা বা জীবনযাত্রার মধ্যে যতই দূরতিক্রম্য

দূরত্ব থাকুক আমরা ঠিক সেতুবন্ধন করে ফেলবো। দেখবেন, এই কারণে আমেরিকাতেও ইন্ডিয়ানরা যত সহজে নতুন কালচারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় তা আর কোনো বিদেশী পারে না!"

"কী বলছেন মশায়?" প্রতিবাদ করলেন সেনগুপ্ত। "কত জাতের ছেলেমেয়ে দেখেছি—একবারে আমেরিকান হয়ে গেছে।"

আবার হাসলেন অধ্যাপক নাগ। বললেন, "দুটো চরম অবস্থা দেখতে পাবেন। হয় সেদ্ধ হয়ে, গলে গিয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একেবারে মার্কিনী বনে গেছে—না হয় চীনেদের মতো আসেদ্ধ হয়ে আমেরিকাতেও পুরো চীনে থেকে গেছে। কিন্তু ইন্ডিযানরা দেখবেন আমেরিকানও হয়েছে অথচ ইন্ডিয়ানও রয়ে গেছে।"

"অর্থাৎ দুধ ও তামাক দুই খাচ্ছে, এই বলতে চান?" ফোড়ন দিলেন সেনগুপ্ত।

ঐ মানিয়ে-গুছিয়ে চলা কথাটা আমার খুব ভাল লেগে গেলো। সুচিত্রার সম্পর্কে হঠাৎ একটু ভরসাও পেলাম। ওর সমস্যা যা-ই হোক, দিদিমাদের পুরানো মানিয়ে-গুছিয়ে চলার উপদেশটাই সুচিত্রাকে আবার দিতে হবে—এবং মনে করিয়ে দিতে হবে, সাযেবরাও এখন স্বীকার করেছেন, ইন্ডিয়ানরা এই বিষয়ে যাদুকরের ক্ষমতা রাখে।

রচেস্টারের পথে বাসের সীটে বসেও সুচিত্রার কথা ভাবছিলাম। মধুর স্বভাবের সপ্রতিভ এই বালিকাটিকে আমি ফ্রক পরা অবস্থা থেকে চিনি। কোনো বিখ্যাত গ্লিসারিন সাবানের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, যখন সে 'একটি সুন্দরী মহিলা হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে' তখন থেকেই সুচিত্রার সঙ্গে আমার মধুর রসিকতার সম্পর্ক। তখন থেকেই কিছু কিছু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। জামাইবাবুর পত্রাবলী সুচিত্রাদেবী সযত্নে রক্ষা করেছে।

এই সুচিত্রা যথাসময়ে আমেরিকা-প্রবাসী এই ছোকরার গলায় মালা দিলো। ব্যবস্থাটা সুনয়নাদেবীই করেছিলেন। রীতিমত পণ্ডিত ও সুদর্শন এই জামাই মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা রোজগার করে। সাড়ে-সাত হাজার টাকা মাইনের বর পেলে বাংলার সব মেয়েই যে মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত যেতে পারে এমন একটা মন্তব্য গিন্নী আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

দোষের মধ্যে, আমি বলেছিলাম—অত দূরে বিয়ে কি ভাল হবে? সুচিত্রার দিদিমা ও আমি ছাড়া তখনই সকলেই খুশি। দিদিমা বলেছিলেন, "ছোটবেলায় নাতনীকে পৈ-পৈ করে বলেছিলাম, ডাল ঝাড়ার সময় কাছে আসিস না, কুলোর হাওয়া লাগবে। আর পা-ছড়িয়ে খাস না। তা নাতনী তখন কথা শুনলো না আর আমার মেয়ে কথাটা কানেই নিলো না। এখন বোঝো, তখনই জানি এ মেয়ের দূরদেশে বিয়ে হবে।"

আমেরিকাতে যখন সুচিত্রার প্রথম সন্তান হলো তখন আমরা অমিতের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে সুচিত্রা আমাকে জরুরী চিঠি লিখেছিল : "সাতদিনের মধ্যে মেয়ের নামকরণ করে পাঠিয়ে দেবেন। খাঁটি ভারতীয় নাম হবে, অথচ সায়েবদের যেন উচ্চারণ করতে কষ্ট না হয়। এখানে এক ভদ্রলোক মেয়ের নাম রেখেছিলেন সুশ্রুতা—এখন ইস্কুলে সেই মেয়ের যা অবস্থা। কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, অদ্ভুত অদ্ভুত বিকৃতি ঘটছে।"

আমি খেটেখুটে, বই-পত্তর ঘেঁটে সুচিত্রার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সুচিত্রা সে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। শ্বশুরবাড়িতে শুনেছিলাম, সুচিত্রা আমার পরামর্শ অনুযায়ী মেয়ের নাম কুমকুমই রেখেছে, কিন্তু আমার ওপর সে ভীষণ চটেছে, হয়তো আমার সঙ্গে কোনোদিন কথাই বলবে না। ছ'মাসের কুমকুমকে কোলে নিয়ে সুচিত্রা যখন কলকাতায় ছুটি কাটাতে এসেছিল তখনও আমার ওপর রাগ কমেনি। আমি অবশ্য শ্যালিকা সন্দর্শনে গিয়েছিলাম। পর্যাপ্ত বর্ষণের পর লতাগাছগুলো যেমন সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে সুচিত্রাকে তেমন প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। দেহটি বেশ সুপুষ্ট হচ্ছে—অথচ কিছুতেই তাকে মোটা বলা চলে না। সর্বদেহে নবমাতৃত্বের স্নিগ্ধ দীপ্তি। নবযৌবনের অস্থিরতা বিদায় নিয়েছে স্বভাব থেকে, তার বদলে চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সেই প্রশান্ত দীপ্তি যা মধ্যযৌবনেও মেয়েদের মহীয়সী করে তোলে। সুচিত্রার কাছে নিজের মনোভাব গোপন রাখিনি! সাধুভাষায় সাহিত্যিক গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলাম, "মহিলারা মাতা না হইলে প্রকৃত সুন্দরী হয় না।"

প্রশংসায় খুশি হওয়া সত্ত্বেও, পুরনো রাগ ভুলতে পারছিল না সুচিত্রা। বেশ গম্ভীরভাবেই বললো, "আপনার সঙ্গে কথা বলবো না ঠিক করে

রেখেছিলাম।”

খুবই দুঃখের সঙ্গে বললাম, “ছেলেমেয়েদের নাম দেবার জন্যে লেখকরা আজকাল ফি নেয়। পারিশ্রমিক তো দূরের কথা আমি এক লাইন ধন্যবাদপত্র পর্যন্ত পেলাম না।”

সুচিত্রার বিরক্তির কারণটা এবার জানতে পারলাম। ইন্ডিয়ান অথচ আন্তর্জাতিক নাম ভাবতে গিয়ে একটা নামের বদলে হঠাৎ এক সেট নাম আমার মাথায় এসে গিয়েছিল। এবং এই আবিষ্কারের আনন্দে আমি সুচিত্রাকে লিখেছিলাম, “এই মেয়ের নাম দাও কুমকুম। সায়েবদের উচ্চারণ করতে মোটেই কষ্ট হবে না। কুমকুমের সঙ্গে ম্যাচ করে আরও দুটো মারাত্মক নাম মাথায় এসে গেছে। কুমকুমের বোনের নাম যদি ‘আলতা’ এবং ‘টিপ’ হয় তাহলে যা ছন্দ মিল হবে। ও দুটো নাম হারিও না। চিঠিটা যত্ন করে রেখে দিও।”

সুচিত্রা জানালো, যত্ন করে চিঠি রাখা তো দূরের কথা, সেই অমূল্য পত্রখানি সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সুচিত্রার রাগের কারণটাও এবার বুঝতে পারলাম। সুচিত্রা মনে করেছে, আমি চাইছি তার শুধু পর পর কন্যারত্নই হয়ে যাক।

“আমি শুধু ছন্দের দিক ভেবেই নামগুলো তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, সুচিত্রা। আমার অন্য কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না।” সুচিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সুচিত্রা কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না। ওর ধারণা আমি দুষ্টুমি করেই তিনটে নাম পাঠিয়েছিলাম। আমি আবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম, “তুমি কষ্ট করে মা হবে, সুতরাং ছেলে নেবে না মেয়ে নেবে—সে তোমার নিজস্ব চয়েস। আমরা বাইরের লোকেরা সেখানে নাক গলাতে যাব কেন? তবে তোমার ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক আমাদের কাছে সমান আদর পাবে।”

একটা টাওয়েল জড়ানো অবস্থায় কুমকুম মায়ের কোলেই ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য বললুম, “কুমকুম না হয়ে ইনি যদি গুমগুম হতেন তাহলেও আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতুম। তুমি অযথা রাগ করছো সুচিত্রা। কোনো দুষ্টু প্রকৃতির লোক তোমাকে আমার চিঠির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। হয়তো তোমার এবং আমার পরিচিত এমন কেউ আছে যে

চায় না তোমার সঙ্গে আমার সহৃদয় সম্পর্কটা উত্তপ্ত থাকুক।"

সুচিত্রা দেবীর মেঘলা মুখে ফিক করে রোদ হেসে উঠলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "বাগড়া দিয়ে লাভ?"

"আমার ক্ষতি করা। শ্যালিকা-সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা।" আমি উত্তর দিই।

সুচিত্রার মুখে হাল্কা হাসির ইঙ্গিত পেয়ে আমি বললুম, "চিঠিটা ছিঁড়ে না-ফেলে যদি ঠাণ্ডা মাথায় খুঁটিয়ে পড়তে, তাহলে দেখতে, আমি হয়তো আলতা এবং টিপকে আহ্বান করেছি, কিন্তু তোমার ছেলে না হোক এমন কথা কোথাও বলিনি। তোমার ছ'টা ছেলে হোক—আমাকে একটু খাটতে হবে, কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখে এবং নকুল চট্টোপাধ্যায়র সঙ্গে কনসাল্ট করে আমি পরের পর নাম সাপ্লাই করে যাবো।"

"নকুল চট্টোপাধ্যায়টি কে?" সুচিত্রা বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"ইনফরমেশন টাইকুন নকুল চট্টোপাধ্যায়—তামাম সাহিত্যিকদের গ্রন্থ ও গ্রহসংক্রান্ত উপদেষ্টা! আজকাল গ্রন্থ তো লিখলেই হলো না—রচনাকালে কোন্ গ্রহ কোথায় কী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন তার খবরাখবর রাখতে হবে! কুমকুমের বেলায় নকুলবাবুকে কনসাল্ট করেছিলুম। আমি তো প্রথমে রাধিকা নাম দিতে যাচ্ছিলাম—দিশী নাম, অথচ এখন সায়েবরা পর্যন্ত এক ডাকে চেনে। কিন্তু নকুলবাবু স্ট্রংলি আপত্তি জানালেন। বললেন, 'ব' দিয়ে আরম্ভ করা চলবে না—কারণ রচেস্টারের কাছ দিয়ে তোমার মেয়ের জন্ম-সময়ে এমন এক হিংসুটে গ্রহ দৃষ্টি দিয়েছেন যিনি 'র' পছন্দ করেন না। আমাকে 'ক' অক্ষরে নাম দিতে হবে। সেই থেকেই তো আমার ফ্যাসাদ হলো, এমন ফ্যাসাদ যে শ্যালিকার সঙ্গে এতো বছরের সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে।"

এইবার একগাল হেসে ফেললো সুচিত্রা। এবং ফাঁস করলো যে আমার চিঠিটা শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া হয়নি। সুচিত্রা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বামী অমিত হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই চিঠি উদ্ধার করেছে। সুচিত্রা বললো, 'আমিও ভাবলাম রেখে দিই। আমার যদি আবার মেয়ে হয়, ঐ চিঠির সঙ্গেই একটা 'পত্রবোমা' দিয়ে আপনার নামে ফেরত পাঠাবো।"

তারপর কয়েক বছর হয়ে গেছে। সুচিত্রার আর কোনো সন্তান হয়নি

এবং পত্রবোমাও আসেনি। পত্রবোমা বলতে সুনয়নাদেবীর এই পত্র।

বাস চলেছে রচেস্টারের দিকে। আর ক্রমশ আমার চিন্তা বাড়ছে।

রচেস্টারে আমার এখন যাবার কথা নয়। কোনোরকমে মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় ম্যানেজ করেছি। মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় হাতে এইভাবে রচেস্টারে যেতাম না, যদি-না সুচিত্রা সম্পর্কে সুনয়নাদেবী আমাকে এইভাবে চিন্তিত করে তুলতেন। সুচিত্রার সমস্যাটা কী হতে পারে ভাবছিলাম। মাসীমা এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে সুচিত্রা আমার সঙ্গে দেশে ফিরে আসতে পারে।

অমিতের সঙ্গে কিছু হলো নাকি? অমিতের মুখটা মনে পড়ে গেলো। সুদর্শন অমিত ছেলেটি তো ভদ্র এবং শান্তশিষ্ট। কথা কম বলে। সে কখনও গণ্ডগোল পাকাতে পারে না। কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না। শঙ্করীদার কথা মনে পড়লো। তিনি বলেন, "শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলেবাই হৃদয়সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশী গণ্ডগোল পাকায়। হেঁকো-ডেকো ছেলেদের সম্বন্ধে আমরা দুশ্চিন্তা করি, কিন্তু তারা কখনও বেশী দূর এগোয় না। পরনারী থ্রম্বোসিস তাদের বিশেষ হয় না।"

শঙ্করীদার বলবার অধিকার আছে, কারণ কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার সঙ্গে তিনি অনেকদিন সহ-অবস্থান করছেন।

মনে পড়লো, সুচিত্রার মা আমাকে কিছুদিন আগে পশ্চিমের ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি কোনোদিন ওদেশে যাইনি, আমার বিদ্যে বই থেকে এবং কিছু শোনা কথা থেকে। তার ওপর নির্ভর করে কতটুকু উত্তর দেওয়া যায়? শুধু এইটুকু বলেছিলাম, "পশ্চিমে বিয়েটা ভাঙে একটু বেশী। আজকাল আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে ফাটা বিয়ে রয়েছে। ছেঁড়া সম্পর্কে তাপ্পি দিয়ে চালিয়ে নেবার অভ্যেস আমাদের দেশের গৃহকর্মনিপুণা ধৈর্যবতী মেয়েদের আছে—ওদেশে নেই। ওরা কেউ ফাটা বাসন ব্যবহার করে না।"

শাশুড়ি-সুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে সুচিত্রার মা আরও যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা আমি ভেবেছিলাম পাঠিকা-সুলভ কৌতূহল। সুনযনাদেবী বলেছিলেন, "মেয়ের চিঠি পড়লে তো রক্ত হিম হয়ে আসে। হুদো-হুদো স্বামী-স্ত্রীরা নাকি অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছে এবং তারপরেই ঘর ভাঙছে। দোজবউ তেজবউ-টা কিছুই নয়। এসব কি

সত্যি?"

আমি বলেছিলুম, "সে-দেশের লোক যা ভালবাসে তাই করবে—আমাদের কী এসে যায় বলুন।"

সুনয়নাদেবী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বলেছিলেন, "এসে যায় বৈকি, বাবা। এইসব সায়েবদের হাতেই তো ক্ষমতা—এরাই তো দুনিয়া চালাচ্ছে। এদের সঙ্গেই তো আমার মেয়ে জামাইকে মিশতে হয়।"

আমি বলতে গিয়েছিলাম, "ওরা যে দুশ্চরিত্র তা নয়। তবে বিয়ের আগে বহুজনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে ; বিয়ের পরেও অনেকের সেই অভ্যেসটা যেতে চায় না। সমাজ একদিক থেকে বেশ গোঁড়া। আইবুড়ো ছেলে-মেয়েদের জন্যে অবাধ লাইসেন্স, কিন্তু বিয়ের মন্তর পড়লেই কঠিন আইনকানুন, সব স্বাধীনতা বাতিল হয়ে গেলো।"

মনে পড়ছে, সুচিত্রার মা ওদের জন্যে কোনোরকম সহানুভূতি প্রকাশ করেননি। বলেছিলেন, "বিয়ের পরেও যারা চপল চঞ্চল থাকে তাদের ক্ষমা করা যায় না। গল্প-উপন্যাসে এদের কখনও আস্কারা দিও না। ছেলেময়েরা তো তোমাদের বই পড়েই শিখবে।"

পশ্চিমী হাওয়া শেষ পর্যন্ত অমিতের গায়েও লাগলো ভেবে আমি শিউরে উঠছিলাম। আহা, সুচিত্রা মেয়েটি বড় ভাল। কুমকুমও এতোদিনে নিশ্চয় খুব মিষ্টি হয়েছে। (ওর বয়স বছর সাতেকের বেশি হযনি বলেই মিষ্টি কথাটা লিখতে সাহস করলাম। আজকালকার যুবতী মেয়েরা এই বিশেষণ মোটেই পছন্দ করে না, ওদের অঙ্গে লাগে। রেগেমেগে জিজ্ঞেস করে, মেয়েরা কি খাবার জিনিস, যে মিষ্টি বলছেন?)

সুচিত্রার সুখী সাংসারিক পরিবেশে স্বয়ং অমিত গাঙ্গুলী ছাড়া কে আব তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে? ভগবানের ওপরও রাগ হলো। সংসারের হাজার রকম জট ছাড়িয়ে জীবনে একবার কয়েকদিনের জন্যে বিদেশে বেড়াতে এলাম, এখনও মুক্তি দিলেন না। এখানেও স্নেহভাজনীয়া কারও চোখে জল দেখতে হবে।

বাসের হাল্কা নীল কাঁচের মধ্য দিয়ে সুচিত্রাকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। নীল রংয়ের এক নাইলন শাড়ি পরে বিষণ্ণ ম্যাডোনার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাসস্ট্যাণ্ডের ঠিক বাইরে।

বাসস্ট্যাণ্ডে অমিতকে না দেখে বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সুচিত্রাকে তাহলে একলা আসতে হয়েছে। আমি মনস্থির করে ফেললাম। আমি তো মাত্র দু'তিন ঘণ্টা থাকবো। তারপরেই তো আমাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকেই সুচিত্রার মাকে আমি বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে দেবো। ওঁর মতামত আমি এদেশে থাকতে থাকতেই এসে যাবে। তখন যা হয় করবো। তেমন প্রয়োজন হলে হলিউড যাওয়া বন্ধ রেখে সুচিত্রার কাছে ফিরে এসে ফয়সালা করে ফেলবো।

বাস থেকে নামতেই সুচিত্রা এগিয়ে এলো। ওর শ্রী এবং স্বাস্থ্য প্রায় একরকমই আছে, শুধু আগেকার সবুজ সতেজ ডাঁসা-ভাবটা নজরে পড়ছে না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে সুচিত্রা আমাকে ওয়েলকাম করলো। অভিনয়ে সব মেয়ের জন্মগত অধিকার। সুচিত্রার ওই হাসির আড়ালে কতবড়ো কালো মেঘ লুকিয়ে আছে ভেবে আমার কষ্ট হলো।

"এলেন তাহলে, শংকরদা?" সুচিত্রা বললো।

"না এসে উপায় আছে? এই রকম শ্যালিকার আকর্ষণে লোকে উত্তর মেরু পর্যন্ত যেতে পারে," আমি সরস উত্তর দেবার চেষ্টা করি।

অমিত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাটা সমীচীন হবে কিনা ভাবছি। সুচিত্রা বললো, "খুব তো ভালবাসা। প্ল্যাটফরমে দেখা করে পালাতে চান। একদিন রাত কাটাতে রাজী হচ্ছেন না।"

অন্য সময় হলে এই রাত কাটানোর নিমন্ত্রণ সম্পর্কে বিবাহিতা শ্যালিকার সঙ্গে কত রসিকতা করা যেতো। কিন্তু এখন সে-সময় নয়। বললুম, "আজকে শুধু বুড়ি ছোঁয়া। আমেরিকা ছাড়বার আগে আবার আসবো।"

সুচিত্রা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললো, "আপনি কীরকম লাকি, শংকরদা। কয়েকদিন পরেই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবেন। আমার কপাল খারাপ। আমি রোজ প্রার্থনা করছি, ঠাকুর আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

সিরিয়াস বিষয়ের অবতারণা আশঙ্কায় আমি ভিতরে ভিতরে ঘামতে লাগলাম। বড় সরল মেয়েটা। ফ্রকপরা বয়স থেকে হাসিখুশি দেখে

এসেছি—ওর চোখে জল দেখতে ইচ্ছে করে না।

"কফি খাবেন?" সুচিত্রা জিজ্ঞেস করলো। ভাবলুম একবার বলি, বাড়িতে গিয়েই খাবো। কিন্তু বাড়ির অবস্থা কি জানি না। তাই সে কথা তুলতে সাহস হলো না। বললুম, "চলো, ওই কাফেটারিয়াতে বসা যাক।"

কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে সুচিত্রা বললো, "এখান থেকে চলে যাবার জন্যে রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, অথচ ছ'মাস আগেও এ-দেশ আমাদের খু-উ-ব ভাল লাগতো।

তাহলে গণ্ডগোলটা বিশেষ পুরনো নয়, সুচিত্রার কথা থেকেই আন্দাজ করলাম। মূল সমস্যার ভিতরে না ঢুকে, কিছুমাত্র জানবার আগ্রহ প্রকাশ না করেই বললাম, "দেশটা তো সোনার দেশ। মানিয়ে-গুছিয়ে নাও, আবার ভাল লাগবে। এখানকার পণ্ডিতদের কাছে শুনলাম, মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে ইণ্ডিয়ানদের জুড়ি নেই।"

সুচিত্রার চোখ ছলছল করে উঠলো। "মানিয়ে-গুছিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না, শংকরদা। আমার যা-হয় হোক, কিন্তু কুমকুমের ভবিষ্যৎ এইভাবে নষ্ট হতে দেবো না।"

তাহলে আমি যা আশঙ্কা করেছি, তাই ঠিক। সুচিত্রা বললো, "ও এখানে নেই।"

তাহলে ব্যাপারটা শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অমিত এখানে নেই। আমি বললাম, "ওর সঙ্গে আমার দেখা হলে ভাল হতো।"

ফোঁস ফোঁস করে উঠলো, সুচিত্রা, "খুবই ভাল হতো। হয়তো আপনার কথার কিছুটা মূল্য দিতো।"

মনে মনে বললাম, পার্সোনাল ব্যাপারে আজকাল কেউ কারুর কথার মূল্য দেয় না। সুচিত্রাকে বললাম, "অমিত যে চলে গেছে তা মাসীমাকে জানিয়েছো?"

গম্ভীর মুখে সুচিত্রা বললো, "জানাবো কি করে? এখনও তো দু'দিন হয়নি।"

খুবই নাটকীয় সময়ে তাহলে এসে পড়েছি—আপন একজনকে কাছে পেয়ে সুচিত্রা একটু ভরসা পাবে। বললুম, "কিছু ভেবো না, সুচিত্রা। ওপরে ঈশ্বর আছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে?" তারপর জিজ্ঞেস

করলুম, "আমি যে আসছি তা অমিত খবর পেয়েছিল?"

আমার আশঙ্কা হলো ভায়রা-ভায়ের সঙ্গে দেখা করার ভয়েই অমিত পালিয়েছে। আমার আন্দাজই ঠিক। সুচিত্রা বললো, "আপনার চিঠিটা ও-ই তো নিয়ে এলো। বললো, ব্যাড লাক। শংকরদার সঙ্গে দেখা হলো না।"

সুচিত্রার বাড়িতে এসে গেলাম। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি বেশি দূরে নয়। ঘড়ির দিকে তাকালাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে কত সময় লাগবে হিসেব করতে লাগলাম।

সুচিত্রা বললো, "বাড়িতে ঢুকেই ঘড়ি দেখবেন না, শংকরদা। আমি খোঁজখবর করে রেখেছি। আপনি দু-ঘণ্টা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। তারপর ইয়োলা ক্যাবকে ফোন করে দেবো। আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি থেকে তুলে নেবে। এখানে এই সুবিধে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গাড়ি না থাকলেও ওরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক ট্যাক্সিতে বেতার যন্ত্র আছে, তার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হাজির হবে। আপনি ঠিক সময়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাবেন।"

অন্য সময় হলে সুচিত্রার সংসার আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। কিন্তু এখন যা মনের অবস্থা তাতে সংসার দেখে লাভ কী? চুপচাপ বসে সময় কাটিয়ে বিদায় নেওয়াই ভাল।

সময় যখন অল্প তখন আসল সমস্যাগুলো আর না এড়িয়ে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। জিজ্ঞেস করলাম, "কুমকুম কোথায়?"

সুচিত্রা বললো, "ইস্কুলে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে কিনা সন্দেহ। কারণ আজ আবার ইস্কুলে কি সব ফাংশন আছে।"

জেরা করতে সাহস হলো না। বেচারা কুমকুমকে সুচিত্রা হয়তো ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে, যাতে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে। সুচিত্রা বললো, "আপনি আসবেন বলে পায়েস তৈরী করে রেখেছি, শংকরদা। পায়েস তো আপনার ফেভারিট।"

"সে ওয়ান্স-আপন-এ-টাইমের কথা, সুচিত্রা। এই বয়সে তোমার দিদির বকুনি ছাড়া কিছুই মুখে রোচে না।"

মনে একটু সুখ থাকলে সুচিত্রা যে অনেক কিছু রেঁধে রাখতো তার ইঙ্গিত পেলাম। এ সময়ে খাওয়ার তেমন কথাই ওঠে না। তবু ওদের

ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতে হলো। ফ্রিজ থেকে সুচিত্রা পায়েসের বাটি বার করে দিলো। পায়েসের মধ্যে চামচ চালিয়ে আমি এবার সমস্ত হলঘরটা দেখে নিলাম। ছবির মতন সাজানো সংসার। এমন সংসারের সুখী গৃহিণী সুচিত্রা। এইরকম একটা রিপোর্ট মাসীমাকে পাঠাতে পারলে কী সুখের হতো।

মিষ্টি খেতে খেতে তেতো আলোচনা ভাল লাগে না। কিন্তু সময় খুবই অল্প। সুতরাং আমাকে বলতেই হলো, "তোমাকে নিয়ে মাসীমার খুব চিন্তা।"

"চিন্তা আমারও, শংকরদা। শুধু চিন্তা নেই ওই ভদ্রলোকের, যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন আপনারা। এতো করে বলছি, তবু কানে নেয় না।"

"ব্যাপারটা কী, যদি একটু গুছিয়ে বলো।" আমি পায়েস আস্বাদ করতে করতে শ্যালিকাকে অনুরোধ জানাই।

এবার যা শুনলাম, তাতে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। গোলমালটা অমিতকে নিয়ে নয়। সে এখন শ্যালিকার শাসনাধীনেই রয়েছে। সমস্যাটা কুমকুমকে নিয়ে। অমিত হঠাৎ কী এক সেমিনারে শিকাগো গেছে। আগামীকাল ফিরবে।

আনন্দে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তাতে সুচিত্রা ভুল বুঝলো—"মেয়ে নিয়ে আমি বিপদে পড়েছি, আর আপনি হাসছেন।"

আমি বলে ফেললাম, "আমি ভেবেছিলাম, তোমার ঘাড়ে বাঘ পড়েছে। বাঘিনীও বলতে পারো।"

সুচিত্রা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো কিনা জানি না। বললো, "বাঘিনী এক আছেন। আমাদের প্রতিবেশী। জনের মা। জন ছেলেটি কুমকুমের বয়সী। কুমকুম ওখানে যাতায়াত করে।"

আবার দুশ্চিন্তা হলো। যা সব বাল্যপ্রণয়ের রিপোর্ট আজকাল কাগজে পড়ি। তবে হিসেব-টিসেব করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, "সবে তো সাত বছর বয়স। এখন থেকে দুশ্চিন্তা করে লাভ কী সুচিত্রা?"

সুচিত্রা বললো, "ও যদি নিজের দেশে একটা চাকরি পেতো তাহলে আমি বেঁচে যেতাম, শংকরদা।"

বললুম, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, সুচিত্রা। অমিত শুনেছি

মাহুলি দশ হাজার টাকার ওপরে মাইনে পাচ্ছে। ওই ধরনের চাকরি, যতদূর জানি স্বদেশে একটাই আছে—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে।"

সুচিত্রা আমার ব্যঙ্গে কান দিলো না। বললো, "ডলারকে সাড়ে সাত দিয়ে গুণ করে কে চাকরি চাইছে, শংকরদা? একটা আট-নশো টাকার চাকরি পেলেই ওকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আমি। টাকার চেয়ে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ আমার কাছে অনেক দামী।"

বললাম, "হলো কী? এতো ভেঙে পড়ছো কেন সুচিত্রা?"

সুচিত্রার চোখে জল। "আমি কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র উপায় মনে হচ্ছে।"

"আহা আহা! কেঁদো না। তুমি কাঁদলে মাসীমাকে সে-রিপোর্ট দিতে হবে। এবং মেয়ের চোখে জল পড়ছে শুনলে মাসীমা শয্যা নেবেন, ব্লাডপ্রেসার তালগাছে চড়ে বসবে।" আমি সুচিত্রাকে সাবধান করে দিই।

ঘরের এক কোণে কুমকুমের ছবি রয়েছে। হাসিখুশি বালিকার রঙীন-ছবি। দেখে মোটেই দুষ্টু মনে হয় না। মায়ের চোখে জল ফেলাবার জন্যে সে যে দায়ী হতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।

বললুম, "ইস্কুলে পড়াশোনা করছে তো? বাবা কত বড় স্কলার, তুমিও পড়াশোনায় খারাপ ছিলে না, স্কুল-ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলে, তোমাদের মেয়ের তো পড়ায় খারাপ হওয়া উচিত নয়।"

সুচিত্রা স্বীকার করলো মেয়ে পড়াশোনা মন্দ করছে না। স্কুলে যেতে কাঁদে না। যদিও তার আগের অধ্যায়ে বেশ চিন্তার কারণ হয়েছিল। সুচিত্রা মনে করিয়ে দিলো, "আপনি তো জানেন ওর কথা ফুটতে দেরি হয়েছিল। আমাদের কী যে ভয় হয়েছিল, বোবা হবে নাকি।"

বললুম, "শুনেছিলুম বটে মাসীমার কাছ থেকে। মাসীমা আবার নাক-কানের বড় ডাক্তার তড়িৎদার সঙ্গে দেখা করলেন। তড়িৎদা বললো, বিদেশে অনেক সময় ও-রকম হয়ে থাকে। বাবা-মায়ের কাছে বাংলা শুনছে, তারপর সেই বাবা-মা'র মুখে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনর্গল ইংরিজি বলতে শুনছে, বাইরে খেলার পার্কে সমবয়সীদের মুখে শুধু ইংরেজি শুনছে, এতে বাচ্চারা ঘাবড়ে যায়। ওদের বুলি ফুটতে দেরি হবেই তো।"

সুচিত্রা বললো, "কুমকুমের ঠিক তাই হলো। দিনরাত টিভি দেখতো। শেষে কথা ফুটলো, কিন্তু প্রথমে ইংরিজি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর জনের মা এগনেসের সঙ্গে আলাপ হলো আমার। উনিও এখানে আসেন, আমিও ওঁদের বাড়িতে যাই! আমরা দুজনেই চাকরি করি না—তাই হাতে দুপুরবেলায় অনেক সময় থাকে।"

"গিন্নীদের পাড়া-বেড়ানো তাহলে এখানেও আছে," আমি আনন্দ প্রকাশ করি।

"গৃহিণীসম্মেলন আছে—তবে কী দিয়ে ভাত খেলি জিজ্ঞেস করবার পালা নেই। আর নারীগণের পতিনিন্দা নেই, বরং পতি-প্রশস্তি আছে।"

"এটা তো খুবই ভরসার কথা," আমি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করি।

সুচিত্রা বললো, "পতিনিন্দার স্টেজেই এখানকার কেউ পৌঁছোয় না। 'হনি-হনি' 'ডার্লিং-ডার্লিং' করতে করতেই একদিন তালাক দিয়ে বসে। এই একটা বিশ্রী অভ্যাস এখানকার। কথায় কথায় ডাইভোর্স!"

আমি বললাম, "স্বামীকে বা বউকে চিরকাল ভালবাসুক না বাসুক—সন্তানদের প্রতি ভালবাসা আছে তো? মায়েরা তো সব দেশেই এক শুনেছি—কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কভু না হয়!"

সুচিত্রা বললো, "ছেলেপুলেকে ভীষণ ভালবাসে এগনেস—কিন্তু ভালবাসার রকম-সকমই অন্যরকম। ছেলেকে যে কী শিক্ষা দেয়, ভগবান জানেন।"

পায়েসের বাটি শেষ করে আমি সুচিত্রার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি।

সুচিত্রা বললো, "ওইসব থেকেই তো আমার বাড়িতে গোলমাল শুরু হলো। কুমকুম তখন আরও একটু ছোট। আমাকে একদিন বললো, মা জন আমাদের বাড়িতে এলে আমার কোনো খেলনায় হাত দিতে দেবো না।"

আমি কুমকুমকে বকুনি দিলাম। "ছিঃ, জনকে খেলনা না দিলে আমি ওর মায়ের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না। জনের মা ভাববেন, আমি তোমাকে কুশিক্ষা দিচ্ছি।"

কুমকুম সেদিন কিছু বললো না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনকে তার খেলনাগুলো দিলো এবং জন সেদিন দু-একটা খেলনা ভেঙেচুরে বিদায় নিলো। আমি কুমকুমকে বোঝালাম, ভেঙেছে তো কী হয়েছে? জন

তোমার ভাই হয়। আমি তোমাকে আবার খেলনা কিনে দেবো।

কুমকুম তখনকার মতো শান্ত হয়ে গেলো। কিন্তু পরের দিন সন্ধেবেলায় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। একটু আগেই জনের বাড়িতে গিয়েছিল সে। চোখ মুছতে মুছতে সেই সঙ্গে বেশ রাগের সঙ্গে কুমকুম বললো, "তুমি শুধু আমাকে বকো। বলো জনকে খেলনা দাও। আর জনের বাড়িতে গেলাম, ও আমাকে একটা খেলনাতেও হাত দিতে দিলো না। ভয় দেখালো, খেলনায় হাত দিলে আমার মাথা ভেঙে দেবে।"

"তুমি কী করলে?" আমি কুমকুমকে জিজ্ঞেস করলাম।

কুমকুম যা বললে, তাতে আমি বেশ লজ্জায় পড়ে গেলাম। কুমকুম বললো, "আমি জনের মাকে বললাম, জন আমাকে খেলনায় হাত দিতে দিচ্ছে না। আন্টি শুনলো, কিন্তু জনকে কিছু বললো না।"

সুচিত্রা থামলো। আমি এই পর্যন্ত শুনে বললাম, "ভদ্রমহিলা বেশ স্বার্থপর।"

সুচিত্রা একমত হলো না। "তাই বা কী করে বলি? খুব জেনারাস—কুমকুমকে জামা কিনে দিয়েছেন, পুতুল কিনে দেন।"

"তাহলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সুচিত্রা বললো, "কুমকুমের কথা শুনে আমি ভেবে ভেবে যাই আর কি! কুমকুমের বাবা পরামর্শ দিলেন মনের মধ্যে ভাবনা পুরে না রেখে, জনের মা'র সঙ্গে কথা বলো। আমি দোনোমনো করছিলাম। কিন্তু যা অবস্থা দেখলাম, এ বিষয়ে একটা সমাধান না হলে কুমকুম একদিন হয়তো ওদের সামনেই সীন ক্রীয়েট করে বসবে। হয়তো স্রেফ বলে দেবে, জনকে কোনো খেলনা দেবো না। অগত্যা একদিন এগনেসের কাছে গেলুম। তাকে খোলাখুলি সব বললুম। উপদেশ চাইলাম।

এগনেস মোটেই বিরক্ত হলো না। লেখাপড়া জানা মহিলা—কিছুদিন কলেজে পড়েছে। এগনেস বললো, "তোমরা অন্য কালচার থেকে এসেছো—এখানকার কালচার এখনও বুঝতে পারোনি। আমার মনে হয় তুমি মেয়ের অপকার করছো।"

আমি রেগে গেলুম। বললুম, "মেয়েকে এই বয়স থেকে স্বার্থপরতা শেখাবো?"

এগনেস বললে, "চিত্রা, ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না। জনের ওপর আমার নিজের ইচ্ছেটা কেন জোর করে চাপিয়ে দেবো? জনের যদি ইচ্ছে হয় এবং সে যদি চায় কুমকুমের সঙ্গে সে নিজের খেলনা শেয়ার করবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তার ইচ্ছে না হলে আমি কেন জোর করবো?"

আমি খোলাখুলি বললাম, "আমার মেয়ে যাতে স্বার্থপর না হয় তার জন্যে এখন থেকেই আমাকে চেষ্টা করতে হবে। আমার মা শুনলে দুঃখ পাবেন।"

এগনেস বললো, "তুমি ওকে উদারতার শিক্ষা দিচ্ছ না, ওকে হিপক্রিট হতে বাধ্য করছো। মনের ইচ্ছে একরকম এবং মুখে আরেক রকম হবার কপট ট্রেনিং আমি জনকে দেবো না। তাহলে ওর মন নোংরা হয়ে যাবে।"

শ্যালিকাকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কী সিদ্ধান্তে এলে?"

সুচিত্রা উত্তর দিলো, "আমি নিজের পথেই চলবো। এগনেস যা-ই বলুক, সবার সঙ্গে মিলেমিশে মানিয়ে-গুছিয়ে থাকবার শিক্ষা তো মেয়েকে দিতেই হবে।"

সেই মতোই চালিয়ে যাচ্ছিল সুচিত্রা। নিজের সমস্ত স্নেহ-মমতা ও পরিশ্রম দিয়ে নিজের দেশের আদর্শযোগ্য করেই কুমকুমকে সে মানুষ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার গণ্ডগোল বাধলো।

সুচিত্রা বললো, "শংকরদা, আপনি তো ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখছেন। সেই ছোটবেলা থেকেই মাকে আমি কী ভীষণ ভালবাসতাম। মা'র কথার অবাধ্য হয়েছিল কখনও? মায়ের দুঃখ আমাদের দেশের মেয়েরা ছোট বয়স থেকেই বোঝে। মায়ের কত ফাইফরমাশ খাটতাম।" আবার সুচিত্রার চোখ ছলছল করে উঠলো। আঁচল দিয়ে একবার চোখ মুছে ফেললো।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "আমার কাছে লজ্জা কী? বলে ফেলো, সুচিত্রা।"

সুচিত্রা বললো, "জানেন তো এখানকার অবস্থা—পয়সা ফেললেও ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। এই সংসারে হাজার রকম কাজ আমাকে একা করতে হয়।"

"সে-সব তো শুনেছি তোমার মায়ের কাছে। তোমার দিদিকে বলেওছি, সুচিত্রা এখন শুধু রাঁধে না—বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাথরুম পরিষ্কার করে, মায় অমিতের ঘাড়ের চুল ছেঁটে দেয়। এক কথায় রাঁধুনি কাম তোলা ঝি কাম মেয়ের আয়া কাম মেথরানী কাম ধোপানী কাম নাপতেনী কাম শয্যাসঙ্গিনী কাম গার্লফ্রেণ্ড কাম সেক্রেটারি কাম নার্স।"

"তোমার দিদি অবশ্য দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, যদি ভেবে থাকো, আমিও সে রকম হচ্ছি তাহলে খুব ভুল করেছো। আমিও রেগেমেগে শুনিয়ে দিলুম, তোমার মাসতুতো বোন যদি অমন হতেপারে, তাহলে তুমি পারবে না কেন? তোমার দিদি ঠোঁট উল্টে বললেন, আমার মাসতুতো বোনের বর যত টাকা মাইনে পায় তার দশ ভাগের এক ভাগ তুমি রোজগার করো।"

সুচিত্রা বললো, "দিদিকে বকুনি দিয়ে চিঠি লিখতে হবে তো। বরকে কোথায় অনুপ্রেরণা দেবে, তা নয়, আত্মসম্মানে আঘাত দিচ্ছে।"

"যদি পারো, একটু লিখো", আমি কাতর অনুরোধ জানাই শ্যালিকাকে। "কলকাতায় বেশীর ভাগ লেখকের স্ত্রীদের ধারণা সাহিত্যিকদের কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। অমন-যে-অমন দোর্দণ্ড লেখক অমুক বাবু, যাঁর লেখা পড়তে তুমি খুব ভালবাসতে, যাঁর একটা কলমের খোঁচায় সমাজবিপ্লব হয়ে যেতে পারে, তাঁর ওয়াইফ বাড়িতে ওঁকে মিনসে বলে চিৎকার করে ডাকেন।"

এতো দুঃখের মধ্যেও সুচিত্রা ফিক করে হেসে ফেললো। আমি বললাম, "নিজের দুঃখের কথা থাক। তোমার কথা শোনাও।"

সুচিত্রা বললো, "এদেশে সংসার চালাতে কি পরিশ্রম হয় তাহলে আপনি তো জানেন। একে লোকজন নেই, তার ওপর ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে রেখে দিতে হবে—কোনো মার্কিন বন্ধু এসে পড়লে যাতে ডার্টি বলে বদনাম না হয়।"

একটু থেমে সুচিত্রা বললো, "ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে কোমর ব্যথা হয়ে যায়, শংকরদা। একদিন শরীরটা খুব খারাপ, সর্দি-জ্বরের মতো লাগছে। কুমকুম স্কুল থেকে ফিরে এলো। ওকে খেতে দিলুম, তারপর বললুম, লিভিং রুমের দরজা-জানালা আর ফার্নিচারগুলো

একটু মুছে দিবি, লক্ষ্মীসোনা?"

আবার থামলো সুচিত্রা। তারপর বললো, "যে-মেয়ের জন্য এতো করি, সে আমাকে যা উত্তর দিলো তা শুনে আমার মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো।"

আমি বললুম, "ডাক্তার দেখাও শ্যালিকা। বড় সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘুরছে। পারবো না—এ-কথাটা ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে লেগেই থাকে। তুমি এই প্রথম মা হয়েছো, তাই জানো না।"

সুচিত্রার দুঃখ কমলো না। বললো, "পারবো না বললে, আমার দুঃখ থাকতো না। বুঝতাম, ছেলেমানুষী করেছে। কিন্তু ও যা বললো তা মুখে আনা যায় না। কুমকুম ঘর দুটো খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর বললো, করতে পারি। কিন্তু কত টাকা দেবে?"

কুমকুমের উত্তর শুনে তার মায়ের ফেন্ট হবার অবস্থা। মেয়ে বলে কী! ঘরের কাজ করে দেবার জন্যে পয়সা চাইছে!

সুচিত্রা বললো, "আমি বকুনি লাগালাম, ছিঃ কুমকুম, বাবা-মায়ের কাজ করে পয়সা চাইতে নেই।"

সুচিত্রা বলে চললো, কিন্তু কুমকুম অটল। জিজ্ঞেস করলো, "কেন আমাকে ঠকাতে চাও? সেদিন যে-লোকটা এসে তোমাদের জলের পাইপ সারালো তাকে পয়সা দিলে আর আমাকে দেবে না কেন?"

"শুনুন মেয়ের কথা। 'আমাদের' জলের পাইপ বললো না, বললে 'তোমাদের'। আমি তবু বিরক্তি না দেখিয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যিনি কল সারিয়ে গেলেন উনি বাইরের লোক। আর তুমি হচ্ছো আমাদের আপনজন। আপনজনের কাছে পয়সা চাইতে নেই।"

"কুমকুমের মাথায় আমার কথাগুলো ঢুকলো না। সোজা বললো, ওসব জানি না, পয়সা না দিলে কাজ হবে না।"

"চোখে জল এসে গেলো। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কুমকুম আবার বললো, তুমি মা হতে পারো, কিন্তু কাজ করিয়ে পয়সা দেবে না কেন?"

"বুঝুন একবার। আমার ভীষণ অভিমান হলো। আমি বললাম পয়সা দিয়ে কাজ আমি মরে গেলেও করাতে পারবো না। তোমাকে কাজ করতে হবে না, আমি নিজেই সব করে নেবো।"

সুচিত্রা ভেবেছিল, এবার ফল হবে। কুমকুম এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কুমকুম দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।

সুচিত্রা বললো, "ভীষণ দুঃখ হলো আমার। আমরাও তো মেয়ে ছিলাম। এমন নিষ্ঠুর তো কখনও হতে পারিনি। তারপর ভাবলাম, রাগ করে লাভ নেই—মেয়েকে বোঝাতে হবে। ওকে ডেকে খুব আদর করলাম। বললাম, কুমকুম, তোমাকে আমি আর বাপি কত ভালবাসি। তোমার সেবার অসুখ করলো, আমাদের কত দুঃখ হলো, তোমার ইস্কুল থেকে আসতে দেরি হলে আমি ছটফট করি। তবু আমার কাজ করতে তুমি পয়সা চাইবে?"

কুমকুম গম্ভীর হয়ে ভাবলো একটু। তারপর বললো, "তুমি বলতে চাও, জনের মা জনকে ভালবাসে না? জন তো পয়সা ছাড়া বাড়ির কোনো কাজ করে না ; কত পয়সা দেবে সে নিয়ে রীতিমতো দরদস্তুর হয়।"

সুচিত্রার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, সোজা বললো, "তোমাকে আমার কথা মতো চলতে হবে। এ-বাড়িতে কী নিয়ম চালু থাকবে তা আমি ঠিক করবো। চোখের সামনে থেকে মেয়েকে দূর করে সরিয়ে দিলুম। ওর বাবা তখন ছিল না এখানে। দু'দিন পরে ফিরতেই ব্যাপারটা বললুম। প্যান্ট-কোট-টাই পরে বড় বড় গাড়িতে ঘুরে বেড়ালেই সভ্য হওয়া যায় না। যে-দেশে ছোট ছেলেমেয়েও পয়সা ছাড়া বাপ-মায়ের কাজ করে না, তাকে সভ্য দেশ বলে না।"

সুচিত্রা যে রেগেছে তা বুঝলেন কুমকুমের বাবা। বললেন, "রাগ কোরো না, শরীর খারাপ হবে। আমি বরং কুমকুমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখি।" সুচিত্রা বললো, "আমাদের যুগে কথাবার্তা নয়, থাপ্পড়ই ছিল এর ওষুধ। কিন্তু যে-দেশে বাস করছি, সে-দেশে থাপ্পড় মারলে মেয়ে হয়তো থানায় রিপোর্ট করবে।"

সুচিত্রা বললো, "আমার সামনেই কুমকুমের সঙ্গে ও কথাবার্তা বললো। বুঝলাম, মেয়ের কাঁচা পয়সার লোভ হয়েছে—ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সাকড়ি দেখে। সেই পয়সায় তারা ইচ্ছেমতো জিনিসপত্তর কেনে। আমি বললুম, আমাদের সময়ে তো ভাল ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা থাকতো না। যখন যা দরকার হতো বা

কেনার ইচ্ছে হতো মাকে বললেই আনিয়ে দিতেন। বুঝতে পারছি, এখন আর ও নিয়ম চলবে না।"

সুচিত্রা আবার একদিন কুমকুমকে ধরলো। বললো, "তোমার পয়সার দরকার হলে চেয়ে নেবে। এই নাও এক ডলার। যা ইচ্ছে কিনবে।"

খুব খুশি হলো কুমকুম। পয়সাটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলো। সুচিত্রা তখন বললো, "দেখো কুমকুম, এই যে তোমাকে পয়সা দিলুম এর সঙ্গে কাজকর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। দরকার হলে তুমি পয়সা চাইবে—কিন্তু কখনও কাজ করতে বললে, পয়সার কথা তুলবে না। এতে বাপির আমার অপমান হয়, মনে কষ্ট হয়।"

এই পর্যন্ত বলে সুচিত্রা থামলো। আমি ওকে অভিনন্দন জানালাম, "জটিল সমস্যার বেশ সহজ সমাধান করলে।"

"সমস্যার সমাধান হলো কই?" সুচিত্রা দুঃখের সঙ্গে জানালো। "মেয়ে এসে বলে, এটা কিনবো। আমি পয়সা দিয়ে দিই। তারপর হঠাৎ জনের মা টেলিফোন করলেন, এখনই একবার আসতে চান। এখানের এই নিয়ম। পাশের বাড়ির লোক হলেও হঠাৎ বেল টিপবে না। ফোন করে, অনুমতি নিয়ে বাড়িতে আসবে।

জনের মা এসে সুচিত্রাকে বেডরুমে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, "চিত্রা, আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। কুমকুমের ভবিষ্যৎটা তুমি নষ্ট করছো কেন? কুমকুম তোমাদের মেয়ে, তাকে নষ্ট করার এভরি রাইট তোমাদের আছে। কিন্তু এর ফলে আমার জন-এরও নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে।"

ভদ্রমহিলার কথা শুনে সুচিত্রা তো তাজ্জব—"আপনি কী বলছেন?"

এগনেসের কাছে জানা গেলো, জন গতকাল মায়ের কাছে দু'ডলার চেয়েছে। জন-এর মা সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বললেন, "তোমার লজ্জা করে না জন? কাজ না করে পয়সা চাইছো? জন তাতে বেশ রেগে ওঠে। কুমকুমের কথা তুলে বলে, পয়সার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কী? কুমকুমের মা তো ওকে বলে দিয়েছে, দরকার হলেই পয়সা চাইবে।"

এগনেস গম্ভীরভাবে বললেন, "চিত্রা, প্লিজ ডোন্ট মাইণ্ড। কিন্তু তুমি নিজের সন্তানের আত্মসম্মান নষ্ট করছো। তাকে ভিখিরী হতে উৎসাহ দিচ্ছো। আমি তো জনকে একশো ডলার দিতে পারি। কিন্তু কেন

দেবো?”

সুচিত্রা বললো, “শংকরদা, বুঝুন ব্যাপারটা। আমার মেয়েকে দুটো পয়সা দিলে সেটা ভিক্ষা দেওয়া হলো। আমি কিন্তু ছাড়ছি না। এখান থেকে আট মাইল দূরে আর এক বাঙালী থাকেন। মিস্টার এণ্ড মিসেস্ কর। ওঁদের ছেলের বয়সও আট-নয় বছর। ওঁদের একই সমস্যা—ছেলেকে কাজ করতে বললে পয়সা চাইছে। ওঁরা একটু নরম প্রকৃতির মানুষ। বলছিলেন, যস্মিন দেশে যদাচার। ভাবছেন ছেলেকে মজুরি দিয়েই কাজ করাবেন। আমার কর্তাও ওঁদের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন। আমি কিন্তু খাপ্পা হয়ে উঠেছি। বলেছি, কিছুতেই না। বিদেশে আছি বলে সন্তানকে অমানুষ করতে পারবো না। বাবা-মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে কাজ করবে, এ হতে দেবো না।”

সুচিত্রার সমস্যা শুনে আমিও গম্ভীর হলাম। বললাম, “ব্যাপারটা কঠিন বটে।”

সুচিত্রা বললো, “জিনিসটা আমার কাছে মোটেই ছোট নয়। মেয়ের সঙ্গে বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা এর ওপরেই নির্ভর করছে। দরকার হলে আমি কুমকুমকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। আমিও না হয় কয়েক বছর দেশে গিয়ে থাকবো। ও তো নিজের দেশে চাকরি পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, মেয়েকে আমি বাড়ির কাজের জন্যে পয়সা দেবো না। মেয়ে এখনও নিজের গোঁ নিয়ে বসে থাকে—আমিও ওকে কিছু করতে বলি না।”

ভাবলাম, সুচিত্রাকে বলি, মানিয়ে-গুছিয়ে চলো। কিন্তু এক্ষেত্রে কী উপায়? ছোট্ট এই ঘটনার মধ্যে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পনেরো মিনিট ধরে অনেক মাথা ঘামালাম। কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না। এগনেস যা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তি আছে। ওঁরা শিশু বয়স থেকে সন্তানদের আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইছেন। ওঁরা ভাবছেন ইন্ডিয়ানরা সন্তানদের পরনির্ভর করে রাখেন, বড় বয়সেও তারা খোকা হয়ে থাকে, জাতটা ভিখিরীর জাতে পরিণত হয়। আর সুচিত্রা ভাবছে, সংসারের গোড়ার কথা। বাবা-মা এবং সন্তানদের ভালবাসার মধ্যে পবিত্রতা থাকবে। সে-সম্পর্ককে পয়সা কেন কলুষিত করবে?

দুই সভ্যতার এই সংঘর্ষ সুচিত্রার সংসারে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু কোনো পথ তো খুঁজে পাচ্ছি না।

সুচিত্রা বললো, "আমি অনেক ভেবেছি, শংকরদা। ওঁর সঙ্গে তো রাতের পর রাত ধরে আলোচনা করেছি। মিস্টার এণ্ড মিসেস্ করও ভেবেছেন। কিন্তু মানিয়ে-গুছিয়ে চলার পথ তো খুঁজে পেলাম না।"

বললাম, "আমি উঠি সুচিত্রা। প্লেনে বসেই মাসীমাকে বিস্তারিত লিখে নেবো। ওঁরা সে-যুগের মানুষ, সমাজতত্ত্বও পড়েননি। তবু তো মা, জেনে রাখুন।"

প্লেনে বসেই সুনয়নাদেবীকে আমি সব লিখেছিলাম। বলেছিলাম "আমি কোনো আশা দেখছি না। তবে সুচিত্রাকে আপনি ভাবতে বারণ করে দেবেন। না-হলে ওর শরীর খরাপ করবে।"

রচেস্টার থেকে বেরিয়ে নানা পথ ঘুরে সপ্তাহ দুয়েক পরে আমি ডেনভারে হাজির হয়েছিলাম। ওখানে হোটেল থেকে সুচিত্রাকে দূরপাল্লার ফোন করলাম। ভাবলাম, জেনে নিই ও আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরবে কিনা।

ওপার থেকে সুচিত্রার স্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম। "শংকরদা, কবে আসছেন?" সুচিত্রাকে বেশ খুশি-খুশি মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অমিত, কুমকুম ওরা কেমন আছে?" সুচিত্রা হৈ হৈ করে বললো, "খু-উ-ব ভাল। শংকরদা, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। পরশু মা'র চিঠি পেয়েছি। মাকে সব লিখে দিয়ে আপনি যা উপকার করেছেন। এখন ভাবছি, মাকে আগে লিখিনি কেন? ওঁরা তো সেকালের জয়েন্ট ফ্যামিলির মেয়ে, মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে ওঁদের তুলনা নেই।"

"সমাধানটা কী?" আমার জানবার প্রবল আগ্রহ হলো।

সুচিত্রা টেলিফোনের ওধার থেকে বললো, "মা লিখেছেন, সামান্য ব্যাপারে অত ভাববার কী আছে? কুমকুম এখনকার মতো মিস্টার করের বাড়িতে কাজ করুক, আর মিস্টার করের ছেলে সঞ্জয় তোর বাড়িতে কাজ করে টাকা রোজগার করুক। তাহলে ওদেরও কেউ ভিখিরী বলবে না, তোমাদেরও মনে কষ্ট হবে না। জানেন শংকরদা, মিস্টার কর তো হাতে চাঁদ পেয়েছেন। আমার কর্তা একটু আগেই কুমকুমকে মিস্টার

করের বাড়িতে কাজ করবার জন্যে নিয়ে গেছেন। মিস্টার করের ছেলে কাল আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করতে আসবে।"

আমি স্তম্ভিত। সুচিত্রা বললো, "রাগ করে কী লাভ? আমাদের মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হবে। তাই না?"

আমার উত্তরের আগেই ডেনভার-রচেস্টার দূরপাল্লার টেলিফোন কেটে গেলো।

[গ্রন্থসূত্র
যেখানে যেমন]

মাখনদা ও মিস্টার মানকেলো

সেবার ক্লিভল্যান্ডে বঙ্গ সম্মেলনের দিনগুলো বড় আনন্দে কেটেছিল। বাঙালির মানসিক সজীবতার সঙ্গে আমেরিকান কর্মদক্ষতার মিলনে সম্মেলনের সববকম ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল অতি চমৎকার।

বাঙালি পুরুষ ও বাঙালি মহিলা মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে চলছে আড্ডা। অথচ সব কিছু আয়োজন চলছে ঘড়ির কাঁটার মতন। কত দূর দূর অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন সপরিবারে, তাঁদের অসুবিধেও অনেক। কিন্তু সবাই হাসিমুখে সব রকম কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন। সারাজীবনে কম সভা-সমিতিতে যাইনি, কিন্তু ক্লিভল্যান্ডের মতন এমন চমৎকার ব্যবস্থাপনা কোথাও দেখিনি।

কর্মকর্তাদের আর একটা মজার দিক হলো, এতো বড় সম্মেলনের আয়োজনের দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারেই বেশ কয়েকজন দূরের অতিথি এসেছেন, এবং তাঁদের সকলকে নিয়ে সারাক্ষণ নরক গুলজার হচ্ছে! ব্যাচেলর রণজিৎ দত্ত তো দশভুজ হয়ে উঠেছেন—তাঁর বাড়ি এখন হাউস ফুল—অথচ সবকিছু সাংসারিক দায়িত্ব তাঁর। একটি ঠিকে কাজের লোক সপ্তাহে দু'বার ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসেন। কিন্তু বণজিৎ দত্তর ছবির মতন সাজানো সংসার দেখলে কে বলবে তাঁর গৃহিণী নেই, রাঁধুনি নেই, চাকর নেই?

কাজেকর্মে কষ্ট আছে, কিন্তু হাতের গোড়ায় দেশের মানুষ পেলে বিদেশের বাঙালিরা সব দুঃখ ভুলে কিছুক্ষণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। যে-সব পরিবার বাইরে থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বয়েছেন, প্রসন্নহৃদয় রণজিৎ তাঁদের স্ত্রীদেরও বলছেন, "আমার বউ নেই। কিন্তু বাড়িতে সাজগোজের ইনফ্রাস্টাকচার অর্থাৎ আয়না আছে। সুতরাং চলো সব ওখানে সন্ধ্যার আসরে হাজির হবার আগে।" এর অর্থ বণজিৎবাবু অগণিত মানুষকে চায়ের নামে ভূরিভোজনে আপ্যায়ন

করবেন---বাড়িটা সব অর্থে আনন্দভুবন হয়ে উঠবে।

ডঃ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যও এই আড্ডায় উপস্থিত হয়েছেন। এঁর মেজাজটি অনেকটা মুজতবা আলীর রচনার মতন—সুযোগ পেলেই একটু ইয়ারকি ফচকেমি করে নেন।

বৈজ্ঞানিক আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার কয়েকটি পয়েন্ট আমি রণজিৎ-গৃহের ড্রইংরুমে বসে টুকে নিচ্ছিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দু বললেন, "আরে মশাই লেখা তো সারাজীবন আছে, ক্লিভল্যান্ডের এই আড্ডা তো আর আগামীকাল থাকবে না।"

"বেচারা ঢেঁকি! তাকে স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হয়।" আমাকে সমর্থন করলেন রণজিৎবাবু।

আনন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা দিব্যেন্দু কিছুটা শুনেছেন। দিব্যেন্দুর রসিকতা, "সায়েবদের জয়যাত্রা মন খারাপ করে দেয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তেড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা লেখা পড়েছিলাম, প্রধান চরিত্রের নাম মিস্টার মানকেলো—তাকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল!"

এবং জানাতে বাধ্য হলাম মানকেলো সায়েবের ঘটনাটা আমিই লিখেছিলাম— গতবারের মার্কিন দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে।

হৈ-হৈ করে উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। বললেন, "লেখাটা এখানে অনেকের প্রিয়—মুখে-মুখে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজে খুব রটে গিয়েছে।"

দিব্যেন্দু ছাড়েননি। লেখাটা আমাকে পড়তে বাধ্য করছিলেন। মানকেলো সায়েবের এই বৃত্তান্ত কোনো বইতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁর ব্যাপারটা জেনে রাখা প্রয়োজন ভেবেই এখানে দেওয়া হলো।

মাখনদার চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই বুঝলাম, উনি ভীষণ ইনসালটেড ফিল করছেন। বিদেশে অমন ঠাণ্ডা পরিবেশেও তাঁর চোখ দুটো ইলেকট্রিক হিটারের ইগনিশন কয়েলের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা দুজনেই মিস্টার মানকেলোর কার্পেটে-মোড়া ঘরে ফুলের মতন নরম ফোম-রবারের গদিতে বসে আছি। কোনোরকম শারীরিক কষ্ট হবার কথা নয়। তবু মাখনদা বাংলায় আমাকে জানালেন, "খুব

অস্বস্তি বোধ করছি, শংকর। মনে হচ্ছে যেন শর-শয্যায় বসিয়ে রেখেছে আমাকে।"

মাখনদার মেজাজ এবং মুখচোখ দেখে আমিও বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। একেই আমি নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ—তার ওপর পাকে-চক্রে এসে পড়েছি এই ফরেন কানট্রিতে। আমি কোনোরকমে ইডিয়মেটিক বাংলায় হাওড়া-শিবপুরের ইনটোনেশন দিয়ে মাখনদাকে অনুবোধ জানালাম—ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক! বিখ্যাত এই কোটেশনটা হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাঁব কোনোদিনই ভুলবার কথা নয়।

কিন্তু দেশাত্মবোধক উষ্ণ উদ্ধৃতিতেও কাজ হলো না। প্রত্যুত্তরে মাখনদা আমাদের ইস্কুলের আর একখানা বিখ্যাত উদ্ধৃতি ছাড়লেন, "ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তারপরেই মাখনদার বিপদ সংকেত, "শংকর, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে—আমাব মেজাজেব ব্রেক এবার নিশ্চয় ফেল করবে। তুই আমাকে ক্ষমা কবিস। মনে হচ্ছে আমি তলিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আর নিচে নামতে আমি বাজি নই।"

মাখনদার কথাতেই বুঝেছি, ক্রাইসিস পয়েন্টে পৌঁছতে আব দেবি নেই। ধৈর্যেব বাঁধ বিপন্ন, বন্যা যে-কোনো সময় বিপদসীমা অতিক্রম কববে।

ক্রাইসিসটা কী? কোথায়? কেন? এবং মানকেলো সায়েবটিই বা কে?

কী করে বিদেশে দৈবের বশে আমি এই গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম তা অবশ্যই আপনাদের কাছে নিবেদন করতে হবে। কিন্তু তার আগে মাখনদার পরিচয়টা আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখতে চাই।

মাখনদা মানে মাখনলাল পাঁজা। স্বদেশ থেকে সতেরো হাজার সাতশ সাতাশ মাইল দূরে এই শহরে মাখনদার সঙ্গে যে আমার পুনর্মিলন হবে তা আমাদের ইস্কুলের মহাকবি গৌরমোহন দাস পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেননি।

মাখনদার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা হাওড়া ওলাবিবিতলা লেনের মুখে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যখন বললেন, "ও লর্ড, কেন তুমি এই ইন্ডিয়া সৃষ্টি করেছিলে? নরক বলে তো একটা জায়গা তোমার

আস্তারে ছিল, তাতেও মন পোষালো না?”

“কী এমন ব্যাপার হলো, মাখনদা? অমন দাপাদাপি করছেন কেন?” আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

“যারা নরকেও থাকবার যোগ্য নয়, সেইসব পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যই তো ইন্ডিয়া এবং স্পেশালি এই হাওড়া শহর তৈরি হয়েছে।” এই বলে মাখনদা নাকের ওপর রুমালটা আরও জোরে চেপে ধরেছিলেন।

“রসিকতা করিস না, শংকর। সব জিনিসের ইয়ে একটা সীমা আছে,” মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, “তুই এখনও ফিক-ফিক করে হাসছিস?”

“কী হলো আপনার মাখনদা?” ইস্কুলের সিনিয়র ছাত্রদের আমরা ‘দাদা’ ও ‘আপনি’ বলতে ট্রেনিং পেয়েছি। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখানোর অনেক সুবিধে—বাসে দাদারা কেউ থাকলে টিকিট কাটতে হয় না।

মাখনদা এবাব বিরক্ত হয়ে বললেন, “তুই কী ওই পচা কাঁঠালের ভুতুড়িটা দেখতে পাচ্ছিস না? তোব নাকেব কি কোনো সিরিয়াস অসুখ করেছে?”

নাক তুলে কথা বলায় আমার খুব রাগ হযে গিয়েছিল। আমরা যাকে বলে কিনা অকৃত্রিম হাওড়া নাগরিক, আমাদেব নাকের সহ্যশক্তি অনেক। রাস্তা, বাড়ির বারান্দা এসব তো ময়লা ফেলার জায়গা বলেই আমরা জানি। এই তো একটু আগেই বুড়োশিবতলায় মিষ্টির দোকানের সামনে একটা মরা বেড়ালকে পচতে দেখে এলাম। কই আমার তো মেজাজ খারাপ হলো না? সেখানে কেমন খোশ মেজাজে যুবকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা গল্পগুজব চলছে, কেউ তো ব্যস্ত হচ্ছে না। আর সামান্য একটা কাঁঠালের ভুতুড়ি—যার ওপর মাত্র ডজন পাঁচেক নীলরঙের মাছি নট নড়ন-চড়ন হয়ে বসে আছে, সেই দেখে মাখনদার এমন বদমেজাজ!

“আমেরিকা হলে এতেক্ষণে কী হতো জানিস?” মাখনদা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

আমি ইন্ডিয়ান নাগরিক, আমাব.আমেরিকা-রাশিয়া-চায়নার খবর

রাখার কী দরকার? আমি পরের ব্যাপারে অতশত মাথা ঘামাই না।

মাখনদা বললেন, "এতোক্ষণে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। অন্তত দেড়শ টেলিফোন কল চলে যেতো আমেরিকান মিউনিসিপ্যালিটিতে। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করতো যে এই কাঁঠাল ফেলেছে তাকে—কাঁঠাল খাও আর কাঁঠালের ফোঁড় গনো না।"

আমি তখনও অতশত বুঝি না। আমি বলেছিলাম, "আমেরিকা কী এখনও ব্রিটিশ শাসনে রয়েছে?"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন মাখনদা। "এর সঙ্গে স্বাধীনতা পরাধীনতাব সম্পর্ক কী? তুই ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্সের চ্যাপটার পড়িসনি? কোন দুঃখে ইউ-এস-এ ব্রিটিশের দাসত্ব কবতে যাবে? বরং উল্টোটাই এখন সত্যি হতে চলেছে।"

আমি নার্ভাস হয়ে বললাম, "এই সব অত্যাচার পরাধীন দেশে ইংরেজবাই চালাতো জানতাম। আমার দেশের রাস্তায় আমার খাওয়া কাঁঠালের ভুতুড়ি ফেলবো তাতে পুলিশের কি? এটা তো আমাদের মৌলিক অধিকার। না-হলে এতো কষ্টে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মেরে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ইংরেজকে কুইট ইন্ডিয়া করিয়ে লাভ কী হলো?"

মাখনদার মাথায় তখন ফরেন ব্যাপারটা গজ-গজ করছে। বললেন, "অনেক পাপ করলে লোকে এই ইন্ডিয়ায় জন্মায়! বিদেশের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। সভ্য হতে আমাদের আরও দেড় হাজার বছর লেগে যাবে।"

মাখনদাই বলেছিলেন, "ফরেনে লোক খৈনি টিপতে-টিপতে কানে পৈতে জড়িয়ে কথায়-কথায় রাস্তার ধারে বসে পড়ে না। ফরেনে আমাদের মতো লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে না, গায়ে গা ঠেকলে ফরেনের সায়েবরা পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।"

"ফরেনে যে মা-ভগবতীকে কেটে খায়, তার বেলায়?" আমি পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু মাখনদার সঙ্গে পেরে ওঠাই শক্ত ব্যাপার। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুরা যে কথায়-কথায় মোষ বলি দেয় তার বেলায়? মোষ আর গোরুতে তফাৎ কি? কালো রং বলে যত দোষ!"

আমরা মাখনদার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছি, তিনি মনে-মনে বিদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। এই ডার্টি ইন্ডিয়ার প্রায় কিছুই তাঁর পছন্দ নয়।

চলনে-বলনে মাখনদা একেবারে পাকা সায়েব হয়ে উঠেছেন। কি করে টাইয়ের গিঁট বাঁধতে হয়, কোন সময় কোন রঙের জুতো পরতে হয়, কখন থ্যাংক ইউ বলতে হয়, কত সামান্য কারণে চেনা-অচেনা লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, কোথায় পকেট থেকে রুমাল বের করতে নেই, কোথায় ঢেকুর তোলা নিষিদ্ধ—এসব তাঁর কণ্ঠস্থ।

মাখনদার সঙ্গে কিছুক্ষণ মিশলেই আমাদের হীনম্মন্যতা এসে যেতো। মাখনদার গায়ের শার্ট বকের মতো শাদা, ইস্ত্রিবিহীন প্যান্ট পরতে তাকে কেউ দেখেনি। মাখনদার জুতো সব সময় ঝক-ঝক করতো—ইচ্ছে করলেই ওদিকে মুখ রেখে চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়। মাখনদার চুলও সব সময় বিন্যস্ত—সব সায়েবী নিপুণতা, কোথাও দিশিলোকদের মতো খুঁত নেই।

মাখনদার আরও গুণ ছিল। তিনি ইংলিশ স্টেটসম্যান ছাড়া কোনো অখাদ্য কাগজ পড়তেন না—ফরেন থেকে বিমান ডাকে তাঁর নামে আরও কী সব ম্যাগাজিন আসতো, তাতে কী সুন্দর-সুন্দর মেমসায়েবদের ছবি থাকতো! মনে হবে, মেমসায়েব ঠিক যেন আমার দিকেই প্লিজড হয়ে স্পেশাল কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

মাখনদা কোনোদিন ভুলেও হাওড়ার সিনেমায় ঢোকেননি—তাঁর নিয়মিত গন্তব্য কলকাতার মেট্রো, লাইট-হাউস, এলিট। মাখনদা রেডিও খুলতেন শুধু দুপুরের বিশেষ এক সময়, যখন মনে হয় খোদ বিলেত থেকে সায়েব-মেমদের গান ভেসে আসছে। মাখনদা খাবার ব্যাপারেও ছিলেন পাকা সায়েব। কখনও নগেন পালের কচুরি, হরিধন মোদকের জিলিপি, নানকু সাউয়ের হালুয়া, ক্ষেত্তরের ঘুগনি, হরিদাসের বুলবুলভাজা খেয়ে শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেননি।

মাখনদা বলতেন, "এই পাঁচ আঙুলে ডাল-ঝোল মেখে সাপটে খাওয়া খুবই আন-সায়েন্টিফিক।"

"খাওয়া ইজ খাওয়া। এর সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক রে বাবা?"

আমরা একটু অবাক হয়ে যেতাম।

"বুঝবে একদিন! যখন আজীবন পেটের অসুখে ভুগবে," সাবধান করে দিতেন মাখনদা।

"ওরে বাবা! পেটের অসুখটা আবার অসুখ নাকি? পেটের অসুখটা তো বলতে গেলে প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্মগত অধিকার! এতে লজ্জার কী, লুকোবারই বা কী?"

মাখনদা বলেছিলেন, "হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতে আমেরিকা হলে। স্মলপক্সের মতো পেটের অসুখটাও নোটিফায়েবল ডিজিজ—কেউ বারকয়েক বাথরুম করেছে শুনলেই জনস্বাস্থ্য বিভাগে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কেন এমন হলো? কী খেয়েছিলে, কোথায় খেয়েছিলে? কোন দোকান থেকে খাবার কিনেছিলে? এসবের ফিরিস্তি দিতে-দিতে নাড়ি ছেড়ে দেবার দাখিল হতো।"

এসব কারণেই মাখনদা কাঁটাচামচ ব্যবহার করতেন—কোনো সভ্য দেশেই নাকি আজকাল ডান হাতের ব্যবহার নেই। মাখনদা সেজেগুজে ডিনার টেবিলে বসতেন, পায়ে চটি থাকতো এবং সামনে চীনে মাটির ডিশ সাজানো থাকতো। মাখনদা ভুলেও কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতেন না, তাঁর কোলের ওপর থাকতো দুধের মতো সাদা ন্যাপকিন।

মাখনদার আরও এক সায়েবীআনা ছিল। ডিনারের পরেই টুথব্রাশ ও পেস্ট নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, "সকালে উঠে দাঁত-মাজাটা নিতান্তই ভুল—ফরেনে কেউ তা করে না। আর দাঁতে বুরুশ অথবা নিম দাঁতন ঘষতে-ঘষতে পাড়া বেড়িয়ে আসার থেকে বর্বরতা সভ্যসমাজে অকল্পনীয়! দাঁত মাজাটা একটা প্রাইভেট অ্যাফেয়ার—পাবলিককে দেখিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অপকর্মের অসভ্যতা কবে যে বন্ধ হবে!" মাখনদা নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারতেন না।

মাখনদা যে জেনুইন্ সায়েব এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ইন্ডিয়ায় জন্ম নিয়েছেন এমন সন্দেহ আমার বন্ধুমহলে প্রায়ই প্রকাশ করতাম।

এই মাখনদা যে শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া ছেড়ে দেবেন তা আমরা আন্দাজ করেছিলাম। মাখনদা যখন সত্যিই কী একটা কাজ নিয়ে দমদম থেকে হাওয়াই জাহাজে উধাও হলেন, তখন কেউ-কেউ মন্তব্য

করেছিলেন—ফরেনের জিনিস তো ফরেনে ফিরে যাবেই!

মাখনদার একটা ব্যাপারে আমাদের একটু স্পেশাল উদ্বেগ ছিল। সেটাও ওঁর নাম নিয়ে। পৃথিবীতে সব লোকেরই পোষাকী নামটা ভাল হয় এবং ডাক নামটা একটু নিরেস হয়। মাখনদার ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো, ভাল নাম মাখনলাল পাঁজা, ডাক নাম সুপ্রতীক। ব্যাপারটার পিছনে ভুল বোঝাবুঝি আছে। মাখনদাকে ইস্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর মায়ের বাবা সুধাসিন্ধু সামন্ত। সুধাসিন্ধুবাবু ভুল করে আদরের নাতির ডাক-নামটাই ইস্কুলের ফর্মে লিখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বিপত্তি। যখন ভুলটা জানাজানি হলো তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। কড়া ইস্কুল, নামের রেকর্ড পালটাতে চাইলে না—বললে এফিডেভিট করতে হবে। সে-সব শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি, তাই মিষ্টি নামটাই রয়ে গেলো।

ফরেনে মাখন নামটা কেমনভাবে নেওয়া হবে এ-বিষয়ে আমাদের মনে কিছু উদ্বেগও ছিল। কিন্তু একজন ফচকে ছোকরা বলেছিল, "অত ভাবিস না—বাটারের সঙ্গে ফরেন ব্রেডের চমৎকার মিল হবে।"

এই মাখনদার সঙ্গে যে অনেক বছর পরে বিদেশে আবার দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারিনি! চান্স পেয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমেরিকায় এসে পড়েছি। ওয়াশিংটনের প্রাথমিক পর্ব চুকিয়ে আমি ছোট এক মার্কিনী শহরের হোটেলে উপস্থিত হয়েছি। মালপত্তর গুছিয়ে সবে একটু বিছানায় ফ্ল্যাট হয়েছি, এমন সময় টেলিফেনে ক্রিং ক্রিং।

"হ্যালো মিস্টার শংকর? স্পিক হিয়ার টু মিস্টার পান্‌জা।"

এ আবার কোন সায়েব? আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ওমা! সায়েব নয়। "হ্যালো শংকর, আমি মাখন বলছি। ভেবেছিলি, লুকিয়ে-লুকিয়ে এই দেশ দেখে চলে যাবি। হলো না তো?"

মাখনদা একটু পরেই হোটেলে এসে হাজির হলেন। বললেন, "লন্ডনে পটলের কাছে টেলিফোনে খবর পেলাম।" পটলদা আমাদের ইস্কুলের আর এক ছাত্র।

"পটলের সঙ্গে টেলিফোনে মাঝে-মাঝে আড্ডা মারি।" মাখনদা বললেন।

"অ্যাঁ! আটলান্টিকের দু'পাশ থেকে আড্ডা!"

"অনেকেই আড্ডা মারে—ডাইরেকট ডায়ালিং তো! টেলিফোন তুলে পটলের সঙ্গে কথা বললেই হলো। পালং শাকের ঘণ্টোর রেসিপিটা জানা ছিল না, তাই লন্ডনে পটলকে ফোন করতে গেলাম। তখনই শুনলাম, তুই লন্ডনে পটলের সঙ্গে দেখা করেছিস এবং এখানে আসছিস।"

সামান্য পালং শাকের ঘণ্টোর মশলা জানবার জন্যে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে দূরপাল্লার টেলিফোন! ভাবা যায় না।

আমি ভেবেছিলাম, সায়েব হবার যেটুকু বাকি ছিল তা এদেশে পূরণ করে নিয়েছেন মাখনদা। কিন্তু তিনি কী সুন্দর বাংলায় কথা বললেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, মাখনদার বাংলায় বিশেষ ইংরিজি খাদ নেই।

মাখনদা আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। বললেন, "আমি গোলাপীকে বলে এসেছি। ও তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। গোলাপী তোর বউদি।"

খুব লজ্জা করতে লাগলো। মাখনদার কোনো খোঁজ-খবরই রাখিনি আমি। এর মধ্যে তিনি কতবার দেশে ঘুরে গিয়েছেন, কবে গোলাপীকে বিয়ে করে এনেছেন তা-ও আমার জানা নেই।

নিজের পারিবারিক খবরাখবর জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোন ইয়ারে বিয়ে করলেন, মাখনদা?"

মাথা চুলকে তিনি বললেন, "তা ন' বছর হয়ে গেলো। সময় কী ভাবে উড়ে চলে! তুই আমার দুই মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করবি। তোর মেয়ের নাম কী?"

আমি বললাম "জুলি। জুলিয়েট কুরী থেকে অনুপ্রেরণা।"

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। মাখনদা বললেন, 'আমার বড়টির নাম কুসুমকুমারী আর ছোটটি বিপত্তারিণী।"

"এ্যাঁ! এই ইউ-এস-এ-তে বসে মেয়ের নাম বিপত্তারিণী! মাখনদা করেছেন কী?"

"কেন? এদেশে কী বিপদ নেই যে বিপত্তারিণীর প্রয়োজন হবে না।" সরল মনে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "তা হলে ওঠা যাক এবার।"

হঠাৎ হোটেলের পাট চুকিয়ে কারও বাড়িতে চলে যাবার অসুবিধে

আছে আমার। হোটেল ঠিক করে দিয়েছেন আমার নিমন্ত্রণকর্তা।

"ওদের কাছে কিছু দাসখত লিখে দিসনি যে মাখনদার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবি না," আমার মনে শক্তি যোগাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

দাসখত নেই, কিন্তু অসুবিধা আছে। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কোনো-কোনো শহরে স্থানীয় হোস্টের ব্যবস্থা আছে। মিস্টার মানকেলো এখানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন—তিনি এখানকার উদ্যোক্তা, তিনি হয়তো কারো সঙ্গে এই হোটেলে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন, সে-সব বানচাল হয়ে যাবে।

"সে-সব দেখা-সাক্ষাৎ আমার বাড়ি থেকেও হতে পারে—আমরা তো পর্দাপ্রথা পালন করি না।" মাখনদা তর্কের পয়েন্ট তুললেন।

অগত্যা সত্যি কথাটা বললাম। "মাখনদা হোটেল ছেড়ে চলে গেলে ইন্ডিয়ার প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে যায়। হোটেল খরচ যাঁরা দিচ্ছেন কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিলে তাঁরা ভাবতে পারেন যে দুটো ডলার বাঁচাবার জন্যে ইন্ডিয়ানরা অতিমাত্রায় লালায়িত।"

এবার মন্ত্রবৎ কাজ হলো। দেশের মান-সম্মানের কথা উঠতেই মাখনদা বললেন, "আলবৎ, ভারতবর্ষের মাথা নিচু হয় এমন কোনো কাজ অবশ্যই করবে না। আমি তো ইন্ডিয়া-ইন্ডিয়া করে পাগল হয়ে গেলাম। ইন্ডিয়ার গায়ে হাওয়া লাগলে আমার দেহটা সিরসির করে ওঠে। কত বড় দেশের সন্তান আমরা, আমাদের মূল্য এরা বুঝতে পারছে না আমরা গরীব বলে।"

মাখনদার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেশের সমালোচনায় যিনি সব সময় মুখর হয়ে থাকতেন তিনিই এই বিদেশে কট্টর স্বদেশীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

মাখনদা বললেন, "তোকে তো দেশের কথাই বলতে এসেছি। কাজেকর্মে কথাবার্তায় এখানে এমন দাগ রেখে যা যে ওরা যেন বুঝতে পারে ইন্ডিয়াকে কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। এমন কিছু করিস না যাতে ভারতবর্ষ ছোট হয়ে যায়। তোকে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই, যদি কারও বাড়ি বাথরুম ব্যবহার করিস বাথটবটা মুছে খটখটে করে তবে বেরিয়ে আসবি। এর যেন কখনও অন্যথা না হয়।"

"কলঘর, সে তো ভিজে থাকবেই, মাখনদা!" আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি।

"সে আমাদের দেশের কলঘর। এখানে কলঘর মানে শুকনো খটখটে! যদি কারও গাড়িতে বেড়াতে বেরোস তাহলে গাড়ির পার্কিং ফি-টা তুই অফার করিস। আর ট্যাকসিওয়ালাদের খুব লিবারেলি বকশিশ দিবি। বকশিশ না পেলেই ব্যাটারা ইন্ডিয়ার নামে যা-তা রিমার্ক পাশ করে।"

মাখনদার দিকে আমি সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। এ কী সেই মাখনদা একসময় যিনি ইন্ডিয়ার কোনো কিছুই দেখতে পারতেন না?

মাখনদা বললেন, "আর একটা কথা, এখানকার কিছু লোকের বড় দম্ভ। গরীব দেশগুলো সম্বন্ধে বেশ নাক উঁচু ভাব। তাঁদের কখনও ছাড়িস না। লম্বা নাক দেখলেই নাকে একটা থাবড়া দিয়ে দিবি। কিছু হাফ-পচা গম ধারে বিক্রি করে শালারা ভেবেছে একটা প্রাচীন মহান দেশের মাথা কিনে নিয়েছে।"

মাখনদার মুখে আনডিপ্লোম্যাটিক শালা কথাটি শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। কিন্তু সে-রাত্রে ডিনার খেতে ওঁর বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম প্রত্যেক আমেরিকানকে শ্যালক সম্বোধনের অধিকার তিনি আইনগতভাবেই অর্জন করেছেন।

মাখনদার ওয়াইফ দরজা খুলে দিলেন। "মিট ইওর গোলাপী বউদি", মাখনদা দিশি কায়দায় বললেন।

গোলাপী নাম, কিন্তু এ তো পুরো মার্কিনী তনয়া! ভাঙা-ভাঙা বাংলায় গোলাপী বউদি বললেন, "আপনি খুব আদরের দেবর, আসুন, আসুন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে মাখনদা একেবারে দিশি স্টাইলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে লিভিং রুমে হাজির হলেন। মাখনদা বললেন, "তোর বউদির অরিজিন্যাল নাম ছিল রোজী—আমি করে দিলাম গোলাপী। ও অবশ্য খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছে জিনিসটা। আমাদের বড় মেয়ে যখন হলো তখন নামকরণের কোনো অসুবিধা হলো না। গোলাপীর মেয়ে কুসুমকুমারী ছাড়া আর কী?"

ফুটফুটে বালিকা কুসুমকুমারী ইতিমধ্যে ঘরে এসে বসলো। কেমন

সুন্দর ভারতীয় প্রথায় কুসুমকুমারী আমাদের প্রণাম করলো! মাখনদা জানালেন, "ওকে আমি দেশের সব ম্যানারস্ শেখাচ্ছি। এয়ারমেলে বাংলা বইয়ের অর্ডারও দিয়েছি।"

গোলাপী বউদি চায়ের সঙ্গে এবার যা এগিয়ে দিলেন তা আমার অকল্পনীয়। খোদ মার্কিন মুলুকে বসে মুড়ি খাচ্ছি!

মাখনদা বললেন, "খা, খা। অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে, বেশ কয়েকশ ডলারের সরঞ্জাম কিনে তোর অনারে এই মুড়ি ভাজার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। পটলকেও লং ডিস্ট্যান্সে দু'বার কনসাল্ট করতে হয়েছে—ওর মাসীমা যে খুব ভালো মুড়ি ভাজতেন!"

আমি মুড়ি চিবোবো কি! আমার মনে পড়ে গেলো, দেশে মাখনদা চিড়েমুড়ি স্পর্শ করতেন না। টোস্ট এবং এগ ছাড়া সকালে অন্য কিছুই খেতেন না।

গোলাপী বউদি এবার নিজেই কাঁসার গেলাসে জল এনে দিলেন। বললেন, "ইওর দাদার ফেভারিট বেলমেটাল—ইন্ডিয়া থেকে বাই এয়ারে কয়েক হাজার ডলার খরচ করে পুরো সেট আনিয়েছেন।"

"ইনক্লুডিং ওয়ান পিতলের ঘড়া। এই দেখ না ওয়াটার কুলারের ওপর বসিয়ে রেখেছি। খুব কদর হয়েছে এখানে, কত মেমসায়েব যে দেখতে আসে তুই ভাবতে পারবি না!"

গোলাপী বউদি এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্জিন ব্রাটার ড্রয়িং ডিজাইন এবং সিক্রেট ভার্সগুলি তোমার জানা আছে নিশ্চয়?"

আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার অবস্থা। "হোয়াট ইজ ব্রাটা?" সে আবার কী জিনিস রে বাবা!

"ব্রত রে। কুমারী ব্রত। কুসুমকুমারীকে দিয়ে ব্রতটা করাবো ঠিক করেছি। ওদের ইস্কুল থেকেও খুব উৎসাহ দেখিয়েছে—অবসকিওর রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস সম্বন্ধে ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখবে। আমি অবশ্য বলেছি রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস, তবে অবসকিওর নয়। ইন্ডিয়াতে লক্ষ-লক্ষ কুমারী মেয়ে প্রতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে এসব পালন করেছে। পটলকে লং ডিস্ট্যান্সে ফোন করলাম, কিন্তু ও হতচ্ছাড়াও কিছু জানে না।"

ড্রয়িং ডিজাইন কিছুই জানা না থাকায় আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম।

গোলাপী বউদি বললেন, "আমাদের ছোট মেয়ের নাম বিপ্‌ট্যারিণী।"

"বিপত্তারিণী নামটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না, বুঝলি," দুঃখ করলেন মাখনদা। "সবাই ট্যারিনী বলে ডাকে, ভাবে ইটালিয়ান নাম। তুই সাহিত্যিক লোক, এই বিপত্তারিণী ব্যাপারটা ভাল করে ব্যাখ্যা কর তো।"

বিদেশে এ কী বিপদে ফেললে বিপত্তারিণী মা আমার! তাঁকে স্মরণ করে দুঃসাধ্য কাজটা শুরু করে দিলাম। গোলাপী বউদির সঙ্গে মাখনদাও খুব মন দিয়ে শুনলেন আমার লেকচার। তারপর নিজেই বললেন, "এক কথায় বিপত্তারিণী হলেন কমবাইনড লাইফফায়ার-মেরিন অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স পলিসি।" আমার দিকে তাকিয়ে এবার মাখনদা বললেন, "তোর বউদির পক্ষে এইটা বোঝা সহজ—ও প্রুডেনসিয়াল ইনসিওরেন্সে কাজ করতো।"

ওয়ান্ডারফুল! বিপত্তারিণীর ব্যাখ্যা শুনে মাখনদার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা খুশী হলেন।

রাতের খাবার সময় আবার বিস্ময়। টেবিল চেয়ারের ধারে-কাছে গেলেন না মাখনদা। মেঝেতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে দিলেন গোলাপী বউদি। বললেন, "আমাদের একটা ডাইনিং টেবিল আছে পাশের ঘরে, 'মাকান' ওটা পছন্দ করে না।"

খাবার আসতেই খালি হাতেই শুরু করলেন মাখনদা। কে বলবে, এই মানুষটাই কাঁটা চামচের গুণগানে আমাদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করেছিলেন!

"নিজের আঙুল নিজের মুখে পুরে দিলে খাওয়ার টেস্টই পাল্টে যায়! কিন্তু আমার অফিসে ও কর্মটি করবার উপায় নেই।" দুঃখ করলেন মাখনদা।

আমি দেখলাম, গোলাপী বউদি ও মেয়ে খাবার থালায় ডান হাত বাঁ হাত দুই গলিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। গোলাপী বউদি বললেন, "তোমরা প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ান এক-একটি ম্যাজিশিয়ান। কী করতে একটি হাতের পাঁচটি আঙুলে কোনো ইনসট্রুমেন্টের হেল্প না নিয়ে তোমরা মাছের কাঁটা ম্যানেজ করো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।"

"জানিস, ব্যাপারটা হাতে-কলমে দেখাবার জন্যে এখানকার টি-ভি সেন্টার আমাকে প্রোগ্রাম দিয়েছিল। আমি বললাম, এর পিছনে পাঁচ হাজার বছরের দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজ করছে! খুব হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছিল প্রোগ্রামটা, বুঝলি, শংকর!" মাখনদা মনের আনন্দে হাত চাটতে-চাটতে বললেন।

রাতে মাখনদা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে এসে বললেন, "একটাই আমার দুঃখ থেকে গেলো—তোকে পান খাওয়াতে পারলাম না। পান এই শহরে দুষ্প্রাপ্য। দোক্তা আনবার উপায় নেই—কাস্টমসে নারকোটিক বলে সন্দেহ করে।"

বিছানায় যাবার আগে আমার মনে পড়লো এই মাখনদাই বলেছিলেন, "গভরমেন্টের উচিত আইন করে পান খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। তাতে শুধু দাঁতের এনামেলের নয়, দেশেরও বারোটা বাজছে।"

ভোরবেলায় মাখনদা টেলিফোনে আবার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোর লোকাল গার্জেন কখন আসছেন?"

বললুম, "মিস্টার মানকেলো সাড়ে-আটটা নাগাদ আমাকে তুলে নেবেন।"

"যা ওঁর সঙ্গে কিছুটা ঘুরে আয়। বিকেলে আবার ফোন করবো'খন। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবেই। দেখি তেমন দরকার হলে ওই মানকেলোর পারমিশন নিয়ে নেবো'খন।"

এই পর্যন্ত বেশ ভালই চলেছিল। কিন্তু তারপরেই গণ্ডগোলের শুরু হয়েছিল। গোলমালের পাণ্ডা যে ডেভিড মানকেলো সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা আটান্ন বছরের মিস্টার ডেভিড মানকেলোর। শরীরের কাঠামোখানা দেখবার মতোই, এবং লম্বায় অন্তত ছ' ফুট।

ওই চেহারার সঙ্গে করমর্দন করবার সময়ে একটু সপ্রশংস দৃষ্টিতে মানুষটিকে আর একবার দেখেছি। তখনই মানকেলো সায়েব হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্রেফ প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম। পাঁচ জেনারেশন প্রোটিন না খেতে পারলে এরকম

কাঠামো হয় না।"

কথাগুলোর মধ্যে একটু ধাক্কা ছিল। মনে হলো মানকেলো সায়েব আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "তোমাদের দেশে তোমার বাবা, তোমার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা কেউ প্রোটিন খেতে পায়নি।"

মানকেলো সায়েব ধরেই নিয়েছেন ইন্ডিয়ান সব লোক রোগা-রোগা এবং তাদের হাড়গোড়গুলো পাটকাঠির মতো। মানকেলো বললেন, "টি-ভিতে আমি ইন্ডিয়ান চাষীদের ছবি দেখেছি, আহা ভেরি সিকলি। ওইরকম লিকলিকে চেহারায় তারা গুরুতর পরিশ্রম করবে কী করে? যদি কোনো ইন্ডিয়ান কাজে ফাঁকি দেয়, চুপচাপ বসে থাকে, তাকে দোষ দিও না। দোষ দিও তার ঠাকুর্দার বাবাকে—প্রোটিন অভাবে চেইন রি-এ্যাকশন!"

মানকেলো সায়েবের মহড়া নিতে পারে এমন তাগড়াই ইন্ডিয়ান যে হাজার-হাজার আছে একথা বলবার আগেই ভদ্রলোক মুখ খুললেন। "তুমি তো সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে আসছো, তুমি তো এই রোগা হাড়ের ব্যাপারটা স্পেশালি জানবে।"

কেন রে বাবা! কলকাতা থেকে এসেছি বলে, ভগ্নস্বাস্থ্য শীর্ণ ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার বাড়তি জ্ঞান থাকবে কেন?

মানকেলো হেসে বললেন, "এই যে আমাদের আমেরিকান নেশন এতো বড়ো কেন?"

মাথা চুলকে উত্তর দিতে গেলাম, "প্রচুর জমিজায়গা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তোমাদের, সেই তুলনায় লোকজন অনেক কম, তাই ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েদেয়েও তোমরা বড়ো হচ্ছো।"

"ওয়ার্লডের বেশীর ভাগ নন-আমেরিকানের এই ধারণা। কিন্তু সেন্ট পারসেন্ট ভুল। আশা করি, নিজের চোখে তুমি কিছুটা দেখে যাবে!"

আমেরিকার গ্রেটনেসের কারণটা এবার ব্যাখ্যা করলেন কট্টর স্বদেশী মিস্টার ডেভিড মানকেলো। তিনি বললেন, "আমরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় চলি। আমরা মতামতে বিশ্বাস করি না, আমরা নির্ভর করি তথ্যের ওপর। কোনো-কোনো দেশ স্রেফ থিওরির ওপর নির্ভর করে পিছিয়ে যাচ্ছে শুনেছি।"

মিস্টার মানকেলো অগাধ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "এই যে

রোগারোগা হাড়ের কথা বললেন, এটা মনগড়া মতামত নয়! তুমিও তো বুঝতে পারছো, আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি না। আমার এক বন্ধুর বায়োলজিক্যাল দোকান আছে—তার কাছেই শুনলাম, তোমাদের ক্যালকাটা খুব বড় এক্সপোর্টার। পৃথিবীর যেখানে যত নরকঙ্কাল দরকার হয় সব ওখান থেকে একচেটিয়া সরবরাহ হয়। বছরে কয়েক শ নরকঙ্কাল নাড়াচাড়া করতে হয় আমার ফ্রেন্ডকে, কিন্তু সব কাঠির মতো রোগা-রোগা! কলকাতার নাগরিক হিসেবে তুমি তো এ ব্যাপারে আমার থেকে অনেক ভাল জানবে।"

মানকেলো সায়েব আরও বললেন, "যখন টি-ভিতে দেখি কিংবা খবরের কাগজে পড়ি আমাদের দেশ সম্বন্ধে বাইরের লোকেরা বিশেষ কিছু জানে না তখন খুব দুঃখ হয়। শেষ পর্যন্ত এই স্বেচ্ছাসেবার কাজ নিয়েছি। বিদেশ থেকে আসা লোকদের হাত-ধরে আমাদের উন্নতিটা দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো কেন ইউ-এস-এ সব দেশের আগে রয়েছে।"

বুঝলাম, এই জন্যেই মিস্টার মানকেলো স্বেচ্ছায় আমার সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সংবাদে আরও বিচলিত হলাম। সায়েব বললেন, "তুমিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো। যদিও সত্যি কথা বলতে কি তুমিই প্রথম ভারতীয় নয় যার সঙ্গে আমার দেখা হলো।"

ব্যাপারটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার মানকেলো বলেলেন, "ওই যে কঙ্কাল—আমার ফ্রেন্ডের দোকানে একটা ইন্ডিয়ান স্কেলিটন আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। কলকাতা থেকে জাহাজে পাঠানো।"

আমার সঙ্গে দোকানে কফি পান করে সায়েব নিজেই দাম মেটালেন। আমাকে কিছুতেই পয়সা বের করবার সুযোগ দিলেন না। বললেন, "আমি তোমাদের দেশের বিদেশিমুদ্রা সমস্যা সম্বন্ধে পড়েছি। প্রতিটি ডলার সযত্নে রক্ষা করা তোমাদের উচিত।"

আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। সায়েব আমাদের দেশ সম্বন্ধে আরও কি কি পড়েছেন তা ভগবান জানেন! আমি সে-সব কল্পনা করে শিউরে উঠছি।

মানকেলো সায়েব আমাকে বিরাট মোটর গাড়িখানা দেখালেন।

বললেন, "আমরা বিগ নেশন, বিগ পিপল, আমাদের মনও বিরাট। তাই বড় মোটর গাড়ি ছাড়া আমাদের চলে না।"

সায়েব আমাকে প্রায় জোর করে গাড়ির পিছনের সীটে ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, "এর বিশেষত্বটা লক্ষ্য করছো? শুয়ে পড়ো।"

শুয়ে পড়ে, সায়েবের নির্দেশে পা ছড়িয়ে দিলাম। "এবার বুঝতে পারছো নিশ্চয়!" সায়েবের মুখে একগাল হাসি। "পা ছড়িয়ে দিয়েও জায়গা রয়েছে। এর নাম আমেরিকান অটো! নিজের গাড়িটাও নিজের বাড়ি, তুমি কেন পা গুটিয়ে শোবে? হাজার হোক পা তো তোমারই!"

এই বড় গাড়ি সম্বন্ধে আমি একটা গুজব শুনেছিলাম। আমেরিকান মহিলাদের চুলের ক্ষতি হয় বলে হুড-খেলা গাড়ি উঠে গেলো এবং ঘরের বাইরে যুবক-যুবতীদের একান্ত শয্যা-সুখের প্রয়োজন মনে রেখেই বড় গাড়ি সৃষ্টি হলো। কিন্তু মিস্টার মানকেলো আমাকে সে প্রশ্ন তুলবার সময়ই দিলেন না।

পরবর্তী প্রশ্নে তিনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। "ইন্ডিয়াতে তুমি কি এখনও বুলক কার্টেই যাতায়াত করো?"

"গোরুর গাড়িতে? আমরা!" আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

মানকেলো আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। বললেন, "তোমাদের দেশে দেড় কোটির বেশি গোরুর গাড়ি আছে পড়লাম। মজুর খাটবার জন্যে কোটি-কোটি বলদ আছে।" আমার আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করবার জন্যেই মিস্টার মানকেলো এবার অভিনন্দন জানালেন "কনগ্রাচুলেশন। খেটে-খাওয়া বলদের সংখ্যায় তোমরা যে ওয়ার্লডের ফার্স্ট তা আমার আগে জানা ছিল না।"

"ছাগলেও তোমরা ফার্স্ট। একসঙ্গে এতো ছাগল-পপুলেশন পৃথিবীতে কোথাও নেই।" মিস্টার মানকেলো এক-একটি খবর ছাড়ছেন, আর আমার স্বদেশী মেজাজ খাট্টা হয়ে উঠছে।

"বাঁদরেও তোমরা ওয়ার্লড লিডার।" শুনিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো।

সায়েবকে সহজে ছাড়বো না। ওই গোরুর গাড়ির ব্যাপারটা আমাকে ফয়সালা করতেই হবে।

সায়েবকে বলেই ফেললাম, "আপনার জেনে রাখা ভাল আমি রোজ

মোটর গাড়ি চড়ে আপিসে যাই এবং সেই গাড়ি আমার শ্বশুরবাড়ির টাউনে তৈরি হয়।"

বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন মিস্টার মানকেলো। "তুমি বিদেশিনী বিয়ে করেছো তা আমাকে কেউ বলেনি। তোমার ওয়াইফ ইংলিশ, ইটালিয়ান, জার্মান, সুইডিস, জাপানিজ না আমেরিকান?"

কোন দুঃখে আমার ওয়াইফ বেজাত হতে যাবে! "শী ইজ ভারতীয় এবং আমাদের হিন্দুস্থান মোটর গাড়ির মতোই শতকরা একশ ভাগ স্বদেশী। উভয়েই মেড ইন কোন্নগর, ডিসট্রিকট হুগলী, ওয়েস্টবেঙ্গল, ইন্ডিয়া।"

মানকেলো সায়েব খুব লজ্জা পেলেন। বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। "এই জন্যেই পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা হওয়া প্রয়োজন। আমাকে পীস কোরের এক ছোকরা বললো, পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে তোমাদের গোরুর গাড়ির কোনো ডিজাইন চেঞ্জ হয়নি।" এবার কোনো রিস্ক নিলেন না মিস্টার মানকেলো, জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা—তোমার মোটর গাড়ির মডেল ক'হাজার বছরের পুরনো?"

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। বললাম "মিস্টার মানকেলো, হাওয়া-ভরা টায়ার এবং হাওয়া-গাড়ি তো এই সেদিন আবিষ্কার হলো। এইট্টিন নাইনটি ফোর না নাইনটি ফাইভে প্রথম মোটর গাড়ি আপনাদের দেশ থেকে আমাদের দেশে গেলো।"

"আর বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি", অপরাধ স্বীকার করে নিলেন মিস্টার মানকেলো।

আমি ঝুঁকি নিলাম না। জানতে চাইলাম, "কী বুঝলেন?"

"সোজা অঙ্ক—তোমাদের মোটর গাড়ি এইট্টিন নাইনটি ফাইভ মডেল থেকে ব্যাকডেটেড হতে পারে না।" সায়েব আবার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিলাম, প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

গাড়ি চালাতে-চালাতে মানকেলো সায়েব বললেন, "আমাদের দেশে যখন এসেছো তখন দেখে রাখো এই সব আধুনিক জিনিস। এই যে আমি গাড়ি চালাচ্ছি হাতে ঠেলে-ঠেলে গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় না।

অটোমেটিক গিয়ার চেঞ্জার। গাড়ি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কোন দিকে যাচ্ছে তা এই যন্ত্রটার দিকে তাকালে বুঝতে পারবে।"

আমার এসব উন্নতির কথা জানা ছিল না, তাই আগ্রহের সঙ্গে দেখলাম। কিন্তু সায়েব তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সব নোট করে রাখো, ইন্ডিয়াতে ফিরে সবাইকে গল্প শোনাতে পারবে।"

মসৃণ কংক্রিটের রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে—রাস্তা তো নয় যেন শোবার ঘরের চকচকে মেঝে। তারিফ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মানকেলো মেজাজ খারাপ করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ক্যালকাটার রাস্তার অবস্থা কী রকম?"

আমি প্রশ্নটা না শোনার ভান করলাম—যেন দুপাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে আমি বুঁদ হয়ে আছি। সায়েব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি এনেছো নাকি তুমি? আমার কয়েকজন বন্ধু সম্প্রতি স্পেনের বুল ফাইট দেখে এসেছে, তারা শুনেছে ক্যালকাটায় স্ট্রীট-বুল ফাইটিং নাকি আরও উত্তেজনাপূর্ণ। আরও বিপজ্জনক!"

ভাগ্যে দেশ থেকে কোনো ছবি আনিনি। আনলে কী অবস্থা হতো আমার!

মানকেলো সায়েব এক দোকানের সামনে গিয়ে গাড়ি থামালেন। বললেন, "এটাও দেখে নাও, দেশে ফিরে গিয়ে গপ্পো করতে পারবে। আলিবাবার স্টোরিতে চিচিং ফাঁকের কথা শুনেছো এবার আমেরিকায় ব্যাপারটা দেখে যাও।"

সত্যি তাজ্জব ব্যাপার। দোকানের কাঁচের গেটের সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেলো। মানকেলো সায়েব আমার মতো দেহাতিকে এই সব জিনিস দেখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছেন।

আমার বিস্ময় বৃদ্ধির জন্য তিনি বললেন, "ভাবছো কোথাও কোনো গেটম্যান লুকিয়ে আছে এবং আমাদের দেখেই দরজা খুলে দিচ্ছে! মোটেই তা নয়—এসব সায়েন্সের ব্যাপার এবং নিশ্চয় শুনে থাকবে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যায় আমরা ওয়ার্লডের সবার থেকে অনেক এগিয়ে আছি।"

মানকেলো সায়েবের এই দাবি আমি অনেক আগেই মেনে নিয়েছি।

কিন্তু তবু সায়েব ছাড়বেন না। ওজন-মেসিনের মতো একটা যন্তর দেখিয়ে বললেন, "ওর ওপর পা তুলে দাও।" নির্দেশ মান্য করলাম। সায়েব তখন একটা পঞ্চাশ সেন্ট মুদ্রা দিলেন যন্তরকে। অমনি কোত্থেকে একটা বৈদ্যুতিক বুরুশ এসে আমার জুতো ঝেড়ে দিলো। আমি নেমে পড়ছিলাম, কিন্তু সায়েব ইঙ্গিতে বারণ করলেন। এবার যন্ত্রটা কালি বার করলো এবং আমার জুতোকে ঝকঝকে করে দিলো।

গর্বের হাসি হাসলেন মানকেলো সায়েব। বললেন, "কোন্ দেশে বেড়াতে এসেছো বুঝতে পারছো?"

হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি আমি! আমেরিকার এই মফঃস্বলেই যদি এমন কাণ্ড হয় তাহলে বড়-বড় শহরে কী চলে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা!

ইলেকট্রিক লিফ্‌টের কাছে গিয়ে সায়েব বললেন, "এর নাম লিফ্‌ট।"

আমার একটু দুঃখ লাগলো। সায়েব ভেবেছেন কী? আমি লিফ্‌টও দেখিনি!

মানকেলো সায়েব এবার বড়দা-স্টাইলে ভরসা দিলেন, "মন খারাপ কোরো না, এসব জিনিস একদিন পৃথিবীর সব দেশেই যাবে—শুধু একশ দেড়শ বছর সময়ের প্রশ্ন।"

সমস্ত দিনই এইভাবে চললো। বলবার কিছুই নেই—পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে!

সন্ধেবেলায় মাখনদা টেলিফোনে খবর করলেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "মনে রাখিস নিজের দেশকে তুলে ধরার চেয়ে বড় কাজ তোর এখানে নেই। কখনও কোনো অন্যায় সহ্য করবি না—মুখের ওপর ফটাফট উত্তর দিয়ে দিবি।"

টেলিফোনেই দু'একটা নমুনা শুনতে চাইলেন মাখনদা। ব্যাপারটা তিনি মোটেই হাল্কাভাবে নিচ্ছেন না।

আমি বললাম, "মাখনদা, মানকেলো সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দেশে এতো প্রোটিনের অভাব, ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হায়েস্ট

নাম্বার গোরুবাছুর তোমাদের রয়েছে, অথচ বীফ খাও না কেন?"

"তুই নিশ্চয় মুখ বুজে আক্রমণটা হজম করে নিয়েছিস," টেলিফোনে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন মাখনদা। "তোর প্রথমেই বলা উচিত ছিল, আমাদের দেশের ঋষিরা লিখেছেন, আপরুচি খানা।"

"মাখনদা, ওটা বোধহয় কোনো মোগল-রসিকের উক্তি—কৌপীনধারী উপবাসী ঋষিরা কি খানাপিনা বা পরনা নিয়ে ওই ধরনের পাবলিক বিবৃতি দিতেন?"

"আলবৎ ঋষি। জ্ঞানী-গুণী ঋষিরা মোগলদের থেকে কম যেতেন না," মাখনদা আমাকে সাহস যোগালেন।

"হ্যাঁ শংকর, তোকে যা বলছিলাম, সায়েবের কাছে প্রথম জবাব, আমরা শালা কী খাই-না-খাই, তাতে তোমাদের কি? নাম্বার টু, আমরা তো জিজ্ঞেস করছি না, তোমরা কুকুর খাও না কেন? নাম্বার থ্রি, ইন্ডিয়ানদের একটা বিরাট অংশ গোরু কেন, মাছ মাংস ডিম কিছুই খায় না। নাম্বার ফোর, ইন্ডিয়াতে বিরাট এক পাবলিক গোরু খায়, তারা মুসলমান খৃষ্টান পার্শী এটসেটরা! নামবার ফাইভ, সবাই বীফ্ খেতে আরম্ভ করলে, দেশের চাষ উঠে যাবে—হাল টানবার মতো বলদ, দুধ দেবার মতো গোরু আর একটিও থাকবে না। ছ নম্বর..."

আমার এবার ভয় হয়ে গেলো। "মাখনদা, এতোক্ষণ টেলিফোন এনগেজড থাকলে লাইনে গোলমাল হবে না? ক্রস কানেকশন হবার ভয় থাকবে না?"

"সে আবার কী? ক্রস কানেকশন, নো ডায়াল টোন, ঘড় ঘড় আওয়াজ হওয়া, ডায়াল করলে খট খট খটাং এসব টেলিফোন-রোগের কথা এদেশের কেউ জানে না। খুব সাবধান, ইন্ডিয়ান টেলিফোনের এই সব কথা ভুলেও এখানে তুলিস না।"

মাখনদা আমার অবস্থা আন্দাজ করে টেলিফোন ছেড়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে হোটেলে হাজির হলেন। স্বদেশের জন্যে এমন ভালবাসা দেশের মধ্যে আজকাল নজরেই পড়ে না। দেশকে ঠিক মতো ভালবাসতে হলে প্রত্যেকেরই একবার বোধহয় বিদেশে যাওয়া দরকার।

মাখনদার যে অনেক কাজ, তাঁর সময়ের যে অনেক দাম, তাঁর স্ত্রী

ও মেয়েদেরও যে তাঁর সময়ের ওপর দাবি আছে, এসব আমার অজানা নয়। কিন্তু তিনি সব কিছু নো-তোয়াক্কা করে দেশের লোকের কাছে চলে এসেছেন।

মাখনদা জানতে চাইলেন আমার সারদিনের কর্মবৃত্তান্ত। বললাম, "একটা ইস্কুলে গিয়েছিলাম, খুব আদরযত্ন করলো। তবে ছোট-ছোট ছেলেরা সব রেড ইন্ডিয়ানদের মতো ড্রেশ করে এসেছিল। আমাকে দেখে তারা একটু হতাশ হলো, জিজ্ঞেস করতে লাগলো কেন আমি জাতীয় পোশাকে আসিনি। খুব ভুল হয়ে গেলো মাখনদা, ডজন-খানেক ধুতি পাঞ্জাবি সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

মাখনদা আমার চোখ খুলে দিলেন। "ওরা তোর ধুতি পাঞ্জাবি দেখতে ব্যগ্র নয়—ওরা ভেবেছে, তুই একটা জ্যান্ত রেড ইন্ডিয়ান! তোকে যে ওয়ার ডান্সিং-এ নামিয়ে দেয়নি তাই ভাল।"

পরবর্তী অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করলাম। "মেয়েদের এক হাই ইস্কুলে গিয়েছিলাম। তেরো-চোদ্দ বছরের টিন-এজ গার্লদের ভিড়ে হল বোঝাই—তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভাবখানা এমন, যেন আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি।"

মাখনদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, "প্রথমে ভাবলাম, বাংলা সাহিত্যের কিছু খবরাখবর তাহলে এখানেও পৌঁছে গিয়েছে।"

ইস্কুলের দিদিমণিও স্বীকার করলেন, "এবারে রেকর্ড গ্যাদারিং—সভায় এরকম ভিড় অনেকদিন হয়নি। আগের মাসে ফাদার জনসন এসেছিলেন, সেবার মাত্র পাঁচটি মেয়ে উপস্থিত ছিল।"

মিস্টার মানকেলো আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি আমাকে কানে-কানে বললেন, "আমি কোনো ঝুঁকি নিইনি। যাতে হাউস-ফুল হয় তার আগাম ওষুধ হেড মিস্ট্রেসকে দিয়ে দিয়েছি।"

"তোর সম্বন্ধে সায়েব কী বললো রে বাবা!" চিন্তিত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "বোধহয় বলেছে রবিশঙ্করের ব্রাদার, তোরও শংকর নামটা রয়েছে তো।"

"শেষ পর্যন্ত শুনুন মাখনদা," আমি কাতরভাবে নিবেদন করলাম।

হেড মিস্ট্রেস মিসেস এলিশন এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

"মেয়েরা, আজকের এই মিটিংয়ের ব্যাপারে তোমরা যা আগ্রহ দেখিয়েছ তার অর্ধেক আগ্রহ যদি প্রতিদিনের পড়াশোনায় দেখাও তা হলে তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে।"

খিলখিল, কিশোরী-হাসির বন্যা বইলো।

"মেয়েরা", আবার আরম্ভ করলেন মিসেস এলিশন। "তোমরা সবাই দশ-এগারো বছর বয়স থেকে বয়ফ্রেন্ড এবং ডেটিং নিয়ে ব্যস্ত। তোমাদের ধারণা, সমস্ত পৃথিবীটাই এইভাবে চলছে। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় এই ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখো। ইনি এবং এঁর স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বিয়ের রাতে। তার পরে মেনি ইয়ারস কেটে গিয়েছে।"

"কত বছর?" মেয়েরা তারস্বরে জানতে চাইলো।

"অনেক বছর," উত্তর দিলেন মিসেস এলিশন। "তবু এখনও এঁদের ডাইভোর্স হয়নি। এঁরা হ্যাপিলি ম্যারেড।"

"মাখনদা, প্রত্যেকটি মেয়ে আমাকে এমনভাবে দেখতে লাগলো যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে নতুন কোনো নিদর্শন এসেছে।"

"হুম্". বিরক্ত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "ইন্ডিয়ান সোসাইটির বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে তোর কিছু বলা উচিত ছিল। আমাদের মেয়েরা যে এখনও কত নিষ্পাপ, কত পলিউশন-ফ্রি তা তোর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।"

"ব্যাখ্যা করবো কী মাখনদা? একটা মেয়ে তো তখন আমার বউয়ের জন্যে খুব দুঃখ করছে—পুওর মিসেস শংকর। ভদ্রমহিলা জানতেই পারলেন না লাইফটা কী!"

এমন সময় মানকেলো সায়েবের টেলিফোন এসে গেলো। "হাই! শংকর, কী হলো, এখনও তুমি এলে না? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"খুবই দুঃখিত মিস্টার মানকেলো। আমার বহুদিনের হারানো এক ইন্ডিয়ান বন্ধু এসে গিয়েছেন।" এরপর মাখনদার বিবরণ দিলাম। মানকেলো সায়েব বললেন, "তোমার বন্ধুকে ফোনটা দাও।"

ভালই হলো, মাখনদাও আমার সঙ্গে চললেন। মানকেলো সায়েব

ওঁকেও সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মাখনদাকে বাড়িতে ফোন করে ক্ষমা চাইতে হলো। আগামী কাল ভোরে ওঁর অফিস। তবু তিনি আমার সঙ্গী হলেন। কারণ আমাকে একলা পেয়ে ইন্ডিয়ার আর-এক দফা ক্ষতি হোক তা মাখনদা কিছুতেই সহ্য করবেন না।

গাড়িতে যেতে-যেতে আমি মিস্টার মানকেলোর কথা ভাবছি। মাখনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সাদা সায়েবের নাম কেলো হলো কী করে?"

"পয়সাকড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি হলে এদেশে সাদা-কালো সবারই সমান দেমাক হয়।" মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিলেন। তাঁর চিন্তা তখন স্বদেশ সম্পর্কে। বললেন, "মানকেলো যদি বাড়াবাড়ি করেন তা হলে আজ যোগ্য শিক্ষা দিতে হবে।" মাখনদা তো ইন্ডিয়াতে নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর গলায় যেন সন্ত্রাসবাদীর সুর।

তিনি বললেন, "আজ কিন্তু ইন্ডিয়াকে ওপরে তুলতেই হবে। যে-করে হোক বুঝিয়ে দিতে হবে সব ব্যাপারেই সায়েবরা এগিয়ে নেই।"

"সেটা কী করে হবে?" আমার চিন্তা বেড়ে যায়। "একমাত্র জনসংখ্যা ছাড়া সেরকম আর কোনো বিষয় আছে?"

"সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে", মাখনদা নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিচ্ছেন। "ওদের মুখে চুনকালি দেবার মতো বিষয় নিশ্চয় আমাদের আছে। শোন্ তেমন প্রয়োজন হলে, তুই চুপ করে যাবি, তোর নাম করে আমিই মুখ খুলবো। জন্মভূমির নুন তো আমাকে একদিন শোধ করতেই হবে।"

দরজার কলিংবেল টিপতেই মানকেলো সায়েবের ভৌতিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। "হ্যালো, শংকর?"

আমার উত্তর পাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেলো অথচ কেউ নেই। অনেক দূরে মিস্টার মানকেলো দাঁড়িয়ে আছেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "এখানে সব অটোমেটিক ব্যাপার। বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলাম।"

"যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ হতো তা হলে তো বিপদে পড়ে যেতেন!"

"মোটেই নয়," মানকেলো আমাকে বোঝালেন। "তার কারণ, এইখানে সি-সি-টি-ভিতে তোমার ছবি আমি দেখে নিয়েছি। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন!"

"অ্যাঁ! এ যে ময়দানবের পুরী!"

মিস্টার মানকেলো বললেন, "এই যে তোমার সঙ্গে গল্প কবছি এই ছবিও কলঘর থেকে আমার স্ত্রী দেখতে পাচ্ছেন। এখনই তিনি নেমে আসবেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মানকেলো বললেন, "বুঝতেই পারছো, বার বার ছোটাছুটি করে দরজা খুলবার হাঙ্গামা আমাদের নেই। তোমাদের নিশ্চয় এসব যন্ত্রপাতির অভাবে খুব ভুগতে হয়।"

মাখনদা গোড়া থেকেই রেগে আছেন। বাংলায় ফিসফিস করলেন, "বল না, আমাদের অন্য যন্ত্রপাতি আছে। অন্তত এখনকার মতো মান রক্ষে হোক।"

আমার মুখ খুললো না। ভরসন্ধেবেলায় কাঁচা মিথ্যে কথা বলি কী করে?

মিস্টার মানকেলো ততক্ষণে তাঁর বাড়ি দেখাতে শুরু করছেন। "শংকর-এর নাম ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। বোতাম টিপলেই সব কিছু মশলা গুঁড়ো হয়ে যায়। এই অ্যাটাচমেন্ট জুড়লেই মাংস হয়ে যায় কীমা!"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত এবং আমরা গাঁইয়া অবস্থা দেখে মাখনদা বেশ বিরক্ত।

সায়েব কিন্তু আমার ছানাবড়া চক্ষু দেখে খুব সন্তুষ্ট। বললেন, "এই ঘরে তেইশ রকম ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আছে! সব অটোমেটিক।" ইলেকট্রিক ছুরি, ইলেকট্রিক হাঁড়ি, ইলেকট্রিক বঁটি আরও কত কী সব! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা।

আমি বোকার মতো বলে ফেললাম, "ছুরি, বঁটি, দা, শিলা-নোড়া হাঁড়ি-কড়া সবই আমাদের আছে—কিন্তু কোনোটাই অটোমেটিক নয়। প্রত্যেকটির পিছনে বড্ড মেহনত করতে হয়।"

এই ধরনের উত্তরই যেন মানকেলো সায়েব প্রত্যাশা করেছিলেন। সগর্বে বললেন, "দেখে যাও সব—ফিরে গিয়ে তোমার ফ্রেন্ডদের

বলতে পারবে। ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ারসে তোমরা তো কিছুই চেঞ্জ করোনি।”

এবার বাথরুমের দিকে নিয়ে গেলেন মিস্টার মানকেলো। ওরে সর্বনাশ! কল ঘরেও কতো রকমের কলকব্জা। সায়েব বললেন, “তোমাদের দেশে দাড়ি কামানোর সরঞ্জামের খুব অসুবিধে বোধ হয়। আমার এক ফ্রেন্ড ডেল্লির রিপাবলিক-ডে-প্যারেডের ছবি তুলে এনেছিল—দেখলাম সমস্ত সৈন্যদের দাড়ি। সঙ্গে অবশ্য ম্যাচিং হেডগিয়ার রয়েছে যার নাম পুগরি।”

“পুগরি নয়, সাহেব, পাগড়ি।”

“আই অ্যাম স্যরি, তা তুমি এই মেসিনে অটোমেটিক দাড়ি কামাতে পারো।”

সায়েব এবার যন্ত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু না-বাবা ওইসব ইলেকট্রিক জিনিস গালে ঠেকিয়ে বৈদ্যুতিক শক খেতে রাজী নই। “এদিক-ওদিক একটু-আধটু লিক থাকলেই ইলেকট্রিক শেভার না ইলেকট্রিক ডেস্ট্রয়ার বোঝা যাবে না!”

মানকেলো সায়েব আমার কথায় খুব হাসছেন। “তুমি ইলেকট্রিক শেভারে ভয় পাচ্ছো, আর-এক আফ্রিকান ইয়ংম্যান এসেছিল গত বছরে, সে কিছুতেই ইলেকট্রিক কম্বল গায়ে দেবে না। তাকে নিয়ে রাত্রে আমার রীতিমত সমস্যা, কারণ আমার বাড়িতে ইলেকট্রিক কম্বল ছাড়া কম্বলই নেই।”

কী সব দেখছি বাবা! হয়তো এখানকার লোটাও ইলেকট্রিক। মাখনদা বাংলায় সাবধান করে দিলেন, “এখানে কেউ লোটা ব্যবহার করে না, তুই আর বাইরের লোকের সামনে আমাদের ইজ্জত ডোবাস না।”

সায়েব এবার দেখালেন, ইলেকট্রিক টুথ-ব্রাশ। পাছে আমি সন্দেহ করি, তাই মেশিনটা চালু অবস্থায় একটু ব্যবহার করে নিলেন।

ইলেকট্রিক-দাঁতন রেখে সায়েব হাত ধুয়ে নিলেন। কিন্তু গামছা বা তোয়ালেতে হাত মুছলেন না। একটা পাইপের সামনে হাতদুটো নাড়তে লাগলেন। আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, “মিসেস মানকেলো হয়তো ধোয়া তোয়ালে দিতে ভুলে গিয়েছেন!”

"নো নো! এটা হলো অটোমেটিক তোয়ালে—সামনে হাত ধরলেই গরম হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে।"

আরও দু-খানা কল দেখিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো। একখানা অটোমেটিক ডিশওয়াশার—"এঁটো বাসনপত্র ভিতরে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দাও। বাকি বাসন মাজার কাজ মেশিনে হবে।" আর একখানা অটোমেটিক কাপড়-ধোলাই কল। ইলেকট্রিক-ধোপা বলা চলতে পারে। এসব জিনিসের কথা কস্মিনকালেও কল্পনা করিনি।

মানকেলো বললেন, "এই মেশিন থাকলে বর্ষাকালেও ডোন্ট কেয়ার। এই মেশিন শুধু কাপড়ই কাচে না, দশ মিনিটে ভিজে কাপড় একেবারে শুনো খটখটে করে দেয়!" মিষ্টি হাসি দিয়ে সায়েব তাঁর বিজয়-ঔদ্ধত্য চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি—সুন্দরবন থেকে প্রথম কলকাতায় এলেও লোকে বোধহয় এমন ধাক্কা খায় না।

মাখনদা কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছেন না। শুদ্ধ বাংলায় আমাকে বললেন, 'মহাভারত বা রামায়ণে তো অনেক আধুনিক জিনিসের বর্ণনা আছে। ওখানে এই বৈদ্যুতিক-ধোপার মতো কিছু নেই?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "উড়ন্ত পুষ্পকরথের কথা আছে। কিন্তু এইসব আজব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে রামায়ণ মহাভারত সম্পূর্ণ নীরব। সীতার সংসারে একটা ডানলোপিলো বা একটা ফ্রিজিডেয়ার পর্যন্ত ছিল না।"

দুঃখে মাখনদা মাথার চুল টানতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। মিস্টার মানকেলো কিন্তু ছুটে যাবার ব্যস্ততা দেখালেন না। আমি বললাম, "আপনার টেলিফোন হয়তো কেটে গেলো—কোনো আওয়াজ হচ্ছে না।"

"কোনো চিন্তা নেই।" আশ্বস্ত করলেন মিস্টার মানকেলো। "ওখানেও অটোমেটিক মেশিন আছে—ফোন তুলে মেশিনই জিজ্ঞেস করে নেবে কে কথা বলছেন, তারপর রিকোয়েস্ট করবে, আপনি ধরুন, মিস্টার মানকেলো এখনই আসছেন।"

এ্যাঁ! ভূতকে বাড়িতে মাস-মাইনের চাকরি দিয়েছেন নাকি মিস্টার মানকেলো?

আবার মুচকি হেসে সায়েব রসিকতা করলেন, "এই টেলিফোন অপারেটর-মেশিন তোমাদের দেশে নেই?"

মানকেলো সায়েব এবার টেলিফোন ধরতে চলে গেলেন আর সেই অবসরে মাখনদা রাগের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন।

নিকটবর্তী ফোম রবার গদিতে বসে পড়লাম আমরা। অপমানে ঘেমে উঠেছেন মাখনদা। মুখ লাল করে তিনি বললেন, "আর সহ্য হয় না। এদের বাড় বড্ড বেড়েছে। কিন্তু অতিদর্পে হত লঙ্কা।"

কিন্তু এটা লঙ্কা নয়—ইউ-এস-এ। যুগটাও বিংশ শতাব্দী, রামায়ণের কাল নয়। এ যুগে অতি দর্পে কিছু হয় না, বরং সম্মান আরও বেড়ে যায়। কিন্তু মাখনদা আজ দর্পহারী ইন্ডিয়ান মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয় করতে বদ্ধপরিকর।

"ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি আমি। এবার যা-হয় হবে, আমি সায়েবকে শিক্ষা দেবো, সায়েবকে বুঝিয়ে দেবো ইন্ডিয়াকে নিয়ে রসরসিকতা চলবে না।" মাখনদার স্বদেশী রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে তা বুঝতে পারছি।

মাখনদা বললেন, "শোন। এবার ওই সায়েব তোকে অটোমেটিক ঘড়ি, জুতো, ইলেকট্রনিক চশমা, ফাউন্টেনপেন এটসেটরা আরও কত কি দেখাবার মতলব ভাঁজছে কে জানে। তুই কিন্তু ঘাবড়ে যাস না।"

"আমার আর ঘাবড়াবার বাকী কি আছে, মাখনদা? ইউ-এস-এ এতো এগিয়ে আছে জানলে আমি এখানে আসতামই না। এতো প্রগতি আমাদের সহ্য হয় না। আমাদের পক্ষে বিলেতই ভাল।"

"তুই ওসব কথা মুখে আনিস না, শংকর। তোর মাখনদা তো এখনও মরেনি। আমার এখনও সেই পুরনো শিখ-পাঞ্জাবী পলিসি—শির দেবো তবু শরম দেবো না!"

"মাখনদা!" আমি কাতরভাবে আবেদন জানালাম, "পরিস্থিতিটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চলুন আমরা বরং ফিরে যাই। যাবার আগে বলে যাবো, আমাদের ইন্ডিয়াতে এতো সব জিনিস নেই কিন্তু বুদ্ধ, অশোক, গান্ধী মায় যীশুখ্রীষ্টও তোমাদের দেশে জন্মায়নি।"

"ওসব বড়-বড় নামে চিঁড়ে ভিজবে না রে।" নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বোধহয় মাখনদা বললেন। "এদের জব্দ করতে হলে আইটেম-

বাই-আইটেম অপমান করতে হবে।"

কী যেন ভেবে নিলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "শোন, এবারে সায়েব যা দেখাবেন যা বলবেন, তুই সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস ইন্ডিয়াতে আছে। তারপর আমি দেখছি।"

আমি একটুও সাহস পাচ্ছি না। "বড্ড মেথডিক্যাল জাত এই আমেরিকানরা। যদি পুরো বিবরণ জানতে চায়? তাহলে যে সর্বনাশ হবে মাখনদা।"

"মিস্টার মানকেলো তো ইন্ডিয়ার সবকিছু মুখস্থ করে বসে নেই।" অভয় দিলেন মাখনদা।

তবু আমার প্রয়োজনীয় সাহস হচ্ছে না। "মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে গেলে তার থেকে অপমান নেই। বিশেষ করে এই ফরেন কানট্রিতে।"

"আঃ," চাপা বকুনি লাগালেন মাখনদা। "অ্যামবাসাডর-এর ডেফিনিশন শুনিসনি?"

"শুনেছি বৈকি। ফোর্টিন হর্স পাওয়ার, ফোর সিলিন্ডার, সেলুন বডি...।"

"ও তোর শ্বশুর বাড়ির টাউনের অ্যামবাসাডর মোটর গাড়ির ডেসক্রিপশন!' আমি বলছি রাষ্ট্রদূতের কথা। শোন, অ্যামবাসাডর হচ্ছেন তিনি যিনি বিদেশে যান মিথ্যে কথা বলতে স্বদেশের জন্যে।"

তড়িৎগতিতে আমার মনে পড়ে গেলো আমরা যারাই বিদেশে এসেছি তারাই দেশের বেসরকারী অ্যামবাসাডর। সুতরাং...।

মাখনদার কথা আবার আমার কানে ঢুকছে। "সায়েব যাই দেখাক, তুই বলবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস তোর হাওড়ার বাড়িতে আছে। কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি। জয় মা হাজার-হাত কালী, জয় মা ওলা-বিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ক্ষুধিত বাঘের মতো মাখনদা এবার মানকেলো সায়েবের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিসেস মানকেলো ইতিমধ্যে সুসজ্জিতা ও সুগন্ধিতা হয়ে নিচে নেমে এলেন। আমাকে খুব হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। বললেন, "জনের মুখের তোমার কথা অনেক শুনেছি। তারপর আজ মেয়েদের স্কুলে তোমাকে নিয়ে যে সেনসেশন হয়েছে তার রিপোর্টও আমার এক

বান্ধবীর কাছে পেলাম। গ্রেট! মেয়েরা এমন পুরুষমানুষ কোনোদিন দেখতে পাবে ভাবেনি। তোমার ওয়াইফ সঙ্গে এলে তো ইস্কুল ভেঙে পড়তো—এমন মেয়ে বিয়ের রাতের আগে স্বামীর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক হয়নি!"

আমি প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছি। কী বলবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

মিসেস মানকেলো এবার সমস্যা আরও পাকিয়ে তুললেন। বললেন, "বিশ্বাস করো, তোমার ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছিল আমার। কিন্তু মিস্টার মানকেলোর মুখে একটা কথা শুনে কিছুটা বিব্রত হলাম।"

আবার কী হলো!

"আমি শুনলাম, দেশে ফিরে গিয়েই তুমি ডেটিং শুরু করবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত! কী সব বলছেন এই ভদ্রমহিলা?

মাখনদা ইতিমধ্যে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছেন। তিনি গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করলেন, "মহাশয়া, আপনি ভারতবর্ষের ব্যাপারটা ঠিক বোঝেন নি। আমাদের ওখানে ডেটিং নেই, তবে মেয়ে-দেখা আছে। শংকর দেশে ফিরে গিয়েই মেয়ে দেখা শুরু করবে তার ভাইয়ের বউ সিলেকশনের জন্য।"

খুব ক্ষমা চাইলেন মিসেস মানকেলো। "কী লজ্জার ব্যাপার! আমি তো ধারণা করে নিয়েছি, তোমাদের ওখানে ভাইয়ের ফিউচার ওয়াইফের সঙ্গেই ডেটিং করবার নিয়ম!"

"অল্পের জন্যে রক্ষে হয়ে গেলো, মাখনদা। এরা কী সব ভেবে রেখেছে কে জানে!"

মাখনদা বললেন, "তুই চিন্তা করিস না। সব ঠিক করে ফেলবো।"

যথাসময়ে মিস্টার মানকেলো ফিরে এলেন। এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মিসেস মানকেলো খাবার সাজাবার জন্যে প্যানট্রিতে চলে গেলেন।

ডিনারের জন্য অপেক্ষা করবার আগে মানকেলো সায়েব আমাদের আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এবার তোমাদের এ-বাড়ির সর্বাধুনিক যন্ত্রটা দেখাবো। একেবারে হালফিল আনা হয়েছে। সম্পূর্ণ অটোমেটিক।" ট্রানজিস্টারাইজড, সলিড স্টেট, হাইব্রিড, হাইফাই

আরও কতকগুলো বিচিত্র শব্দ পরের-পর উল্লেখ করে গেলেন মানকেলো সায়েব।

দেখলাম টেবিলের ওপর একটি ছোট্ট কেটলি রয়েছে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "একে অর্ডিনারি জিনিস ভেবো না। আমেরিকান সুপার টেকনোলজির সুপার লেটেস্ট অবদান।"

আমি বোকার মতো তাকিয়ে আছি ওঁর দিকে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "কেটলির সঙ্গে একটা কোয়ার্টজ ঘড়ি রয়েছে যা বছরে হাফ সেকেন্ডের বেশি স্লো-ফাস্ট যায় না। এই ঘড়ির দু-নম্বর কাঁটা ঘুরিয়ে তুমি কেটলিকে নির্দেশ দিতে পারো। চল্লিশটা পর্যন্ত হুকুম এর মিনি কমপিউটারে মজুত রাখা যায়!"

"মানে?"

"মানে কেটলিতে জল ভর্তি করে আমি ঘড়ির কাঁটায় ছ'টা করে দিলাম। ঠিক ভোর ছটার পাঁচ মিনিট আগে অটোমেটিক ইলেকট্রিক হিটার চালু হয়ে যাবে। জল যেমন ফুটতে আরম্ভ করবে অমনি..."

ঠিক এই সময় মাখনদা আমাকে কনুইয়ের ধাক্কা দিলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলাম, "এ-আর কী? এর থেকে বেটার জিনিস আমার বাড়িতে আছে।"

এরকম উত্তরের জন্য সায়েব প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বড়দা স্টাইলে বললেন, "একটু ধৈর্য ধরো, এখনও সবটা বলা হয়নি। জল ফোটা মাত্রই কেটলির ইলেকট্রনিক ঢাকনি অটোমেটিক খুলে যাবে এবং ওপর থেকে অটোমেটিক একটা কিংবা দুটো টী-ব্যাগ জলের মধ্যে নেমে আসবে এবং কেটলির মুখ আবার বন্ধ হয়ে যাবে।"

আমি আবার কনুইয়ের সিগন্যাল পেলাম। এখন আর কোনো উপায় নেই। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ির ব্যবস্থা এর থেকেও বেটার।"

বিরক্তি চেপে রেখে সায়েব বললেন, "এখনও সবটুকু শোনা হয়নি তোমাদের। হাল্কা, কড়া, খুব কড়া—তিনটে বোতাম আছে। যেটা টিপে রাখবে সেই অনুযায়ী চা তৈরি হওয়া মাত্রই কেটলি থেকে টুংটুং হাইফাই স্টিরিওফোনিক বাজনা আরম্ভ হবে। তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে কেটলির কাছে চলে এসো। চা রেডি। কেটলি থেকে ঢালো এবং

খাও। ওয়াইফকেও এক কাপ দাও।"

সায়েব ভেবেছিলেন এবার আমার মুখ বন্ধ হবে। কিন্তু আবার কনুইয়ের খোঁচা খেয়েছি আমি। সুতরাং বললাম, "আমার বাড়ির সিস্টেম এর থেকে অনেক অটোমেটিক—অনেক হাঙ্গামা কম।"

মানকেলো সায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠলো। "ইন্ডিয়া যে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে এতো এগিয়ে গিয়েছে তা জানতাম না। জাপানীরাও এই মিনি মারভেলো মেশিনের কথা ভাবতে পারছে না, শংকর।"

এবার আমার সত্যিই বুক ধুকপুক করছে। মানকেলো সায়েব জিজ্ঞেস করলেন বলে, তোমার বাড়ির মেশিনটি কি রকম?

যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো। মানকেলো সায়েব প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন। আর আমি একমনে মা হাজার-হাত কালীকে ডাকতে লাগলাম। "মা, এই সায়েবের জিবটাকে আধ ঘণ্টার জন্যে অসাড় করে দাও।"

শিবপুরে মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা পৌঁছলো কিনা জানি না, কিন্তু মাখনদা নিজেই এবার যুদ্ধে নেমে পড়লেন। বললেন, "শংকর একটুও বাড়িয়ে বলেনি। এই আমেরিকান কেটলিতে অনেক উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সিটি বাজলেই তোমাকে উঠে আসতে হয়। কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে সিস্টেম রয়েছে তাতে বিছানা ছেড়ে টেবিল পর্যন্ত আসতে হয় না।"

"অ্যাঁ!" মানকেলো সায়েবের চোখ দুটো ছানাবড়া হবার উপক্রম।

আমারও বুকের ধুকপুকুনি বাড়ছে। কী করছেন মাখনদা! এইভাবে কত মিথ্যে বানিয়ে বলবেন!

তিনি বললেন, "শংকরের বাড়িতে যে সিস্টেম আছে তাতে কেটলি থেকে চা কাপে অটোমেটিক ঢালা হয়ে গিয়ে প্রয়োজন মতো দুধ-চিনি মেশানো হয়ে যায়?"

"তাহলে তোমরা ইন্ডিয়াতে এ ব্যাপারে এক কদম এগিয়ে আছো।" মানকেলো সায়েব বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু মাখনদা বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। "দাঁড়াও। এখনও সমস্তটা বলা হয়নি—এক কদম নয়, বহু কদম এগিয়ে রয়েছে ইন্ডিয়া।"

বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন মিস্টার মানকেলো। আমিও তখন বোকা বনে গিয়েছি।

মাখনদা বললেন, "আমাদের বন্ধুটি লাজুক, তাই এইসব মেশিনের কথা উল্লেখই করছে না। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।"

আবার আক্রমণ করলেন মাখনদা। "চা তো কাপে অটোমেটিক তৈরি হলো। তারপর সেই কাপ সোজা মুভ করতে লাগলো বিছানার দিকে।"

"অ্যাঁ! রিমোট কনট্রোল? ফ্লাইং কাপ-ডিস!" মানকেলো সায়েব এবার মোক্ষম ঘা খেয়েছেন।

"ফ্লাইং সসারের একটা মিনি সংস্করণ বলতে পারো। তবে এখনও সবটা বলা হয়নি।"

মানকেলো সায়েব হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

মাখনদা বললেন, "ইন্ডিয়ার প্রধান সমস্যা হলো মশা। তোমাদের আবিষ্কৃত ডি-ডি-টি ছড়িয়ে এইসব মশার কিছুই করা যায়নি। ফলে এনসেন্ট মসকিটো নেট ছাড়া বিছানা হয় না। কিন্তু এই মেজর প্রবলেম সত্ত্বেও ফ্লাইং কাপডিসের কিছু অসুবিধে হয় না।"

"মশারির নেট কেটেই কাপ-ডিস ভিতরে ঢুকে পড়ে!" সায়েবের গলা ঘড়-ঘড় করছে।

"পুওর কানট্রি, প্রত্যেক দিন মশারির নেট ছিঁড়লে চলবে কি করে? স্পেশাল প্রসেসে মশারির মধ্যে কাপ-ডিস ঢোকে কিন্তু নেটের কোনো ক্ষতি হয় না, সেইটাই এই ট্রিপল-সুপার হায়েস্ট-ফায়ডিলিটি করোনেশন কোয়ালিটি ম্যাগনা-সিস্টেমের সিক্রেট বিউটি! ঘুমের ঘোরে চা খাবার পরে এঁটো কাপ-ডিস আবার রিটার্ন জার্নি শুরু করে—যেমন চাঁদের মহাকাশযান চাঁদ থেকে ঠিক সময়ে আবার ফিরে চলে পৃথিবীর দিকে।"

মানকেলো সায়েব এবার সম্পূর্ণ ধরাশায়ী। করুণকণ্ঠে জানতে চাইলেন, "এরকম যন্ত্র কত আছে ইন্ডিয়ায়?"

অসংখ্য। বলতে গেলে প্রত্যেক বাড়িতেই এই যন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।"

"কতগুলো বোতাম টিপতে হয়? চলে কিসে? ইলেকট্রিক না ব্যাটারিতে, না নিউক্লিয়ার পাওয়ারে?" নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আগে মানকেলো করুণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

চোখ বুজে বিজয়ী জেনেরেল ম্যাকআর্থারের স্টাইলে মাখনদা

বললেন, "বোতাম টিপতে হলে তো সেকেলে টেকনলজি হয়ে গেলো মিস্টার মানকেলো।"

"তা হলে কী 'লেজার অ্যাকটিভেটেড' কাজকর্ম হয়ে যায়?"

"ইন্ডিয়া এখনও অনেক এগিয়ে রয়েছে, মিস্টার মানকেলো। টেকনলজিটা খুবই জটিল—একটা সাউন্ড কোড থাকে—যেটা বিভিন্ন মেসিনের পক্ষে বিভিন্ন। সেই সাউন্ড কোড রিপিট হলেই ভয়েস একটিভেটেড চেন রি-এ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। খুবই জটিল পদ্ধতি—অ্যাটম ভাঙার মতো। কিন্তু পদ্ধতি যতই শক্ত হোক, চায়ের কাপ বালিশের পাশে চলে আসে। কুইকলি।"

"ইলেকট্রো মেকানিক্যাল প্রসেস?" জানতে চাইলেন মানকেলো।

"ইলেকট্রো মেকানিক্যাল, না ফিজিও-কেমিক্যাল সে-সব বলা বারণ, মিস্টার মানকেলো। বুঝতেই পারছেন, ইন্ডিয়ার ন্যাশানাল সিক্রেট।" মাখনদার কথায় চাপা ঔদ্ধত্য ফুটে উঠলো।

সায়েব একেবারে ধরাশায়ী। "সামান্য একটা কোড সাউন্ড থেকে এমন ম্যাজিক অ্যাকশন এখনও অকল্পনীয়। এবং বিভিন্ন মেশিনের জন্যে বিভিন্ন সাউন্ড কোড!"

কাতরভাবে সায়েব জানতে চাইলেন, "এই মেশিনের দাম কতো?"

"এসব মেশিন কখনও সোজাসুজি বিক্রি হয় না, মিস্টার মানকেলো। অনলি ভাড়া সিস্টেম—যেমন তোমাদের আই-বি-এম কমপিউটার মেশিন লিজ পাওয়া যায়।"

সাউন্ড কোডের ব্যাপারটা সায়েবের মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। মাখনদা বললেন, "প্রয়োজন হলেই সাউন্ড কোড চেঞ্জ করা যায়। অনেক বাড়িতে প্রায়ই চেঞ্জ হয় আজকাল। সমস্ত কথা বলা যায় না। তুমি হাওড়া কাসুন্দিতে এসো, শংকর তোমাকেও এই সুপার সিস্টেমে চা খাওয়াবে। এমন মেশিন থাকলে তোমার এই যে ডজন-ডজন অটোমেটিক মেশিন রয়েছে তার কোনোটাই আর লাগবে না। সব কাজই এই সাউন্ড অ্যাকটিভেটেড টোটাল সিস্টেমে চলবে।"

"সত্যি কথা বলতে, ডিনারের পর এঁটো বাসন মেশিনে পুরতে আমাদের খুব খারাপ লাগে। আর সকালে ওই অটোমেটিক মেশিনে হুইস্‌ল যখন দেয় তখন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছেই করে না। তোমাদের

এখানে ওই মেশিন অন্তত একটা এক্সপোর্ট করো।" ডিনারের পর আমাদের বিদায় দেবার সময় কাতর অনুনয় করেছিলেন মিস্টার ও মিসেস মানকেলো। কিন্তু মাখনদা পাথরের মতো অটল।

"স্যরি, এই মুহূর্তে কোনো চান্স নেই," এই বলে মাখনদা আমাকে নিয়ে সায়েবের বাড়ি থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন।

গর্বিত সায়েবের পতনে খুশী হলেও মাখনদার পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছিল না। "জাতীয় সম্মান রক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে মিথ্যার আশ্রয়!"

আমার মন্তব্য শুনে একটুও বিচলিত হলেন না মাখনদা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, "একটি কথাও মিথ্যে বলিনি। সব হানড্রেড টেন পারসেন্ট সত্যি।"

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মাখনদা বললেন, "বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মদন, জগু, কেষ্ট এই রকম কোনো নাম ধরে ডাকলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ির কাজের লোক তোদের মশারির মধ্যে চা এনে দেয় না? এই মেশিনই তো উনুনে আঁচ দেয়, বাসন মাজে, বাটনা বাটে, জল তোলে, কাপড় কাচে, দরজা খুলে দেয়, এঁটো কাপ-ডিস বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং হাজার রকম কাজ করে। এরকম আশ্চর্য ভয়েস অ্যাকটিভেটেড অটোমেটিক মেশিন এ-শালারা পাবে কোথায়?" এই বলে মাখনদা মনের আনন্দে বাংলা গান গাইতে শুরু করলেন, "সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।"

ক্লিভল্যান্ডের বাড়িতে বসে লেখাটা শোনবার পরে দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, "এবারে আপনার মাখনদার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। বলবেন, আমাদের অনেকের মনের দুঃখটা আগাম বুঝে নিয়ে উনি চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছেন।"

[গ্রন্থসূত্র
জানা দেশ অজানা কথা]

ঘরছাড়া দিকহারা

স্বদেশে বসে বিদেশের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির কথা এবং বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সারাক্ষণ দুঃখিনী স্বদেশের চিন্তা করাটা আমার স্বভাব দাঁড়িয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এক রমণী চরিত্রের উল্লেখ ছিল যে শ্বশুরবাড়িতে অত্যধিক বাপের বাড়ির প্রশংসা করায় অচিরেই পিত্রালয়ে প্রেরিতা হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও সারাক্ষণ শ্বশুরালয়ের প্রশংসায় ব্যস্ত থাকায় সে পিত্রালযেরও প্রিয় হতে পারেনি।

আমার অবস্থা প্রায় একই রকম। এসেছি ফরাসি দেশে, খ্যাতনামা ফরাসি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে, কিন্তু মানবসভ্যতার পীঠস্থান পারির কিছুই তেমনভাবে আমাকে টানতে পারছে না।

প্যারিসের বাইবে ভুবনবিদিত এক প্রাচীন শহরেব কেন্দ্রবিন্দুতে গিযেছিলাম, সেখানেও বিরাট বইমেলায় তিন প্রজন্মের ফরাসি আমার ফ্রান্সে প্রকাশিত উপন্যাসে স্বাক্ষর নেবার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, তবু মনে হচ্ছিলো আমার শহর কলকাতার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ কি তাঁদের ভাল লাগবে? আরও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, পাশ্চাত্যের এই নবলব্ধ প্রাচ্যপ্রীতির পিছনে কোন্ অভাব বা কোন্ কৌতূহল কাজ করছে? আমরা কেমন করে আশ্চর্য এই জাতের সমস্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবো?

সেবার আমেরিকায় এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। সুযোগ ছিল নায়াগ্রা জলপ্রপাত দর্শন করার। অথচ সেইসময়ে এক অপরিচিত অনাবাসী ভারতীয়র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশায় ভেবে-চিন্তে আমি ওই অনাবাসীর কাছেই গেলাম। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য মাথায় রইল সাময়িকভাবে। এর কারণ ভারতবর্ষ দূর থেকে আমাকে টানছে, আমি আমার জন্মভূমির মোহিনী মায়াপাশে বন্দী হয়ে পড়েছি। গতবার

প্যারিস প্রবাসী ডিজাইনার সম্বিৎ সেনগুপ্তর পাঠানো টিকিটের দৌলতে মানুষের মহাতীর্থ প্যারিসে এসেও একই অবস্থা হয়েছিল—একজন বাঙালি চরিত্রের সন্ধান করতে গিয়ে আইফেল টাওয়ারই দেখা হলো না। এমনই লজ্জার ব্যাপার যে কাউকে বলতে পারি না যে দু'দুবার প্যারিসে এসেও আইফেল টাওয়ারে যাবার সময় আমার হলো না।

এবারে আমার জাঁদরেল অবস্থা, এর আগের বার কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন রিফিউজি সম্বিৎ ছিল ব্যারন দ্য শহীদনগর, আর হাওড়ার হরিদাসপাল আমি ডিউক অফ কাসুন্দিয়া—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই দুই নিধিরাম সর্দার। থ্যাংকস টু দি প্রবাসী বেঙ্গলি, সেবার ভারিক্কিচালে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি হোটেলের সবচেয়ে দামী সুইটেও কিছুক্ষণ সময কাটানো গিয়েছিল। এই সুইটে রাজরাজড়া ধনকুবের এবং চিত্রতারকাদের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করতে গিয়ে বারবার ছায়া পড়ছিল হাওড়া চৌধুরীবাগান লেনের কানাগলিতে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের ঘরটার, যার ছাদ ফুটো, জানলার রেলিঙ ভাঙা, দরজার পাল্লা বহুদিন অদৃশ্য এবং ঘরে উঠতে গেলে একটা নড়বড়ে সিঁড়ি অতি সাবধানে পর্বত আরোহীর নিপুণতায় ব্যবহার করতে হয়।

এবারে আমি একজন কেউকেটা। মেড-ইন-বনগ্রাম, প্যাক্‌ড্ ইন হাওড়া-কাশুন্দে—এসব ইতিবৃত্ত চেপে রেখে স্রেফ বলতে পারি আমি একজন রাইটার, খোদ ফরাসিরা ইচ্ছে করলে মূল্যবান ফ্রাঁ খরচ করে প্যারিসের প্রখ্যাত প্রকাশন সংস্থা থেকে আমার সাহিত্যকর্মের নমুনার সঙ্গে এবং আমার সারস্বত সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। ভায়া ফরাসি রাজদূত ইন ইন্ডিয়া, তাবড় তাবড় বঙ্গীয় লেখকবৃন্দের সঙ্গে আমি এক্স-এন প্রঁভসের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এদেশের নিমন্ত্রিত অতিথি। আতিথেয়তার বহর দেখেই বোঝা যায় কেন ফরাসিরা দুনিয়ার সেবা জাতের একটা হয়েছে, কেন বিবেকানন্দ থেকে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত সবাই ফ্রেঞ্চ বলতে 'ইগনরান্ট' অর্থাৎ অজ্ঞান!

কিন্তু মহাশয়, আমি ফরাসি জাতের গুণকেত্তন শোনাবার জন্যে আজকে কলম ধরিনি, আমার লক্ষ্য বিদেশ বাসের দুঃখের কথা বঙ্গভূমির বঙ্গজনদের কাছে সবিনয়ে এবং সকাতরে নিবেদন করা।

অধমের নিবেদন, ফরাসি দেশে ভারিক্কিচালে চষে বেড়ানো,

লেকচার দেওয়া, সুন্দরী সুন্দরী ফরাসিনীর খাতায় অটোগ্রাফ দেওয়া ইত্যাদির ধারাবিবরণ আত্মপ্রচারের অপরাধে পড়বে। আমি শুধু বলবো· ফরাসি দেশে যদি আসতেই হয় তাহলে আর্টিস্ট হয়ে এসো, রাইটার হয়ে এসো, ফিলজফার হয়ে এসো—ফরাসি তোমার সেভেন মার্ডার ক্ষমা করে দেবে। শিল্পীকে প্রশ্রয় দিতে এবং মাথায় তুলতে এ জাতের তুলনা নেই।

ফরাসি দেশ বিজয় করতে করতে এরই মধ্যে টুক করে দুটো রাতের জন্যে লন্ডন ঘুরে এসেছি। পুরনো প্রভুদের সেলাম জানানো এবং সেইসঙ্গে একটু এপার বাংলা ওপার বাংলার যোগসূত্র খুঁজে বেড়ানো। গঙ্গা এবং পদ্মা, এখনও আমাদের মধ্যে দূরত্ব রেখেছে, কিন্তু টেমসের তীরে বেঙ্গলিরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, যদিও শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবরা নাম দিয়েছে ব্ল্যাকি। আরে হতভাগারা, 'কালো যদি মন্দ তবে চুল পাকিলে কান্দ কেনে?' বুঝবে বাছা বুঝবে, যখন বয়স বাড়বে দাঁত নড়বড় করবে এবং সেইসঙ্গে চুল সাদা হবে, তখন কালোর মর্ম বুঝবে! আরে বাছা, সৃষ্টির আদিতে কালো, অন্তে কালো, মধ্যিখানে সূর্যের লণ্ঠনে মহাবিশ্বে সামান্য আলো হয়েছে। দার্শনিকদের জিজ্ঞেস করে দেখো।

এবার আটচল্লিশ ঘণ্টায় লন্ডনে সোনার খনির সন্ধান পেলাম। ইচ্ছে হলো, ঘর-সংসার ছেড়ে মুজাহির অর্থাৎ স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে কিছুদিন প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে ওঁদের আবিষ্কার করি। বাংলাদেশের বাঙালিরা অনেকদিন আমার হৃদয় হরণ করেছে—বেশি বয়সের প্রেম! ঘোর কাটিয়ে ওঠা বড়ই কঠিন কাজ। এই যে প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়া, এই যে ভালবাসার দাপটে অন্যসব কিছু তুচ্ছ হয়ে ওঠা, এর পিছনে রয়েছে এক সিলেটি গবেষক-ঐতিহাসিক যাঁর নাম নুরুল ইসলাম।

বিনীত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত এই মানুষটি একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। লন্ডনে সিলেটিদের এক সভায় আমার কাছে এসে, আমাকে তাক লাগিয়ে দিলেন। হাতে একখানা অভিধান সাইজের বাংলা বইয়ের মোড়ক ধরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললেন, আমার কোনো একটি রচনা তাঁকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছে এই বই রচনায় এবং যথাস্থানে তা স্বীকৃত হয়েছে।

আমার লেখা পড়ে কারুর কারুর বাংলা সাহিত্যে অরুচি ধরে গিয়েছে তা স্বদেশে বিভিন্ন সূত্র থেকে শুনেছি, কেউ কেউ আমার কোনো লেখা নেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরেই শারদ সংখ্যা ক্রয় করেন একথাও বন্ধুরা বলে থাকেন। কিন্তু সুদূরপ্রবাসের কোনো বঙ্গসন্তানকে সুবৃহৎ এই রচনায় অনুপ্রেরণা দান!

এই অপকর্মটি আমি কেমনভাবে করলাম তা জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। সিলেটি এই গবেষক নুরুল ইসলামের জন্ম ১৯৩২ সালে, কিন্তু দেখলে অনেক কম মনে হয়। প্রবাসের সভায় সামান্য ভিড় ছিল, তারই মধ্যে বিরাট বাংলা বইটি বগলদাবা করলাম। লেখক সুযোগ বুঝে সবিনয়ে কিছু কথা বললেন। সেইসব কথা আমার মধ্যে অনেকদিন জড়ো হয়ে আছে।

বিদেশের মাটিতে স্বদেশের ভাষায় বই উপহার পাওয়ার মধ্যে কী আনন্দ আছে তা সকলকে বোঝানো কঠিন। আকারে বৃহৎ বই, আমার ব্যাগটি নিতান্তই ছোট। যা নিজে বহন করতে পারবো না তা প্রবাসের পথে নানা বিঘ্নের কারণ হতে পারে জেনেই এই ছোট্ট ব্যাগ নির্বাচন করে এনেছি। তবু নুরুল ইসলামের বইটি আমার অমূল্য সংগ্রহের অংশ হয়ে দাঁড়াল। লন্ডনে বসে এবং লন্ডন থেকে প্যারিসের দ্যগল বিমানবন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে ঘুরতে ঘুরতে এই বইয়ের যত অংশ পড়েছি ততই বিস্মিত হয়েছি।

প্যারিসের মতো শহরে ভেতো বাঙালিকে কে আর কল্কে দিচ্ছে? কিন্তু ধন্যি এই ফরাসি জাত, গুণের সমাদর করবার জন্যে গত দু'শ বছর ধরে সারাক্ষণ উঁচিয়ে আছে।

ফরাসি যা কিছু করে তা নিজস্ব স্টাইলে করে। নিজের ভাষায় বইমেলা যখন করে তখন তার সঙ্গে অন্য কোনো দেশ বা ভাষার সাহিত্যকে নিজেকে দোসর করে নেয়। কারা এই দোসর হবার যোগ্য তার জন্যে অনুসন্ধান চলে সারা বছর ধরে। এবছর তাঁরা বেছে নিয়েছেন বাংলাকে। ফরাসি জানে স্রেফ লেখা পড়ে সুখ সম্পূর্ণ হয় না, যদি না চোখের সামনে গোটা কয়েক লেখক জলজ্যান্ত ঘুরে বেড়ান। অতএব নিয়ে এসো আধডজন কবি, গল্প লেখক, প্রবন্ধকারকে তাঁদের স্বক্ষেত্র থেকে।

অতিথিদের আদর-যত্ন করো, কিন্তু সামনা সামনি বসিয়ে চোখা চোখা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে লজ্জা পেয়ো না। এই হচ্ছে ফরাসির স্বভাব—লেখককে বাজিয়ে নিতে ভীষণ ভালবাসে। স্রষ্টাকে মুখোমুখি পেলে তোমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন করিয়ে নাও। নির্জলা প্রশস্তির অর্থ যে লেখককে অপমান করা তা ফরাসি বহুবছর আগেই আবিষ্কার করেছে। এমন হয়েছে বলেই তো ইউরোপে সাফল্যের সিংহদ্বার এই ফরাসি দেশ। ফরাসি যাকে প্রবেশের গেট পাশ দিলো সমস্ত ইউরোপ তার দখলে।

বাংলাকে স্বীকৃতি দিয়ে ফরাসি এবার মস্ত সম্মান দিয়েছে বাঙালিকে। এসম্মান আড়াইশ বছরের মধ্যে ইংরেজ কখনও দিতে পারল না, কারণ তার সে দিল নেই, তার ধারণা ইংরিজির বাইরে কোনো সভ্যতা নেই, ভাষা নেই, এমনকি আড়ালে-আবডালে ফরাসিকেও ওরা ভ্যাংচায়। ফরাসিদের স্টাইল অন্য। তারা দুনিয়ার যেখানে ভাল কিছু আছে তার স্বাদ নেবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে। তারা তোমাকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিয়ে গিয়ে গলায় মালা দিল, প্রশস্তি গাইল, রাজসম্মান দিল, প্রঁভসের খোদ হাইকোর্ট ভবনকে তোমার সম্মানে সাময়িকভাবে সাহিত্যভবনে রূপান্তরিত করল। কিন্তু সেইসঙ্গে তলে তলে তোমার মাপজোক নিতে শুরু করল। যাচাই না করলে লেখকের অসম্মান হয় একথা জানে সুরসিক ফরাসি। অথচ তোমার রাগ করার উপায় নেই। পৃথিবীর আর কোথায় সাহিত্যিকের সম্মানে রাজদ্বারে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান হতে পারে? বিশালপুরীতে একই সঙ্গে চলেছে ন্যায়বিচার ও সাহিত্য বিচার। যাকে রসবিচারও বলতে পারেন।

এইসব সেরে প্যারিসে ফিরে এসে আবার সাহিত্য সভা। বাংলার বাঘা বাঘা লেখক-লেখিকাদের মঞ্চে বসিয়ে এবার রসের লিমিটেড ওভার টেস্ট ম্যাচ। বিষয়টিও দুর্দান্ত। গোপনে গোপনে খোঁজখবর নিয়েই বিদগ্ধ ফরাসি যে আলোচনাসভা ডেকেছে তার বিষয় বাঙালি লেখকের ডবল লাইফ। এই ডবল লাইফের অনুবাদ 'দ্বৈত জীবন' করা যেত, কিন্তু ঠিক রসটা পাওয়া যেত না। ডবল লাইফ বললে অনেক কিছুর ইঙ্গিত থাকে, এমনকি জেকিল হাইডের ভূমিকায় একালের বাংলার বুদ্ধিজীবী। দুমুখো দুই জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে বাঙালি লেখক

কি থমকে দাঁড়িয়েছে? কী এই টানাপোড়েন? কেন তার দ্বৈতভূমিকা? এই দ্বৈতভূমিকা একেশ্বরবাদীরা কেন সহজে বুঝতে পারে না। এরই নাম কি কপটতা অথবা হিপক্রিসি? এবং আরও নানা গভীর প্রশ্ন।

বিশাল প্রেক্ষাগৃহে হাজির হয়ে আমি তাজ্জব! মফস্বলের বঙ্গীয় লেখকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন প্যারিসের বিশিষ্ট ফরাসি লেখকরা এবং প্রকাশ্য সভায় যে কোনো রসিকজন যে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেন এই উন্মুক্ত বিচারসভায়। এই হচ্ছে ফরাসির ধর্ম—যাকে তাকে যে কোনো প্রশ্ন করার স্বাধীনতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখবেই ফরাসি। তবে ফরাসি মঞ্চ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে তোমাকে জেরা করবে না, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা স্মরণে রেখে তোমাকে ভ্রাতার সম্মান দেবে। বুঝিয়ে দেবে তুমিও এখানে বসে আছো তার সঙ্গে।

সাধে কি আর দুনিয়ার সেরা জাতের রাজতিলক জুটেছে ফরাসির কপালে। ফরাসিকে দেখে প্রেমে না পড়ার ক্ষমতা আছে একমাত্র ইংরেজ জাতের। খালের ওপারে বসবাস করেও এই সভ্যতার ছিটেফোঁটা ওদের সমৃদ্ধ করলো না। ফরাসির সাজগোজ, ফরাসির আতর আর ফরাসির রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু নেবার উদারতা ইংরেজের হলো না।

প্যারিসের সভাগৃহে একবার উঁকি মেরে আমি তাজ্জব। হলঘর বোঝাই! সায়েব মেম গিজগিজ করছে সুদূর দেশের বাঙালি লেখকদের দেখবার এবং শুনবার জন্যে। অন্যপ্রান্তে বাঙালি লেখকদের ফরাসি সংস্করণ কেনবার জন্যেও লাইন। সুরসিক ফরাসি এই বিষয়ে সজাগ—গাঁটের কড়ি খরচা করে একখানা বই কিনে লেখকের দস্তখত আদায়ের জন্যে সে ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়াতে রাজি। এমন গুণগ্রাহী নাহলে কি আর বড় জাত হওয়া যায়? এসব ট্রেনিং নিতে এক একটা জাতের শত শত বর্ষ কেটে যায়। সৃষ্টির জগতে অসামান্য হবার পথে ফরাসিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। তবেই না দুনিয়া তার কাছে মাথা নত করেছে।

আরও অবাক হলাম দর্শকদের আসনে কিছু বাদামি রঙের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। সভা আরম্ভ হবার আগে দু'জন সুসজ্জিত স্মার্ট তরুণ আমার কাছে এসে নির্ভেজাল বাংলায় বললো, "খবরের কাগজে দেখে বাংলা ভাষায় গৌরবের সাক্ষী হতে চলে এলাম।"

এই দু'জনই বাংলাদেশী। সেলিম (নামটা কাল্পনিক) বললো, "বাংলা ভাষা যে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাষা তা তো আমরা চিরকালই জানি ; কিন্তু ফরাসিরাও সেটা স্বীকার করল তা দেখবার জন্যে কাজ ফেলে চলে এলাম। এমন সুযোগ আবার কবে পাবো তা আল্লাই জানেন।"

প্যারিসের সাহিত্যসভা খুবই আকর্ষক হয়েছিল। নানা প্রশ্নে এঁরা বাংলার লেখক সমাজকে জর্জরিত করলেও উইকেট নিতে পারেননি। দক্ষ ব্যাটসম্যানের মতো কয়েকটি শক্ত প্রশ্নকে উল্কাবেগে বাউন্ডারিতে প্রেরণ করলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী ও সুনীল গাঙ্গুলি। এঁদের ভাল রান তুলতে সাহায্য করলেন ফরাসি ভাষাবিদ কলকাতার পুষ্কর দাশগুপ্ত।

ফরাসি দেশে মস্ত সুবিধে বাংলায় কথা বলা যায়। তুমি তোমার মতন করে কথা বলো, তারপর ফরাসিতে বুঝে নেবার দায়িত্ব আমার। এই সেতুবন্ধনে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত মশাই তাঁদের অন্যতম। আলোচনাসভায় বোঝা গেল, ফরাসিরা আমাদের অনেক খবরাখবর রাখেন, সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে হলে যেসব খোঁজখবর বিশেষ প্রয়োজন তা ফরাসি আগেভাগেই নিয়ে বসে। সাধে কি আর সারা দুনিয়া ফরাসিদের দিকে মুখ চেয়ে বসে আছে—ফরাসি যাকে কল্কে দিল সে তা দুনিয়ার প্রবেশপত্র পেয়ে গেল এক ঝটকায়।

বাঙালির যদি কোনোদিন পয়সাকড়ি হয়, তখন বাপধন আজে বাজে জায়গায় সময় নষ্ট না করে প্যারিসে দু'একটা আখড়া গড়ো। শুধু চিত্রকর নয়, বিশ্বসাহিত্যের লাইসেন্স পাওয়ার আগে প্যারিসপ্রবাস সব ভাষার লেখকদের পক্ষে আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। সাধে কি আর শ্যামচাচা এই প্যারিসে ইউনেসকোর সদর দপ্তর বসাতে বাগড়া দিয়েও সফল হয়নি। সাধে কি আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্যারিসের প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠতেন। ফরাসিরা যে মস্তজাত তা স্বীকার যে করবে না সে নিতান্তই ছোট জাত, অথবা হাড় হিংসুটে!

ফরাসির চোখে বাঙালি লেখকের ডবল লাইফ আজকের লেখার বিষয়বস্তু নয়। এর বিবরণ ধীরেসুস্থে অন্য কোনোসময়ে দেওয়া যাবে। কয়েকটা বাউন্ডারি পেটালেও তাবড় তাবড় লেখকদের উইকেট কীভাবে যাওয়ার দাখিল হয়েছিল ফরাসিদের বোলিং-এ তার বিবরণও

স্বদেশবাসীর মুখরোচক হবে। তবে এই মুহূর্তে আমার নায়করা ফরাসি নন। তাঁরা নেহাতই দেশোয়ালি বঙ্গসন্তান। বাংলার মাটি, বাংলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

মিটিঙের মধ্যেই সেলিম কয়েকবার মঞ্চে আমার উদ্দেশে স্লিপ পাঠিয়েছে। সে উৎসাহ দিয়েছে, "দাদা, দুর্দান্ত হচ্ছে! লড়ে যান! পিটিয়ে ফেলুন। এরা বুঝুক বাংলা সাহিত্য কত বড়! এরা, বুঝুক, ইংরেজ কীভাবে আমাদের চেপে রেখে দিয়েছিল।"

আমি অবশ্যই উৎসাহিত বোধ করেছি, বিদেশের মাটিতে এমন স্বদেশী সমর্থন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

স্লিপের মাধ্যমে আবার ষড়যন্ত্র হয়েছে! "দাদা, প্যারিসে আপনাকে দেখাবার অনেক স্পেশাল জিনিস আছে।"

ফবাসি যেমন কাজ করে তেমন ভোগ করে। বেশি কাজটা ফরাসির কাছে এক ধরনের অশ্লীলতা। তাই সাহিত্যসভারও বিরতি থাকে, একটু পানাহার থাকে। পেটুক বাউনের মতন গোগ্রাসে গিলবার জন্যে ফরাসিরা আহার করে না, ঢক ঢক করে গলায় পানীয় ঢেলে মাতাল হওয়ারও ঘোরতর-বিরোধী এই ফরাসি। সবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্ন পরিমিতিবোধ হলো ফরাসির জাতীয় ধর্ম। পরিমিতিবোধ ফরাসি একবারই হারিয়েছিল যখন প্যারিসের রাজপথে গিলোটিন বসিয়েছিল অভিজাত মানুষের গর্দান নেবার জন্যে। তার ঠেলা সামলাতে ইউরোপের একশ বছর লেগে গিয়েছিল।

এখানে আজ একটু পানীয়ের সুব্যবস্থা আছে, তারপর আইফেল টাওয়ার দর্শনের বিশেষ সুযোগ। কিন্তু সেলিম আমাকে টানছে। একজন বাঙালির পক্ষে আইফেল টাওয়ারের থেকে শতগুণ আকর্ষণীয় কিছু সে আমাকে দেখাবে।

সুতরাং মূল সভার শেষে আমি চুপি চুপি কাটিতং। মুখ টিপে হেসে ফরাসি এইসব সহ্য করে। লেখক মানুষ, একটু নিয়ম এবং একটু সামাজিক ব্যাকরণ বিভ্রান্তিং, একটু ছটফটানিং, তো থাকবেই! সুতরাং কোনো লেখক কিছুক্ষণের জন্য সন্দেহজনকভাবে উধাও হলে স্থানীয় অভিভাবকরা তেমন কিছু মনে করেন না। দু'দশটি সুন্দরী সুরসিকা যদি স্রষ্টাকে ঘিরে না ধরল তাহলে লেখক জীবনের হাঙ্গামায় যাবে কোন্

শর্মা?

অতএব আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছি সেলিমের সঙ্গে। সেলিম ছেলেটি বাংলা, ইংরিজি এবং ফরাসি তিন সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর রাখে। সে বললো, "বাঙালিরা কারও থেকে কম যায় না দাদা।"

"তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বাঙালিরা যেন তাদের হারানো গর্ব ফিরে পায়। আমাদের সাহিত্যকে আমরা তো বিদেশের পাঠকদের সামনে ঠিক মতন পৌঁছে দিতে পারিনি। অথচ এখন পাশ্চাত্যের পাঠকরা সুদূর দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠছে।"

সেলিম আমার খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। পরপর দু'দিন নিজের কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে সে আমার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্যারিসের গলিঘুঁজিতে।

সেলিমের জীবিকা অতি সাধারণ, প্যারিসের এক ট্যুরিস্ট অধ্যুষিত অঞ্চলে একটা ছোট্ট পিকচার পোস্টকার্ডের দোকান আছে, সেখানকার কর্মী। ছোট্ট দোকানদারের ছোট্ট কর্মী বলতে পারেন। দোকানে কাজ করতে করতে হিমশিম খেতে হয়, "কিন্তু আনন্দ আছে দাদা। কত ট্যুরিস্টদের যে মুখ দেখি। এ এক আশ্চর্য শহর এখানে আসবার জন্যে সারা দুনিয়া উঁচিয়ে আছে। যে মানুষ প্যারিস দেখেনি তার মানবজন্মই বৃথা।"

তাই কিছু পয়সা জমলেই ট্যুরিস্টরা ছুটে আসে মানুষের এই মহাতীর্থে। প্যারিসে যত লোক বাস করে বছরে তার থেকে বেশি আসে ট্যুরিস্ট। গরিব-গুর্বো থেকে আরম্ভ করে কোটিপতিরা। সেইসঙ্গে আসে দেশবিদেশের পকেটমাররা। পশ্চিমের পকেটমার, তার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অন্য। তার নিজের পকেটে পাসপোর্ট, এরোপ্লেনের টিকিট, সে থাকে হোটেলে এবং ব্রেকফাস্ট সেরে নিজের প্রফেশনাল কাজে নেমে পড়ে। পড়তায় পোষায় বলেই বিদেশের পকেটমাররা এখানে আসে। নাহলে আসতো না, তারা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে রাজি নয়।

সেলিম বললো, "এখানেও অনেক বাঙালি পাবেন শংকরবাবু। বাঙালিদের কালচারই আলাদা! তারা গরিব বটে, কিন্তু চোর-জোচ্চোর-

পকেটমারের দলে একজনও নেই। এইটাই আমাদের জাতের বৈশিষ্ট্য।"

ধীরে ধীরে সেলিম আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালো। বললো, "প্যারিসের মেট্রোতে যত ফেরিওয়ালা দেখবেন তার বড় অংশ বাঙালি। এরা চুড়ি বেচে, ফিতে বেচে, টুকিটাকি জিনিস বেচে। অমানুষিক পরিশ্রম করে, তাই পেট চলে যায়।"

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দু' একজন দেশওয়ালির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সেলিম। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল এঁদের বিনয় ও ভদ্রতা দেখে। আরও অবাক হলাম, এঁরা স্বদেশে আমার বই পড়েছেন। একজন তো জিজ্ঞেস করে বসলেন, "সাজাহান হোটেলের স্যাটাদা এখন কোথায়?" আর একজন বললেন "জন অরণ্যের সোমনাথের জন্যে দুঃখ হয়। নিজের বন্ধুর বোনটাকে অপরের হাতে তুলে দিল! একবার ভেবেছিলাম, আপনাকে লিখবো সোমনাথকে অত ছোট করবেন না, ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিন। চলে আসুক রোম অথবা প্যারিসে। আমরা ওকে দাঁড় করিয়ে দেবো।"

"বাজার কেমন?" সেলিম জিজ্ঞেস করলো।

"খুব-উ-ব ভাল। যা নিয়ে আসছি তা হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমাদের দাম দোকানের থেকে অনেক কম। লোকে জেনে গিয়েছে, বাংলাদেশীরা গরিব কিন্তু তারা ঠকায় না। মুশকিল হলো ওই পুলিস। আজকাল ঘনঘন প্ল্যাটফর্মে হামলা চালাচ্ছে। গতকাল হল্লা করেছিল। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু আকবর এবং শাজাহান ধরা পড়ে গেল। রাত্রে ওদের খালাস করে আনতে অনেক খরচ হয়ে গেল। এ মাসে বোধ হয় বাড়িতে টাকা পাঠানো যাবে না। সব উকিলের পেটে চলে যাবে।"

সিরাজ এরই মধ্যে জিজ্ঞেস করলো "ক'দিন আছি? গরিবের সঙ্গে দুটো ডাল ভাত খাবেন? সোনার দেশ, এখানে ডালভাতের কোনো অভাব নেই।"

সিরাজের মনে দুশ্চিন্তা। এখনই বোধ হয় আর এক দফা পুলিস রেড হবে, "দেখে দেখে শুধু বাঙালিদের ধরে। আরবদের গায়ে হাত তুলবার সাহস নেই। এক জায়গায় আরবরা পুলিসকে ধরে এমন মেরেছে যে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। বাঙালিরা সাতে নেই, পাঁচে নেই।

খদ্দেররাও তাদের ভালবাসে। না হলে এত মাল আমরা বিক্রি করছি কী করে?"

সেলিম একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো, বললো, "আজ আর হাঙ্গামায় যাওয়া কেন? দু'নম্বর পেশায় মন দাও।"

দু'নম্বর শুনে সিরাজ হেসে ফেলল। "তাই যাবো। কিন্তু এখানে আরও কয়েকটা ফ্রাঁ বেচে দিয়ে। নাহলে 'ক্যাপিট্যাল' শর্ট হয়ে যাবে।"

সেলিম আমাকে নিয়ে আর একটা মেট্রোতে উঠলো। গাড়ি চলমান হলে বললো, "কে বলে বাঙালি পরিশ্রমী নয়, উচ্চাভিলাষী নয়? এইসব ছেলেরা দিনে কত ঘণ্টা খাটতে পারে তার হিসেব নেই। এরা ট্রেনে ভিড়ের সময় হকার। তারপর দু'নম্বর পেশায় পার্কের ধারে বাদামওয়ালা।"

বাদাম মানে চীনেবাদাম নয়। এব ডাক নাম নোয়া। ওরা পথে বেরিয়ে পার্কের ধারে এক বাদামওয়ালাব কাছে আমাকে নিয়ে গেলো। তার ঠেলাগাড়িতে আগুন জ্বলছে এবং সেই আগুনে চীনাবাদামের ডবলসাইজের কালো খোলাওয়ালা বাদাম বালিতে ভাজা হচ্ছে এবং গরমাগরম ফরাসিদের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। লোকে সেই বাদাম অথবা নোয়া খেতে খেতে পথ হাঁটছে।

দোকানের সামনে কয়েকজন যুবকযুবতীর ভিড়। সেলিমকে দেখেই লোকটি বললো, "এই যে দাদা একদম ভুলে গেলেন, দেখাই নেই! দেশের খবর কী?" কথাও চলছে, একই সঙ্গে কাজও চলছে নিপুণ হাতে।

আমার পরিচয় পেয়ে ছেলেটির চোখ বিস্ফারিত। "অ্যাঁ কী সৌভাগ্য আমার। আপনার 'কেরাকটার' বারওয়েল সাহেব আমার আব্বার খুব প্রিয় ছিল। উনিও ওকালতি করতেন সিলেটে।" সব খরিদ্দার বন্ধ রেখে ছেলে পরম যত্নে আমার জন্যে বাদাম তৈরি করল আগুনে, আমার হাতে উপহার তুলে দিয়ে সে যেন কৃতার্থ হলো। দাম দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সেলিম বললো, "যে আপনাকে জানতে পারবে, সে আপনাকে বাদাম খাইয়ে ধন্য হবে।"

লোকটি বললো, "বাসায় আসবেন? তাহলে দোকান বন্ধ করি।"
"শুধু শুধু রোজগার বন্ধ করবে কেন? বিদেশ বিভুঁয়ে যত পারো কামিয়ে

নাও।" বললো সেলিম। "টাকা নিয়ে কি সেদ্ধ করে খাবো, দাদা? মেহমানের আদরযত্ন যদি না হলো তাহলে আর বিদেশে বিজনেস করে কী লাভ?"

সেলিম বললো, "আমাদের সিরাজ অভিজ্ঞ লোক। দেশ ছেড়ে অনেক বছর বিদেশের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সিরাজ নিজেই জানালো, "এর আগে ছিলাম গ্রীসে। পাকা দু'বছর। লোকে ওখানে গরিব হয়ে যাচ্ছে, বাইরের মানুষ দেখলেই চটে যায়। বড্ড কড়াকড়ি শুরু হলো, তখন বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে চলে এলাম। এরা স্যর মেজাজি লোক। এক একজন এমন ভালবাসবে, আদর করবে যে চোখে জল এসে যাবে। আর একজন এমন ভাব করবে যেন আমরা না খেটে স্রেফ ফ্রান্সের পয়সা লুট করতে এসেছি। বাদাম বেচে, দোকান দিয়ে, রেস্তোরাঁ খুলে আমরা ক'টা পয়সা নিয়ে যেতে পারব? নিয়ে যাচ্ছে তো জাপানিরা স্যর। চাঁদির জুতো মেরে, কম দামে এমন ভাল ভাল জিনিস পাঠাচ্ছে যে সায়েবদের চোখ মাথায় উঠে যাচ্ছে। জাপানিদের খুব খাতির, স্যর। বড়লোক জাপানির বকে যাওয়া ছেলেমেয়েরা এখন তো ফ্রান্সেই ঘুরে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে অঢেল পয়সা। পকেটে পয়সা থাকলে এখানে জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামানো নেই—আমীর ওমরাহ, রাজারাজড়া, মিলিয়নেয়ার, বিলিয়নেয়ার সবার বেজায় খাতির এই দেশে। ফেলো কড়ি মাখো তেল।"

সিরাজ ইউরোপের বহু দেশে পোড়খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। জার্মানি, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম কিছুই তার বাদ নেই।

আমরা সিরাজকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "হুস করে তোমার বাদামের স্টক শেষ হয়ে যাক।"

"আজকে হবে মনে হচ্ছে। সায়েবদের এক একদিন বাদাম খাওয়ার মেজাজ হয়—আকাশের রঙ অনুযায়ী। আমাদের এই স্টক কিন্তু শেষ হবার নয়। সামনের রুটির দোকানে আরও দু'বস্তা বাদাম জমা রেখে এসেছি, ফুরনো মাত্র ওখান থেকে নিয়ে আসবো। রুটিওয়ালা চালু লোক, দানছত্র করছে না। বস্তা পিছু ভাড়া নেবে। স্টক না থাকলে ব্যবসা হয় না, অথচ স্টক সঙ্গে রাখার উপায় নেই। কখন যে পুলিসের হাঙ্গামা হবে ঠিক নেই। গতকাল এক পুলিসের খপ্পরে পড়েছিলাম।

লোকটি ভাল, গরম বাদামভাজা খেয়ে খুশি হলো, বললো একঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে চলে যাও, আর দু'দিন এখানে বোসো না। ওই পুলিসই এই জায়গার খবর দিল। বললো, পার্কে অনেক ছেলেমেয়ে প্রেম করতে আসে, তোমার সব বাদাম বিক্রি হয়ে যাবে। বড় ভাল জিনিস এই নোয়া। প্রেম করবার সময় সায়েবরা খাবে, প্রেম ভাঙবার সময় নোয়া খেতে খেতে ঝগড়া করবে, তারপর নতুন বে করবার সময় আবার খাবে। যে সায়েবের রাস্তায় বাদাম খেতে রুচি নেই সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে বুঝতে হবে।"

এই বাদামের ব্যবসা সায়েবরা নিজেরা করছে না কেন? আমি জানতে চাইছি।

"পাগল হয়েছেন। সমস্ত ইউরোপের সায়েবরা এখন নবাব খাঁঞ্জাখাঁ হয়ে গিয়েছে। ঠেলাগাড়িতে জ্বলন্ত উনুন চাপিয়ে সায়েবের বাচ্চা পাঁচটা দশটা ফ্রাঁর জন্যে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকবে! সেসব যুগ অনেক দিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। সায়েবরা এখন কেবল ভোগসুখ চায়। আর কেনই বা চাইবে না স্যর? অঢেল টাকা, ছেলেপুলে তেমন হয় না, বাপপিতেমহ মরবার সময় বস্তা বস্তা টাকা রেখে যাচ্ছে, সায়েবরা কোন দুঃখে গতর খাটাতে যাবে?"

"সিরাজ, তোমার কাগজপত্তর হলো?" জিজ্ঞেস করলো সেলিম।

"আপনি তো জানেনই, স্যর।"

"একেবারে পাগল লোক। জার্মানিতে ইমিগ্রেশন পেপার হয়েছিল অনেক কষ্টে। তা আর এক সিরাজুদ্দিনের কষ্ট দেখে নিজের ইমিগ্রেশনের কাগজ তাকে বিনা পয়সায় দিয়ে চলে এল।"

"তা কী করে সম্ভব?"

"সম্ভব স্যর। পথ জানা থাকলে, খরচাপাতি করলে সায়েবদের দেশে অসম্ভব কিছুই নেই। যার পকেট গড়ের মাঠ, এজেন্টের টাকা, উকিলের টাকা, পুলিসের টাকা জোগানো যার পক্ষে অসম্ভব সে জেলে পচবে, কিংবা ঘাড় ধরে তাকে দেশের বাইরে বার করে দেবে।"

সেলিম বললো, "এরা বলছে, কাগজপত্তর ছাড়া একটা মাছিকে দেশে ঢুকতে দেবে না। আরে বাবা, তোমাদের বাপঠাকুদ্দা যখন জাহাজে চড়ে আমাদের দেশে হাজির হয়েছিল, তখন কোন্ কাগজপত্তর

ছিল তাঁদের কাছে? ক্লাইভের মাইনে ছিল মাসে ক'পাউন্ড? কিন্তু ঘুষ নিয়েছিলেন ছাব্বিশ লাখ পাউন্ড! সুরাটে প্রথম যে জাহাজ এসেছিল তার ক্যাপ্টেনও তো বোম্বেটে!"

সিরাজ লোকটি এখানকার এই ভাগ্যহীন বাঙালি সমাজের অভিভাবক বিশেষ। সমস্ত ইউরোপের পথঘাট তার মুখস্ত। কোন্ ট্রাভেল এজেন্টকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে করা যায় না, রাতের অন্ধকারে দেশের সীমানা পেরোতে হলে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ এসব তার নখদর্পণে। তার কথা শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেশন আইনও তার জানা, কোথায় কোন্ আইন কিছুদিনের জন্য শিথিল হবে, কোথায় আরও কড়াকড়ি হবে এবং পুলিসি হাঙ্গামা বাড়বে তারও খবর রাখে সিরাজ।

"তাছাড়া উপায় কি স্যর? যাদের কাগজপত্তর নেই তাদের অবস্থা রাস্তার নেড়িকুত্তার থেকেও খারাপ। লোকে খাটিয়ে নেবে পয়সা দেবে না, মাথার ওপর আশ্রয় পাবেন না, পুলিস সারাক্ষণ তাড়া করবে, তার মধ্যে প্রাণধারণ করা এবং অপেক্ষা করা কবে সুদিন আসবে।"

সুদিন কীভাবে আসবে তাও জানা গেল। বছরের পর বছর কড়াকড়ির পরে এক একটা দেশ বুঝতে পারে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু মানুষ দেশে ঢুকে পড়েছে। তারা চোর নয়, ডাকাত নয়, তারা সমর্থ মানুষ। তাদের প্রয়োজন নেই এমনও নয়—দেশে এমন অনেক কাজ আছে যা দেশের মানুষ করতে চায় না। এদের অযথা ভয় দুটো বাড়তি মানুষ হাজির হলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। এটা বাজে কথা। কোনো দেশের অর্থনীতি বহিরাগতরা নষ্ট করেনি। বরং বহিরাগতদের শ্রমেই এক একটা দেশ রাজার হালে রয়েছে। স্থানীয় লোকরা যেসব কাজ চায় না কেবল সেসব কাজই তো বহিরাগতরা পায়।

"আমরা মাইনে পাই অনেক কম, তার থেকে আবার দালাল পয়সা কেটে নেয়। পুলিসে খরচ আছে, উকিলের খরচ আছে। বলতে পারেন, তবু আমরা দেশ ছেড়ে এখানে রয়ে গেছি কেন?"

একটু থেমে সিরাজ বললো, "যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাকে একথা কখনও জিজ্ঞেস করবেন না। দেশে তেমন কিছু নেই বলেই তো

মানুষ প্রবাসে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রশ্ন শুনলে মনে বড় কষ্ট হয়।"

সেলিম শুনছিল আমাদের কথা। সে বললো, "কোন্ দুঃখে মানুষ দেশ ছাড়ে তা সায়েবদের থেকে বেশি কেউ জানে না। এরাই তো জাহাজে চড়ে বোম্বেটেগিরির জন্যে একদিন আমাদের দেশে হাজির হয়েছিল। শুনুন শংকরবাবু, কয়েক হাজার লোককে কাগজপত্তর দিতে এরা নারাজ, আর ১৮২০-১৯৬৩ এই দেড়শ বছরে আমেরিকায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ বিদেশ থেকে আমেরিকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে ভাগ্যসন্ধানে, তার শতকরা ৭৮ ভাগ মানুষ গিয়েছিল ইউরোপের বারোটা দেশ থেকে। আমরা রাস্তায় পুলিসের ধাক্কা খাই বটে, কিন্তু কিছু খবরাখবর রাখি। আমাদের বাপমায়েরা পেটে ভাত না দিলেও কিছু বিদ্যে দিয়ে তবে বিদেশে পাঠিয়েছেন।"

"আমাদের দেশের লোকরা ওইসময় যায়নি কেন আমেরিকায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"যাবে কী করে? ওরা নিলে তো! ওই সময় চার লাখ চীনে এবং সাড়ে তিন লাখ জাপানিও দেশ ছেড়ে মিরিকিনি হয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশীর সংখ্যা আপনি হাতে গুনতে পারবেন। নামমাত্র। এখন আমেরিকায় যতটুকু দেখতে পাবেন তা ওই ষাটের দশকের শিকে ছেঁড়া!"

সিরাজ এরই মধ্যে নিজের বিজনেস অব্যাহত রেখেছে। তার হাত চলেছে খটপট। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভেজে বাদাম সরবরাহ করতে বেশ নৈপুণ্য লাগে। "বাদাম বেচে, কিংবা ট্রেনে মনিহারি বেচে আমরা এদেশের কী ক্ষতি করছি বলুন তো? বরং লোকে সস্তায় কিছু পছন্দসই জিনিস পাচ্ছে। কিন্তু পুলিস এসব শুনবে না। সে বলবে কাগজ দেখাও। আরে বাপধন, কাগজই যদি থাকবে তা হলে এখানে হকার হবো কেন? তা হলে তো আমি নিজেই দোকান দেবো।"

"চাকরি?"

"চাকরি মানে তো আজীবন দাসত্ব। বরং আল্লার দয়ায় একটু গুছিয়ে নিয়ে কিছু সাহেব-মেমকে চাকর রাখো তোমরা বিজনেসে, তবেই তো সুখ। তবেই তো বাপ-মা বলবে ছোঁড়াটা ঘর ছেড়ে গিয়ে কাজের কাজ করেছিল।"

সিরাজ ফিসফিস করে বললো, "স্যর, এখানকার হাওয়ায় পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। যে দামে কিনে যে দামে বেচে এখানকার লোক তা ভাবলে বাঙালির মাথা বনবন করে ঘুরতে থাকে। বড্ড ভোগী জাত হয়ে উঠেছে এই সাহেবরা, এদের পতন কেউ আটকে রাখতে পারবে না। দেখবেন, পঞ্চাশ বছর পর এদের কী হাল হয়। চীনে জাপানে কোবিয়ানের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করাব জন্যে এরা তখন কাগজপত্তর বানাবে। ইতিমধ্যে কিন্তু এ ব্যাটারা বান্নাও ভুলে যাচ্ছে। পৈতৃক পেশায় মন নেই। দিক না আমাদের সিলেটিদের কয়েকটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ চালু করতে। অর্ধেক সায়েব-মেম যদি না আমাদের দোকানে চলে আসে তাহলে আমার নামে একটা দুম্বা রাখবেন!"

বেশ মজার কথা বলে সিরাজ। ফিস ফিস করে আরও বললো, "রহস্যটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মশল্লা! এই মশলার মায়া এরা কোনোদিন কাটাতে পারবে না। এরা আতর তৈরি করতে পারে, চিজ তৈরি করতে পারে, কিন্তু মশলার অ আ ক খ জানে না। আপনি তো জানেন, এই মশলা নিয়েই চার পাঁচশ বছর ধরে কী ব্যাপার ঘটল।"

সিরাজেব কথাবার্তা শুনে আমি তাজ্জব। দেশ ছাড়বাব আগে সে বি এ পাশ কবেছিল। তারপর মাথায় ভূত চাপলো।

সিরাজের সে জন্য অবশ্য কোনো দুঃখ নেই। সে বললো, "এই যে আমাব বাদামের দোকানে এত ভিড়, তার কারণ গোপন মশলা। একটু মাখিয়ে দিই বাদামে— সায়েবদের জিভে ম্যাজিক খেলে যায়। কী আছে, কেন আছে, কেমন করে আছে কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ বাদাম মুখে দিলেই মনে হবে কোনো নীল পরী পরাণে হাল্কা ধাক্কা দিল। এ পাড়ায় আর দুটো গোমড়ামুখো ফ্রেঞ্চ নোয়া বেচতো, তারা লড়তে না পেরে উধাও হয়ে গেল, এখন দোকানে চাকরি করে—ফলের রস বিক্রি করে।"

সিরাজের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি ও সেলিম পথ হাঁটছি। পথের আলোগুলো জ্বলে উঠে সাঁঝের প্যারিস তার মোহিনীমায়া বিস্তার শুরু কবেছে।

সেলিম বললো, "মাঝে মাঝে কোনো কোনো দেশ বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অপরাধ মকুব করে দেয়। যাদের কাগজপত্তর নেই

তাদের পক্ষে তখন স্বর্ণযুগ। তাড়াতাড়ি অ্যামনেস্টির সুযোগ নিয়ে আইনসঙ্গত পথে দেশে থেকে যাবার সুযোগ মেলে।

সিরাজ সব খবর রাখে, কোন্ দেশ কখন অ্যামনেস্টির কথা ভাবছে তা বাঙালি মহলে ছড়িয়ে পড়ে। হতভাগা মানুষগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সিরাজ কিছুটা বেপরোয়া, নিজের কাগজপত্তর দানছত্তর করে দিয়ে পুলিসকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কোনো দুশ্চিন্তা দেখতে পাবেন না ওর মধ্যে। সিরাজ আশা করছে ফরাসি দেশে অ্যামনেস্টি অথবা অপরাধ মকুবের সময় আসছে। যদি সুযোগ না আসে অনেকেই চুপি চুপি হল্যান্ডে পালাবে। পাসপোর্ট নেই, ঠিকানা নেই, পরিচয় নেই বলে কোনো দুঃখ নেই ওদের মধ্যে। দুর্জয় ওদের প্রাণশক্তি। কে বলে বাঙালি ঘরকুনো? বাঙালি ভীতু। বাঙালি বিপদের মুখোমুখি হতে চায় না? সব বাজে কথা।"

সেলিমের সঙ্গে পথে যেতে যেতে সায়েবদের মশলাপ্রীতির কথা আবার উঠলো। সেলিম অনেক খবরাখবর রাখে। সে বললো, "দেশে গিয়ে খোঁজ করে দেখবেন, এই গোলমরিচের দাম ওলন্দাজরা এক পাউন্ডে পাঁচ শিলিং বাড়িয়ে দিল বলে ইতিহাসের ধারাই পাল্টে গেল। অতি তুচ্ছ এই কারণ থেকে ইংল্যান্ডের ভাগ্য খুলে গেল। ওলন্দাজ বিজনেসম্যানদের বিরুদ্ধে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৪ জন নাবিক লন্ডনের এক ভাঙা বাড়ির দালানে সমবেত হলেন ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এবং ৭২,০০০ পাউন্ড মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যাতে ভারতের গোলমরিচ, এলাচি এবং দারুচিনির দামটা নিজেদের আয়ত্তে রাখা যায়। কয়েক মাস পরে উইলিয়াম হকিন্স নামে এক বোম্বেটে ক্যাপ্টেনের পরিচালনায় ৫০০ টন ওজনের একখানা জাহাজ সুরাটে এসে নোঙর করলো। ভারতবর্ষের ইতিহাসও পাল্টে গেল।

সেলিম জানালো, আমেরিকা আবিষ্কারের পিছনেও রয়েছে গোলমরিচের সন্ধান। সে যুগে পচা মাংস এবং আঁশটে মাছকে, খাওয়ার যোগ্য করে তুলবার জন্যে সায়েবদের প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের গোলমরিচের। এই তো কয়েক বছর আগে (১৯৮৩) সালে সাড়ে-চারশ বছর আগে (১৫৪৫) ডুবে যাওয়া এক নৌজাহাজকে (মেরি রোজ)

সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হলো। যেসব নাবিক ডুবে মরেছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে গোলমরিচের পুঁটলি ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া গেল।

সেলিম অনেক খবরাখবর রাখে। সে বললো, "বহু বছর বহু দেশে পুলিসের তাড়া খেয়ে খেয়ে অবশেষে পরিষ্কার কাগজপত্তর হয়েছে আমার। এখন আমার সুখের শেষ নেই। আমি এখন নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারি, তাই বাড়তি সময়টা নষ্ট করি না, নিজের দেশের লোকদের একটু আধটু সাহায্য করি, কিছু ম্যাগাজিন, কিছু বই পড়ি, দেশ থেকেও বাংলা বই আনাই কিছু কিছু। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমার দেশের লোকদের কাগজপত্তর নেই, কিন্তু সঙ্গে আপনার লেখা এপার বাংলা ওপার বাংলা আছে। বাংলা না পড়লে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে কী করে? অনেকে আট-দশ বছর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেশে ফেববার পয়সা থাকলেও যাবার উপায় নেই।"

সেলিমকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত কষ্ট ভাল লাগে?"

সেলিম হাসলো, "আগে ভাবতাম আমরা মুষ্টিমেয় নিজের খেয়ালের বশে বিদেশবাসের যন্ত্রণা মাথায় তুলে নিয়েছি। তারপর কোথায় দেখলাম, পৃথিবীতে আমাদের মতন লোক অন্তত তিন কোটি আছেন, যাঁরা প্রবাসের দুঃখ বলুন সুখ বলুন সব মুখ বুঁজে ভোগ করছেন। বাঙালিরা তো দলে দলে বাংলাদেশ ছাড়া হচ্ছে। অন্তত লাখ আষ্টেক বাঙালি দেশছাড়া হয়েছে এই ক'বছরে। বাঙালি ছেলেদের এইটাই নেশা—দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসা।"

"কলকাতার ছেলেদের মাথায় তো এই নেশা চাপেনি," আমি বলি।

সেলিম কথাটার ওপর গুরুত্ব দিল না। "কলকাতার ছেলে আর ঢাকার ছেলের মধ্যে কোনো তফাত নেই, শংকরবাবু। হয়তো আপনাদের দেশটা আকারে মস্ত বড় বলে ওরা দেশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, বিদেশে আসতে হয় না। তবে কারুর আসবার ইচ্ছে হলে কখনও তাকে নিরুৎসাহিত করবেন না। এই দুনিয়াটা তো কেবল সাহেবদের ভোগের জন্যে তৈরি হয়নি। তাছাড়া অনেকদিন ওরা আমাদের ওপর রাজত্ব করেছে, শোষণ করেছে, অপমান করেছে, ছোট জাত বলে মিথ্যে অপবাদ ছড়িয়েছে। আমরা এবার তার হিসেব নেব।"

আমি সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে বললো, "জানেন শংকরবাবু, এই সেদিন এখানে পড়লাম, স্বয়ং। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইন্ডিয়া দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন, স্বীকার করেছিলেন—ইন্ডিয়া দশ শতাব্দী এগিয়ে আছে। তারপর ওই গোলমরিচওয়ালারা সিংহাসনে চড়ে বললো, এরা জাত হিসেবে এত নিচু যে কোনোদিন দেশ চালাতে পারবে না। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগে কী কাণ্ডটা করল। ওই হতভাগা সায়েব জেনারেল ডায়ারকে অপরাধী জেনেও কর্তারা শাস্তি দিলেন না, স্রেফ ওই পোস্ট থেকে বদলি করে দিল। ইংরেজের আস্পর্ধা দেখুন। যে লোক দু'শজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারলো, ১২০০ জনকে গুলিতে জখম করল, তাকে সম্মানিত করার জন্যে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা ২৬০০০ পাউন্ড চাঁদা তুলল। ব্যাটারা এখনও ইংল্যান্ডের স্কুলে সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা গল্প ছেলেদের মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছে।"

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্যারিসের প্রবাসে আমি নিজের দেশের মানুষদের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

সেলিমের সঙ্গে দেখা না হলে আমার প্যারিস ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত। সে বললো, "ভাবতে পারেন এই সায়েবদের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেড় লাখ ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল। ইংরেজের বাণিজ্যতরীতে কত ভারতীয় জাহাজী যে ডুবে মরেছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। এদের পুরো নামটাও অনেকসময় সায়েবদের খাতায় থাকত না, স্রেফ লস্কর বলে চালানো হতো।"

"এতোসব জানলেন কোথা থেকে ভাই?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এখানকার বাংলা বই আনিয়েছি লন্ডন থেকে—নাম 'প্রবাসীর কথা' সেখানে অনেক খবর পাচ্ছি, পড়ছি, আর ভাবছি, ভাবছি আর পড়ছি, আমার চোখ খুলে যাচ্ছে!"

"প্রবাসীর কথা! লেখক নুরুল ইসলাম! ওঁর সঙ্গেই তো লন্ডনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার!"

খুব খুশি হলো সেলিম। "আপনি বইটা দেশে নিয়ে যান, যত্ন করে পড়বেন।" আপনার প্রশস্তিও আছে। আপনি বলেছেন, এই মুহূর্তে বাঙালিদের থেকে অ্যাডভেঞ্চারাস জাতি পৃথিবীতে নেই।"

"ঠিকই তো। বাংলার বাঙালি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। আর কোন্ জাত পৃথিবীতে এত কষ্ট সহ্য করতে পারে?"

সেলিম বললো, 'আগামীকাল দুপুরে আপনাকে একটা গোপন ডেরায় নিয়ে যাবো। প্যারিসের বাঙালিদের দেখে আপনার বুক জুড়িয়ে যাবে।"

সারা রাত ঘুম এলো না চোখে। 'প্রবাসীর কথা' আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিলো। এতো পরিশ্রম করে বই লেখা বাংলা থেকে উঠে গিয়েছে বলে আমার ধারণা ছিল। প্রবাসী বাঙালিকে আবিষ্কার কবতে গিয়ে লেখক ইতিহাস ভূগোল তন্ন তন্ন কবে খুঁজে বেড়িয়েছেন বছরের পর বছর ধবে। শুধু বইপড়া বিদ্যা এবং দলিল-দস্তাবেজের অনুসন্ধান নয়, সেই সঙ্গে বহু জনের সঙ্গে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সাক্ষাৎকার।

কয়েক বছর আগে আমি নর্থ আমেরিকায় বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষে ক্লিভল্যান্ড, ওহায়োতে গিয়েছিলাম। সেখানে ১৮৮০ সালেব সেনসাসে উল্লেখ আছে, শহরের ১ লাখ ৬০ হাজার নাগরিকের মধ্যে ১২ জন ভারতীয়। এঁদের সবাই প্রায় বাঙালি, অনেকেই নাবিক হিসেবে পাড়ি দিয়ে, জাহাজ থেকে বেরিয়ে গিযেছিলেন। এর উল্লেখ ছিল আমার 'জানা দেশ অজানা কথা' বইতে। লেখক নুরুল ইসলামের নজর এড়ায়নি। আমি তখনই দুঃখ করেছিলাম, বাঙালির অ্যাডভেঞ্চারের কোনো প্রামাণিক ইতিহাস আজও রচিত হলো না।

'প্রবাসীর কথা' পড়তে পড়তে মুগ্ধ হচ্ছি। বইটা ধরলে ছাড়া মুশকিল। এর মধ্যে চমকপ্রদ খবর ছাড়াও বাঙালি জাতের সুখদুঃখ হাসিকান্না ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, প্রবাসী সিলেটিয়াদের দুঃখ। কেউ এদের আপন করে নেয় না, অথচ বাঙালিকে বিশ্বপথিকে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে সিলেটিদের দান সবচেয়ে বেশি। একজন প্রবাসী সিলেটিয়া দুঃখ করেছেন : "আমরা লন্ডনে ব্ল্যাকী, করাচীতে বাঙালি, ঢাকায় সিলেটি, আর সিলেটে লন্ডনী।"

আমেরিকা ফেরত সিলেটিরও একটা চমৎকার নাম আছে—মিরিকিনি! অনাবাসী বাঙালি বা এন আর আই বাঙালি না বলে

এই মিরিকিনি শব্দটি আমরা সবাই গ্রহণ করলে কেমন হতো?

প্রথম যুগের মিরিকিনিদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প আরম্ভ করলে রাত কেটে যাবে। অন্য কোনো সময় সে গল্প ফাঁদা যাবে তাঁদের জন্য যাঁরা দুর্নাম রটান আমরা বাঙালিরা নড়তে চড়তে চাই না। নড়াচড়ার ব্যাপারে দুনিয়ার সব জাত আমাদের কাছে শিশু!

'প্রবাসীর কথা' বইয়ের প্রতি পাতা থেকে খবরাখবরের মণিমুক্তো ছড়িয়ে পড়ছে। কখনও প্রাসঙ্গিক, কখনও অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাঙালির পক্ষে অপরিহার্য। যেমন নবমুসলিমদের প্রাণশক্তি। অনেকেরই জানা নেই, পাকিস্তানের পিতা মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দুপুরুষ আগেও ছিলেন হিন্দু। পিতামহ ছিলেন হিন্দু তাঁতী, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ছেলে জিন্নাভাই এবং নাতি মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্।

জাহাজী বাঙালির গলায় মালা পরাও, তাকে সব রকম সম্মান দাও। এখন পৃথিবীতে ফিলিপাইনের নাবিক সংখ্যা সর্বাধিক—বোধহয় এক লাখ। কিন্তু পাঁচ দশক আগেও বাঙালিরাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাবিক সম্প্রদায়। জেনে রাখুন, ১৯৪০ সালে আমাদের এই কলকাতায় ভারতীয় আর্টিকেলে তালিকাভুক্ত নাবিকের সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। আর এই খিদিরপুরের নাম ছিল দ্বিতীয় সিলেট। আর সিলেট প্রবাসীদের ডাক নাম ছিল কলকাত্তি। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় খিদিরপুরের রেজিস্ট্রিকৃত নাবিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল এক লাখ সত্তর হাজার।

খিদিরপুর নিয়ে মস্ত জাহাজীয়া উপন্যাস লেখার সময় চলে যাচ্ছে। বাঙালি লেখকরা সাধারণ বাঙালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে পারছে না। জয় হোক বাঙালি জাহাজীর, জাহাজে যাদের ডাক নাম ছিল কলকাত্তি!

বইটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আমার কেমন ধারণা ছিল রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম কালাপানি পেরিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস নানা সুরে কথা কইছে। একটু নমুনা নিন।

১৬৮৮ সালে বিলেতের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে : তেরো বছর বয়সের ব্ল্যাক ইন্ডিয়ান বয় মালিকের অধীন থেকে পালিয়েছে। ইতিহাস বলছে, ইন্ডিয়ান ক্রীতদাসদের বাজারদর আফ্রিকানদের থেকে অনেক কম ছিল। একটা আফ্রিকানের দামে দশটা ইন্ডিয়ান পাওয়া যেত।

শুনুন, রামমোহন রায় ১৮৩১ সালে বিলেতে পৌঁছন আর সিলেটিরা জাহাজে নাবিক হচ্ছে ১৭৭৪ সাল থেকে। বিলাতযাত্রায় রামমোহনের সঙ্গী হন পালিতপুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও ভৃত্য শেখ্ বক্‌স্। ১৭৭৫ সালে বিলেতে মেমসায়েব বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, ভারতীয় ক্রীতদাসী পাওয়া যাবে, জাহাজে সেবাযত্নের জন্যে। ভারতে ফিরেও তিন বছর সার্ভিস পাওয়া যাবে বিনা মাইনেতে।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা থেকে দেশে ফেরার সময় দু'জন দাস বালক এবং চারজন দাসী নিয়ে যান।

শুনুন, রামমোহন রায়ের দু'দশক আগে ১৮০৯ সালে সিলেটের সৈদ আলী বিলেতে যান। কেন জানেন? যে সায়েব তার বাবাকে হত্যা করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী যা একজন সায়েবই তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে স্বীকার করে গিয়েছেন।

ঠিক আছে বাবা, শুধু সিলেট সিলেট করবো না। সিলেটিরাই যে বিশ্ববিজয়ী বাঙালির মধ্যমণি সে কথা আমার বলার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। শুনুন, এই কলকাতা শহরেই বিলেত থেকে ফিরে এসে এক ভদ্রলোক বসবাস করতেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ১৮০৩ সাল থেকে। তাঁর স্মৃতির প্রতি এখনও কলকাতাবাসীরা কোনো সম্মান দেখাননি। তাঁর নাম আবু তালেব লন্ডনী!

শুনুন সেকালের খিদিরপুরের একটা গল্প। অনেক কলকাতাবাসী নাবিকদের ঘরভাড়া দিতেন। ভাড়া দিতে না পারলে নগদ বিদায়। শাস্তির নাম 'পেটিচাপা'! ভাড়া বাকি পড়লেই বাড়িওয়ালার গুণ্ডা এসে ভাড়াটিয়ার হাত-পা বেঁধে মেঝের ওপর শুইয়ে বিরাট এক কাঠের বাক্স বুকের ওপর চাপিয়ে দেবে। দয়া করে কেউ লিখুন না হারিয়ে যাওয়া খিদিরপুরের গল্প—আমরা আর কতদিন আত্মবিস্মৃত জাতির বদনাম কুড়বো?

প্যারিসে বসে স্বদেশের কথা পড়তে পড়তে কখন যে রাত কেটে গিয়েছে তা বুঝতে পারিনি। যস্মিন দেশে যদাচারের সুযোগ পাওয়া গেল না, কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও অপ্রাপ্তির বেদনা নেই।

নিজের দেশের মানুষদের বিদেশের মাটিতে বসে আমি নবরূপে

আবিষ্কার করছি। মনটা হঠাৎ অপার আনন্দে এবং আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল। শত শত বৎসরের ধারাবাহিকতা রয়েছে আমাদের দুঃসাহসিকতার ইতিহাসে। আমরা পারবো, আমরা যা মন দিয়ে করবো পৃথিবীর কেউ তা পারবে না।

দুপুরে সেলিম আমার জন্যে মেট্রো স্টেশনের কাছে অপেক্ষা করছিল। লাজুক মানুষ, আমার সঙ্গতিপন্ন গৃহস্বামীর মুখোমুখি হতে সে অনিচ্ছুক। জোর করে আমার টিকিট কাটলো সেলিম। কোনো বাধা শুনলো না। বললো, "আজ আপনি আমাদের অতিথি। দেখে যান দেশের ছেলেদের। দেশ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এরা আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করছে। আজ এদের কাগজপত্তর নেই, কিন্তু কাল হবে। তারপর এরা খেটে খেটে পয়সা জমাবে, দোকান নেবে, প্রয়োজনে কলকারখানা বসাবে। পরের বারে যখন আসবেন তখন এদের হয়তো আপনি চিনতেই পারবেন না।"

খুব ভাল লাগছে আমার সেলিমের কথাগুলো শুনতে। সেলিম বললো, "দুঃখ একটাই। অমানুষিক কষ্টে এবং পরিশ্রমে সবার শেষ রক্ষে হবে না— কেউ অসুখে ভুগে অকালে মারা যাবে, কেউ দুঃখের বোঝা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করবে। পুলিস বড় নির্মম, শংকরবাবু। তবু এই স্রোত বন্ধ হবে না। বাঙালিদের রক্তে জেগে উঠেছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। তারা দুনিয়ার হাটে হাজির হবেই, তার জন্যে যত কষ্টই হোক সব তুচ্ছ।"

দু' একবার মেট্রো বদল করে সেলিম অবশেষে আমাকে যেখানে নিয়ে এল তা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিরাট এক পোড়ো ব্যারাকবাড়ি, বহু বছর আগে কোনো সময়ে হয়তো সৈন্যদের রাত্রিবাসের কেন্দ্র ছিল। একতলা দোতলা মিলিয়ে প্রায় শতখানেক খুপরি। তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমার দেশের ভাইরা প্রবাসের জীবনসংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

সেলিম আজ আমার পরিচয় দিল না। সে বললে "তাহলে হই চই পড়ে যাবে। এদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারবেন না। কাগজপত্তরের গোলমালের জন্যে অনেকের ভীষণ ভয়। এরাই

প্যারিসের ফেরিওয়ালা, বাদামওয়ালা, ফুলওয়ালা, এরা কখনও ওয়েটার, কখনও ভৃত্য, কখনও ঠিকে শ্রমিক, কখনও সাফাইদার। কিন্তু কখনও চোর নয়, পকেটমার নয়, ছিনতাইবাজ নয়।"

তখন দুপুর তিনটে। শিফ্‌ট বদলের সময়। একদল বাঙালি কাজ থেকে ফিরছে এবং আরেকদল কাজে বেরুচ্ছে। প্রতি ঘরে অন্তত দু'জন, কোথাও তিনজন। দেশের লোকদের প্রতি এদের টান ভীষণ। কাউকেই নিরাশ্রয় হয়ে থাকতে হবে না। ঠিকানা নেই, কাগজ নেই, অর্থ নেই, রোজগার নেই তো কী হয়েছে? তুমি তো বাংলায় কথা বলো। এসো, এখানে থাকো, দেশের লোকদের পরামর্শ নাও, তেমন হলে ফেরিওযালার কাজে বেরিয়ে পড়ো। পুলিসকে ভয় কোরো না। তুমি রাত্রে বাড়ি না ফিরলে ভোরবেলায় আমাদেরই কেউ থানায় খোঁজ করবে, তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে গাঁটের কড়ি খরচ করে। তুমি না আমার দেশের লোক।

প্রতি ঘরে ঘরে পরিচয়হীন আমার এবং ওদের পরিচিত সেলিমের জন্যে ভালবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার। সবাই জানতে চায় আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন কি না। তার চেয়ে যা আশ্চর্য, সবাই বলে, "দাদা দশটা মিনিট বসুন। ডালভাতের ব্যবস্থা করে ফেলি। প্রেসার কুকার আছে, হুস করে হয়ে যাবে। গরিবের রান্না বউদির হাতের রান্নার মতন হবে না, কিন্তু বিদেশে দুটি ভাত পাবেন না কেমন করে হয়?"

দেশে এঁদের মধ্যবিত্ত পরিবার। কারুর বাবা ডাক্তার, কারুর বাবা উকিল, কেউ সরকারি কর্মচারী। সুখ ও নিরাপত্তার সেই জীবনত্যাগ করে কেন এই ভাবে বেরিয়ে পড়া? একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত কষ্ট জেনেও কেন দেশ ছাড়লেন?" ছেলেটি হাসলো, "বেরোতে তো হবেই। দুনিয়া দেখতে হবে না?"

মনটা গভীর আনন্দ ও গভীর বেদনায় একসঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়েছি। নিখাদ ভালবাসার স্পর্শে আমার চোখে জল টলমল করছে। এতো ভালবাসা কী করে ওদের বুকের মধ্যে জমে থাকে?

সেলিমও হাঁটছে। আমি বললাম, "আইফেল টাওয়ার দেখা হলো না বলে আমার কোনো দুঃখ নেই, সেলিম। এখানে এসে বাঙালিদের

না দেখলে আমার মস্ত ক্ষতি হতো।"

সেলিম বললো, "যদি কখনও এদের সম্বন্ধে কিছু লেখেন, নামধাম সম্বন্ধে একটু সাবধান হবেন। বুঝতেই পারছেন, কাগজপত্তরের গোলমাল।" তারপর কী ভেবে সেলিম বললো, "আপনাকে কী আর বলবো। শুধু কলকাতা আব ঢাকার লোকদের বলবেন, আমরা ঘরছাড়া হলেও দিক্‌হারা নই। আমরা সারাক্ষণ দেশের দিকেই তাকিয়ে আছি।"

[গ্রন্থসূত্র
বঙ্গ বসুন্ধবা]

ঝোলে ঝালে অম্বলে

"গ্রেট সুখবর!" সাত সকালেই আমার টেলিফোন ঝন ঝন করে বেজে উঠেছে। ইলেকট্রনিক দূরভাষ যন্ত্রের অপর প্রান্তে রয়েছেন স্বয়ং ব্যান্ডোদা। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিল্স-এ এখন সন্ধ্যা সাতটা। অনাবাসী ভারতীয় আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা যে এখন আমেরিকায় পসার জমিয়ে বসেছেন তা তো এই বইয়ের পাঠকদের অজানা নয়।

টেলিফোনে দু'বার মাত্র হ্যালো-হ্যালো করেছি, তার জন্যেই বকুনি খেলাম ব্যান্ডোদার কাছে। "ওরে, এখন এ টি অ্যান্ড টি এবং বিশ্বায়নের যুগ, এখন আর নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের মতন হ্যালো হ্যালো করে হাঁপাতে হয় না। এখন ফিস ফিস করে কথা বললেই দুনিয়ার সব জায়গায় স্পষ্ট শোনা যায়।"

শ্রদ্ধেয় ব্যান্ডোদাকে একজন সম্মানিত বাঙালি হিসেবে মনে করিয়ে দিলাম, নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরিতে গেরস্ত বাঙালির বাড়িতে বিদ্যুৎও ছিল না, টেলিফোনও ছিল না, যদিও টেলিফোন কোম্পানি এবং ইলেকট্রিক কোম্পানি ঐ শতাব্দীর শেষ পর্বে কলকাতায় দোকান সাজিয়ে বসেছে। টোয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরির শেষ পর্বেও এদেশে ফোন কানে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ 'হ্যালোর' ফোড়ন না দিলে এবং শ্রবণযন্ত্রে সজোরে চাঁটি না মারলে কিছুই শোনা যেতো না।

স্নেহময় ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পিসির কী হলো?"

বোকার মতন আমি ভুল বুঝলাম। "স্যর পি সি রায়ের সম্বন্ধে সম্প্রতি যথাসম্ভব উপাদান সংগ্রহ করেই চলেছি। সামনেই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিটিউক্যাল কোম্পানি লিমিটেডের শতবার্ষিকী।" কিছু একটা তো করতেই হবে।

"শতবার্ষিকী উৎসবের সময় বস্তাপচা নাম-কেত্তন উৎসবের অভ্যাসটা ছাড়, তোরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে

বল, মা আমাদের মানুষ করো।" ব্যান্ডোদার মুডটা যে আজ খুব মিঠে নয়, তা তাঁর কথা শুনেই আমি আন্দাজ করতে পারছি।

"আই অ্যাম ভেরি ভেরি স্যরি, ব্যান্ডোদা। আপনি পিসি বলতে পার্সোনাল কমপিউটার বুঝিয়েছেন, আমি প্রথমে ভেবেছি আপনি আমার পিসির কথা জিজ্ঞেস করছেন, পরের মুহূর্তে খেয়াল হলো লাস্ট বার আপনি তো আমার পিসির নিয়মভঙ্গ সেরিমনিতে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং ইট মাস্ট বি আচার্য পি সি রে।"

ব্যান্ডোদার ভবিষ্যদ্বাণী : "তোরা জাত হিসেবে মরবি। এখনও বাড়িতে পিসি আনলি না, কার্ডে ই-মেল নম্বর ছাপলি না ; আর আমেরিকায় এমন সংসার নেই যেখানে ইন্টারনেট ঢুকে পড়েনি।"

"ব্যান্ডোদা, এইভাবে আমাদের ভাজা-ভাজা করবেন না, আমরা এখন সব বাঙালিকে বঙ্গোপাধ্যায় টাইটেল দিতে চাই ; ক্যালকাটাকে করতে চাই 'কোলকাতা', দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই, আমাদের দেশ, আমাদের শহর নিয়ে আমরা যা খুশি করবো, একেই বলে মুক্তির স্বাদ।"

"তোরা আরও দুটো দল তৈরি কর! সুতানুটি পার্টি আর গোবিন্দপুর পার্টি। জোব চার্নক আদিতে কলকাতায় ল্যান্ড করেছিলেন? না সুতানুটিতে? এই বিষয়ে তোরা চব্বিশ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ ডাকতে পারিস এবং এরই মধ্যে চুপিচুপি কলকাতায় বাঙালিদের সমস্ত ভদ্রাসন অন্য রাজ্যের ধনীদের কাছে বিক্রি হয়ে যাক।"

"মাই ডিয়ার ব্যান্ডোদা, দূর দেশ থেকে এই ভাবে অভাগা বাঙালিকে মনোকষ্ট দেবেন না। আমি সেকেন্ডহ্যান্ড পিসি অর্ডার দিয়েছি, দাম আর একটু কমলে আমি নিজেই ই-মেল নেবো এবং তখন আপনার সঙ্গে আমার কোনও দূরত্ব থাকবে না।"

শান্ত হয়ে গেলেন মার্কিন দেশের ব্যান্ডোদা। দুঃখ করলেন, "এই আমাদের লাস্ট চান্স রে। কমপিউটারটা বাঙালিদের স্বধর্ম—ওটা আয়ত্ত করে, জন্মসূত্রে পাওয়া অঙ্কের মাথাটা খাটিয়ে দুনিয়াকে টেক্কা দেওয়াটা যে অসম্ভব নয় তা সিলিকন ভ্যালিতে ইন্ডিয়ান এবং চীনেদের দাপট দেখলেই বুঝতে পারবি।"

"ব্যান্ডোদা, সেবার আপনি অনুপ্রেরণা দিলেন, আমরা প্রমাণ করে দিলাম, কল্‌কাতা এখনও বিশ্বের মিষ্টান্ন রাজধানী—সুইটমিট ক্যাপিটাল

অব দ্য ওয়ার্ল্ড। পরের বার আপনি কলকাতায় এলেন কচুরি সিঙাড়ার উৎস সন্ধানে। নোনতা খাবারেও আমাদের এই ইন্ডিয়া—দ্যাট ইজ ভারত—যে কারও কাছে দু'নম্বর ছিল না তার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। তবে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন ; এবং এই ধরনের অনুসন্ধান ঠিক মতন করতে যা খরচ তার ধাক্কা সামলাতে সাহেবি ফাউন্ডেশন লাইক ফোর্ড ফাউন্ডেশন অথবা গুগেনহাইম অথবা রকফেলারই পারেন।"

ব্যাড়োদার উত্তর : "সায়েবরা তো এই সেদিন টাকার মুখ দেখলো, তার আগে আমাদের ইন্ডিয়ায় নানা বিষয়ে বিশাল বিশাল গবেষণা এবং ঢাউস-ঢাউস গ্রন্থ রচনা হয়েছে। সায়েবরা একটা আধলা না ঠেকালেও এশিয়ায় মহাভারত সাইজের বই লেখা হবে।" তারপর সোজাসুজি যড়রস প্রসঙ্গে চলে এলেন ব্যাড়োদা। আমি বুঝছি ব্যাড়োদা ব্যান্ড পাল্টেছেন। তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন, "পৃথিবীতে মিষ্টান্নর ভবিষ্যৎ তেমন ভাল নয় রে।"

"কী বলছেন, ব্যাড়োদা? মধুর রসের পিছনেই তো আমরা বাঙালিরা যথাসর্বস্ব বিনিয়োগ করেছি। বাংলার নাম পাল্টে গৌড় করবার জন্যেও তো আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুনিয়ার সেরা গুড় এই দেশে তৈরি হতো, তাই এই মহান দেশের নাম হয়েছিল গৌড়।"

"একেবারেই বাজে কথা! লোকগুলো বোধহয় গৌরবর্ণ ছিল, তার থেকেই নিশ্চয় গৌড়।" সবকিছু সহজে মেনে নেবার পাত্র নন আমাদের আন্তর্জাতিক পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতা ব্যাড়োদা।

"ব্যাড়োদা, প্লিজ আমাদের গায়ের রঙের কথা তুলে মনে দাগা দেবেন না। জেনে রাখুন, মেগাস্থিনিসের আমলে গোটা ইন্ডিয়ার লোকের রং ছিল ধবধবে ফর্সা। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, বৌদ্ধ আমলে এদেশের মানুষের গায়ের রং বাদামি হয়ে গেলো, অবাধ মিশ্রণ ও সহজবোধ্য বৈবাহিক কারণে। সাদা দুধের মধ্যে কালো কফি পড়লে, অথবা ভাইসি-ভারসা হলে যে রকম পরিবর্তন ঘটে। লিকারের রংটা ব্রাউন হয়ে যায়।"

ব্যাড়োদা চামড়ার রং নিয়ে মাথা ঘামালেন না। বললেন, "ওরে জেনে রাখ, নতুন সহস্রক বা মিলেনিয়াম এসে গেলো, এবার পীত এবং

বাদামি জাতরাই দুনিয়ার সব হাটে নিজেদের লাঠি ঘুরোবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীও বিবেকানন্দর।”

আবার মিষ্টির কথা উঠলো। ব্যান্ডোদা সাবধান করে দিলেন, “তোরা মিঠাই ইনডাসট্রিতে বেশি বিনিয়োগ করিস না, এদেশে যতো মেয়েমদ্দ আছে সবাই নিজেদের ওজন কমাবার জন্যে নাচানাচি করে শরীর ঘামাচ্ছে—পেটে এক ছটাক মেদ জমতে দেবে না। এদেশে ধারণা, মিষ্টি খেলেই ওজন বেড়ে শরীরের টুয়েলভ ও ক্লক বেজে যায়। খবরদার সুগার কোম্পানির শেয়ার কিনবি না!”

“হোয়াট অ্যাবাউট কচুরি সিঙাড়া?” জিজ্ঞেস করি ব্যান্ডোদাকে কাতরভাবে। “ওই সাবজেক্টেও তো অনেক অনুসন্ধানের কাজ পড়ে রয়েছে।”

লবণরসের লাইনেও যে গভীর অন্ধকার তা দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ব্যান্ডোদা। “তেলেভাজা, ঘিয়েভাজার কাছাকাছি যাবে না এদেশের সায়েব-মেমরা। ওরা জেনেছে, এক চামচ তেলে কয়েকশো ক্যালরির রাক্ষস লুকিয়ে রয়েছে!”

“ব্যান্ডোদা, আমরা বাঙালিরা স্নেহপ্রবণ জাত। আমাদের মা-বোন শাশুড়িরা চিরদিন স্নেহময়ী। আবার তেল-ঘির নামও স্নেহ। আমরা কিছুতেই খ্যাংরা কাঠি মেমসায়েবদের মতন স্নেহহীন হয়ে এই দুনিয়াকে শুষ্কং কাষ্ঠং করতে পারবো না। ক্ষমা করবেন আমাদের।”

“ওসব ওয়ান্স আপন এ টাইম, মুখুজ্যে। এখনকার ইন্ডিয়ান বউমাদের নাম হচ্ছে সুতনুকা, তনিমা, তনুশ্রী। এরা আরও তন্বী হতে চাইছে।” বেশ জোরের সঙ্গেই জানালেন ব্যান্ডোদা।

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। “ব্যান্ডোদা, গাঁজার কলকের মতন সরু লম্বা চেহারার মেয়েদের আমরা হাওড়ায় এখনও ছিলিম বলি, কথাটা যে ‘স্লিম’ থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।”

ব্যান্ডোদা আমার সঙ্গে একমত হলেন না। শেষবারে ইন্ডিয়াতে এসে ফেরবার পথে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স মর্নিং ফ্লাইটে তিনি কলকাতা থেকে বোম্বাই গিয়েছিলেন। বিমানসেবিকা তাঁকে চুপি চুপি বলেছে, সারা বিশ্বের মধ্যে মাখনের বৃহত্তম অপচয় এদেশেই হয়—আড়াইশো প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দুশো পঁচিশজন যাত্রী মাখনের ঝকঝকে প্যাকেটকে আমূল বর্জন

করেন!

মানে, কমবয়সী ফিগারসচেতন রুমকি ঝুমকিরা শুধু নয়, মধ্যবয়সী বোস ঘোষ প্যাটেল ধাওয়ানরাও সায়েবদের মায়ামোহে পড়ে ক্রমশ ভাজাভুজি থেকে দূরে সরে আসবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং ক্রমশ আরও দূরত্ব সৃষ্টি হবে।

"ডিয়ার ব্যান্ডোদা, ফোন তুলেই আপনি বললেন, গ্রেট সুখবর। অথচ আমি তো দেখছি, সবই খারাপ খবর। আমার ডাক্তারবন্ধুর বোন বিলেতে পিঁয়াজির দোকান করবার আগে এদেশে ব্যবসায়িক সমীক্ষায় আসবে বলছিল। বেচারা তো ধনে-প্রাণে মারা পড়বে।"

টেলিফোনে বকুনি লাগালেন ব্যান্ডোদা। "তুই বড় অধৈর্য হয়ে পড়িস। তোদের মতন নার্ভাস লোক দিয়ে বাঙালিদের কস্মিনকালেও কোনও উন্নতি হবে না। ব্যাপারটা শোন ভাল করে। কচুরি সিঙাড়া জিলিপির যুগ পশ্চিমে সহজে আসছে না। কিন্তু পিঁয়াজির ব্যাপারটা আলাদা। ড্রিংকের সঙ্গে গোল্ডেন-ব্রাউন পিঁয়াজির স্বাদ বিদগ্ধ সায়েবরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন।"

"পিঁয়াজি কথাটা সায়েবরা উচ্চারণ করতে পারছে, ব্যান্ডোদা?" গভীর আশঙ্কা মনে পুষে রেখে আমি জানতে চাই।

"নোলা দিয়ে জল গড়ালে প্রাণের দায়ে এযুগের আয়েসী সায়েবরা সব উচ্চারণ করতে রাজি। ওই যে ইন্ডিয়াতে স্কুটার তৈরি করে ইটালিয়ান কোম্পানি—পিয়াজিও, ওই নামটা পিঁয়াজির বদলে উচ্চারণ করছে।"

গোপন খবরটা এবার বলেই ফেললাম ব্যান্ডোদাকে। উচ্চারণ প্রমাদ থেকে সায়েবদের রক্ষে করবার জন্যে ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর সর্বদমন রায়কে লাগিয়েছিলাম। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে আমার বন্ধুর বোনের পিঁয়াজি কোম্পানির ব্র্যান্ডনেম ঠিক করে দিয়েছেন— ওনিওনি।

ব্যাখ্যা চাইলেন ব্যান্ডোদা। "খুবই সহজ ব্যাপার—পিঁয়াজ ইজিকলটু ওনিওন—বেগুন থেকে যেমন বেগুনি, তেমনি ওনিওনি। ঝটিতি রেজিস্ট্রি করে নিচ্ছে আমার বন্ধুর বোন—বিদেশে নামকরা ব্র্যান্ড হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁরে, 'ব্র্যান্ড' শব্দটার বাংলা নেই বুঝি? নামটার গোড়াতেই

তোদের গলদ। তোরা বিদেশে ব্র্যান্ড বিল্ডিং করবি কী করে?"

"ব্যান্ডোদা, প্রফেসর সর্বদমন রায়কে আমি চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিলাম, উনি তিন দিন সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই এসে আমাকে বললেন, আনন্দমার্গের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা প্রভাতরঞ্জন সরকার আনন্দমূর্তিজি ব্র্যান্ডের চমৎকার বাংলা করে দিয়েছেন— 'কেতন।' অতি যোগ্য নাম, কিন্তু পতাকার মতন এই কেতন তুমি ওড়াতে পারো। কিন্তু নামটা এখনও তেমন চালু হয়নি।"

খবরটা পেয়ে খুব খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। "আমার বন্ধু, কেলগের মার্কেটিং প্রফেসর অজয় বসুমিত্রকে খবরটা দিতে হবে।"

"বসুমিত্র! ব্যান্ডোদা, ওঁকে বলবেন না, প্রভাতরঞ্জনের মতে বসুমিত্র কথাটির আদি অর্থ ছুঁচো। মাটির গর্তে থাকে তাই এই নাম।"

আরও খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। "ওরা আমেরিকান সিটিজেন, ব্যাপারটা স্পোর্টিং স্পিরিটে নেবে। হ্যাঁরে অজয়ের বউ ছিল প্রামাণিক। ওই নাম নিয়ে কোনও রিসার্চ আছে?"

"অবশ্যই আছে। তবে আমার নয়। এগেন পি আর সরকার রিসার্চ! নপ্ত শব্দ থেকে এসেছে নাপিত। প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণের পরেই ছিল নাপিতের স্থান—বিধিবিধানের জন্যে বাউনকে হাতের গোড়ায় না পাওয়া গেলে সোজা চলে যাও নাপিতের কাছে—তাই প্রামাণিক।"

আরও খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। তারপর ফিরলেন পিঁয়াজ প্রসঙ্গে। সায়েবরা যে শীঘ্রই পিঁয়াজিপ্রেমী হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পেঁয়াজ রসুন সম্বন্ধে চিরন্তন ভারতবর্ষের মানসিকতা কি তা জানতে তিনি বিশেষ আগ্রহী। এবিষয়ে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমি শুধু জানি, প্রাচীন ভারতে পিঁয়াজ আমাদের পূর্বপুরুষদের তেমন মনোহরণ করতে পারেনি।

"খোঁজখবর নে, আমি মিনিট পনেরো পরে আবার তোকে ফোন করছি", এই বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন ব্যান্ডোদা। আর আমি ভাবতে লাগলাম, কালে কালে হলো কি! কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ইন্ডিয়া—কিন্তু ফোনের বোতাম টেপামাত্র হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি, জগৎ আসি সেথা করেছে কোলাকুলি।

আমি এবার অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের সঙ্গে স্থানীয় টেলিফোনে কিছু কথা বললাম।

"প্রফেসর রায়, আপনি রেডি হয়ে থাকুন। ব্যান্ডোদার মতিগতি ভাল মনে হলো না! যেভাবে টেলিফোনে পিঁয়াজ রসুন সম্বন্ধে এনকোয়ারি করছেন, তাতে কোনও একটা কঠিন বিষয়ের স্পেশাল রিসার্চে আমাদের জড়ালেন বলে।"

সর্বদমনবাবু সিরিয়াস রিসার্চে সারাজীবন জড়িয়ে থেকেছেন। ফলে আমাদের সঙ্গে কাজ করে তিনি যে মজা পান তা সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে জানিয়ে দিলেন।

"প্রফেসর রায়, কাজের মধ্যে এই মজাটাই তো সব। এই জন্যেই তো আমেরিকান ডলারে মিলিয়নেয়ার এবং এদেশের টাকায় বিলিয়নেয়ার হয়েও ব্যান্ডোদা এই সব স্পেশাল অনুসন্ধান চালিয়ে যান।"

একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে প্রফেসর রায়ের। আমি বললাম, "সর্বদমন বাবু, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। আমেরিকায় কুড়ি মিলিয়ন জমাতে পারলেই, ইন্ডিয়ান রুপির হিসেবে আপনি শত কোটিপতি হয়ে গেলেন। বিলিয়নেয়ার হিসেবে তখন আপনার মাথায় অবশ্যই নানা রকম স্পেশাল খেয়াল জাগতে পারে।"

পিঁয়াজ রসুন একেবারেই পছন্দ করেন না প্রফেসর রায়। তবু জানালেন, "ব্যান্ডোবাবুকে বলবেন, এ দুটোতেই দুর্গন্ধ—এসেছিল গান্ধারীর দেশ আফগানিস্থান থেকে। ১৭০০ বি সি-তে পেটুক গ্রীকরা রসুন আমদানি করতো ইন্ডিয়া থেকে। পিঁয়াজের নাম ছিল পলাণ্ডু। যার থেকে পোলাও শব্দটা এসেছে। নবাবী আমলে পিঁয়াজ জাতে উঠেছে।"

"ম্লেচ্ছ ও যবনদের প্রিয় বলে পিঁয়াজকে অবজ্ঞা করা যাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সাধনভজনে পিঁয়াজ নিষিদ্ধ। আনন্দোৎসবেও পিঁয়াজ বারণ। স্বামী বিবেকানন্দকে লন্ডনের সায়েব ভক্তরা সেবার জিজ্ঞেস করলেন, পিঁয়াজ খাওয়া চলবে কি না? সাধনকালে পিঁয়াজ খেতে বারণ করলেন বিবেকানন্দ, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন, কম বয়সে তিনি নিজে প্রচুর কাঁচা পেঁয়াজ খেতেন। মুখের গন্ধ দূর করবার জন্যে

অনেকক্ষণ ধরে তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন।"

ঘড়ির কাঁটা ধরে আবাব সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে ফোন এলো ব্যান্ডোদার।

"হ্যালো ব্যান্ডোদা। ব্যাড্ নিউজ। প্রফেসর রায় ঋগ্‌বেদের ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৬টি পদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন—একবারও পিঁয়াজের উল্লেখ নেই, যদিও গোরুর উল্লেখ আছে অন্তত সাতশোবার।"

"তোর ফিগার নির্ভরযোগ্য?" অনুসন্ধানী ব্যান্ডোদার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

"কী বলছেন! প্রফেসর রায় বাড়িতে পিসি বসিয়েছেন। হিসেব করে ফেলেছেন ১০২৮টা সূক্ত আছে ঋগ্‌বেদে। প্রতিটি সূক্তের আবার আটটা খণ্ড।"

"সাম্‌বেদে নিশ্চয় পেঁয়াজকে পাওয়া যাবে," সাজেশন দিলেন ব্যান্ডোদা।

"স্যরি ব্যান্ডোদা। ওই বেদে তো স্রেফ কবিতা—১৫৪৭টা স্তবক আছে, অ্যাকর্ডিং টু সর্বদমন রায়। প্রায় সবই ঋগ্‌বেদের পুনরাবৃত্তি, ৭৫টি স্তবক ছাড়া। ওখানে কেন, পরবর্তীকালের উপনিষদেও কান্দাহারি পেঁয়াজকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।"

"সেকালে ইন্ডিয়া ভীষণ রক্ষণশীল ছিল। তবে তোকে পূর্বপুরুষদের নিন্দে নিজের মুখে করতে হবে না।"

"দুধ মুড়ি চিড়ে এই সবই বোধ হয় শ্রদ্ধেয় আর্যদের প্রিয় খাদ্য ছিল, ব্যান্ডোদা।"

"মুড়ি এবং খই সম্বন্ধে একটা রিসার্চ পেপার এখানকার সায়েবরা তৈরি করেছে। খইয়ের তখন নাম ছিল 'লাজ'—এই লাজই বিয়ের কনে আগুনে ফেলতো, যার থেকে লাজবন্তী কথাটার উৎপত্তি। আর চ্যাপ্টা বলে চিড়ের নাম চিপিট, এটাও বইতে দেখলাম।"

"ওর আর একটা নাম প্রফেসর রায় প্রায়ই বলেন—পৃথুক। বইতে মুড়ির পোশাকী নামটি চমৎকার ঢাণ্ডিঢাক। আর এক নাম হুড়ুম্ব—সংস্কৃত বলে মনে হয় না।"

"প্রফেসর রায়ের মাথা খারাপ। আমাকে লিখেছেন, স্যুপ এবং জুস দুটি শব্দই নাকি আবহমান ভারতের নিজস্ব অবদান। ডাল দিয়ে যে

তরল স্যুপ তৈরি হতো, তার নাম স্যুপ অথবা জুস। আর রাঁধুনিকে যে সূপকার বলা হতো তা বাংলা অভিধানেও বেশ কয়েকবার দেখেছি! সস্ শব্দটিও নাকি ইন্ডিয়ান। আচার্য সর্বদমন রায়ের হাতে পড়লে, দুনিয়ার সব খাদ্যদ্রব্যই ইন্ডিয়ান হয়ে যাবে।"

"ও কথা ওঁকে বলবেন না, ব্যান্ডোদা। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল ভাষাবিদ। আমি ওই ধরনের ইঙ্গিত দিতে তিনি ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, কই আমি তো বলিনি কাবলি ছোলা আমাদের, যদিও সংস্কৃতে এর নাম পাওয়া যাচ্ছে ওলিসন্দগ। কিন্তু এটি এসেছে প্রাচীন কালের আলেকজান্দ্রিযা অঞ্চল থেকে।"

ব্যান্ডোদার খেয়াল থাকে না যে আন্তর্জাতিক টেলিফোনের বিল চড় চড় করে উঠে যায়। এইবার আমার দিক থেকে বিনীত অনুরোধ, "আর, সাসপেন্সে রাখবেন না ব্যান্ডোদা, সমবয়সী হলে বলতাম এবার ঝেড়ে কাশুন!"

ব্যান্ডোদা জানালেন, "গতকালই লন্ডন থেকে ফিরেছি। গ্রেট সুখবর— বিলিতি সায়েবরা তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতীয় ডিশ নির্বাচন করেছে!"

"নিশ্চয় ফিশ অ্যান্ড চিপ—আলু-মাছ ভাজা। জাতটা আর কিছু জানে না। আঙুল সাইজ ছাড়া আলুও কাটতে শেখেনি, অথচ আমার মা গরিব ঘরের মেয়ে হয়েও অন্তত বাইশ রকমভাবে আলু কাটতে জানতেন। আঙুলে আলু প্রথমে সেদ্ধ করে এবং পরে ভেজে সায়েবরা রসনায় যে কি সুখ পায়!"

"ভাজাভাজিই তো বাঙালিদের পছন্দ! ভাজা পেলে আমরা তো আর কিছুই চাই না।"

আমার সবিনয় প্রতিবাদ : "তা ঠিক নয়, ব্যান্ডোদা। স্বামী বিবেকানন্দ তো শুধু বেদ-বেদান্তকে মডার্নাইজ করেননি, নতুন যুগের বাঙালিদের মডার্ন করবার জন্যে বলেছেন, বাছাধন, ওঠো জাগো, কিন্তু সকালবেলায় উঠেই ময়রার ভাজাভুজি খেয়ো না। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মশায় পর্যন্ত স্বামীজির অ্যাডভাইসকে গুরুমন্ত্র হিসেবে নিয়ে মায়াবৌদিকে নির্দেশ দিয়েছেন, পিঁয়াজ ভাজবে না, হজম সহজে হয় পিঁয়াজসিদ্ধ! স্বামীজি নাকি পই পই করে বলে গিয়েছেন।"

ব্রিটেনের ভোট কোন্ দিকে পড়লো? ব্যান্ডোদা আবার একটা চান্স দিলেন আমাকে। "নিশ্চয় বিফ স্টেক জাতীয় কিছু একটা হবে।"

"ওরে কলকাতায় বসে কূপমণ্ডুক তোরা কোনও খবরই রাখছিস না। এখন গ্যালপ পোলে দেখা যাচ্ছে, বিলিতি সায়েবদের সবচেয়ে প্রিয় ডিশের নাম 'কারি'। ৬ কোটি ইংরেজদের সিকিভাগ, মানে দেড় কোটি সায়েব, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার চিকেন টিক্কা কারি খেতে না পেলে মনে করবে সায়েব হয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না!"

একটু থেমে ব্যান্ডোদা বললেন, "কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড! পলাশির যুদ্ধের বদলা নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন অকুপাই করতে আমাদের মাত্র আড়াইশো বছর লাগলো।"

"গ্যালপ পোলে স্বীকার করা মানে তো একেবারে সারেন্ডার করা, ব্যান্ডোদা। ইংরেজদের আত্মসমর্পণের এতো বড় খবরটা স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বছরেও আমাদের খবরের কাগজে ফলাও করে বার হলো না!"

ব্যান্ডোদা নিজেরও বেশ উত্তেজিত। জানালেন, "আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। তারপর শ্রাবণী বসু বলে এক ধানিলঙ্কা মহিলার সঙ্গে বিলেতে যোগাযোগ করলাম। আনন্দবাজারের লন্ডন প্রতিনিধি, তিনিই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন ; জন্মভূমির গর্বে গরবিনী হয়ে শ্রাবণী এই কারি নিয়ে বই লিখছেন—সায়েব মহলে হই হই পড়ে গিয়েছে।"

ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছি। বললাম, "আমরা এখান থেকে এই লেখিকার জয়ধ্বনি তোলার জন্য কী করতে পারি?"

ব্যান্ডোদা জানালেন, "বইয়ের নাম বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'রাজমুকুটে কারি'!"

"আহা! স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরীর রাজমুকুট বলে কথা! শুনেছি, এই রাজমুকুট সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে পরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান সায়েবরা দ্বীপপুঞ্জের বাইরে এই রাজমুকুট পাঠাতে রাজি হলেন না—আইন নেই। ওদেরও কালাপানি পেরনোর বিধিনিষেধ আছে! তখন অনুগত ভারতীয় প্রজারা বহুটাকা খরচ করে আর একটা রাজমুকুট বানালেন স্রেফ দিল্লি দরবারের জন্যে। এক বাংলাদেশি ছোকরা বললে, সেই মুকুটেরও ভ্যালুয়েশন এখন নাকি চারশো কোটি টাকা! রাজার মুকুটে এখন কারির ভুরভুরে গন্ধ! আহা!"

ব্যান্ডোদা বললেন, "তোরা শ্রাবণীব লেখাকে জাতীয় পর্যায়ে একটু ফোড়ন দে।"

"কী দেবো?"

"ফোড়ন—একটি ছ্যাঁক ছ্যাঁক আওয়াজ হোক, চারদিকে বইটার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ুক, লোকে জানুক আমাদের ইংলন্ড বিজয়পর্ব অবশেষে সম্পূর্ণ হয়েছে।"

ফোন নামিয়ে রাখার আগে ব্যান্ডোদা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। মণ্ডামিঠাই ফুলুরি কচুরি ফেলে রেখে এবার আমাদের ঝালের দিকে নজব দিতে হবে তড়িৎগতিতে।

প্রফেসব রায়ের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমাকে আলোচনায় বসতে হবে। যতোই ব্যান্ডোদা অপছন্দ করুন, সর্বদমনের দৃষ্টিভঙ্গি বেদান্তিক, ওঁর মতামত থেকে অনুসন্ধানের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমি বলেছি, "ব্যান্ডোদা, যদি আপনাকে ঝাল নিয়ে কাজ করতে হয় তা হলে দলে একজন তেলুগু বিশেষজ্ঞ রাখারও বিশেষ প্রয়োজন—ঝালের হাড়হদ্দ ওবাই বোঝে।"

ব্যান্ডোদা বাজি নন। "তোরা দু'জন আমার কাছাকাছি থাকলেই যথেষ্ট। দু'জনে দুশো। জেনে রাখ, সাচ্চা বাঙালি ঝালোয়ান এখনও দুনিয়ার সেরা।"

"পালোয়ান থেকে আপনি ঝালোয়ান করে দিলেন। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হলো, ব্যান্ডোদা।"

প্রফেসর সর্বদমন রায় এখন বেশি সময় এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ব্যয় কবেন।

এশিয়াটিকের কাছেই পার্ক স্ট্রিটের ওপর যে কাঠি রোলের দোকান আছে সেখানেই ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম। সর্বদমন রায় ভেজিটেব্‌ল রোলের অর্ডার দেওয়ায় আমি দুঃখ পেলাম। "সর্বদমনদাদা, আপনার পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দ তো কখনও ভক্তদের শাকাহারী হতে বলেননি।"

অধ্যাপক রায় একটি বোমা ছাড়লেন। "মোগল সম্রাটরাও স্বেচ্ছায়

শাকাহারী হয়ে পড়েছিলেন এটা জেনে রাখুন। উপোস এবং নিরিমিষ, দুটোই টেনেছিল সম্রাট আকবরকে। স্বয়ং হুমায়ুন গোমাংস ভক্ষণের বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন একসময়। আর সম্রাট ঔরঙ্গজীব তো কট্টর নিরামিষী! উপবাসে ইসলামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া পৃথিবীর কোনও ধর্মের পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ বিষয়ে একদিন বিস্তারিত আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রফেসর রায়। এখন এই কাঠি রোলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উপবাসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কথা তুললে আর্যপুত্রদের নার্ভের ওপর অত্যধিক চাপ পড়বে।

প্রফেসর রায় এখন যে বিষয়ে সারাক্ষণ ডুবে আছেন তা হলো—কৌদ্রাবিক।

“ব্যাপারটার তাৎপর্য কী?” জানতে চাই আমি।

“এর মানে হলো যার বাড়িতে নুন খাওয়া চলে। সে যুগে নিজের জাতভাই ছাড়া অন্য কারও হাতে নুন খাওয়া চলতো না। কাজের বাড়িতে পৃথক পাত্রে পৃথক জাতের জন্য পৃথক পাত্রে নুন থাকতো।”

আমি বললাম, “কারি তৈরি করতে ঝাল লাগে, নুনও লাগে। সুতরাং আপনি অনুসন্ধান চালিয়ে যান।”

প্রফেসর রায় : “ব্যান্ডোদাকে বলবেন, নুন নিয়ে ইন্ডিয়াতে অনেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। লবণকে আগে বলত লক্তপ্রাণ অর্থাৎ রক্তপ্রাণ।”

“নুন বলতে ছোটবেলায় বুঝতাম বিটনুন!”

“জেনে রাখুন, আগে একে বলা হত খণ্ডনুন। মুসলমানি আমলে হয়ে গেলো সুলেমানি নুন।”

“ছোটবেলায় ফেরিওয়ালার মুখে গান শুনেছি, সুলেমানি নিমক খেতে আর ভুলো না দাদা, আর ভুলো না।”

প্রফেসর রায় : “ব্যান্ডোদা কী প্রমাণ করতে চাইছেন জানি না। কিন্তু জেনে রাখুন প্রাচীন ভারতে নুন সহজলভ্য ছিল না। সমস্ত ঋগ্‌বেদে একবারও নুনের উল্লেখ নেই—পুণার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে বলেছে। আসলে মানুষকে নুন খেতে কোনওরকমে উৎসাহ দেওয়া হতো না। শাস্ত্রে প্রথম তিনদিন যাদের নুন খাওয়া নিষিদ্ধ তাদের মধ্যে রয়েছে—ছাত্র, বিধবা এবং নববিবাহিতা।”

এরপর যা বললেন সর্বদমন রায় তা লিখে নেবার জন্যে রাস্তার ফুটপাথেই আমি নোটবই খুললাম। ব্যান্ডোদা ঢিলেঢালা কাজ পছন্দ করেন না। যা জানা যাচ্ছে, ইংরেজরা নুনের ওপর একটা ট্যাক্সো চাপিয়েছিলেন বলে গান্ধীজি লবণ আন্দোলন ও ডাণ্ডি অভিযান করে দেশ কাঁপিয়ে তুললেন। অথচ আদিযুগ থেকে দুটো টাকা রাজকোষে তুলবার জন্যে লবণের দিকে নজর সব সরকারের, মৌর্য যুগে সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল নুনের উপর।

"শুনুন মশাই, সায়েবরা নুনের ওপর একটা ট্যাক্সো চাপিয়ে গালমন্দ খেলেন, আর আমাদের হিন্দু রাজারা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে ছিলেন একটা নয় ছ'টা লবণ ট্যাক্সো। চারটে দিতো বিক্রেতা, আর দুটো দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ক্রেতার।"

"এখন আর এসব খারাপ খবর সায়েবদের কানে তুলে লাভ নেই।"

সর্বদমন রায় একমত হলেন না। বললেন, "সায়েবরা তো তাদের অনেক অপ্রিয় খবরের মহাফেজখানা শত্রুমিত্র সবাব কাছে খুলে দিচ্ছে ইতিহাসের মুখ চেয়ে। আমাদেরও এই পথ অনুসবণ কবতে হবে। এইটাই তো যুগধর্ম।"

ব্যান্ডোদার নির্দেশ মতন কয়েকটা জটিল প্রশ্ন তুলে দিলাম অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের হাতে। সবিনয়ে বললাম, "ব্যান্ডোদাব মনটা এখন ঝালেব দিকে। তাই এবারের প্রোজেক্টের নাম দিয়েছি 'ঝালে-ঝোলে-অম্বলে'।"

"খুব ভাল নাম হয়েছে! ঝালে-ঝোলে-অম্বলে—কমন মশলা হলো ঝাল! অথচ প্রতিযোগীরা বুঝতে পারবে না আমরা কী নিযে অনুসন্ধান করছি! নুন হতে পারে, ঝাল হতে পারে, টক হতে পারে, এমনকি মিষ্টিও হতে পারে। অথচ ব্যান্ডোদা অ্যান্ড কোং-এর আসল নজর থাকবে ঝালের দিকে।"

কোশ্চেনগুলোর দিকে তাকালেন সর্বদমন রায়। এসব প্রশ্ন তাঁর কাছে ডালভাত। ভগবান এই ভদ্রলোককে একখানা স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন বটে! মাথার মধ্যে যেন একডজন ইন্টেল পেন্টিয়াম চিপ্‌স সাজানো রয়েছে।

"লিখে নিন," বললেন সর্বদমন রায়। "সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে খাদ্যরহস্য নিয়েই খানকয়েক সর্বজনপাঠ্য উপন্যাস লিখে ফেলতেন। দেশের যে কী ক্ষতি হলো, মানুষটা অকালে চলে গেলো, অথচ শরীরের ওপর কোনওরকম অত্যাচার করতেন না, নিয়মে বাঁধা সংযমী জীবন।"

আমি লিখতে প্রস্তুত। সাবজেক্টটা বললে মাসিক চমচম পত্রিকার সম্পাদক ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী মশাই আমাকেও হয়তো চান্স দিতে পারেন। কিন্তু বড় কঠিন এই অনুসন্ধান।

সর্বদমন শুরু করলেন : "ব্যান্ডোদাকে বলবেন, গোলমরিচের আদিনাম কৃষ্ণ! ইংরিজিতেও তো ব্ল্যাক পেপার বলে! পিপুলীর আদি নাম কৃষ্ণা।"

"কী ব্যাপার—কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে দেশটা গেলো! এই সেদিন শুনলাম, আমের নামও কেশবায়ুধ!"

"হ্যাঁ! কৃষ্ণের অস্ত্র ছিল এই আম। অপরকে আম খাইয়ে অনেক কাজ তিনি করিয়ে নিতেন, তাই কেশবায়ুধ! ওঁর প্রিয় লতা—মাধবস্য প্রিয়—তাই তার নাম মাধবী। প্রিয়পথতরু—দেবদারু।"

কৃষ্ণনিন্দা বেশিদূর এগলো না। কারণ ভোজনে ও রন্ধনে কেশবের যে প্রবল আগ্রহ ছিল তা জানা গেলো। সুতরাং ব্যান্ডোদা ও কৃষ্ণের কমন ইনটারেস্ট!

সর্বদমন জানালেন, "যজ্ঞিডুমুরের তরকারি পর্যন্ত রাঁধতে পারতেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ।"

সামান্য কয়েকদিন পরেই খোদ তাজ বেঙ্গল থেকে এই অধমকে ফোন। ব্যান্ডোদা চুপি চুপি কে এল এম ফ্লাইটে ক্যালকাটায় পদার্পণ করেছেন। বিরাট সুইট নিয়েছেন চারতলায় হোটেলের উত্তর-পশ্চিম দিকে। আজকাল সায়েবরা যে অনুপাতে ইন্ডিয়ান হবার চেষ্টা করছেন, তার সমপরিমাণ উৎসাহে ইন্ডিয়ানরা সায়েব হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এদেশেও ব্যান্ডোদার নামকরা ক্লায়েন্ট আছেন—তাঁরাই সাগ্রহে সব খরচাপাতি দিয়ে ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ব্যান্ডোদার দেখভাল করছেন এদেশে।

হাওড়া হাট থেকে আগের বারে সংগৃহীত একটি ফুলকাটা কোরা

পাঞ্জাবি পরে ব্যান্ডোদা সোফায় বসে আছেন। সেবার সর্বদমন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার দাদা কখনও 'কোষাতক' পরেন না?" এর অর্থ যে গেঞ্জি তা আমার জানা ছিল না। চরণকোষ অর্থাৎ মোজাতেও ব্যান্ডোদার উৎসাহ নেই—আন্তর্জাতিক বিমানের উঁচু শ্রেণীতে মোজাবিহীন হয়ে তিনি ভ্রমণ করেন।

এবারে ভীষণ আনন্দিত এবং উত্তেজিত আমাদের ব্যান্ডোদা। লন্ডনে তিনদিন তিনরাত বসবাস করে লেখিকা শ্রাবণী বসুর সঙ্গে যে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তা বুঝতে পারছি।

ব্যান্ডোদা বললেন, "ভাবা যায় না, মুখুজ্যে! অ্যালকহলিকের মতন নতুন একটা কথা—কারিহলিক—ওদেশে সৃষ্টি হয়েছে। ওইটুকু দেশে আট হাজারের বেশি ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ! দিল্লি বম্বেতেও এতো ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ পাবি না তুই।"

"নামেই ইন্ডিয়ান! বিলেতের প্রায় সব ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁই তো বাঙালিদের।"

প্রতিবাদ করলেন না ব্যান্ডোদা। "সিলেটিরা বিশ্বের দরবারে বাঙালিদের মান রাখছে। এই কলকাতায় বাঙালি খাবারের রেস্তোরাঁ মাত্র দেড়খানা ; অথচ আমরা বাঙালিরাই এদেশের খাবার নিয়ে বিলেত জয় করলাম। শুনে রাখ, কারির জন্ম এদেশে, কিন্তু কারির বিশ্বকেন্দ্র হয়ে উঠেছে লন্ডন—থ্যাংকস্ টু বেঙ্গলিজ। প্রতি সপ্তাহে কুড়ি লাখ সায়েব হট কারি খেয়ে হা-হু করার জন্যে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় যায়। প্রতি বছর এই খাতে ইংরেজ সায়েবদের খরচ দুইবিলিয়ন পাউন্ড—অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায়...না, শুনলে তোদের হার্ট ফেল করবে—১৪০০০ কোটি টাকা।"

আরও কিছু খবর দিলেন ব্যান্ডোদা। "একজন ইংরেজ সায়েব ব্যবসায়িক কাজে লন্ডন থেকে আমেরিকার মিয়ামি, ফ্লোরিডায় গিয়েছিলেন। সেখানে মনের মতন কারির দোকানের খবর না পেয়ে তিনি তাঁর পরিচিত লন্ডন রেস্তোরাঁ থেকে একটা কারি মিল আনিয়ে নিলেন—খরচ পড়ল মাত্র এক লাখ টাকা। সো হোয়াট! কারির নেশা বড় নেশা। ১৯১৮ সেপ্টেম্বর মাসে লেবার পার্টির জরুরি বৈঠক চলেছে। প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ারের স্ত্রী চেরি ব্লেয়ার চুপিচুপি চলে

গেলেন স্থানীয় সুনম তন্দুরিতে খাবারের অর্ডার দিতে—পাপড়ম্, চিকেন টিক্কা মশালা, মাদ্রাজী ল্যাম্ব, ডাল ও সজি। আঠারো জনের জন্য লাঞ্চ প্যাকেট, খরচ পড়লো ১১৫ পাউন্ড।"

টেলিভিশনের বিখ্যাত রাঁধুনি কেন হোম। সাংবাদিকদের চাপে পড়ে এই তারকা স্বীকার করেছেন, যেখানেই ভোজ খেতে যান পকেটে রাখেন ম্যাড্রাস হট কারি পাউডার। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে নেন এই পাউডার জিভে স্বাদ আনার জন্যে।

"ব্যান্ডোদা, আমরা আজ যা ভাবি, মহাপুরুষরা একশো বছর আগে তাই করে থাকেন। এইট্টিন নাইনটি ফাইভ থেকে একজন বাঙালি খাদ্যরসিক একই কাণ্ড করেছেন আমেরিকায় ও ইংলন্ডে।"

"কে এই মহাপুরুষ?" সাগ্রহে জানতে চাইছেন আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা।

"সর্বত্যাগী পুরুষ, কামিনীকাঞ্চনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, বিশ্বকে বেদান্ত সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সারাক্ষণ নিজের জোব্বায় রেখেছেন নানা ধরনের ইন্ডিয়ান গুঁড়ো মশলা। এই ভদ্রলোকের নাম স্বামী বিবেকানন্দ।"

কপালে হাত ঠেকালেন ব্যান্ডোদা। "সাধে কি আর রামকৃষ্ণদেব নরেন দত্তকে এক নম্বর শিষ্য হিসেবে সিলেক্ট করেছিলেন। প্রবাসে স্বদেশি রান্না ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সব খবরাখবর যোগাড় করে ফেল, দরকার হলে তুই প্রফেসর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বাড়িতে ধর্না দিয়ে পড়ে থাক, কিন্তু রান্নাবান্না সম্পর্কে সমস্ত অকথিত কাহিনী যেন আমাদের রিসার্চ রিপোর্টে থেকে যায়।"

"ব্যান্ডোদা, কেন সামাজিক ভদ্রতায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান করছেন? বলুন, পলাশিতে বাঙালির রক্তেই ক্লাইভের খঞ্জর লাল হয়েছিল, আবার সময়ের রসিকতায় বাঙালিরাই ইংলন্ডের মাটিতে রসনালোলুপ সায়েবদের নিঃশর্ত সারেন্ডার গ্রহণ করলো।"

ব্যান্ডোদা বেশি প্রতিবাদ করলেন না। "বিলেতের আশিভাগ রেস্তোরাঁই এখন বাঙালিদের। এঁদের বাৎসরিক রোজগার ১.৬ বিলিয়ন পাউন্ড—টাকায় ধরলে এগারো হাজার কোটি। এঁরা সেলস্ ট্যাক্স দেন বছরে ১৮০০ কোটি টাকা—তোদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সকলে মিলে এর

অর্ধেক সেলস্ ট্যাক্স দিতে পারিস না। বুঝছিস ব্যাপারটা!"

শ্রাবণী বসুর লেখা থেকে ব্যান্ডোদা যে অনেক মালমশলা সংগ্রহ করেছেন তা বুঝছি, যদিও পরিসংখ্যান আমার মাথায় কোনওদিন তেমন ঢোকে না।

ব্যান্ডোদা বললেন, "শুনে রাখ, ইংরেজের ইস্পাত শিল্পে এবং বিলেতের সমস্ত খনিতে যতোলোক কাজ করে তার থেকে বিলেতে বেশি লোকের কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন সিলেটের প্রতিভাবান বাঙালিরা! ওঁদের কর্মচারীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতন।"

জয় হোক বাঙালিদের। জয় বাংলা বলা উচিত ছিল, কিন্তু ছোঁয়াচে চোখের রোগের কল্যাণে এখন তার অর্থ অন্য।

শুধু রেস্তোরাঁয় মুখ পাল্টানো নয়, মেমসায়েবের হেঁসেলেও ইন্ডিয়ান কারি ইদানীং বীরবিক্রমে ঢুকে পড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ নিয়ে এসেছেন ব্যান্ডোদা।

মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকান থেকে বিলিতি মেমরা প্রতি সপ্তাহে ১৮ টন চিকেন টিক্কা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে সার্ভ করার জন্যে। জেনে রাখুন, বিখ্যাত এই দোকানে অন্তত ছাব্বিশ রকম ইন্ডিয়ান ডিশ পাওয়া যায়। প্রতি মিনিটে সায়েবরা দশটা প্যাক মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকান থেকে কিনছেন। এই রেটে প্রতি বছর কলকাতার এক কোটি লোককে একটা করে মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার ইন্ডিয়ান কারি দেওয়া যেতে পারে।

ব্যান্ডোদার হাতে এখন অনেক খবর। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকানে যারা কারি সরবরাহ করেন তাঁরা বছরে সাড়ে সাত লাখ রসুন কোয়া ব্যবহার করেন।

আরও খবর আছে। ভারতীয় মশলার জয়জয়কার। এদেশে আমরা যখন বহুজাতিক কর্পোরেশনের ব্রান্ডের তাড়নায় বিব্রত, ভিটেমাটি সামলাতে পারছি না, তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক গুজরাতি কোম্পানির 'পাঠক' মশালা ইংলন্ডের সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান ব্র্যান্ডের সম্মান অর্জন করেছে। এঁরা বিক্রি করেন নানা রকমের আচার এবং কারি পেস্ট। কোম্পানির বিক্রি বছরে তিনশো কোটি টাকার ওপরে। ইন্ডিয়াতে

বারোটা এবং বিলেতে তিনটে কারখানা চালান এই পাঠক পরিবার। প্রতিদিন পনের থেকে কুড়ি টন আচার এবং বাটা মশলা ওঁদের বিলিতি কারখানায় তৈরি হয়। এর জন্যে সরষে আসে কানাডা থেকে, রসুন ইতালি থেকে, আম, আদা এবং লেবু ইন্ডিয়া এবং ব্রাজিল থেকে, তেঁতুল পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া থেকে, নারকেল তাইল্যান্ড থেকে, ধনিয়া কেনা হয় ইরান থেকে। শুনুন, বছরে ধনিয়া পাউডার লাগে ৫০০ টন, হলদি ২৫০ টন এবং ৫০০ টন কাঁচা আম।

লঙ্কার কথা উঠছে না। ব্যান্ডোদা বললেন, "ওটা পুরো একটা সাবজেক্ট—পাঠকমশাই নিজে ব্যবহার করেন ৫০০ টন গুঁড়ো লঙ্কা। ওঁদের পপুলার কয়েকটি আইটেম—কোর্মা কারি পেস্ট, ম্যাড্রাস কারি পেস্ট, টিক্কা মশালা কুকিং সস, দোপিঁয়াজা কুকিং সস।"

."এই নিঃশব্দ বিপ্লব কীভাবে ঘটলো, ব্যান্ডোদা?" আমি সবিনয়ে জানতে চাই।

শ্রাবণী বসুর লেখা থেকে কিছু মেটিরিয়াল পেয়েছেন ব্যান্ডোদা। তিনি বললেন, "ঝাল? এই ঝাল ছাড়া ইংরেজের জীবন এখন অচল। যখন এদেশে সায়েবরা রাজত্ব করতেন তখন তাঁদের মেমসায়েবরা স্বামীদের ঝাল থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। অথচ রাজত্ব ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়ে সেই ইংরেজ ভারতবর্ষের 'নস্টালজিয়ায়' পড়লো। সম্ভব হলে, গাঁটের কড়ি খরচ করে একবার অন্তত চলো বীরস্বামী রেস্তোরাঁয়।"

"তবে এই যে আমরা নোলার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে জয় করলাম, তার পিছনে রয়েছে সুইডিশ অবদান। শুধু বোফর্স কামান নয়, সুইডেন আমাদের কারি বিপ্লবকে নিঃশব্দে ভীষণ সাহায্য করেছে।"

"কী করেছে সুইডেন?" আমরা সকলে জানতে চাই।

"সুইডেনের রাজা গুস্তভ প্রায়ই লন্ডনে থাকতেন। তাঁর প্রিয় রেস্তোরাঁ বীরস্বামী। এখানেই তিনি বীয়রের সঙ্গে কারি খাওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। তাঁর ফেভারিট আইটেম কার্লসবাড বীয়র ও সেই সঙ্গে ডাক ভিন্ডালু অর্থাৎ ঝালসহ হাঁসের মাংস। এই থেকেই স্টাইলটা চালু হয়ে গেলো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে!"

ব্যাপারটা অতো সহজ নয়, এক রাজা গুস্তভ থেকে প্রবাসে ভারতীয়

কারির জয়যাত্রা শুরু হয়ে কেমন করে?

ব্যান্ডোদা বললেন, "তোর সঙ্গে তো সিলেটিদের বেশ জমে। আজেবাজে সাবজেক্টে সময় নষ্ট না করে চলে যা লন্ডনে—জীবনের বাকি ক'টা দিন ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁগুলো মন দিয়ে স্টাডি কর। মিসেস শ্রাবণী বসু করেছেন কিছুটা, কিন্তু ওটা তো আইসবার্গের ওপরের দিকটা।"

কারি ইন দ্য ক্রাউন আমি পড়ে ফেলেছি।

"কেমন লাগলো?" জানতে চাইছেন কৌতূহলী ব্যান্ডোদা।

"এক কথায় চমৎকার, ব্যান্ডোদা! তবে..."

"তবে আবার কি!"

"গুজরাতি পাঠক কিংবা শা, কিংবা তাজের বম্বে ব্রাসারিতে অনভিজ্ঞ সেবিকা একটু বেশি সময় দিয়েছেন, বাঙালিদের বিলেতবিজয়ের বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাতে পারেননি।"

"বিলেত না গিয়েই পরনিন্দা করছিস!" ব্যান্ডোদা এই ধরনের মানসিকতা পছন্দ করেন না।

"না ব্যান্ডোদা। এই অধম ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বার্মিংহামের এক রেস্তোরাঁয় বসে বাঙালি মুসলমানদের আচরণ দেখে আশঙ্কা করেছিল পূর্ব পাকিস্তান টিকবে না, বুঝতে পেরেছিল, এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে কোথায় এক অদৃশ্য ভালবাসার বন্ধন অটুট থেকে গিয়েছে—তখন অবশ্য অনেকেই আমাকে বিশ্বাস করেননি, তারপর তো সকলের চোখের সামনেই অঘটন ঘটে গেলো। এর অনেকদিন পরে এক সিলেটি বন্ধুর সঙ্গে দু'দিনের জন্যে লন্ডনের কয়েকটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় টুঁ মেরেছি ১৯১৯ সালে।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "তুই যদি এবার ওখানে যাস তা হলে খোঁজ-খবর করার দুটো দায়িত্ব তোকে দেবো। এক : বিলিতি সায়েবদের ঝাল খাওয়ার দুর্মতি কীভাবে হলো? শুনছি, যতো ঝাল বেশি বিলেতে ততো সেই পদের জনপ্রিয়তা। এখন একনম্বর ঝাল ইন্ডিয়ান আইটেম হলো পিরিপিরি। কাঁদতে কাঁদতে খাওয়া এবং খেতে খেতে কাঁদা সায়েবদের স্বভাবে ঢুকে যাচ্ছে। দু'-নম্বর : কারা কারা কীভাবে এই নিঃশব্দ বিপ্লবের জনক হলেন? সেই সব পথপ্রদর্শকের অমৃতজীবনকথা জাতীয় স্বার্থে

আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।"

"বাঙালি যে আত্মবিস্মৃত জাতি সে সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নেই, ব্যান্ডোদা। বিলেতবিজয় করলো দুঃসাহসী বাঙালিরা, অথচ নাম হলো অন্যদের। খোদ বিলেতে সায়েবদের নোলা পাল্টানো ইস্ট আফ্রিকান গুজরাতিদের কম্মো নয়, ব্যান্ডোদা। এ-বিষয়ে এই অধম দু'দিনের বিলেতভ্রমণকালে নুরুল ইসলাম বলে এক ধৈর্যশীল সিলেটি গবেষকের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে, তার কথা আমরা এখনও প্রচার করে উঠতে পারিনি।"

বেজায় আগ্রহী এই ব্যান্ডোদা। সস্নেহে আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন বাঙালিদের বিলেতবিজয়ের কিছু নতুন ঘটনা জোগাড় করে রাখতে।

আমি যথাসময়ে তাজ বেঙ্গলে ব্যান্ডো সুইটে পদার্পণ করেছি। আসবার সময় বউবাজারের বঙ্গলক্ষ্মী কেবিনের মাছের ঝাল-দে সংগ্রহ করে এনেছি টিফিন বক্সে।

খুব খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। বঙ্গলক্ষ্মীর স্বাদ অবহেলা করে এই সব তাত্ত্বিক আলোচনা অসম্ভব! আমাদের উচিত ছিল সুইডেনের রাজা গুস্তভকে এবং হেনরি কিসিংগারকে বউবাজারের পাইস হেটেলে হাজির করা। তা হলে বিস্ফোরণটা এখান থেকেই শুরু হতো। পলাশির উত্তরটা পলাশি থেকেই দেওয়া যেতো।

ব্যান্ডোদা প্রশ্ন করলেন, "ব্রিটিশ কারির হিস্ট্রিটা কেমন বুঝলি?"

আমার সবিনয় উত্তর : "ব্যান্ডোদা, সাধারণ লোকদের ধারণা, একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, যাঁর বাবা ছিলেন সায়েব জেনারেল এবং মা ভারতীয় রাজকুমারী, ভারত থেকে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে এসে নিজের অজান্তে ব্রিটিশ কারি-বিপ্লবের সূচনা করলেন। এঁর নাম এডওয়ার্ড পামার। জন্মভূমিতে কারিতে অভ্যস্ত এই ইউরেশিয় যুবকটি বিদেশে ইন্ডিয়ান খানার অভাব সহ্য করতে না পেরে ১৯২৬ সালে লন্ডনে বীরস্বামী রেস্তোরাঁর সূচনা করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই রেস্তোরাঁ হাতবদল হয়েও এখনও টিকে রয়েছে লন্ডন্ শহরে। সময় হলে এই বীরস্বামী রেস্তোরাঁ হয়তো জাতীয় কারির হেরিটেজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পাবে।"

"ভালই তো।" সুরসিক ব্যান্ডোদার তাৎক্ষণিক মন্তব্য।

আমি বললাম, "শ্রাবণী বসু বলেছেন, এই বীরস্বামীতে এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস, সুইডেনের রাজা গুস্তভ, চার্লি চ্যাপলিন থেকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত কে আসতেন না? বীরস্বামী নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ১৯৫৯ সালে লন্ডনের প্রথম তন্দুরি চিকেন সাপ্লাই করে।"

ব্যান্ডোদার মন্তব্য : "শ্রাবণী বসু যা বলেননি তা এবার শুনতে চাই, মুখুজ্যে।"

"লেখিকা খোদ বীবস্বামীর জীবনকথা বললেন না। কেমন করে বিলেতের এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এই কমবয়সী রাঁধুনি সায়েবদের ভারতীয় রান্না খাইয়ে রাতারাতি হিরো বনে গেলেন এবং আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন না। বহু বছর আগে গল্প শুনেছি, এই বীরস্বামীই বিদেশে ম্যাড্রাস কারির সূচনা করেন, যদিও স্বদেশে এই ধরনের কোনও নাম খাদ্যপ্রেমীদের জানা ছিল না। এই বীরস্বামীই যে বিদেশে মুলিগাটানি স্যুপকে সায়েবীসমাজে জনপ্রিয় করেছিলেন এমন গল্পও আমি গ্রেট ইস্টার্ন ও স্পেনসেস হোটেলের রাঁধুনি মহলে অনেকবার শুনেছি, তখন আমি 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছি এবং লন্ডনের বীরস্বামীতে তখন সবেমাত্র তন্দুর বসছে। মুলিগাটানি আসলে ডালের ঝোল, এর যে দক্ষিণভারতীয় অর্থ আছে তা অভিধানে উল্লিখিত। কিন্তু স্পেনসেসের রাঁধুনিরা আমাকে বলতেন, আসলে কথাটি 'মুলুকতানি' অর্থাৎ দেশের জিনিস শব্দটির অপভ্রংশ। বীরস্বামীর জীবনকথা আমাদের কাছে অমৃতসমান, নতুন যুগে সমস্ত ভারতীয়দের জন্য তা অবশ্যপাঠ্য হোক।"

"ভালই বলছিস, চালিয়ে যা," উৎসাহ দিলেন ব্যান্ডোদা। তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবি?"

"এখানে বড্ড দাম। এককাপ চা মানে একশো টাকার ধাক্কা। দু'কাপের খরচে আর এক কপি শ্রাবণী বসু কিনে ফেলা যাবে হারপার কলিন্‌স্ থেকে," আমার সবিনয় নিবেদন।

আবার ইতিহাস প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বিলিতি এক সূত্র উল্লেখ করে শ্রাবণী বসু বলেছেন, লন্ডনে প্রথম ভারতীয় ভোজনালয় স্যালুট ই হিন্দ ১৯১১ সালে হোবর্নে স্থাপিত হয়। প্রথম চাইনিজ রেস্তোরাঁ ম্যাক্সিম

১৯০৮ সালে লন্ডনে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। তারপর ঝাঁপ দিয়ে লেখিকা ১৯৪৬ সালে চলে এসেছেন এবং জানিয়েছেন তখন লন্ডনে মাত্র তিনটে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ—শফি, বীরস্বামী ও কোহিনূর। এইখানেই বোধহয় বেশ কিছু জানবার থেকে গিয়েছে। এই ফাঁক সিলেটের দুঃসাহসী বাঙালি লেখক নুরুল ইসলাম তাঁর প্রবাসীর কথায় অসীম ধৈর্য সহকারে সংগ্রহ করে গিয়েছেন। নুরুল ইসলামের কাজকর্ম দেখে আমি নিশ্চিত যে একজন সিলেটি ছাড়া আর কারও পক্ষে বাঙালি জাহাজিয়া এবং বাঙালি রেস্তোরাঁচালকের পরিপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

"নুরুল ইসলামের সঙ্গে আমার যে লন্ডনে দেখা হয়েছিল এবং কিছু আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল একথা আগেই আপনাকে বলেছি, ব্যান্ডোদা।"

"ওঁর মতামতটা শুনুন। লন্ডনে প্রথম ইন্ডিয়ান ভোজনালয় স্থাপনের কৃতিত্ব সিলেটি সৈয়দ তফুজ্জুল আলির। ভিক্টোরিয়া ডক রোডে এই মিস্টার আলি তাঁর বোর্ডিং হাউসের সঙ্গে একটি কাফে খোলেন—চা নাস্তার সঙ্গে এখানে ভাত ও কারি পাওয়া যেতো। বিখ্যাত সারং আত্তর আলি ৭৫ বছর বয়সে তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'বিলেতে এই সময় আর কোথাও ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ছিল না।' মিস্টার আলির কাফেতে সায়েব ডাকাতদের অত্যাচার ছিল, খাবারের দাম নিয়ে তারা প্রায়ই মারামারি লাগিয়ে দিতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণে এই কাফে ধ্বংস হয়ে যায়।"

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হোয়াইট চার্চ লেন, কেব্‌ল স্ট্রিট ও ড্রামন্ড স্ট্রিটে তিনটি দিশী কাফের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বীরস্বামীর আগেই ১৯২৫ সালে মোহাম্মদ ওয়াছিম এবং মোহাম্মদ রহিম দুই ভাই লন্ডনের প্রথম ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ শফি ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে লেখাপড়া করতে এসে ভারতীয় খাবার সম্বন্ধে সায়েবদের কৌতূহল লক্ষ্য করে এঁরা এই ব্যবসায় নেমে পড়েন। এরপরেই 'আবদুল্লা কারি পাউডার' খ্যাত বোম্বায়ের আবদুল্লা এখানে দ্বিতীয় রেস্তোরাঁ স্থাপন করেন। তৃতীয় স্থানে মেজর পামারের বীরস্বামী। পরবর্তীকালে এই রেস্তোরাঁ তিনি বিক্রি করে দেন স্যর

উইলিয়াম স্টুয়ার্ড এম. পি-কে।

নুরুল ইসলাম ধৈর্য ধরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত বিলেতে যে চোদ্দোটি ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ছিল তার খবরাখবর সংগ্রহ করেছেন। দিল্লি, বম্বে, পাঞ্জাবের পাইওনিয়ারদের সঙ্গে কলকাতার এক বঙ্গ সন্তানের ব্যবসায়িক দুঃসাহসের খোঁজ পেয়ে আমি উল্লসিত হয়ে উঠি। কে বলে গতরবিহীন বোস, ঘোষ, মুখুজ্যের ফরেন বিজনেসে রুচি নেই? প্রাতঃস্মরণীয় এই বঙ্গসন্তানটির নাম নগেন্দ্র ঘোষ, উইন্ডমিল স্ট্রিটে এঁর রেস্তোরাঁর নাম ছিল দিলখোস। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার দিলখুশা রেস্তোরাঁর পরিচালকরা এই নগেন ঘোষের খোঁজখবর নিতে পারেন। যুদ্ধ শুরুর আগেই ১৯৩৮ সালে নগেন ঘোষ মশাই এই প্রতিষ্ঠান বিক্রি করেন জনৈক সিলেটিকে। বিলেতে সিলেটি মালিকানায় এইটিই প্রথম রেস্তোরাঁ, যার আদিতে রয়েছেন কলকাতাইয়া নগেন ঘোষ।

ব্যান্ডোদা নগেন ঘোষের নাম শুনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু মন্তব্য করলেন, "স্ট্রে ইনসিডেন্ট—বিক্ষিপ্ত ঘটনা—এক কোকিলে তো বসন্ত হয় না।"

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। সৌভাগ্যক্রমে হাতের গোড়ায় কিছু অস্ত্র ছিল। বললাম, "ব্যান্ডোদা, আমাদের দুঃখ, সবাই হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁর মিস্টার চাটওয়ালকে মনে রেখেছেন, কিন্তু কেউ লন্ডনের অশোক মুখার্জির নাম করে না। ইনি বহুকাল আগে লন্ডনের পার্সি স্ট্রিটে 'দরবার' রেস্তোরাঁ খুলেছিলেন, এঁর আদি নিবাস নগর কলকাতা। একই সময়ে একটা নয় দুটো রেস্তোরাঁর মালিক হয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানের নাম—'খৈয়াম' ও 'ইন্ডিয়া-বার্মা'। উড়িষ্যা থেকে গিয়েছিলেন জুবল হক—রেস্তোরাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল-ইন্ডিয়া'। আমার সন্দেহ কলকাতার সঙ্গে হক সায়েবের নিবিড় যোগাযোগ ছিল—কারণ ঐতিহাসিকভাবে উড়িষ্যার কর্মীরাই কলকাতার সমস্ত বিখ্যাত হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ক্লাবের সেবা করেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই একসময় কর্মসূত্রে আমার সখ্যতা জমে উঠেছিল।"

মিটমিট করে হাসছেন ব্যান্ডোদা। বললেন, "তোর বক্তব্য, লন্ডনের আদিপর্বে ১৪টি উদ্যমের মধ্যে অন্তত পাঁচটি মুখার্জি, ঘোষ ও চৌধুরীদের। এবং এসব ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। বড় সহজ

কথা নয়।”

“মহাযুদ্ধের সময় এঁদের কী অবস্থা হলো?” জানতে চাইছেন ব্যান্ডোদা।

“পরিস্থিতি তখন গুরুতর। চারদিকে বোমা পড়ছে। জার্মান বোমায় বিধ্বস্ত হলো নগেন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দিলখোস রেস্তোরাঁ। খাবারের অভাব, পয়সার অভাব, মানুষের অভাব। এরই মধ্যে মশরফ আলি ও ইছরাইল মিয়া খুললেন অ্যাংলো-এশিয়া। এইটিই সিলেটি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের প্রথম রেস্তোরাঁ।

“মশরফ আলিকে নিয়ে বোধহয় বাংলায় একখানা উপন্যাস লেখা যেতে পারে, ব্যান্ডোদা। ১৬ বছর বয়সে জুনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত পড়ে মশরফ আলি সিলেটের কুচাই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন ভাগ্যসন্ধানে। সেটা ১৯৩১ সাল। চার বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করে তিনি লন্ডনে নেমে পড়েন ১৯৩৬ সালে। বিলাতে তখন মহামন্দা—কোথাও কোনও চাকরি নেই। তার ওপর মশরফ আলির ইংরিজি অক্ষর পরিচয় ছিল না। মশবফ আলি ধৈর্য ধরে ইংরিজি অক্ষর শিখলেন, ফেরিওয়ালার কাজ করে তিনি জীবনধারণ করতেন। বাস ভাড়া ছিল দু’ পেনি, তাও দিতে পারতেন না, তাই পায়ে হেঁটে লন্ডনের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতেন।

“বিলেতের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মোজা, রুমাল, চিরুনি ইত্যাদি দরজায় দরজায় বিক্রি ছাড়া তখন নতুন এক পেশার সন্ধান পেলেন মশরফ আলি। ‘চকোলেট গেম’—এটা এক ধরনের বাজির খেলা, এর উদ্ভাবক একজন বাঙালি—ছওয়াব উল্লা। এক পেনি ফেলে এই খেলা খেলতে হতো—জিত হলে দু’পেনি দামের একটি নেসলে চকোলেট। মশরফ আলি ঘুরে ঘুরে এই খেলা দেখানো শুরু করলেন। তিনি থাকতেন তাঁর গ্রামের মানুষ জয়তুন মিয়াঁর বাড়ি। ইনি একজন শাদিওয়ালা।”

“এই বস্তুটি কী?” মৃদু হেসে ব্যান্ডোদা জানতে চাইলেন।

“যেসব বাঙালি স্থানীয় মেমসায়েব বিয়ে করে বিলেতেই ঘরসংসার পাততে সমর্থ হতেন বঙ্গীয় সমাজে তাদের শাদিওয়ালা বলা হতো। এঁদের সামাজিক সম্মান একটু বেশি ছিল।”

“তারপর?”

"কিছুদিন পরে আমাদের মশরফ আলি শালিমার রেস্তোরাঁয় চাকরি পেয়ে গেলেন। মনে রাখা ভাল, তখন বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয়, এমনকি বীরস্বামীতে ওয়েটাররা মাইনে পেতেন না। নির্ভর একমাত্র বকশিস বা টিপ্‌স। কিন্তু শালিমারে তখন মাইনে সপ্তাহে এক পাউন্ড—তবে নো টিপ্‌স, যা বকশিস সংগৃহীত হতো তা অন্যত্র চলে যেতো। ওখান থেকে মশরফ গেলেন তাজমহল রেস্তোরাঁয, সাপ্তাহিক মাইনে এক পাউন্ড ১৫ শিলিং। এর পরেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হয় অশোক মুখার্জির। তিন পাউন্ড বেতন নিয়ে মশরফ আলি চলে এলেন অশোকবাবুর দরবাব রেস্তোরাঁয়।

"যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে নতুন বিপদ। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে মশরফ আলির ওপর নোটিস পড়লো। নোটিস এড়াবার জন্য চটজলদি মশরফ আলি আবার বাণিজ্যিক জাহাজে ফিরে গেলেন।

"১৯৪২ সালে অনেক ঘা খেয়ে মশরফ আলি আবার লন্ডনে ফিরে এলেন এবং ইছবাইল মিয়ার সঙ্গে পার্টনারশিপে অ্যাংলো-এশিয়া রেস্তোরাঁ খুললেন। এই সময় বিলেতে খাদ্যদ্রব্যের কড়া রেশনিং। বেস্তোরাঁ খোলার জন্যেও লাইসেন্স দরকার। মশরফ আলি পাকড়াও করলেন তাঁর পুরনো মালিক হিন্দুস্তান রেস্তোরাঁর চাটওয়ালকে। সহৃদয় চাটওয়াল তাঁকে পাঠালেন ভারতীয় হাইকমিশনার রঙ্গনাথনের কাছে। পরোপকারী রঙ্গনাথনের সুপারিশের জোরে মশরফ আলি অল্প সময়ের মধ্যে লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গনাথন একবার অ্যাংলো-এশিয়াতে ডিনার খেতে আসেন। কৃতজ্ঞ মশরফ পয়সা নিতে চাইলেন না। কিন্তু রঙ্গনাথন শুনলেন না, বললেন, ভারতীয়দের সাহায্য কববার জন্যেই আমি ভারতীয় হাইকমিশনার। আপনারা ব্যবসায় আরও উন্নতি করুন। এই রেস্তোরাঁ খুলতে দুই পার্টনারের তখনকার দিনে মাত্র সাতশ পাউন্ড লেগেছিল।"

"তোর সিলেটি বন্ধু তো দেখছি লন্ডনের হাঁড়ির খবর জোগাড় করে ফেলেছে।" ব্যাণ্ডোদা এমন বিস্তারিত বিবরণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

"এই ভদ্রলোক বেশি কথা বলেন না, কিন্তু খবরের স্বর্ণখনি—বিলেতের বাঙালি সম্বন্ধে লিখতে গেলে নুরুল ইসলামের কাছেই হাতেখড়ি হওয়া প্রয়োজন।"

"মশরফ আলির এবার কী হলো?"

"ভীষণ কাণ্ড, ব্যান্ডোদা। ছটফটে মানুষটি। এক এক জায়গা ঘুরে আসেন এবং সেখানে এক একটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বিশ্বাস হয় না সাঁইত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এই মশরফ আলি বিলেতে আঠারোটা রেস্তোরাঁ খোলেন। তার একটার নাম ছিল 'ক্যালকাটা', আরেকটি 'দার্জিলিং' এবং আর একটি 'হিন্দুস্তান', শেষ রেস্তোরাঁ হোবর্ন এলাকায় 'কারি গার্ডেন'। ১৯১৯ সালে এই রেস্তোরাঁ বেচে দিয়ে দেশে ফিরে আসেন মশরফ আলি। কিন্তু তিন বছর পরে তিনি আবার লন্ডনে পাড়ি দেন।

"মশরফ আলির আদি পার্টনার ইছরাইল মিয়াও সিলেট থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ১৯৩১ সালে। জাহাজে চাকরি নিয়ে ইছরাইল মিয়াও প্রায় সাত বছর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ১৯৩৭ সালে লন্ডনে নেমে পড়েন। কোনও আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় মাত্র ১৫ শিলিং মাইনেতে এক ইহুদির কাপড়ের দোকানে চাকরি নেন। এঁর ইংরিজি অক্ষরজ্ঞান ছিল না।

ব্যান্ডোদা বললেন, "তুই কায়দা করে দেখাতে চাইছিস, অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও সুদূর প্রবাসে বড় হওয়া যায় স্রেফ নিজের সাধনায়। এবং বাঙালিরাই এটা পারে এখনও।"

"ইয়েস ব্যান্ডোদা, এঁরা তো বিজনেস সৃষ্টি করবার জন্যে ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টদের সাহায্য পান না, তবু মাঝে মাঝে ভেলকি দেখিয়ে দেন, এমন ভেলকি যা ম্যাকিনসে অথবা আর্থার অ্যান্ডারসনের বিদ্যেবুদ্ধির অতীত। ধরুন ইছরাইল মিয়ার কথা। ইংরিজি পড়তে না জানলে লন্ডনে ওয়েটারের চাকরি পাওয়া যাবে না বুঝে ইছরাইল মিয়া অনেক চেষ্টায় বীরস্বামী রেস্তোরাঁর একখানা মেনু কার্ড জোগাড় করে সেটা কাকাতুয়ার মতন মুখস্থ করে নিলেন। ইংরিজি অক্ষরগুলি তাঁর কাছে ছবির মতন। চাকরির জন্যে ঘুরতে ঘুরতে ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরীর খবর পাওয়া গেলো—ওয়াল স্ট্রিটে এঁর ইন্ডিয়া-বার্মা রেস্তোরাঁ চালু হয়েছে, সেখানে ওয়েটার প্রয়োজন। পদ একটি, কিন্তু প্রার্থী দু'জন। ইছরাইল মিয়া আর তাঁর আত্মীয় আফছর মিয়া। ধূর্জটিপ্রসাদ এঁদের দু'জনকেই মেনুকার্ড পড়তে দিলেন—আফছর সফল হলেন না, কিন্তু

ইছরাইল আন্দাজে গড়গড় মুখস্থ বলে গেলেন। ইছরাইলের চাকরি হয়ে গেলো। কিন্তু দিনে ১৬ ঘণ্টা খাটতে হতো ইন্ডিয়া-বার্মায়। মাইনে মাত্র ১৫ শিলিং।”

“তারপর?” জিজ্ঞেস করলেন ব্যান্ডোদা। “তোর বন্ধু নুরুল ইসলাম তো প্রচুর গবেষণা করেছেন।”

আমি বললাম, “ব্যান্ডোদা, বাঙালিরা যে কুঁড়ে, ভীতু এবং ঝুঁকি নেবার মতন কলজে তাদের নেই একথা যারা বলে তাদের জন্যে বিলেতে গরিব বাঙালিদের জয়যাত্রা সম্বন্ধে একখানা বই লিখে বিশ্বের প্রতি বাঙালির ঘরে বিনামূল্যে বিতরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।”

ব্যান্ডোদাকে শুনিয়ে দিলাম ইছরাইল মিয়ার পরবর্তী খবর। মাঝেমাঝে তাঁর পরিশ্রমের মাত্রা ১৮ ঘণ্টা ছাড়িয়ে যেতো। যুদ্ধের সময় তিনিও আবার জাহাজি হলেন। ১৯৪২ সালে আবার বিলেতে ফিরে এসে মশরফ আলির সঙ্গে অ্যাংলো-এশিয়া রেস্তোরাঁ খুললেন। একে একে ১২টি ইন্ডিয়ান ভোজনালয়ের মালিক হয়েছেন তিনি। এর মধ্যে একটার নাম ছিল ‘ভোগ’। ইংরিজি ‘ভোগ’ নয়, বাংলা ‘ভোগ’, তিনটের নাম ছিল মতিমহল। ভাগ্য পরিবর্তন করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে তিনি স্বদেশে পঞ্চাশ বিঘা জমির ওপর বাড়ি করেছিলেন। যথাসময়ে মেমসায়েব বিয়ে করে ইনিও শাদিওয়ালা হন। মেমসায়েবের মৃত্যুর পরে ইনি দেশে গিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতেন।

ব্যান্ডোদা আন্দাজ করলেন, “ইন্ডিয়ান ডিশ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এঁরা দু’জনেই এক্সপার্ট ছিলেন।”

আমি বললাম, “এই সব প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালির মধ্যে বহুরকম দুর্লভ গুণের সমন্বয় হয়েছিল। এঁদের প্রধান গুণ দুর্জয় সাহস। শুনুন একটা গল্প। লন্ডনের জেরার্ড প্লেসে ইছরাইল মিয়ার দোকানের নাম ছিল ইন্ডিয়া কফি বার। ১৯৪৪ সালে দুটি দৈত্য আকারের মার্কিন সৈন্য ওখানে আহার করে পয়সা না দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে চলে যেতে চাইলো। ইছরাইল মিয়া হইচই বাধিয়ে এদের দু’জনকে দোকানের ভিতর টেনে আনলেন। দোকানের দরজায় তালা পড়ে গেছে ততক্ষণে। সৈন্য দু’জন গালাগালি করে বললো, তারা কালা আদমির রেস্তোরাঁয় খেয়ে কখনও পয়সা দেয় না, সাদা আদমি যে এখানে খেয়েছে এটাই তো যথেষ্ট

সম্মানের। দুঃসাহসী ইছরাইল মিয়া কিচেন নাইফ হাতে নিয়ে জানিয়ে দিলেন, পয়সা দিতেই হবে। সায়েবরা রিভলবার বার করে বললেন, জানো এটা কি? ইছরাইল বললেন, জানি এটা রিভলবার। কিন্তু তোমরাও জেনে রাখো, মাত্র একটা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকা থেকে তোমরা এখানে এসেছো, আর আমি এখানে হাজির হয়েছি সাতটা সমুদ্র পেরিয়ে। আমার সমস্ত ভয় পানিতে মিশে গিয়েছে। সায়েবরা তখন বাধ্য হয়ে ১৩ শিলিং ৪ পেন্সের বিলের জন্য এক পাউন্ডের একখানা নোট টেবিলে রেখে বললো, কিপ দ্য চেঞ্জ। যাবার সময় আরও বললো, গুড বাই গ্রেট লিট্‌ল ম্যান।"

ব্যান্ডোদা বিমোহিত। "দেখা যাচ্ছে, বিলেতের ভারতীয় খানার ইতিহাস আসলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস! ওয়ান সাগর ভার্সেস সপ্তসাগর, ব্যাপারটা খুবই চিত্তাকর্ষক, কখনও আমার মাথায় আসেনি।"

"প্রবাসী বাঙালিদের উদ্ভাবনী শক্তিও কম ছিল না, ব্যান্ডোদা। যুদ্ধের সময় চালের ভীষণ অভাব—অথচ চাল ছাড়া লন্ডনের ভারতীয় রেস্তোরাঁ প্রায় অচল। তখন গ্রিন মাস্ক রেস্তোরাঁয় সিলেটি শেফ মাথা খাটিয়ে ম্যাকারনিকে ভাতের মতো রেঁধে মাংসের কারির সঙ্গে বিক্রি আরম্ভ করেন। প্রচারের জন্যে প্রথমে দিনে ম্যাকারনি-কারি বিনামূল্যে পরিবেশন করা হলো, ফলে ভীষণ কাণ্ড, রাতারাতি এই ডিশের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো। এখানকার শেফের নাম ছিল আইন উল্লা এবং তাঁর সহকারী কিচেন পোর্টার ছিলেন তোতা মিয়া।"

ব্যান্ডোদা মন্তব্য করলেন, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় রান্নার বিশ্ববিজয়ের পিছনে রয়েছে ভাল রান্না, উদ্ভাবনী শক্তি ও বাঙালিদের দুর্জয় দুঃসাহস।"

"আরও একটা শক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যা বাঙালিদের নজরে পড়া উচিত। সেটা হলো দেশাত্মবোধ, সেই সঙ্গে প্রবাসে পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবণতা। প্রবাসী চীনাদের মধ্যে এই গুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, আপনি নিজেই সেবারে আমাকে বলেছিলেন।"

মিটিমিটি হাসছেন ব্যান্ডোদা, "এই যে শুনি বাঙালি বিদেশে গিয়েও দল পাকায়, কাঁকড়া মনোবৃত্তির ঝগড়াঝাঁটি পাকিয়ে নিজেদের আরও

দুর্বল করে তোলে।"

"ব্যান্ডোদা, সবদেশে সবসময় খারাপ খবরগুলোই তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রিন মাস্ক রেস্তোরাঁর খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না। এই রেস্তোরাঁ কেনবার চেষ্টা করছিলেন আবদুল মান্নান সায়েব ও তাঁর পার্টনার বাতির মিয়া। ওঁদের হাতে তখন আছে দেড় হাজার পাউন্ড, অথচ রেস্তোরাঁর দাম দিতে হবে চার হাজার পাউন্ড, সাজাতেগোছাতে লাগবে আরও এক হাজার পাউন্ড—মোট পাঁচ হাজার পাউন্ড। ওঁদের বাঙালি বন্ধু-বান্ধবরা খবর পেয়েই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। তাঁদের অবস্থাও তেমন ভাল নয়। কিন্তু অনেকেই সপ্তাহের মাইনে পাওয়া প্যাকেট ওঁদের দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রত্যেককে দু' পাউন্ড ফিরিয়ে দিয়ে বাকিটা নিলেন মান্নান সায়েব। কয়েক সপ্তাহে গ্রিন মাস্ক কেনার টাকা উঠে গেলো। অবশ্য সমস্ত দেনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শোধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ চালু রেস্তোরাঁয় তখন লাভের পরিমাণ মোট বিক্রির প্রায় অর্ধেক।"

"প্রবাসে সম্প্রদায়গত সৌহার্দ্য ও সাহায্য—এটা একটা দামি পয়েন্ট, মুখুজ্যে। আমাদের রিসার্চ পেপারে অবশ্যই এবিষয়ে উল্লেখ রাখতে হবে।"

অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের বাড়িতে বৈদ্যুতিক ডোর বেল বাজিয়েই চলেছি, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। শেষে সাবেকি পন্থায় কড়া নাড়তে ফল হলো। সর্বদমন রায়ের দোষ নেই, ঐ অঞ্চলে তখন বিপুলবিক্রমে লোডশেডিং চলছে।

সর্বদমন বললেন, "লোডশেডিং হয়েছে বললে এখন মন্ত্রীদের গোঁসা হয়, ওটা নাকি লোকাল ফল্ট! আমি মশাই মোমবাতি জ্বালিয়ে আপনাদের রিসার্চের কাজ করে চলেছি।"

"রায়সাহেব, এ যাত্রায় আমাদের যে কী গতি হবে তার ঠিক নেই। হয় আমরা লন্ডনের বাঙালি রেস্তোরাঁয় বসে সুইসাইড খাব, না হয় ব্যান্ডোদার সঙ্গে পাড়ি দেবো পেরু অথবা বলিভিয়া!"

"দুগ্গা দুগ্গা! সকালবেলায় আত্মহত্যার কথা তুললেন—আত্মহনন মহাপাপ থেকে কোনওরকমেই মুক্তি নেই, শাস্ত্রে বলছে।"

"প্রফেসর রায়, আমি সায়েবদের ঝাল প্রীতির ব্যঙ্গ করেছি। লন্ডন রেস্তোরাঁয় সব খাবার নাকি তিন রকম থাকে। যেমন ধরুন : হট, ভেরি হট এবং সুইসাইড। ভেরি হটেই আপনি আমি ভিরমি খাবো, আর সায়েবের পো আরও ঝাল খেয়ে পাগল হবার জন্যে বেপরোয়া স্টাইলে অর্ডার দেবে সুইসাইড। ওই জিনিস মুখে যাবার পরে রেস্তোরাঁয় দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে, মনে হবে যেন বোষ্টমপার্টির কেত্তন শুনছেন।"

প্রফেসর রায় আজ উত্তেজিত হয়ে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নতুন ক্লাসে তিনটি মেয়ের নাম সবিতা, কেতকী ও বিপাশা।

"হয় না মশাই! খোঁজখবর না করে ফুটফুটে ইন্ডিয়ান মেয়েদের এমন বেমক্কা নাম বাপ-মা কেমন করে দেয়? ঋগ্‌বেদে সবিতা তো পিতা! কেতকী ফুল তো ক্লীবলিঙ্গ, একই অবস্থা বিপাশার। এসব কথা সকলের সামনে মেয়েগুলোকে বলি কেমন করে?"

"গতবারেও আপনি ওই রকম একটা ভুলের কথা বলেছিলেন। সম্ভ্রান্ত শব্দের অর্থ অবশ্যই অভিজাত নয়—যিনি বড় রকমের ভুল করেছেন তিনি (সম+ভ্রম+ক্ত) সম্ভ্রান্ত।"

"এই তো আপনি চমৎকার মনে রেখেছেন", খুশি হলেন সর্বদমন রায়।

আমার প্রশ্নের উত্তরে রায়সায়েব বললেন, "গোলমরিচ অতি প্রাচীন মশলা—আদিতে নাম ছিল কোলক। মুখে লালা আসে, পরিপাকে সাহায্য করে, স্নায়ুতন্ত্রে সজীবতা আনে, আলস্য ও বিষাদবায়ু রোধ করে—মরিচের কোনও তুলনা ছিল না প্রাচীন ভারতে। দক্ষিণ ভারতের চেরা দেশে এই মরিচ পাওয়া যেতো—এই চেরাই আজকের কেরালা! ব্যান্ডোদাকে বুঝিয়ে বলবেন, কারি শব্দটি আমরা বাংলাতেও তরকারির মধ্যে পাচ্ছি, আবার দক্ষিণ ভারতেও পাচ্ছি, ওরা মরিচকে কারি বলে। মাংস কষবার পক্ষে অপরিহার্য এই কারি। সরষে এবং মরিচ দিয়ে মেখে তেলে ভাজলে পদের নাম হয় থাল্লিতকারি। ভাজা মাংসর নাম পোরি-কারি। যে অর্থে সায়েবরা এখন কারি শব্দটি ব্যবহার করছেন তা অনেক সুদূরপ্রসারী—যে কোনও ব্যঞ্জনই বিলেতের অজ্ঞ সায়েবদের কাছে কারি!"

আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর সর্বদমন রায় আরও বললেন, "জেনে রাখবেন, বেদে অন্তত আড়াইশো রকমের মাংসের উল্লেখ আছে। বৈদিক বাজারে এক একটি স্টলে এক এক রকম মাংস বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। যেমন—অরাবিকা (ভেড়া), শূকরিকা (শূকর), নগরতিকা (হরিণ), শকুন্তিকা (মোরগ), গিধবুদ্দকা (কচ্ছপ)। কিছু মনে করবেন না, সুপক্ক ঘোড়ার মাংস বিক্রির উল্লেখও দেখতে পাচ্ছি। এদেশের আর্যরা পোলাও খাচ্ছেন দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। রামায়ণে সীতা পোলাও রাঁধছেন, আর মহাভারতে পাণ্ডবরা কিমা কারি সহযোগে ভাত খাচ্ছেন মহানন্দে!"

রায় জানালেন, "সেযুগে অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধেও মাংসের প্রচলন ছিল। শিশুকে যেমন জিনিস দেবে পরবর্তীকালে তার প্রকৃতি তেমনি হবে। পাঁঠার মাংসে বলশালী, তিতিরের মাংসে সন্তভাব, মাছে শান্তভাব এবং ঘি-ভাতে গৌরবশালী হবার ইঙ্গিত রয়েছে। শ্রাদ্ধে প্রয়োজন হতো গণ্ডারের মাংস। বলতে লজ্জা নেই, বাঁদরের মাংসও বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে গ্রহণীয় ছিল।"

রায়সাহেব সবিনয়ে জানালেন, "তবু মনে রাখবেন, ভারতের সিকিভাগ লোক এখনও স্বেচ্ছায় শাকাহারী—দুনিয়ার ইতিহাসে এমন যুগান্তকারী ঘটনা কোথাও ঘটেনি এই ইন্ডিয়া ছাড়া। আমাদের এই বাংলাতেও শতকরা ৬ জন মানুষ শাকাহারী। সবচেয়ে বেশি শাকাহারী গুজরাতে (৬৯%), রাজস্থানে (৬০%) এবং উত্তরপ্রদেশে (৫০%)।"

"মাদ্রাজীরা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"খুব ভুল ধারণা। ওরা মাংসর যম! প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজন শাকাহারী তামিলনাড়ুতে।"

আজ কিছু খাবেন না আচার্য রায়—নিষ্ঠাবান মানুষ। বললেন, "খেতেও যেমন, না খেতেও তেমন সেকালের ভারতীয়রা। প্রাচীন যুগে পাঁচরকমের না-খাওয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত—একনাথ : এক দুপুর থেকে আরেক দুপুর অনাহার। উপবাস : এক দুপুর থেকে তৃতীয় দুপুর। কৃচ্ছ্র : দু'দিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহার। তারপর তৃতীয় দিনে না চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই ভোজন। পারক : তিন দিন দুপুরে অনাহার, তারপর তিন সন্ধ্যায় অনাহার, অবশেষে পুরো তিনদিন তিন রাত

অনাহার। চান্দ্রায়ণ : সম্পূর্ণ অনাহার থেকে শুরু করে একটু একটু আহার বাড়িয়ে চোদ্দ দিন, তারপর আবার একটু একটু কমিয়ে চোদ্দদিন। আরও আছে : সাম্বা!"

"এসব খবর সায়েবদের সরবরাহ করে লাভ নেই। একবার উপোসের দিকে শ্বেতাঙ্গদের নজর গেলে বিলেতের বাঙালি রেস্তোরাঁগুলো বেশ বিপদে পড়ে যাবে।"

ব্যান্ডোদার জন্যে অন্য প্রশ্নে এলাম। "প্রাচীন ভারতে লঙ্কার সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ছিল না, তা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেওয়াই তো সঙ্গত?"

"তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। প্রাচীন ভারতে পাচ্ছি মাত্র জিরে, পিপুলী এবং সর্ষপ! এমনকি ঝাল ঝাল লবঙ্গও এদেশে ছিল না। এই মশলাটি ইংরেজরা নিয়ে এসেছে এদেশে।"

"প্রায় পাঁচ হাজার বছর ইন্ডিয়ানরা লঙ্কা ছাড়া রান্নাঘর সামলিয়েছে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না—এমনকি জার্মান গবেষকরাও। তাঁরা ধরে বসে আছেন লঙ্কার জন্ম এই ইন্ডিয়ায়।"

"যে বস্তুতে আমাদের অধিকার ছিল না তা দাবি করাটা অন্যায়, ব্যান্ডোদাকে বলবেন।" জানালেন সর্বদমন রায়।

"রায়সায়েব, তা হলে প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটরাও লঙ্কার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন?"

"অন্তত জাহাঙ্গির পর্যন্ত কেউ যে লঙ্কার স্বাদ পাননি, তা জোর করে বলা যায়। সম্রাট শাজাহানের সময় লঙ্কা এলো এদেশে, সম্ভবত গোয়াতে প্রথম। সম্রাট শাজাহানের ইতিহাস তন্নতন্ন করে দেখতে বলুন ব্যান্ডোদাকে, হয়তো ঝাল লঙ্কা সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন।"

সর্বদমন এবার পিপুলী সম্বন্ধে কিছু খবর দিলেন। "যে পিপুল দিয়ে আমাদের পাঁচ হাজার বছর কটুরসের স্বাদ নিতে হয়েছে, বেদে তাকে বলা হয়েছে কণ।"

"ওঃ, রায়সায়েব আপনি বিপুল বিক্রমে কতো খবরই সংগ্রহ করে রেখেছেন।"

"ব্যান্ডোদার জন্যে দু' দিন বড়বাজারে বেনের দোকান চষে

রেড়িযেছি। সূক্ষ্ম হয়ে শরীরে প্রবেশ করে বিকৃত রসধাতু পান করে নেয় এবং সূক্ষ্ম হয়েই নির্গত হয়ে যায়, তাই এই নাম। কর্ণের প্রিয় জন্মভূমি মগধ দেশ। তাই আর এক নাম মাগধি। শুধু মশলা নয়, ভেষজ হিসেবে হাজাব হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই পিপুলকে পর্যবেক্ষণ করছেন। কণ্ঠরোগে, তৃষ্ণা রোগে, শিবোবিরোচনে, হিক্কা দমনে, শীতপ্রশমনে এর তুলনা নেই।"

"শীতপ্রশমনে কালো মরিচেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। স্বামী বিবেকানন্দর জীবনী পড়ে দেখবেন। ওঁরা একবার হিমালয়ে আচমকা তুষারবৃষ্টির মধ্যে পড়ে যান। পথ হারিয়ে কোনওরকমে একটা গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেই সময় সামনে অনিবার্য মৃত্যু। তখন একজন সহযাত্রী সান্যালমশায়ের কাছে কয়েকটা গোলমরিচ ছিল। সেই মরিচ মুখে দিয়ে কোনওরকমে সে যাত্রায় প্রাণরক্ষা হলো!"

বড়বাজারে গিয়ে অধ্যাপক রায় নানারকম পিপুলী দেখে এসেছেন—মাগধি, গজপিপুলী, সিংহলী এবং বনপিপুলী। সিংহলী পিপুলীকে বাজারে জাহাজি পিপুলী বলে।

বায়সাযেব দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কয়েকটি নমুনা দিলেন মুখে পুরবার জন্যে। ঝাল আছে, কিন্তু এমন কিছু নয়। এই পিপুলী দিয়ে আমবা কী করে ইংলন্ডের কারিযুদ্ধে জয়ী হতাম?

অধ্যাপক রায় উপদেশ দিলেন, "নিয়মিত পিপুলী খেতে পারেন, মেদহ্রাসে অদ্বিতীয়! মেধাহ্রাস রোধেও অনেকে পিপুলী ব্যবহার কবেন।"

আমার নোট বইয়ের পাতার দিকে তাকালাম। ব্যান্ডোদা গোলমরিচের ইতিহাস সংগ্রহে আমাদের দু'জনকে নিয়ে ক'দিনের জন্যে কেরালায় যাবেন। অধ্যাপক রায় কেরলদেশে কখনও গমন করেননি, অথচ ভাস্কো ডা গামার জীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আগ্রহ বয়েছে।

আমাকে বললেন, "গোলমরিচের ইতিহাস মানেই তো চার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস, মুখুজ্যে মশাই। টু থাউজেন্ড বি সি-তেও ইন্ডিয়া সদর্পে মরিচ রপ্তানি করছে মধ্যপ্রাচ্যে, সেই সঙ্গে দারুচিনি। ইজিপ্টের ফারাওদের মমিতে ইন্ডিয়ার অত্যাশ্চর্য মশলা ব্যবহার হচ্ছে

অন্তত ১৭০০ বি সি থেকে। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন! এই মরিচের সন্ধানে যুগযুগান্ত ধরে ফিনিসিয়ান, সিরিয়ান, ইজিপসিয়ান, গ্রীক, রোমান, আরব এবং চাইনিজরা আমাদের দেশে হাজির হয়েছে। রোমানরা মরিচের বদলে ভারতবর্ষকে সোনা দিতো। ভেনিস ও জেনোয়া ঘুরে ভারতবর্ষের এই মরিচ রোমে হাজির হতো। তিনশো বছর (পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত) ভারতীয় মরিচের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে ভেনিসের হাতে ছিল।"

"ইংলন্ডে মরিচের খবর পৌঁছতে দেরি হয়—নর্মানরা ইংলন্ড জয়ের পর অভিজাত ধনীরা প্রথম মরিচের স্বাদ পেলেন। বহুদিন ধরে সোনা রুপোর মতন মূল্যবান ছিল এই মরিচ। মরিচ দিয়ে ট্যাক্সো দেওয়া যেতো, দেনা শোধ করা যেতো—সাড়ে চারশো গ্রাম মরিচের বদলে পাওয়া যেতো বেশ কয়েকটি ভেড়া।"

আমি বললাম, "ডানলপ কোম্পানিতে একসময় উঁচুপদে একজন পেপারকর্ন সাহেব ছিলেন—পরে তিনি বিলেতের পিলকিংটন কোম্পানির বড় কর্তা হন। এই পেপারকর্নের মানে যে মরিচ দিয়ে দাম দেওয়া এটা আমি জানতাম না। নিশ্চয় প্রাচীন কোনও পরিবার।"

মজার ব্যাপার। ভেনিসের লোকরা ক্রমশ মরিচের জন্যে এতো বেশি দাম চাইতে লাগলো যে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশরা মশলার দেশ ভারতে আসবার জন্যে নতুন জলপথ সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরাও তখন ব্যগ্র মরিচের উৎপাদনস্থলে সোজা চলে যেতে। স্পেনের রাজা যে কলম্বাসের পিছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালতে রাজি হলেন তার কারণ কলম্বাস বোঝালেন, আটলান্টিক মহাসাগরের অপর প্রান্তে রয়েছে ভারত ও চীনের মহামূল্যবান মশলাসম্ভার।

এরপর তো পর্তুগিজ ভাস্কো ডা গামার গল্প। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামা ভারতে আসতে চাইলেন, যাতে কমদামে সোজাসুজি মরিচ মশলা কেনা যায়, মধ্যিখানে যেন তৃতীয়পক্ষ না থাকে। কেনিয়া থেকে ভারতীয় নৌ-বিশারদ ইবন মজিদ পথ দেখিয়ে ভাস্কোকে নিয়ে এলেন আজকের কোজিকোড় অথবা কালিকটে।

ভাস্কোর পরে কালিকটে এলেন পেড্রো আলভারিস কাব্রাল। এঁকে

স্থানীয় বিক্ষুব্ধরা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ভাস্কো আবার সদলবলে ভারতে ফিরে এলেন এবং রাজাকে পরাভূত করে পর্তুগালে ফিরে গেলেন ১৫০৩ সালে। ভারতীয় মরিচের ব্যবসা এবার পর্তুগিজরা কব্জা করলো। একটা জাহাজে যেতো ১৫০০ টন গোলমরিচ, আঠাশ টন আদা, সাত টন লবঙ্গ এবং ন'টন দারুচিনি। শোনা যায় প্রথমবার ভাস্কো ডা গামা এদেশ থেকে যা মশলা নিয়ে গিয়েছিলেন তাতেই তাঁর অভিযানের খরচের ছ' গুণ উঠে গিয়েছিল।

১৫৯১ সালে ইংরেজরা ভারতীয় মশলার জন্যে হন্যে হয়ে অভিযান শুরু করলো। চার বছর পরে ডাচরাও একই পথের পথিক হলেন—তাঁদের কোম্পানির নাম হলো ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। প্রথমবারে স্রেফ লবঙ্গ বেচে ২৫০০ পারসেন্ট লাভ হয়েছিল এঁদের।

১৬০০ সালের শেষ দিনে রানি এলিজাবেথের চার্টার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হলো ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উদ্দেশ্য মশলার ব্যবসা। উদ্যোগের কারণ ডাচরা তাল বুঝে অযথা গোলমরিচের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

সর্বদমন রায় মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলাম, "গোলমরিচের প্রতি দুনিয়ার মানুষের এতো বেশি টান কেন?"

সর্বদমন উত্তর দিলেন, "মরিচ না হলে ইউরোপের আধপচা মাংস তখনকার সাহেবরা খাবে কী করে?"

"সাহেবদের মাংস আধপচা কেন, রায়সাহেব?"

"তা হলে তো আপনাকে ইউরোপিয়ানদের আদি দারিদ্র্য নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। তখন শীতের আগে সায়েবদের নানা দুর্ভোগ হতো। শীতের সময় কোথায় পাওয়া যাবে পশুদের খাদ্য? তাই শীত আসবার ঠিক আগেই সমস্ত পশু হত্যা করে মাংস স্টক করা হতো। সেযুগে তো ডিপ ফ্রিজ নেই—ভরসা কেবল নুন এবং মরিচ। তাই মরিচের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠতো সমস্ত ইউরোপীয় মহাদেশ। মরিচের সেই মায়ামোহ থেকে আজও মুক্তি মেলেনি পশ্চিমের, যদিও চার মাসের মাংস এখন ফ্রিজবিহীন অবস্থায় স্টক করে রাখার প্রয়োজন হয় না।"

আমার চিন্তা, ব্যান্ডোদা অতো সহজে সন্তুষ্ট হবেন না। জিজ্ঞেস করবেন, এতো মরিচের দাম গরিব সায়েবরা ভারতবর্ষকে কোথা থেকে দিতেন? ধরে নিচ্ছি, মরিচের পুরো দাম আমাদের হাতে আসতো না, মোটা অর্থ মেরে দিতো এই মাঝপথের দালালরা যাদের বোম্বেটে ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলে না।

"এ আর এমন কী কথা? যে কোনও হিস্ট্রি বই খুললেই খবরটা পেয়ে যাবেন। মধ্যযুগের ইউরোপ আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত নিতো মশলা, গয়নাগাঁটি আর মিহি কাপড়। পরিবর্তে ইংরেজরা পাঠাতো গরম জামাকাপড়, ওলন্দাজরা নোনা হেরিং মাছ, আর স্প্যানিশ ও ফরাসিরা স্রেফ লবণ। বিদেশের বাজার থেকে ভারতবর্ষ আরও কিনতো তামা ও পার্সিয়ান কার্পেট। সুদৃশ্য গালিচার দিকে ধনী ভারতীয়দের নজর বহুদিন ধরে।"

জরুরি তলব পেয়ে আবার নতমস্তকে তাজ বেঙ্গলে ব্যান্ডোদা দর্শনে হাজির হয়েছি। তাঁর সুইটে প্রবেশ করে ঘরে দেখি এক বিচিত্র দৃশ্য।

ছোট ছোট পুরিয়ায় ব্যান্ডোদার বিছানার ওপর ও কার্পেটের ওপর অসংখ্য মশলার পুরিয়া ছড়ানো রয়েছে। মেঝেতে হাফ প্যান্ট পরে বসে ব্যান্ডোদা প্রত্যেক পুরিয়ায় মার্কার কলম দিয়ে নম্বর লিখছেন এবং একটা খুদে খাতায় কীসব নাম লিখে রাখছেন।

"একি করছেন, ব্যান্ডোদা? আপনি যে তাজ বেঙ্গলকে বড়বাজারের বেনে মশলার দোকানে রূপান্তরিত করলেন।"

"উপায় নেই রে, এই পিপুল তো বাবার জন্মে দেখিনি। কালো মরিচের মায়ের পেটের ভাই শাদা মরিচের যে এতো রকম ভ্যারাইটি এসব নিজের চোখে না দেখলে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতো না। আর সায়েবি নামের সঙ্গে দিশি নামের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আজকাল সায়েবরা আমাদের লজ্জা দিতে চায়, ব্ল্যাক পেপার না বলে কালা মরিচ বলতে চায়। শুনে রাখ, পিকিং যদি বেজিং হয়ে যায়, মাদ্রাজ যদি চেন্নাই হয়ে যায়, বোম্বাই যদি মুম্বাই হয়ে থাকে, এমনকি ক্যালকাটা যদি কোলকাতা হয়ে যায় তা হলে সায়েবদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তোমার ছাগল তুমি যেদিক থেকে ইচ্ছে কাটো, তবে ডলার অথবা

পাউন্ডে নগদ দামটা দিয়ে দিও।"

ব্যান্ডোদা এবার আমার হাতে দু'খানা অভিধান ধরিয়ে দিলেন—বাংলা থেকে ইংরিজি এবং ইংরিজি থেকে বাংলা। বললেন, "ঝটপট বলে যা আর আমি ল্যাপটপ কম্পুটারে ঢুকিয়ে নিই।"

"টারমেরিক হলো হরিদ্রা—এটা আবার সংস্কৃত শব্দ নয়, আদি মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে। করিয়ান্ডার হচ্ছে ধনে অথবা ধন্যকা। তুলসীর ইংরিজিটা যেন কী?"

"সেকরেড্ ব্যাসিল—বহু রকমের তুলসী আছে, বেঙ্গল ক্লাবের স্টুয়ার্ট দত্তসাহেব একদিন আমাকে ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। ক্যাটাচু হচ্ছে খয়ের অথবা খদির।"

"জিঞ্জারের আদা ছাড়া আর কোনও নাম আছে?" জিজ্ঞেস করলেন উৎসাহী ব্যান্ডোদা।

"বইতে আদ্রক লেখা আছে। আপনাকে মনিয়ার উইলিয়মসের সংস্কৃত-ইংরিজি অভিধানও কিনতে হবে। স্বয়ং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গাঁটের টাকা খরচ করে বিরাট এই বই ছাপিয়েছিলেন, এখনও মানুষের কাজে লাগছে। আমার মা প্রায়ই বলতেন, পচা আদায় পোড়ে গাল।"

"ওটা আর চাউর করিস না, প্রচণ্ড ঝাল আছে শুনলে বিলেতের সায়েবরা এখনই আদা পচিয়ে, পেটেন্ট নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠাবে। স্রেফ ঝালের জন্যে একটা জাত হঠাৎ এমন পাগল হয়ে উঠবে তা ভাবা যায় না।"

পরের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, "ব্যান্ডোদা, আই অ্যাম স্যরি, পানের সংস্কৃত নাম হিসেবে যে তাম্বুল শব্দটি চালাতাম ওটা আর্যদের নয়, ওঁরা ওটা মেরে দিয়েছেন মুণ্ডাদের কাছ থেকে।"

"পিপুলী ব্যাপারটা সায়েবরা এখনও বোঝে না, বৈজ্ঞানিক বইতে খুঁজে পাবে লং পেপার বলে। কিন্তু ঝাল আছে শুনলেই, সায়েবরা কয়েক টন পিপুলী ইমপোর্ট করে নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পিপুলী প্রায় একই রকম দেখতে। এর শিকড়ও নিয়ে এসেছি বড়বাজার থেকে, নাম পিপুলী মূল। এর ইংরিজি কী হবে ভগবান জানেন।"

কার্ডামম ব্যাপারটা গোলমেলে—ছোট এলাচ ও বড় এলাচ।

পৃথিবীর বাজারে ছোট এলাচই আসল এলাচ, বাজারে বলে মাইসোর ভ্যারাইটি। বড় এলাচের কদর বাংলায়—মুখের গন্ধ মারতে গেরস্তর লিস্টারিন মাউথওয়াশ। সংস্কৃতে এর নাম বোধ হয় দারুহরিদ্রা।

"কামিন বলতে যে জিরা বোঝায় তা প্রায়ই আমার গোলমাল হয়ে যায়। ছোটবেলায় ওয়ার্ড বুকে মন দেওয়া হয়নি, এখন সেই অবহেলার মাসুল গুনছি।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "দরকার হলে প্রফেসর রায়কে ফোন কর, 'কুঞ্চিকা' না কী একটা সংস্কৃত টার্ম বলেছিলেন।"

মার খেয়ে গেলাম ফেনুগ্রীক শব্দে। আমার অভিধানে-এর খোঁজ পাচ্ছি না। সর্বদমনবাবু টেলিফোনে মান রক্ষা করলেন। "আরে মশাই, মেথি! বোধ হয় গ্রীস থেকে এসেছিল, তাই গ্রীক কথাটা লেজুড় হয়েছে। সংস্কৃত খুব সহজ—মেথিকা।"

আবার ধাক্কা : ক্লোভ! "চীনেরা নাকি থার্ড সেঞ্চুরি বি সি থেকে এদেশ থেকে লবঙ্গ আমদানি করছে।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "শুনেছি, নখের মতন দেখতে তাই নাম হয়েছে ক্লোভ।"

সর্বদমন রায়ের টেলিফোনিক উপদেশ · "লবঙ্গ মশাই! রামায়ণে রেফারেন্স আছে। বেশ ঝাঁঝওয়ালা জিনিস। খোঁজ করুন, ওর মধ্যে বঙ্গ-কথাটা কেন উঁকি মারছে?"

সিনামমের নাম কেন দারুচিনি হলো? এ নিয়েও কথা উঠলো।

সর্বদমনবাবু সাবধান করেদিলেন, "চিনি বলে ভুল করবেন না। দার-চিনি মানে চীন দেশের গাছের ছাল।"

ব্যান্ডোদা সবচেয়ে অবাক হলেন তেজপাতা প্রসঙ্গে এসে। ওঁর ধারণা ছিল তৈজসপত্রই চলতি ভাষায় তেজপাতা। কিন্তু সর্বদমনবাবু টেলিফোনেই জানিয়ে দিলেন, "খিচুড়ি থেকে আরম্ভ করে পরমান্ন পর্যন্ত সমস্ত রান্নায় যে পাতাটি ব্যবহার করতে ইন্ডিয়ানরা অদ্বিতীয় তার সংস্কৃত নাম তমালি। তেজপাতার ইংরিজি নাম বলতে ব্যর্থ হয়ে এই অধম একবার পাঁচ টাকা বাজি হেরেছিল। তখন পাঁচ টাকা অনেক টাকা, ছাত্রাবস্থায় পুরো দুটি সপ্তাহ পদব্রজে শিয়ালদহ থেকে হাওড়া স্টেশন যাতায়াত করে যে অর্থ বেঁচেছিল তাই দিয়ে কোনওক্রমে মানরক্ষা

হয়েছিল। তেজপাতার ইংরিজি এখনও জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি যে খ্রিস্টের জন্মের আগেই রোমানরা যখন এদেশ থেকে তেজপাতা আমদানি করতেন তখন এর নাম ছিল ম্যালাবাথরাম!

"ব্যান্ডোদা, কাউকে এইভাবে প্যাকেটে প্যাকেটে মশলা সংগ্রহ করতে আমি কখনও দেখিনি।"

"দেখবি কী করে? বড়বাজারটা যে বাঙালিদের অক্ষয়সম্পদ হতে পারতো তা তো তোদের মাথায় এলো না। ফ্রান্সে গেলে লোকে উপহার প্যাকিং-এ হোমিওপ্যাথিক শিশির সাইজের শত সেন্টের সংগ্রহ কিনে এনে সারাজীবন বাড়িতে সাজিয়ে রাখে। তোরা বড়বাজারের বেনের দোকানের মশলা এইভাবে সাজিয়েগুছিয়ে সুদৃশ্য বাক্সে বোঝাই করে বিক্রি কর—দেখবি এক্সপোর্ট অর্ডার সাপ্লাই করতে গিয়ে ধুঁকছিস। মনে রাখিস, এই দুনিয়ার নোলা এমন বাড়ছে যে ওয়ার্ল্ড মার্কেটে অন্তত এক লাখ টন মরিচ প্রতি বছর দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যাচ্ছে।"

ব্যান্ডোদা নিজেই ইতিমধ্যে দু'শো মশলার প্যাকেট তৈরি করে ফেলেছেন। ওঁর ভীষণ ইচ্ছে কারি ও ঝাল সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি শেষ হলেই হাত দেবেন পাঁচফোড়নে।

ব্যান্ডোদা বললেন, "সায়েবদের 'পাঞ্চ' আছে, তবে মদে, তার নামই পাঞ্চ।"

"অপরাধ মার্জনা করবেন, ব্যান্ডোদা। এই অধম বিশ্বস্ত সূত্র থেকে শুনেছে বিলিতি পাঞ্চ-এর জন্ম এই নাকি কলকাতায়—পাঁচরকম মাল মিশিয়ে খিদমতগাররা তাদের সায়েবদের জন্যে যে ককটেল তৈরি করতো তার নামই পঞ্চ অথবা পাঞ্চ।"

"তুই বলছিস ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস এটসেটরা এই পাঞ্চেই মজে থাকতেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নেবেন একটা বিলিতি পাঞ্চের রেসিপি? অতি প্রাচীন ফর্মুলা। দু' বোতল আরকে প্রথমে তিরিশটা লেবু ভিজিয়ে দিন—মজুক ১২ ঘণ্টা ধরে—এবার ওই দু' বোতল আরক ফেলে দিয়ে লেবুগুলো চুবিয়ে দিন ১০ বোতল আরকে। তাতে ঢালুন ৬ বোতল ব্রান্ডি অথবা রাম। এবার এতে ঢালুন আড়াই বোতল লাইম জুস, ১২ পাউন্ড ভিজে চিনি এবং ৮ কোয়ার্ট ফুটন্ত দুধ। এবার একের পর এক

চোদ্দ বোতল ফুটন্ত জল ঢালতে থাকুন। এইবার পানীয়কে ঠাণ্ডা হতে দিন। ঠাণ্ডা অবস্থায় ফিলটার করুন। স্বর্গসুখের পানীয় তৈরি। ইন্ডিয়া প্রত্যাগত বিলিতি সায়েবদের নেশা মেটাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদামশাই প্রিন্স দ্বারকানাথ বিদেশে এই রাম এক্সপোর্ট করে টু পাইস কামিয়েছিলেন।"

মশলা প্যাকিং পর্ব শেষ করে ব্যান্ডোদা হোটেলের মার্সেডিজটা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লেন গড়িয়াহাটার উদ্দেশে।

ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁচালঙ্কার বিভিন্ন ভ্যারাইটি কোথায় পাবো? এমন জায়গায় চল যেখানে পূর্ববঙ্গের বাঙালদের বসবাস একটু বেশি।"

"ব্যান্ডোদা, আপনাকে আমি যাদবপুর, সন্তোষপুর থেকে আরম্ভ করে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বাঙালরা ঝালের মাস্টার এই ভুল আপনার ভাঙুক। বেঁচে থাক বাঁকুড়া, বেঁচে থাক মেদিনীপুর, ওসব জায়গায় লঙ্কা নয় তো যেন সাপের ছোবল! আর ঝালের কতো যে ভ্যারাইটি কী বলবো!

"আপনি ভাষাতত্ত্ববিদ ভক্তিভূষণ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন—লঙ্কা কথাটা স্ল্যাং এবং অপরাধ জগতেও ঢুকে গিয়েছে। ধানি লঙ্কা মানে একটু ছোট হাইটের মেয়ে যার কথাবার্তায় গায়ে জ্বালা ধরে যায়।"

বাজারে হাজির হয়ে ব্যান্ডোদা যতোরকমের সম্ভব লঙ্কা সংগ্রহ করতে লাগলেন। মানুষের মতন লঙ্কাও নাকি দু' রকমের—দেখলে মনে হয় নিরীহ, কিন্তু এমন ঝাল যে ব্রহ্মতালু ঘেমে ওঠে; আর এক শ্রেণী দেখলে মনে হয় ভীষণ ঝাল, কিন্তু আসলে নির্বিষ। কলকাতাতেও যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাপসিকাম পাওয়া যায় তা দেখে ব্যান্ডোদা খুব অবাক হয়ে গেলেন।

"এসব এ অঞ্চলে নতুন এসেছে। আমাদের ছোটবেলায় নিউ মার্কেট ও দার্জিলিং ছাড়া কোথাও ক্যাপসিকাম পাওয়া যেতো না, কিনতেন মেমসায়েবরা!"

একটু ভেবে ব্যান্ডোদা বললেন, "এখন প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বঙ্গবধূই তো মেমসায়েব, আমার খেয়াল থাকে না।"

আমি বললাম, "অবাক কাণ্ড! ঘোমটার আড়ালে বাংলার বধূ থেকে বিলেতের মেমসায়েব পর্যন্ত সবাই এখন ঝাল লঙ্কার খপ্পরে পড়ে গিয়েছে।"

"অনেকের ধারণা, খেটে খাওয়া মানুষরা, যাদের একসময় আমাদের বাবুরা ছোটলোক বলতেন, কেবল তারাই লঙ্কার ভক্ত। ভদ্রলোকরা কেবল মণ্ডামিঠাই লুচিপরোটায় মজে থাকেন।" কিন্তু ব্যান্ডোদা এবার বিলেতে গিয়ে এই বাংলার উল্টো রামায়ণ দেখেছেন। "যে সায়েব কলেক্টর এদেশে লঙ্কার গন্ধ নাকে গেলে রেগে আগে ১৪৪ ধারা জারি করতেন তাঁর বংশধর এখন নিজের দেশে চেটে পুটে লঙ্কা খাচ্ছে এবং প্রয়োজনে হাপুস নয়নে চোখের জল ফেলছে।"

ব্যান্ডোদা ও সর্বদমন রায়কে আমি বলে ফেলেছি, "এবার মনস্তাত্বিকদের দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের। এই যে ঝাল খেতে-খেতে কষ্ট পাওয়া এবং কষ্ট পেতে-পেতে ঝাল খাওয়ার প্রবণতা এ তো আত্মনিগ্রহের আর এক অপরিচিত রূপ। একালের সম্পন্ন মানুষ কোন্ অবদমিত কামনার প্রভাবে এইভাবে নিজেকে জর্জরিত করবার জন্যে ঝালের পিছনে ছুটছে কে জানে?"

গড়িয়াহাট বাজারে বালতি কড়াইয়ের দর করলেন ব্যান্ডোদা। তারপর ক্যালকুলেটর দিয়ে অঙ্ক কষে বললেন, "সবচেয়ে কম সময়ে যদি কোটিপতি হবার বাসনা থাকে, তা হলে হাওড়া থেকে বালতি এবং কড়াই হিথরোতে এক্সপোর্ট শুরু কর। সায়েবরা শুধু আমাদের ঝাল কারিকে আপন করে নেননি, চাইছেন সেই ঝাল-ঝাল কারি খুদে বালতি থেকে পরিবেশিত হোক। যে পিতলের বালতিতে কিছুদিন আগেও কাজের বাড়িতে তরকারি পরিবেশন হতো সে সব মিউজিয়ম পিস দু'দিন পরে সদবিতে নিলাম হবে এবং তা কেনবার জন্যে সায়েবরা লাফালাফি করবেন, তুই দেখে নিস।"

"হোয়াট নেক্সট্?" বালতির পরে কিসের ঢেউ আসতে পারে? বাজারের ফুটপাতে দাঁড়িয়েই ভাবছেন ব্যান্ডোদা।

"আমি বললাম কারি বিপ্লব তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন লর্ড কার্জনের

বংশধররা কাঁটা চামচ ছেড়ে পাণিপাদং প্রক্ষালয়, ডানহাত দিয়ে ডালভাত খাওয়া শুরু করবেন।"

"আঃ, তোদের চিন্তাধারাটা বড়ই নেগেটিভ! ছুরি কাঁটার বাজারটা ঝপাং করে পড়ে যাবে এইটাই ভাবতে পারছিস, কিন্তু কোথায় বাংলার বাজারটা বাড়তে পারে তা আন্দাজ করতে পারছিস না। এই মানসিকতার জন্যে ক্যালকাটা থেকে তোরা কিছুই এক্সপোর্ট করতে পারছিস না।"

ফুটপাতের ওপর একজন ফেরিওয়ালাকে দেখে ব্যান্ডোদা সানন্দে প্রায় ইউরেকা বলে উঠলেন। নতুন কোনও আইডিয়া তিনি পেয়ে গিয়েছেন। বললেন, "লন্ডনের ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় প্রধান সমস্যা ন্যাপকিন—তেল লঙ্কা হলুদ মাখা কারি খেয়ে ঠোঁট মুছবার জন্যে সায়েবী ন্যাপকিনের জন্ম হয়নি—আর ধোপার বাড়িতে ন্যাপকিন পাঠিয়ে তার দাগ তোলা বেশ কঠিন ব্যাপার।"

এরপরেই ব্যান্ডোদার ব্রেন ওয়েভ। "এখান থেকে আমরা এখনই প্রতি সপ্তাহে বিলেতে বিশ লাখ ডিসপোজেব্‌ল ন্যাপকিন সাপ্লাই করতে পারি যাঁরা সিলেটি দোকানে কারি খেতে যাবেন তাঁদের জন্যে।"

"গামছা কথাটা সায়েবরা উচ্চারণ করতে পারবে?" আমার আশঙ্কা ব্যান্ডোদার কাছে চেপে রাখলাম না।

"যতো ঝাল, যতো শক্ত উচ্চারণ, তাতে ততো আকর্ষণ বোধ করছেন একালের সায়েবরা। তবে প্রয়োজন হলে একটা আকর্ষণীয় নাম ট্রেডমার্ক হিসেবে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে হবে।"

"হোয়াট অ্যাবাউট 'গামকিন'?" আমি ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব পেশ করলাম।

"সাধু প্রচেষ্টা! গামছার গাম + ন্যাপকিনের কিন = গামকিন। সিলেটি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পরে সায়েব-মেম এই গামকিন বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন অ্যাজ এ সুভেনির।"

ফেরার পথে ইঙ্গিত করলাম, অদূরেই মিঠাই-এর প্রখ্যাত দোকান রয়েছে, এখানে অতি উপাদেয় সন্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যান্ডোদা উৎসাহিত হলেন না। "এখন আমরা ঝালপর্বে রয়েছি, কোনওরকমে ঝালচচ্চড়ি পর্যন্ত এগোতে পারি ; কিংবা ঝালমুড়ি। সায়েবদের বাড়িতে যখন দই-সন্দেশ ঢোকানো সম্ভব হবে তখন আমরাও বিপুল পরিমাণে মিঠাই-এর মিষ্টি খাবো। লন্ডনে শ্রাবণী বসুর কাছে শুনলাম, পলাশির যুদ্ধের পরেই ক্লাইভ কী খানা খেয়েছিলেন সে নিয়ে বিবিসি রিসার্চ করেছে। ক্লাইভ সায়েব খেয়েছিলেন—চিকেন দোপিয়াজা, মালাই চিংড়ি এবং বিরিয়ানি। সন্দেশ রসগোল্লার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং মিষ্টিতে সায়েবদের উৎসাহী করতে আর একটু সময় লাগবে।"

আজ সকালে এক সাউথ ইন্ডিয়ান টিফিন হাউসে ব্যান্ডোদা আমাদের দু'জনকে নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যেই সবচেয়ে ঝাল রসম্ আমাদের সামনে পরিবেশিত হয়েছে উইথ ইডলি।

রসমে অকাতরে চিলি পাউডার ছড়াচ্ছেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

"ব্যান্ডোদা! রিসার্চ ডান। কিন্তু সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকা বড় প্রয়োজন রয়েছে।"

প্রফেসর সর্বদমন রায় কিন্তু আমাকে সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, "বেশি লঙ্কা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমন কোনও ঘটনার উল্লেখ লাস্ট দুশো বছরে কোথাও নেই। শরীরে ও মনে একটু ধাক্কা দেয় এই পর্যন্ত, কিন্তু আক্রমণটা গান্ধিয়ান—একেবারে ননভায়োলেন্ট!"

আনন্দে ডগমগ হয়ে ব্যান্ডোদা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "প্রফেসর রায়, আপনি এই অধম এন-আর-আই-এর হার্দিক অভিনন্দন নিন।"

সর্বদমন রায় জানালেন, "দশ হাজার বছর ধরে ইন্ডিয়ানরা ফরেনে যাচ্ছে। এন-আর-আই, অনাবাসী এসব নাম ঠিক জমে না। প্রাচীনকালে যাঁরা কাজের জন্যে দূরদেশে যেতেন তাঁদের বলা হতো গন্ধহারিণ।"

"সোর্স?" আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর সর্বদমন রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাই।

"আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জনের দু'একখানা বাংলা বই পড়ে নিন চটপট।"

"ওই গামকিন না কি একটা শব্দ আপনারা হাঁস-জারু স্টাইলে তৈরি করছেন। সংস্কৃতে ওর নাম : মুখমার্জনি। রেস্তোরাঁ সংক্রান্ত কয়েকটা শব্দ আপনাদের জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি। টেবিল হচ্ছে কাষ্ঠকোষ। পিঁড়ি : পিণ্ডিক। ফর্ক্ : কণ্টকপত্র। খাবার টেবিলের ছুরি : কোষশায়িকা। আর চায়ের চামচকে বলা হতো ডিম্বকা। আমাদের সব ছিল, এখনও সব আছে—কেবল ধৈর্য ধরে একটু খুঁজে নিতে হবে, ব্যান্ডোবাবু।"

সর্বদমনের উদ্দেশে ব্যান্ডোদার প্রশ্ন : "ব্রহ্মচর্য পালন করলে শাস্ত্রে ঝাল খাওয়া বারণ কেন?"

প্রফেসর রায় : "বেদে তো ঝাল লঙ্কার উল্লেখ পেলাম না। বোধ হয়, প্রাচীন ভারতে ধারণা ছিল, অতিমাত্রায় ঝাল আমাদের সিস্টেমটা গরম করে দেয়।"

ব্যান্ডোদার মন্তব্য : "তা হলে বোঝা যাচ্ছে, যারা বলে সম্রাট শাজাহানের আমলে লঙ্কা এদেশে এলো, তার আগে লঙ্কার ল আমাদের জানা ছিল না, তারা মিথ্যে বলে না।"

সর্বদমন রায় প্রতিবাদ করলেন না। "যদিও আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না উইদাউট লঙ্কা আমরা কীভাবে পাঁচ ছ'হাজার বছর এমন সুখে থাকলাম? পর্তুগিজরা যখন এদেশে লঙ্কা নিয়ে এলো তখন লঙ্কার নাম হলো গাছ মরিচ। উড়িষ্যায় এখনও লঙ্কার নাম সোপারিয়া।"

"ওঃ! আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরা যা দেখেন তাকেই পান-সুপুরি মনে করেন!"

"মুখুজ্যে, যা জানিস না তা নিয়ে মতামত দিস না। আমার ওড়িয়া ডাক্তার বন্ধু বলেছে, কথাটা—হলো সাগর পারিয়া—যা বিদেশ থেকে এসেছে, তার থেকে সোপারিয়া—সোপরে!"

প্রফেসর রায় বললেন, "গাছ মরিচ থেকে লঙ্কার নাম আমাদের অনেক জেলায় স্রেফ মরিচ হয়ে গেলো। আবার কোথাও লঙ্কা মরিচ।"

"ওইটাই তো আমার সন্দেহ, ব্যান্ডোদা। হাতের গোড়ায় রামায়ণের লঙ্কা এবং এখনকার শ্রীলঙ্কা রয়েছে। সুতরাং লঙ্কা কোথা থেকে এসেছে তা তো নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।"

সর্বদমন রায়ের মুখের দিকে তাকাতে তিনি ব্যাপারটা আরও জটিল

করে তুললেন। বললেন, "দয়া করে মনে রাখবেন, প্রাচীন ভারতে জলবেষ্টিত যে কোনও ভূখণ্ডকেই লঙ্কা বলা হতো। লঙ্কার অর্থ বিদেশ।"

"ব্যান্ডোদা, এসব ব্যাপারে আমি মাতৃনির্ভর। আমার মা বলতেন, অতি দর্পে হত লঙ্কা। দর্প—মানেই তো ঝাঁঝ। অর্থাৎ লঙ্কা।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "তুই আর সমস্যা সৃষ্টি করিস না। টিমের মেম্বার হয়ে নীরবে খেলে যা, প্রফেসর রায়কে হেল্প কর। আমাদের সামনে এখন দুটো কাজ। এক : লঙ্কার ভিতরের ব্যাপারটা একটু ভালভাবে জেনে রাখা। দ্বিতীয় কাজ : অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাবতবর্ষ কী করে লঙ্কাকে নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ করে নিলো এবং কোন্ দুর্লভ সমন্বয়প্রতিভায় ঝাল তরকারির মাধ্যমে ইংরেজের রসনাকে আমরা জয় করতে সক্ষম হলাম তা অনুসন্ধান করা।"

সর্বদমন রায় গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি ফরেনে যাইনি ; কিন্তু বেদ-বেদান্ত পাঠ করে বলতে পারি, রস ও রসনার সমন্বয় সাধনায় ব্যাপাবে আমরা ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর।"

"একটু পেল্লায় ক্লেম হযে যাচ্ছে না, ব্যান্ডোদা?" এই অধমের বিনীত নিবেদন।

সর্বদমন : "আপনারা সায়েবদের ফিজিওলজির বই খুলে দেখুন—চার রকম টেস্টের বেশি উল্লেখ নেই। ওদের স্বীকৃত চারটি স্বাদ হলো—সুইট, সাওয়ার, সল্ট ও বিটার। আমাদের সত্যদর্শী ঋষিরা শুরু করেছেন ছ'টি স্বাদ বা রস দিয়ে—অম্ল, মধুর, লবণ ও তিক্ত রস ছাড়াও রয়েছে কটু রস। ঝাল অর্থাৎ আলুমরিচ, ঝালঝোল কারি সব এই কটু বিভাগে।"

"ষষ্ঠ রসটা বাদ দিচ্ছেন কেন?" আমি আস্তে আস্তে সর্বদমনকে মনে করিয়ে দিই।

সর্বদমন বললেন, "ষষ্ঠ রস হল কষায়—যেমন ডুমুর, মোচা, থোড়। আর মনে রাখবেন এই ছ'টি অরিজিন্যাল রস ছাড়াও অন্তত তেষট্টিটা মিশ্র স্বাদের বর্ণনা করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। আরও জেনে রাখবেন, আর্যখাদ্যের যেসব খামতি ছিল তা মিটে গেলো আরবপারস্যর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে—এর ফলে পোস্ট-মোগল রস

ও রসনার লা জবাব, অর্থাৎ যার কোনও তুলনা নেই। এই অপরাজেয় ইনভিনসিব্‌ল আর্মাডা নিয়ে আমরা ইউরোপের নোলাকে বহুমুখী আক্রমণে পরাভূত করতে চলেছি।”

আমার সবিনয় প্রশ্ন : “ব্যান্ডোদা, খণ্ডনুন, মরিচ আর পিপুলী দিয়ে আমরা কি ইউরোপকে এইভাবে কব্জা করতে পারতাম?”

ব্যান্ডোদার উত্তর, “যথার্থ প্রশ্ন। সায়েবদের নিয়ে আসা লঙ্কা দিয়েই আমরা সায়েবদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান চালালাম। তবে সায়েবরাও আদিকালে একই কাণ্ড করেছে। যে তিনটে আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে তারা এশিয়াকে পদানত করেছিল সেগুলো হলো বারুদ, দিগদর্শন যন্ত্র এবং হুণ্ডি সিস্টেম। প্রথম দুটির আবিষ্কার চীনে এবং তৃতীয়টির এই ভারতে।”

টেনিসভক্ত ব্যান্ডোদা বললেন, “বিশ্বের দরবারে রসনা নিয়ে যেন সারাক্ষণ উইম্বলডন খেলা চলেছে। প্রথম সেটে ইন্ডিয়ার মহামূল্যবান মরিচ। সেই মরিচের স্বাদে পাগল হয়ে সস্তায় মরিচ কেনার প্রয়োজনে ইউরোপ আমাদের দু'শো বছ্ব দাস করে রাখলো। থার্ড সেটে, পর্তুগিজদের আনা লঙ্কার শক্তিতে শক্তিমান হযে আমরা পাঁচ হাজার বছরের পিপুলীকে কবিরাজের জারে বন্দি করে নতুন পথের পথিক হলাম। আমাদের সাবেকী খাবারগুলো নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো এবং সেই ঝালকে বুদ্ধিমানের মতন ব্যবহার করে আমরা হেলায় ইংল্যান্ড জয় করলাম।”

“প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল সেট এখনও বাকি আছে, ব্যান্ডোদা। এবার সায়েবরা উচ্ছেপলতার শুকতো, মহাপ্রভুর ল্যাপড়া এবং পায়সমের প্রেমে পড়বেন। এবং সেই সঙ্গে হয়তো পানসুপুরি।”

সর্বদমন রায় দুঃখ করলেন, “শেষ আইটেমটার মধ্যে সায়েবরা এখনও ঢুকলেন না। নিকোলাস মানুচি সপ্তদশ শতাব্দীতে সুপুরি মুখে দিয়ে অত্যন্ত খারাপ বর্ণনা দিয়েছেন। —আমার মাথা এমন ঘুরতে লাগলো যে মনে হলো যে মরণ আমার শিওরে এসে গিয়েছে। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, ভাগ্যে সেই সময় একজন ইংরেজ বন্ধু দ্রুতগতিতে আমার মুখে কিছুটা নুন ঢেলে দিলেন, অবশেষে আমার জ্ঞান ফিরে এলো, আমি সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম।”

"এসব পড়লে, কোন্ সায়েব আর শখ করে সুপুরি পানপরাগ চিবোবেন?" দুঃখ করলেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

"মুশকিল হলো, সায়েববাড়ির বাবুর্চিরা কখনও পানের ভক্ত ছিল না। অথচ বিলিতি মেমসায়েব এবং দেশি বাবুর্চির নিঃশব্দ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান থেকেই গড়ে উঠেছিল ফিউশন ফুড, যার বাংলা করতে পারেন মিশ্রমিলন। এইভাবেই কলকাতার সায়েবদের প্রিয় মেনু হয়ে উঠেছিল উইন্ডসর স্যুপ, পাটনা রাইস, ব্রথ অব ডল (স্রেফ ডাল), বার্ডওয়ান স্টু, ক্যাবব্স, ফিশ মোলে (মলয় কথাটাই মোলে হয়েছে), কারি, চাটনি এবং বাইকুল্লা সুফলে।"

"এগুলোকে 'ফিউশন' না বলে, 'কনফিউশন' বলতে পারো, যার বাংলা টার্ম জগাখিচুড়ি!"

চার দিনের জন্যে প্রফেশনের জরুরি কাজে ব্যান্ডোদা হঠাৎ নিউইয়র্কে চলে গেলেন। যাবার আগে আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন, ইন্ডিয়া থেকে পশ্চিমে লঙ্কাকে জনপ্রিয় করতে কোন্ কোন্ মহাপুরুষ সক্রিয় হয়েছিলেন তা খোঁজখবর করে রাখ।

আমাদের আরও বললেন, "লঙ্কার ওপর গুরুত্ব দিতে লজ্জা পাসনি। জেনে রাখ একজন হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী লঙ্কার ওপর গবেষণা করেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁর নাম অ্যালবার্ট সেন্ট-জর্জ।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদার ভাষ্য, "তোরা ভাবছিস অসম্ভব ব্যাপার—তা হলে তো হাজার দশেক সিলেটিকে সুইডেন থেকে নোবেল প্রাইজ দিতে হয়! শোন, এই হাঙ্গেরিয়ান সায়েব, ভিটামিন সি সম্পর্কে গভীর গবেষণা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই হালে পানি পাচ্ছিলেন না। কাজের চাপে বাড়ি এসে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ। তারপর একদিন বৈজ্ঞানিকের ওয়াইফ স্বহস্তে প্যাপারিকা ফুড রান্না করে স্বামীর ল্যাবে পাঠালেন। সেই ঝাল রান্না মুখে দিয়েই বৈজ্ঞানিকের মাথায় আইডিয়া এসে গেলো। পরের দিন বস্তাবস্তা প্যাপারিকা অর্থাৎ লঙ্কা কিনে এনে ক'দিনের মধ্যে অ্যালবার্ট সেন্ট-জর্জ তাঁর পরীক্ষাগারে হাফ লিটার ভিটামিন সি তৈরি করে ফেললেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে হই হই পড়ে গেলো—এঁকে নোবেল পুরস্কার না দিয়ে উপায়

রইলো না। অনেক লোকে কিন্তু এখনও জানে না যে কমলালেবু থেকে তিনগুণ ভিটামিন সি বা অ্যাস্করবিক অ্যাসিড এই লঙ্কায় আছে। এই হাঙ্গেরিয়ান সায়েব লঙ্কানির্ভর এক নতুন ওষুধও বাজারে ছেড়ে ছিলেন, ভিটামিন স্টাইলে নাম দিয়েছিলেন—প্রিটামিন।"

আমরা ব্যান্ডোদার কথা শুনে কিছুটা সাহস পেলাম। লঙ্কার প্রথম যুগে যেসব অনুসন্ধানের কাজ এদেশে নিঃশব্দে হয়েছে তা আমরা খুঁজে বার করবই।

পাঁচ দিনের মাথায় ব্যান্ডোদা ব্যাক টু বেঙ্গল অর্থাৎ তাজ বেঙ্গল। তাঁর গলার স্বরে প্রচণ্ড একসাইটমেন্ট। টেলিফোনেই আমাকে বললেন, "আসবার সময় এক হাঁড়ি জেনুইন রসগোল্লা চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিনে আনিস। আমার সঙ্গে আছে প্রচণ্ড বিষধর..."

"সাপ নাকি?" আমি আঁতকে উঠলাম। "সঙ্গে সাপ রাখার জন্যে তাজ বেঙ্গলের পারমিশন নিয়েছেন তো?"

"পুরো ব্যাপারটা জানলে হোটেলের কোনও পারমিশনই পাওয়া যাবে না। অতি গোপনে অনেক কাজ আমাদের সারতে হবে। তুই কিন্তু চিত্তরঞ্জনটা ভুলিসনি।"

হাঁড়ি হাতে আমি ও একব্যাগ বই হাতে সর্বদমনবাবু একই সঙ্গে তাজ বেঙ্গলে ঢুকছি—লিফটের সামনে দু'জনের ঠোকাঠুকি হয়ে গেলো। বই ছাড়াও সর্বদমনবাবু সঙ্গে এনেছেন এক তাল পাকা তেঁতুল, ব্যান্ডোদার স্পেশাল নির্দেশে।

আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা আজ আনন্দে টগবগ করে ফুটছেন। বললেন, "তুই বিলেতের সিলেটি কারিওয়ালাদের নিয়ে নাচানাচি করছিস কর, কিন্তু এবার আরও মাত্রা বাড়িয়ে দে। তুই অ্যানাউন্স করতে পারিস, এই দুনিয়ায় লঙ্কা সম্বন্ধে বাঙালিদের থেকে বেশি কেউ জানে না। লঙ্কা সম্বন্ধে সেরা বই বহু গবেষণা করে প্রকাশিত হয়েছে, এখন বেস্ট সেলারও হয়েছে, এই বই সায়েবদের হাতে হাতে ঘুরছে—ফ্রম স্পেনের রাজা টু কুইন এলিজাবেথ টু জুবিন মেটা! লেখক একজন নির্ভেজাল বঙ্গসন্তান, নিবাস মার্কিন দেশ।"

"ব্যান্ডোদা, আপনি ভুল করছেন, লেখক বাঙালি নন, তাঁর নাম অমল নাজ!"

"তোদের ব্যান্ডোদা অত সহজে ভুল করে না, মুখুজ্যে। ওই বঙ্গসন্তানের সঙ্গে খোদ ম্যানহাটানের কফিশপে বসে পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আলাপ করে এলাম। সোনার টুকরো ছেলে, আসল টাইটেল নাগ, প্রবাসে উচ্চারণ বিভ্রাটে এবং পাকে পড়ে নাজ হয়ে গিয়েছে। ছেলেটির জন্ম এই ভারতে, শিক্ষা আয়ারল্যান্ডে, পেশা সাংবাদিকতা, বর্তমান সাকিন আমেরিকা। কর্মক্ষেত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।"

ব্যান্ডোদা চোখ বন্ধ করে উচ্চারণ করলেন, "শিবশম্ভু, শিবশম্ভু! পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধরকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। শিব যদি নীলকণ্ঠ হতে পারেন তা হলে তোদের ব্যান্ডোদাও পারবে না কেন? মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!"

কথা বাড়াতে চাইছেন না ব্যান্ডোদা। আমাদের সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কী আছে তা আমিই জানি না। আমার শেষ বক্তব্য হিসেবে কয়েকটা খবর বুলেট ফর্মে ঝটপট টুকে রাখ। অনেক কষ্টে দেশওয়ালি ভাই নাগ মশায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।"

ফার্স্ট: ছোট্ট এই পৃথিবীতে অন্তত ১৬০০ রকম লঙ্কা আছে। লঙ্কা সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন সেই অধ্যাপক আমেরিকার মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানি পড়ান। তাঁর সংগ্রহে ইতিমধ্যে কিন্তু ২২৫০ রকম লঙ্কাবীজ আছে।

সেকেন্ড : দুনিয়ার লোকেরা স্বীকার করছেন, লঙ্কার আদিভূমি বলিভিয়া। মাতৃলঙ্কাটির নাম উলুপিকা। কিন্তু একজন জগদ্বিখ্যাত ডাচ বিজ্ঞানী জোরের সঙ্গে বলে দিয়েছেন লঙ্কার জন্ম ভারতে—এই কথা তিনি বলেছেন দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে আসার পরে। তাঁর ধারণা এদেশ থেকে লঙ্কা প্রথমে যায় ইউরোপে, সেখান থেকে আমেরিকায়।

কিন্তু প্রমাণাভাবে বলিভিয়াকে এই সম্মান দিতে হবে। কলম্বাস এই লঙ্কা ইউরোপে নিয়ে আসেন, কিন্তু তা কারও নেক নজরে পড়লো না। এরপর পর্তুগিজরা পশ্চিম ব্রাজিল থেকে লঙ্কাকে প্রথমে পশ্চিম আফ্রিকায় এবং পরে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে গোয়ায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই লঙ্কায় সর্বভারতবিজয়। পারনামবুকো থেকে এসেছিল বলে এর প্রথম নাম হয় পারনামবুকো পেপার।

থার্ড : কোয়ার্টার ইঞ্চি লম্বা থেকে সাড়ে তেরো ইঞ্চি লম্বা লঙ্কা পৃথিবীর মানুষ মনের সুখে উপভোগ করছে। লঙ্কার সাইজ দেখে কিন্তু ঝালের মাত্রা বোঝা যায় না। এই লঙ্কা কেউ খায় গন্ধের জন্যে, কেউ স্রেফ ঝালের জন্যে। আমেরিকান প্রফেসর হার্ডি এসবোর মতে কাঁচা খাবার পক্ষে সেরা ঝাল পেরুর লোকোটো! দেখতে একটি খুদে সাইজ পেঁপের মতন। পৃথিবীর সেরা এই লঙ্কাবিশারদ নিজে কিন্তু লঙ্কা খান না!

দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা সাত হাজার বছর ধরে লঙ্কার স্বাদ উপভোগ করছে, কিন্তু ইন্ডিয়া মাত্র চারশো বছরে ভেল্কি দেখিয়ে ছেড়েছে।

"দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো থেকে আমি বিষ আনিয়েছি, ভায়া ইউ এস এ," এবার সদর্পে ঘোষণা করলেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

"অমন কথা মুখে আনবেন না। প্লিজ" ব্যান্ডোদার কাছে আমাদের কাতর অনুরোধ।

ব্যান্ডোদা কিন্তু ততোক্ষণে আপনমনে গান ধরেছেন : "আমি জেনেশুনে বিষ করিব পান।"

ফোর্থ : ব্যান্ডোদা বললেন, "ঝামেলা না বাড়িয়ে ঝটপট লিখে নে, তাজ বেঙ্গলে আমাদের আজকের এক্সপেরিমেন্টের পরে কী ঘটবে কিছুই ঠিক নেই। স্বদেশে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ দেহ, আকাশ থেকে নাহি খেদ তায়।"

"প্লিজ, ব্যান্ডোদা, এই সব অমঙ্গুলে কথা মুখে আনবেন না। লঙ্কার পরেও আপনার অনেক রিসার্চ বাকি থাকবে। রহস্যময় অম্লরসের ওপরে সুদীর্ঘ কাজ করতে হবে আমাদের।"

ফোর্থ : রসিক লঙ্কাপ্রেমীরা এক এক পদে এক এক রকম লঙ্কা ব্যবহার করেন। যেমন ব্রেকফাস্টের ওমলেটে কারগো পেপার। পাস্তায় কাইন পেপার। মাংসের স্যান্ডউইচে চিপোট্‌লে, স্যালাডে সারভানো। কেবল আইসক্রিমে এখনও পর্যন্ত লঙ্কা মেশানো হয় না।

পাঁচ নম্বর : জ্বর মাপার থার্মোমিটারের মতন লঙ্কার ঝাল মাপার নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে—এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন পার্ক ডেভিস কোম্পানির উইলবার স্কোভিল। এদেশে আমরা সাধারণত যেসব লঙ্কাকে প্রচণ্ড ঝাল বলি-সেগুলির স্কোভিল

৩০০/৩৫০। বেল পেপার-এর স্কোভিল শূন্য। বিখ্যাত ঝাল লঙ্কা জালাপেনো— স্কোভিল ৩৫০০। জাপানি লঙ্কার ঝালও জগদ্বিখ্যাত : কুসাটাকা (১,৫০,০০০ স্কোভিল), বেজায় ঝালের জাপানি লঙ্কা সনটাকা ও হনটাকা। আর বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লঙ্কা হ্যাবানেরো—জন্মস্থান মেক্সিকো। শুনে রাখ এই লঙ্কার ঝাল ৩,৫০,০০০ স্কোভিল!"

"সে তো কেউটে সাপ, ব্যান্ডোদা!" সাড়ে তিন লাখ স্কোভিল শুনে আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার অবস্থা।

আমার মন্তব্যে ব্যান্ডোদা কান দিলেন না। তিনি বললেন, "তোরা শুনে খুশি হবি জার্মানরা এখনও লঙ্কাকে ইন্ডিয়ান পেপার বলে। গুরু গোবিন্দ সিং রসিক সাধক, ঝগড়ুটে মেয়েকে ঝাল লঙ্কা বলতেন, কিন্তু আজকাল সুন্দরী আকর্ষিকা পাঞ্জাবিনীকেও আড়ালে আদর করে ঝাল লঙ্কা বলা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় লঙ্কা থেকে মদ তৈরি করা হয়। সর্বদমনবাবু হয়তো একেই 'ঝালসা' বলবেন।"

সিক্সথ্ : পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু ঝাল খায় তাইল্যান্ডের লোকরা, ইন্ডিয়ার ডবল—আমরা গড়ে খাই দিনে পাঁচ গ্রাম। অর্থাৎ বছরে ১৮ কেজি! কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে মাথাপিছু লঙ্কা লাগে বছরে সাড়ে ছ' কেজি। এই প্রদেশের গুন্টুরকেই লঙ্কার বিশ্ব রাজধানী বলা হয়—কত লঙ্কা যে গুন্টুর থেকে সারা ভারতে এবং সারা বিশ্বে চালান যায় তার ঠিক নেই। ইন্ডিয়ার সবচেয়ে ঝাল লঙ্কার নাম বার্ড আই। এই পক্ষিচক্ষুর স্কোভিল মাত্র একলাখ, অতএব সাবধান।

সেভেন্থ : ইন্ডিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে একই পদে তিনবার লঙ্কা দেবার দুঃসাহস দেখানো হয়—প্রথমে শুকনো লঙ্কা তেলে ভেজে; তার পর বাটা লঙ্কা এবং নামাবার সময় শেষপর্যন্ত কাঁচা লঙ্কা। তবে ইন্ডিয়ানদের বদনাম তারা লঙ্কার সুগন্ধ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। ইন্ডিয়ান খোঁজে ঝাল, আরও ঝাল।

অষ্টম : পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লোক এখন লঙ্কায় আসক্ত হয়েছেন। যেমন গ্রেগরি পেক, স্পেনের রাজা জুয়ান কার্লো এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কিংবদন্তি পুরুষ জুবিন মেটা। জুবিন যেখানেই যান সেখানেই পকেটে লঙ্কা নিয়ে যান। তেল আভিভে এক কনসার্টের সময় আমাদের

অমল নাজ মশাই ওঁকে পাকড়াও করলে জুবিন স্বীকার করলেন, তাঁর দেশলাই বাক্সে তখনও দুটো লাল লঙ্কা রয়েছে। "লঙ্কা ছাড়া মনে হয় যেন হাসপাতালে শুয়ে রোগীর পথ্য খাচ্ছি।" ওঁর ফেভারিট রেস্তোরাঁতেও যখন তিনি যান, নিজের ম্যাচবক্সটি চুপিচুপি এগিয়ে দেন, ওয়েটার সেটি নিয়ে ছোটে কিচেনে, সেখানে চিফ শেফ নিজেই জুবিন মেটার খাবারে লঙ্কা ঢেলে দেন!

জুবিনের বাগানে তিন রকম লঙ্কা গাছের চাষ হয়—জালাপেলো, টাবাস্কো এবং হাঙ্গেরিয়ান চেরি। ওঁর দেখাদেখি চিত্রতারকা গ্রেগরি পেক তাঁর বাগানে লঙ্কা লাগিয়েছেন। জুবিন মেটা বেজায় খুশি—"ভালই হয়েছে। এতো দিন সব ভোজসভায় গ্রেগরি আমার লঙ্কায় ভাগ বসাতো।" ইংলন্ডের রানি একবার জুবিন মেটাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। সেখানে জুবিনের সোনার ছোট্ট বক্স থেকে লঙ্কা বেরিয়ে এলো। ভদ্রতাবশত জুবিন তাঁর লঙ্কার কৌটো রানির দিকে এগিয়ে দিলেন। রানি অবশ্য লঙ্কা নিলেন না, কিন্তু জুবিনের কৌটোটা অন্য অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিলেন। স্পেনের রাজা কার্লো তো একবার জুবিনের বাড়িতে ডিনার খেতে এসে তাঁর লঙ্কা বাগান দেখতে চাইলেন এবং সেখানে গিয়ে পটপট করে লঙ্কা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলতে লাগলেন স্পেনে নিয়ে যাবার জন্যে।

নাইন্‌থ : ব্যান্ডোদা জানালেন, 'ন' নম্বরটা তোদের বলতে হবে। বলিভিয়ার লঙ্কা ইন্ডিয়ায় ব্রেকজার্নি করে শেষপর্যন্ত কীভাবে কারির দৌলতে ইংলন্ডের হৃদয়সিংহাসনে আরোহণ করলো!"

"ব্যান্ডোদা, আমাদের রিসার্চ কমপ্লিট। এর পিছনে ইন্ডিয়া ফেরত ইংরেজ সায়েবদের তেমন কোনও অবদান নেই। ক্লাইভ তো লর্ড হয়ে কবে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সায়েবরা তখনও তো ঝাল তরকারির দিকে তেমন নজর দেননি। লঙ্কার প্রচারে সবচেয়ে বড় বড় কাজগুলো হয়েছে টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে। কিন্তু তার আগে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।"

বিস্তারিত খোঁজ-খবরের জন্যে আমি ছুটেছিলাম বিবেকানন্দ বিশারদ শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের কাছে। ওলাবিবিতলা লেনের বসু নিবাসে বসে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "বিবেকানন্দের আগে লঙ্কা এবং

ভারতীয় রান্নাকে বিদেশে প্রচারের দুঃসাহস কেউ দেখাননি। ইচ্ছে করলে পথ দেখাতে পারতেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিন্তু তিনি যে ঝালানুরাগী ছিলেন এমন কোনও উল্লেখ কোথাও নেই।"

কথা না বাড়িয়ে শঙ্করীবাবু আমাকে ঠেললেন উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে। ওইখানেই সব খবর চমৎকারভাবে পাওয়া গেলো, যদিও শঙ্কর মহারাজ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঠাকুর স্বামীজি সম্বন্ধে এতো সাবজেক্ট থাকতে রাঁধুনি বিবেকানন্দ কেন? আমাকে বোঝাতে হলো, পাইওনিয়ার হিসেবে এই বিষয়েও তাঁর স্বীকৃতি প্রয়োজন। বীরস্বামী বিলেতে পৌঁছবার আনেক আগেই স্বয়ং বিবেকানন্দ যে বিদেশে লঙ্কার পথ খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন ভক্তমণ্ডলীর তা জানার অধিকার আছে।

নির্ধারিত সময়ে ব্যান্ডোদার সুইটে তাজ বেঙ্গলের চা এলো। আমি দুধ না দিয়েই চা খাচ্ছি দেখে ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কী হলো?"

"কিছুই হয়নি। শঙ্কর মহারাজ বলে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ পরামর্শ দিয়েছেন, দুধ দিয়ে চা খাওয়া ঠিক নয়, ওতে পেটের গোলমাল হয়। উনি ছিলেন লেবু-চায়ের সমর্থক।"

তারপর আমার সবিনয় নিবেদন : "ব্যান্ডোদা, বিবেকানন্দ যখন ইংলন্ডে হাজির হয়েছেন তখন পোলাও এবং কারি তো দূরের কথা, সায়েবরা ভাত রাঁধতেও জানতো না। হাঁড়িতে জল দিয়ে তা ফুটিয়ে কাপড়ে চাল বেঁধে ছেড়ে দিতো, তারপর সেদ্ধ হলে পুঁটুলি তুলে নিতো।"

"প্রমাণ?" ব্যান্ডোদার কথায় অবিশ্বাসের সুর।

"নিশ্চয় প্রমাণ আছে, না হলে শঙ্কর মহারাজ আমাকে কিছুতেই বলতেন না।"

বিবেকানন্দর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত পোলাও ও মাংস ভাল রাঁধতেন। স্বামীজির রান্নার প্রবৃত্তি ও নিপুণতা দুই ছিল। কমবয়সেও তিনি উঠতি পেটুকদের সংগঠন 'গ্রিডি ক্লাব' গড়েছিলেন দফায় দফায় রান্না করার জন্যে। এই পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথ দত্তর স্পেশাল আবিষ্কার খিচুড়ি—হাঁসের ডিম ফেটিয়ে চালে মাখিয়ে সেই চাল, কড়াইশুঁটি ও আলু দিয়ে খিচুড়ি। তাঁর মেজোভাই মহিমবাবু লিখে গিয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ লঙ্কা খেতে

ভীষণ ভালবাসতেন, তীব্র ঝাল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মিষ্টান্ন একেবারে পছন্দ করতেন না ; তবে পরবর্তী জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে তাঁকে আইসক্রিমে আসক্ত হতে দেখা গিয়েছে।

এই লঙ্কাপ্রীতি প্রচণ্ড অভাবের সময় বিবেকানন্দকে শক্তি দিয়েছে। রামকৃষ্ণর মৃত্যুর পরে বরানগরে সাধনভজনের সময় প্রবল অনটন। দারিদ্র্য এমনই যে মুষ্টিভিক্ষা করে এনে তাই ফুটিয়ে একটা কাপড়ের ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। একটা বাটিতে থাকতো লবণ ও লঙ্কার জল। একটু ঝালজল মুখে দিয়ে এক এক গ্রাস ভাত উদরস্থ করা হতো।

অনেকদিন পরে প্রয়াগধামে গুরুজি অমূল্য নামে এক বাঙালি সাধুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দর পরিচয় হয়েছিল। একদিন সকলে আহারে বসেছেন। বিবেকানন্দ একটি লঙ্কা চেয়ে নিলেন, অমূল্য তখন দুটি লঙ্কা খেলেন। বিবেকানন্দ হটবার পাত্র নন, তিনি তিনটি লঙ্কা খেলেন। লঙ্কা ভক্ষণ প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দ যে অপরাজেয় তা প্রমাণ করে তবে তিনি ক্ষান্ত হলেন।

বড্ড ঝালের মুখ। একবার হৃষীকেশে এসে তপস্যা ও নিরন্তর অল্পাহারে বিবেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জ্বর কমলে বিবেকানন্দ খিচুড়ি খেতে চাইলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে খিচুড়ি রাঁধলেন তাতে একটু মিছরি দিয়েছিলেন। খেতে বসেই ব্যাপারটা ধরে ফেললেন লঙ্কাভক্ত বিবেকানন্দ। মিষ্টিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। প্রিয় গুরুভাইকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "শালা, তোর একটু আক্কেল নেই।"

একবার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজি, আপনি এতো লঙ্কা খান কেন?"

বিবেকানন্দর উত্তর লঙ্কাপ্রেমীদের জেনে রাখা ভাল : "মশাই, চিরজীবন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর বুড়ো আঙুলের টাকনা দিয়ে ভাত খেয়েছি। লঙ্কাই তো তখন একমাত্র সম্বল ছিল ; ওই লঙ্কাই তো আমার পুরনো বন্ধু ও মিত্র।"

বিদেশে শুধু বেদান্ত নয়, ইন্ডিয়ান রান্না প্রচারের ব্রত যে ছিল তার প্রমাণ বোম্বাই থেকে আমেরিকার জাহাজে চড়বার আগে বিবেকানন্দ চোদ্দ টাকা খরচ করে স্বহস্তে পোলাও রান্না করে সবাইকে খাওয়ালেন, কিন্তু নিজে কিছু খেলেন না। যাঁরা পোলাওয়ের ব্যাপারটা বোঝেন তাঁরা

জানেন মাস্টার রাঁধুনি না হলে পোলাও ম্যানেজ করা যায় না।

আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে খ্যাতির মধ্যগগনে পৌঁছেও ভারতীয় রান্না থেকে স্বামীজি দূরে থাকতে পারছেন না। সুযোগ পেলেই নিমন্ত্রিত অতিথি হয়েও গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়ে তিনি রান্নায় মেতে উঠছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে নানা ধরনের মশলা। সেইসব মশলা বাটবার জন্যে শিল নোড়া পর্যন্ত তিনি জোগাড় করছেন। ভক্তরা মোহিত, কিন্তু লঙ্কার ধাক্কা তাঁরা সবসময় সামাল দিতে পারছেন না।

বেদান্ত ও বিরিয়ানি একই সঙ্গে প্রচার করে চলেছেন বিবেকানন্দ। সেই সঙ্গে বলছেন ভারতের বিচিত্র খাদ্যভাণ্ডারের কথা। রোমের একজন সম্রাট রান্নায় সারাক্ষণ মেতে থাকতেন, তাঁর খাবারের জন্যে আসাম থেকে টিয়া পাখি এবং উত্তর ভারত থেকে ময়ূর পাঠানো হতো। এই পাখির ঘিলু দুধে সেদ্ধ করে তিনি নাকি নিজের প্রিয় ডিশ তৈরি করতেন।

শুনুন এরপর ইংলন্ডপর্ব। স্বামীজি এ জন্মে একশো বছর বাঁচবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ৩৯ বছরেই সব শেষ হয়ে গেলো।

১৮৯৬ সালে ইংলন্ডে ভারতীয় রান্নার কী অবস্থা তা শুনুন। ভাতের কথা তো আগেই বলেছি। কারি রান্না হতো হাড় বাদ দিয়ে মাংসের টুকরো ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে। খুব ফুটোনোর পরে ওরই মধ্যে কারি পাউডার ও লবণ দেওয়া হতো। ঝোল ঘন করবার জন্যে ময়দা গুলে জলে ঢেলে দেওয়া হতো। এই আনাড়ি দৃশ্য স্বামীজির পক্ষে সহ্য করা খুবই কঠিন ছিল, তাই বক্তৃতার মাঝে-মাঝে তিনি সোৎসাহে রান্নার রহস্যময় জগতে প্রবেশ করেছেন।

লঙ্কার বেজায় অভাব তখন লন্ডনে। স্বামীজি সুযোগ পেলেই বলতেন, "চ, রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধি গে, বেশ ঝাল ঝাল আলুচচ্চড়ি বা আলুর দম।" এক সহযোগী বহু কষ্টে উইলিয়াম হোয়াইটের দোকান থেকে তিনটি কাঁচালঙ্কা কিনে আনলেন। একশো বছর আগে সেই ১৮৯৬ সালে সায়েবদের দেশে তিনটে কাঁচালঙ্কার দাম তিন শিলিং যা তখনকার তিন টাকার মতন। বিবেকানন্দ লঙ্কার মোহমায়া সামলাতে পারেন না, সবকটা লঙ্কা খেয়ে ফেললেন।

লন্ডনে একদিন কচুরি ও আলুচচ্চড়ি রেঁধেছিলেন বিবেকানন্দ। কাজের মেয়েটি ভাগ না পেলে রেগে যেতো, বলতো, "ইউ কুকিং সোয়ামি, কেবল খেয়ে খেয়ে মোটা হবে আর আমার জন্যে কিছু রাখবে না।" এবার ওর জন্যে দু'খানা কচুরি ও কিছু চচ্চড়ি রাখা হয়েছে। খুব খুশি হয়ে মেমসায়েব জানতে চাইলো, কি দিয়ে খেতে হয়—চিনি? না নুন? শরৎ মহারাজ স্বামী সারদানন্দ নুনের পরামর্শ দিলেন। এবার চামচে দিয়ে আলুচচ্চড়ি মুখে নিয়ে মিস কেমিরন লাফাতে লাগলেন। প্রবল ঝাল সামলাতে দুই হাতে দুই গাল চড়াতে লাগলেন এবং সন্ন্যাসীদের গাল পাড়তে লাগলেন। "ও ইট্'স পয়জন, ও ইট্'স পয়জন।" একশো বছর আগের সেই ইংরেজ এখন অন্য মানুষ, সে এখন ঝাল কম হলে চটে যায়, কারিতে ঝাল আরও ঝাল এই হলো এ যুগের স্লোগান এবং এই পরিবর্তনে বিবেকানন্দর ভূমিকা অবহেলার যোগ্য নয়।

প্রবাসে বিবেকানন্দর সঙ্গে আমতেলও থাকতো। তা মুখে দিয়ে পরম ভক্ত গুডউইন একবার মুখ বিকৃত করে যা-তা মন্তব্য করতে থাকেন। প্রিয়ভক্ত সান্যালমশাই আমেরিকাতেই বিবেকানন্দকে বেদের সঙ্গে আচার, আমতেল, ডাল, বড়ি ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন। এইসব বিবেকানন্দ অতি সন্তর্পণে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন। গুডউইন ঝাল ও হিং দেওয়া বড়ি খেয়ে মহারেগে বলতেন, "এরকম বদ্ গন্ধওয়ালা জিনিস ভারতের লোকরা খায়!" সায়েবী নাকের এই গন্ধ যে এতো অল্পসময়ে এইভাবে ঘুচে যাবে তা কে জানতো?

এই যে অদম্য উৎসাহে রান্নার প্রচারব্রত তা বিবেকানন্দকেই মানায়। রান্না কখনও মনের মতন না হলে নিজেই বলতেন : "আসলের নকলও ভাল।"

অনেক সময় কেটে গিয়েছে। ব্যান্ডোদা এবার বললেন, "জেনে রাখ, লন্ডনে ১৬১টি ভাষায় কথা বলার লোক আছে। এরই মধ্যে বঙ্গভাষীরা যে রান্নায় সায়েবদের বন্দি করতে পারলো, হিউম্যান হিস্ট্রিতে সে এক মস্ত ঘটনা। এর আদিতেও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রয়েছেন জানলে এ যুগের বাঙালি ছেলেমেয়েরা একটু ভরসা পাবে।"

ঘড়ির দিতে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা সগর্বে ঘোষণা করলেন, এবার দশ

নম্বর আইটেম।

ব্যাভোদা ইন্টারনেটে আমেরিকার গবেষণাগার থেকে লঙ্কার বিভিন্ন গুণাবলি সংগ্রহ করেছেন। তিনি ঝটপট বলে গেলেন, সায়েবরা সাউথ আমেরিকা থেকে লঙ্কা নিয়ে এলেন, কিন্তু নিজেরা ওর ভিতরে ঢুকতে সাহস পেলেন না একমাত্র হাঙ্গেরিয়ানরা ছাড়া। অবজ্ঞাভরে লঙ্কাকে ওঁরা আমাদের ঘাড়ে ডাম্প করলেন, ওঁরা ভাবতেই পারেননি এই লঙ্কা নিয়ে আমরা নতুন এক কাণ্ড করবো। আমাদের দেশে যখন সবে লঙ্কা চাষ শুরু হয়েছে, তখন নিকোলাস কালপেপার বলে এক ভেষজবিজ্ঞানী তাঁর দেশের লোকদের সাবধান করে দিচ্ছেন, "খুব সাবধান। প্রাণধারণের পক্ষে লঙ্কা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।"

যাঁরা লঙ্কাকে সন্দেহ করেন ব্যাভোদা তাঁদের নাম দিয়েছেন মিট-পটাটো সোসাইটি। এঁরা বললেন, লঙ্কা খেলেই স্টমাকের বারোটা বাজবে, আলসার অনিবার্য। এই এতোদিনে মার্কিন ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ফতোয়া দিয়েছেন, মশলাযুক্ত খাবার খাওয়ার সঙ্গে হজম সংক্রান্ত রোগের কোনও যোগাযোগ নেই। বরং দেখা যাচ্ছে লঙ্কার মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার এমন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা পেটের গোলমালে কাজ দেয়। এখন আমেরিকান গৃহচিকিৎসার বইতে লেখা হচ্ছে, হজমি হিসেবে এবং হার্ট অ্যাটাক আটকাবার জন্যে গরম জলে ১/৪ চামচ লঙ্কা মিশিয়ে খাবার পরে নিত্য সেবন করুন। ৬৫ বছরের সিনিয়র সিটিজেন, যাঁরা সহজবোধ্য কারণে জিভে স্বাদ পাচ্ছেন না, যাঁদের জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠছে তাঁরা লঙ্কাভোজনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

আমেরিকান ডাক্তাররা খুব চালাক লোক। আমেরিকান সরকার বলছে, লঙ্কা নিরাপদ। কিন্তু এঁরা বলছেন, নিরাপদ তবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

"আরে বাবা, জীবের মঙ্গলের জন্যে ভগবান অনেক ভেবে-চিন্তে এই লঙ্কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—আহারকে আহার, ওষুধকে ওষুধ। গরিবের যত্তো আজেবাজে খাবার আছে তাকে মুহূর্তে মাতিয়ে দিয়ে ভোজনযোগ্য করবার জন্যেই মর্তভূমিতে লঙ্কার শুভ আবির্ভাব। এবং লঙ্কার বহুমুখী ব্যবহারে আমরা ইন্ডিয়ানরা এই মুহূর্তে সবার আগে।"

এগারো নম্বর পয়েন্ট : মনে রাখতে হবে, অ্যান্টি লঙ্কা লবি এখনও প্রবল উদ্যমে বিশ্বের সর্বত্র ওভারটাইম খেটে চলেছে।

ব্যান্ডোদা বললেন, সাত হাজার বছর ধরে অ্যাপ্রেনটিসশিপ করার পরেও দুনিয়ার সিকিভাগ লোকমাত্র লঙ্কার স্বাদ গ্রহণে উৎসাহী হয়েছে। অর্থাৎ বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঝালের কীর্তন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে পূর্ণ উদ্যমে দেশে দেশান্তরে। ঝালের মধ্য দিয়েই আমাদের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হবে। বিবেকানন্দ সোজাসুজি এই কথাটা কেন যে কোথাও লিখে গেলেন না! তা হলে স্বয়ং রামকৃষ্ণ মিশন মানবমঙ্গলের জন্য এই কাজটা সরাসরি গ্রহণ করতে পারতেন।

এবার দ্বাদশ পয়েন্ট এবং এইটাই আমাদের ঝালকাহিনীর শেষ পর্ব। অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টায় ব্যান্ডোদা নাকি আইটেমটা সংগ্রহ করেছেন। "এবার বন্ধুরা বলেছে, সাক্ষাৎ বিষ, ওই জিনিসটা মেক্সিকো থেকে আনিও না। কিন্তু বঙ্গসন্তান অমল নাগ মশায়ের বিশ্ববিজয়ী ইংরিজি বই পড়ে লঙ্কার হাড়হদ্দ আমার জানা হয়ে গিয়েছে। বিষ আনাতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।"

ব্যান্ডোদার কথাবার্তায় আমি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছি। "বিষ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবেন না, ব্যান্ডোদা। তার আগে পুলিশের লাইসেন্স প্রয়োজন। বিশেষ করে মনে রাখবেন আপনি ফরেন সিটিজেন।"

ব্যান্ডোদা আমার কথা শুনলেন না। বললেন, "একজন বাঙালি লেখকই তো নতুনভাবে দুনিয়াকে জানিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লঙ্কার কথা।"

এবার অতি যত্নে ব্যাগের মধ্য থেকে একটি সোনার বাক্স বার করলেন ব্যান্ডোদা। বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে অনেক কষ্টে তিনটি কাঁচালঙ্কা সংগ্রহ করেছিলেন, তার স্কোভিল কত ছিল তা আমরা জানি না, জানবার উপায়ও ছিল না, কারণ তখনও স্কোভিল আবিষ্কার হয়নি। আজও আমাদের তিনজনের জন্যে মাত্র তিনটি লঙ্কা। আমার এক জাপানি বন্ধু বলেছিল এক লাখ স্কোভিলের কুসাটাকা লঙ্কা তার বাড়িতেই আছে। আমি জন্মসূত্রে ইন্ডিয়ান, আমার নজর এখন সারা বিশ্বে প্রসারিত করতে হবে, আমি সেরাটাই চাই, অর্থাৎ চাই মেক্সিকোর হ্যাবানেরো লঙ্কা যার স্কোভিল অন্তত সাড়ে তিন লাখ।"

"সাড়ে তিন লাখ স্কোভিল! সে তো গোখরো সাপের বিষ, ব্যান্ডোদা।"

স্বর্ণপেটিকা খুলবার আগে শান্তভাবে ব্যান্ডোদা বললেন, "গত রাতে আমি নিজেই এই হ্যাবানেরোর স্কেচ এঁকেছি। যদি শরীর চলে যায় তা হলে এই ছবিটা অন্তত থেকে যাবে।"

ব্যান্ডোদার আঁকা ভেজিটেব্‌ল গোখরোর ছবিটা আমরা দেখলাম। হ্যাবানেরো লঙ্কা স্লিম নয়, বরং একটু নাদুসনুদুসই বলা চলতে পারে।

এবার রহস্যময় স্বর্ণপেটিকা উন্মোচিত হলো। তিনটি হ্যাবানেরো যেন বিষধর সাপের চোখ নিয়ে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে আছে!

প্রফেসর রায় বললেন, "ঈশ্বরের সৃষ্টি! বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, যতক্ষণ না সংস্পর্শে আসা যায়।"

ব্যান্ডোদা জানিয়ে ছিলেন, "আমার এই টেবিলে ভিনিগার রয়েছে এবং রসগোল্লার মোটা রসও রয়েছে। চিত্তরঞ্জনের স্পঞ্জ রসগোল্লা কয়েকটা খেয়ে নিয়ে আমরা স্টমাকের জমি তৈরি করে নিতে পারি।"

রসগোল্লা কয়েকটা খাওয়া হলো। ব্যান্ডোদা এবার মরিয়া হয়ে উঠছেন। কিন্তু আমাদের তিনজনের কোনও উইল নেই। হঠাৎ কিছু ঘটলে বিধবারা অথৈ জলে পড়বেন। তাজ বেঙ্গলের কর্তৃপক্ষও অকারণে বিপদে পড়ে যাবেন, যদি না আমরা তিনজনেই তাজ বেঙ্গলের প্যাডে লিখে যাই—আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে।

কিন্তু এ তো আত্মহত্যা নয়। কোন্ দুঃখে সুইসাইড নোট রেখে বংশের বদনাম করে যাবো? আমরা তো গবেষণার অংশ হিসেবে হ্যাবানেরো আস্বাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গনে উৎসাহী হয়েছি। আমাদের তো ব্যক্তিগত কোনও দুঃখ নেই।

হ্যাবানেরো তিনটি যেন হাসছে। পরম স্নেহময়ী ধরিত্রী—একই মাটিতে পাশাপাশি আমও হচ্ছে হ্যাবানেরোও জন্ম নিচ্ছে। ধন্য তুমি বিশ্বপ্রকৃতি।

আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ উৎসাহী। কিন্তু আমি এখনও বাঁচতে চাই। প্রফেসর রায়ও কিছুদিন বাঁচতে চান। শুধু দলনেতা ব্যান্ডোদা বেঁকে বসেছেন।

অবশেষে প্রফেসর সর্বদমন রায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রুমাল

দিয়ে একটি হ্যাবানেরো তুলে নিলেন। বললেন, "সবাই আপনারা হ্যাবানেরো তুলে নিন। এবার প্রথমে কপালে ঠেকান, বলুন শিবশম্ভু, শিবশম্ভু। ইনিই তো আমাদের সবরকম বিষের দেবতা। সাপুড়েরা সর্পদংশনে আত্মাহুতি দেবার আগে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।"

তারপর হঠাৎ সর্বদমন জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার ব্যান্ডো, মিস্টার মুখুজ্যে, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন কি? না?"

"স্বামীজি লঙ্কা ভালবাসতেন, সারা বিশ্বে তিনি লঙ্কা প্রচার করেছেন, কিন্তু গুন্টুরের বার্ড আই লঙ্কার বেশি তিনি উঠতে পারেননি। জাস্ট ভাবুন, এই হ্যাবানেরো হাতের গোড়ায় পেলে তিনি কত খুশি হতেন। এক্ষেত্রে একশো বছর পরে তাঁর ভক্ত হিসেবে আমাদের কর্তব্য কী?"

ফাঁপরে পড়ে গেলেন ব্যান্ডোদা। মুখে ফেলবার আগে তিনি নিজেও সর্বদমনবাবুর প্রদর্শিত পথে প্রথমে হ্যাবানেরোকে কপালে ঠেকিয়েছিলেন।

সর্বদমন এবার আমাদের ভর্ৎসনা করলেন, "মুখুজ্যেমশাই, বসে আছেন কী! দুষ্প্রাপ্য ফল প্রথমেই পরম পূজনীয়কে নিবেদন করতে হয়, আপনি জানেন না?"

ঈশ্বরের দয়ায় এবং সর্বদমনের উপস্থিত বুদ্ধি নিতে এ-যাত্রায় প্রাণ বাঁচলো। হ্যাবানেরোকে চোখে দেখে কপালে ঠেকালেও শেষপর্যন্ত আস্বাদ করতে হলো না।

আমাদের অবস্থা দেখে ব্যান্ডোদা বললেন, "হ্যাবানেরো আমি বেভারলি হিল্‌স-এই আস্বাদ করবো, এখন বরং বেরিয়ে পড়া যাক। তিনটে লঙ্কা আমরা বিবেকানন্দর জন্মভিটে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ সমাধিতে নিবেদন করে আসি। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, এই লঙ্কা যে স্বামী বিবেকানন্দর ঝালে ঝোলে অম্বলেও স্থান পেতো সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

[গ্রন্থসূত্র
রসবতী]

ঝাল খেয়ে জল খাবেন না

কিছুকাল আগে 'রসবতী' নামে একটা হাল্কা মেজাজের বই লিখেছিলাম। রসবতী শব্দটির অর্থ রাজকীয় রান্নাঘর। টক ঝাল মিষ্টি নোনতা তেতো ইত্যাদি ষড়রসের তাৎপর্য সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। স্বভাবতই প্রধান নজর মিষ্টি ও ঝালের দিকে।

এই দুটি স্বাদের প্রতি আমার পক্ষপাত কেন তা জানতে চেয়েছেন আমার এক সম্পাদক বন্ধু। আমার সবিনয় নিবেদন, এই দুটো বিষয়েই আমাদের এই ভারতভূমি সাফল্যের হিমালয় শিখরে আরোহণ করেছিল। কৌতূহলী সম্পাদক, বিস্তৃত ব্যাখ্যা চাইলেন। আমার নিবেদন: মিষ্টান্নকে প্রাধান্য জানিয়ে আমরা নিজের দেশের নাম করেছিলাম গৌড়—আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই নামের উৎপত্তি 'গুড়' থেকে। কয়েক হাজার বছর ধরে মিষ্টিতে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার ও ব্যুৎপত্তি—পৃথিবীর সেরা আখ যে হুগলী জেলায় উৎপাদিত হতো তা আজ ঐতিহাসিকদের অজানা নয়। এবং স্বভাবতই হুগলীর জনাই অঞ্চল শুধু সন্দেশের জন্মভূমি নয়, সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন শিল্পীদের ধাত্রীভূমিও বটে। আরও মনে করিয়ে দিই সংস্কৃত শর্করা শব্দটি বিদেশে পাড়ি দিয়ে প্রথমে শক্কর এবং পরে সুগারে পরিণত হয়েছে।

"হোয়াট অ্যাবাউট লঙ্কা?" জিজ্ঞেস করলেন সম্পাদক। আমি সরল মনে বললাম, "ঝাল খাওয়াতেও আমরা একনম্বর—বেঁচে থাক বড়দা চট্টগ্রাম এবং তাঁর অনুজ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এটসেটরা! একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে লঙ্কার সবচেয়ে উৎসাহী প্রচারক ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ—বেদান্তর সঙ্গে লঙ্কাকেও তিনি ইংলন্ড ও আমেরিকায় বিপুল উদ্দীপনায় প্রচার করেছেন ; তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আরও একশ বছর পরে প্রচণ্ড ঝালের কারি খোদ ইংরেজদের জাতীয় খানার

স্বীকতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এর পিছনেও রয়েছেন সেই সব কৃতকর্মা বাঙালিরা যাঁদের জন্ম সিলেটে।”

সম্পাদক মিটিমিটি হেসেছিলেন। তিনি ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে জানালেন, “মিষ্টি এবং লঙ্কার মধ্যে তো কয়েক হাজার বছরে দূরত্ব। ইন্ডিয়া তো তিন চার হাজার বছর ঝালের স্বাদ মিটিয়েছে পিপ্পলী এবং গোলমরিচ খেয়ে, তারপর এই সেদিন পর্তুগীজরা এই দেশকে লঙ্কা জিভে ঠেকানোর শিক্ষা দিল—সময়টা সম্রাট শাজাহানের আমলে।”

আমার আঁতে ঘা লাগলো। আমি বললাম, “রামায়ণ নিশ্চয় সম্রাট শাজাহানের আমলে লেখা হয়নি—শ্রীলঙ্কা কথাটি তো আমরা কয়েক হাজার বছর ধরে শুনে আসছি।”

এই সম্পাদক তুখড় মানুষ—কমপিউটর যন্ত্র মারফত নখাগ্রে দুনিয়ার অনেক খবরাখবর রাখেন। তিনি জানালেন, প্রাচীন ভারতে ছোট ছোট দ্বীপকে আদর করে লঙ্কা বলা হতো, যেমন গুরু নানক মুখরা অথচ সুন্দরী মেয়েদের ধানি লঙ্কা বলতেন।

তর্কে প্রায় পরাজিত হবার অবস্থায় আমি বললাম, “যাই বলুন, গুন্টুরের ইন্ডিয়ান লেডি বার্ড জিভে ঠেকালে সায়েবদের মনে হবে জিভে সাপের ছোবল পড়েছে।”

আবার হাসলেন সম্পাদক। সবিনয়ে বললেন, “আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে বলা যায়, ইন্ডিয়ান সাপের তেমন বিষ নেই, যেমন ইন্ডিয়ান ঝালের ঝালত্ব নিতান্তই দুর্বল।”

আমি সারেন্ডার করার পরে সম্পাদকের ঝাল সম্পর্কে বিপুল জ্ঞানের উৎস সন্ধান করা গেল। আমেরিকায় প্রকাশিত লঙ্কা সম্পর্কিত একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তাঁর টেবিলেই শোভা পাচ্ছে। এই বইয়ের লেখক ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল নামক বিশ্ববিখ্যাত সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সাংবাদিক। এই বইটি বগলদাবা করে লঙ্কা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

বউ পড়তে গিয়ে প্রথমেই প্রবল আনন্দ—লেখকের নাম অমল নাজ। আসলে ইনি বঙ্গসন্তান নাগ—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পড়তে গিয়ে নাগ কী করে ‘নাজ’ হল তা সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশাই বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন!

নাজ মশায়ের লঙ্কা সংক্রান্ত গবেষণা একটি মহাভারত বিশেষ! তিনি সবিস্তারে কোন্ দেশের কোন্ লঙ্কার কত ঝাল তা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। জ্বর এবং উত্তাপ মাপার জন্য যেমন বিশেষ পরিমাপ আছে, তেমনি ঝাল মাপার মাত্রা হচ্ছে 'স্কোভিল'। এই মাপটি বিখ্যাত পার্ক ডেডিস কোম্পানির (জেলুসিল!) গবেষণাগারে আবিষ্কার হয় ১৯১২ সালে, আবিষ্কারক ডঃ স্কোভিল। এই মাপ অনুযায়ী লঙ্কার ঝাল ০ থেকে তিন লাখ স্কোভিল। একেবারে শৌখিন লঙ্কার নাম 'বেল' এঁর স্কোভিল দাপট ০। হাঙ্গারিয়ান ইয়েলো : ৪০০০ ; টাবাসকো : ৩০০০০-৫০০০০; মেক্সিকোন টাবিসে : ১০০, ০০০ ; ইন্ডিয়ান লেডি বার্ড : ১০০,০০০; জাপানিজ কুমাতাকা : ১৫০,০০০ এবং সবার উর্ধ্বে মেক্সিকোর রেড সাবিনা হ্যাবানেরো : ২০০,০০০-৩০০,০০০।

সায়েবদের দেশ থেকে প্রকাশিত বই। নতমস্তকে সব তথ্য স্বীকার করে নিতে হয়েছে। আমার স্বাদ-গবেষণার পথপ্রদর্শক এন-আর-আই ব্যান্ডোদার স্নেহধন্য হয়ে তাজ বেঙ্গল হোটেলে আমি এই হ্যাবানেরো দেখেছি ব্যান্ডোদার ব্যক্তিগত সংগ্রহে। পৃথিবীর হটেস্ট লঙ্কা খাবার স্পোর্টিং সুযোগ কীভাবে ব্যান্ডোদা আমাকে দিয়েছিলেন তা আমি সবিস্তারে 'রসবতী' বইতে বর্ণনা করেছি। কিন্তু ওই ঝাল জিভে ঠেকিয়ে সুইসাইড করবার দুর্জয় সাহস আমার হয়নি—সবিনয়ে স্বীকার করে নিয়েছি তথ্য সংগ্রাহক হলেও, নিজেকে গিনিপিগে পরিণত করার মতন বেপরোয়া মনোভাব আমার নেই।

ওই লঙ্কা দেখে ভারতবর্ষের পরাজয় আমি নতমস্তকে মেনে নিয়েছি—বিভিন্ন অলিম্পিকে স্বদেশের ফলাফল দেখার পর, এ আর এমন কি মর্যাদাহানি! শুধু ব্যান্ডোদা শুনিয়ে দিয়েছেন, "ঝালের ঝালত্বের কারণ এই ইন্ডিয়াতেই আবিষ্কার করেছিলেন একজন ইংরেজ সায়েব ১৮৭৭ সালে। এই কেমিক্যালটির নাম ক্যাপসাইসিন—এই কেমিক্যাল মানুষের রক্তে "সাবসটেন্স পি" নামে এক রসায়ন তৈরি করে, যা আমাদের মস্তিষ্কে বিশেষ সিগন্যাল পাঠায়।

শ্রেষ্ঠ ঝাল হিসেবে মাথা ঘুরিয়ে দেয় বলে, হ্যাবনেরোকে ব্যান্ডোদা বাংলা নাম দিয়েছিলেন হাবানেড়ো! নতমস্তকে এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে আমি 'রসবতী' রচনা শেষ করেছি, যদিও মনে মনে ভীষণ দুঃখ

হয়েছিল—ইন্ডিয়ার একটা গোল্ড মেডাল হাতছাড়া হয়ে গেল। মাননীয় সম্পাদকও আমার অবস্থা দেখে মজা পেয়েছিলেন, এবং আমাকে শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে 'টাইট' দেওয়া তাই দিয়েছিলেন। সেই খবর পেয়ে ব্যান্ডোদা বলেছেন, "কী করবি! মায়ের কাছে প্রার্থনা কর—তাঁর দয়া হলে তিনি মুখ চাইবেন।" সেবার বইমেলা উপলক্ষে গৌহাটিতে গিয়ে কামাখ্যা দেবীকে মনে মনে দুঃখের কথা নিবেদন করলাম। "মা, ইন্ডিয়ার লঙ্কার ঝাল নেই তা কেমন করে হয়?"

এরপর সম্প্রতি কী হয়েছে শুনুন। সম্প্রতি কামরূপ কামাখ্যার দেশ তেজপুর থেকে দারুণ একটি খবর বিশ্বময় প্রকাশিত হয়েছে। বহু বছর আগে একবার তেজপুর শহরে পদার্পণ করেছিলাম—ব্রহ্মপুত্র তীরে এই শহরের দূরত্ব গুয়াহাটি থেকে ১১০ কিলোমিটার। এখানে প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি জাঁদরেল গবেষণাকেন্দ্র আছে। এখানকার এক বিজ্ঞানী সম্প্রতি লঙ্কার ঝালত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বিশ্বগৌরব নিশ্চিত করেছেন! তিনি দেখিয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি লঙ্কার স্কোভিল চারলাখের ওপর, তিনলাখ স্কোভিলের হ্যাবানেরো এর কাছে শিশু!

জয় মা কামরূপ কামাক্ষ্যা! চারলাখিয়া লঙ্কার ছবি আমি সংবাদপত্রে দেখেছি, নাম দেওয়া হয়েছে 'নাগ হোলোকিয়া'। দুনিয়ার সেরা এই লঙ্কার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার জন্যে আমাকে ব্যান্ডোদাকে খবর দিতে হবে, প্রয়োজনে আমার বইয়ের একাংশ আবার নতুন করে লিখতে হবে। কিন্তু এই তথ্যের সন্ধান পেয়ে আমার আনন্দের শেষ নেই। আসুন আমরা সবাই বলি, জয় হোলোকিয়া!

এই সঙ্গে মূল্যবান একটি পরামর্শ। হোলোকিয়ার ছোবল খেয়ে ছটফট করতে করতে ঝাল ধুয়ে ফেলার জন্যে ভুলেও কখনও জল খাবেন না। এতে বিপরীত ফল হয়। ঝালের দাপট সামলাবার শ্রেষ্ঠ উপায় দুধ, দই বা আইসক্রিম! হাতের গোড়ায় হোলোকিয়া পাবার সম্ভাবনা থাকলে কাছাকাছি দোকান থেকে আগাম টক বা মিষ্টিদই সংগ্রহ করে নেবেন।

[অপ্রকাশিত]

আমার বাদলকাকু

বাদলকাকুর কথা কোথাও কোথাও একটু বলেছি, কিন্তু এবার তাঁর পুরো গল্পটাই শোনাতে চাই সবাইকে।

কবেকার সেই ছোটবেলাকার কথা, যার প্রায় সবটুকু কতদিন আগে হারিয়ে গিয়েছে চিরদিনের মতন। একটুখানি যা এখনও বেঁচে রয়েছে তাও হারিয়ে যাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে, কোথাও কোনো নথিপত্তর, মর্মরফলক বা স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকবে না, এই পৃথিবীকে বলবার জন্যে যে বিশাল এই মহানগরীর একটা এঁদো অন্ধগলিতে এক অপরিণতবয়স্ক বালকের সঙ্গে এক পরিণতবুদ্ধি মানুষের মধ্যে এমন সখ্যতা জমেছিল যার স্মৃতি সময়ের সমস্ত ভ্রূকুটি এড়িয়ে ষাট বছর পরেও বেঁচে আছে এবং আরও বেঁচে থাকতে চায়।

এখন রাত চারটে। পৃথিবীর অনেক ক্লান্ত মানুষ এখনও গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে, আগামী মধ্যাহ্নের জীবনসংগ্রামের জন্য তাঁদের শরীর বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি টেবলল্যাম্পের আলো জ্বালিয়ে, কাগজ-কলম নিয়ে বসে রয়েছি কিছু লেখার লোভে। বিশ্বসংসারে আমার পছন্দ নয়, আমার সমালোচনার যোগ্য কত ঘটনাই তো ঘটেছে এবং ঘটছে, আমি ভাবছি তাদেরই একটাকে আক্রমণ করবো, সমালোচনা করবো, প্রশ্ন তুলবো কেন এমন হয়, একটু প্রতিবাদ জানাবো, তারপর একসময় লিখে ফেলবো আমার প্রেসক্রিপশন পত্র, কী হওয়া উচিত এবং কেন হওয়া উচিত। বিষয়ের এবং অভিযোগের অভাব নেই, এতোদিন বেঁচে থাকার এই মস্ত এক সুবিধে, কতো লোক যে কতোভাবে কতো অন্যায় করেছে বেঁচে থাকা অবস্থায় তাদের নিরন্তর সমালোচনা করলেও কাজটা শেষ হবে না।

আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, কি অদ্ভুত এই মানবসমাজ। মিলেমিশে একসঙ্গে ঘর না করলেও চলে না, আবার হাতের গোড়ায়

বোকা বোকা দুর্বল দরিদ্র মানুষকে পেয়ে কত অবুঝ মানুষ কতো অন্যায় অবিচার করে গেলো। পরম দোটানার ইতিহাস এই মানুষের সমাজ—এরাই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে চিকিৎসা করে মাথার ওপর ছাদ দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে ; আবার কতো অন্যায় যে এরা মানুষের ওপরে করেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এরাই মানুষকে বন্দিশালার শিকল পরিয়েছে, আবার এরাই গেয়েছে মুক্তির গান ; এরাই উদ্ধত অস্ত্র তাগ করে মানুষকে ভয় দেখিয়েছে, আবার এরাই কানে কানে বলেছে নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার। এই সমাজের ওপর রাগ করে, দুষ্টের মুখোশ খুলে দিয়ে, প্রতিবাদ জানিয়ে এবং কী হওয়া উচিত তা স্পষ্ট করে বলতে বলতেই তো জীবন কেটে যাবে। সময় সীমিত, আমরা তো অনন্তকালের জন্যে এই পৃথিবীতে আসিনি।

কোথায় এই ভোররাতে এই সব বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবো, তারপর বরফের ওপর সিরাপ ছড়িয়ে দেবার মতন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবো, না এইসব বড় বড় এবং কঠিন ব্যাপারে মন বসছে না।

আমার মন চড়ুই পাখির মতন তার ছোট্ট ও দুর্বল পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে আমার ছোটবেলায়, অর্থাৎ হাওড়ায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী লেনের সেই সরু গলিটায় যেখানে প্রবেশ আছে, কিন্তু প্রস্থান নেই। কানাগলির নিয়মই এই, ঢোকার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু সোজা হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই, দেখুন না আমার অবস্থা, প্রায় সাত দশক আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে সেখানে ঢুকেছিলাম, তারপর মহাযুদ্ধ হলো, অ্যাটম বোমা ফাটলো, দেশ খণ্ড খণ্ড হলো, স্বাধীনতার পতাকা উড়লো, আমার শরীরটাও অনেক কসরত করে ওয়াগন থেকে বেরিয়ে এলো, কিন্তু আমি অর্থাৎ আমার মায়ের শংকর এবং বাদলকাকুর শঙ্কুসাহেব ওই গলিতেই পড়ে রইলাম। স্রেফ বেরুনোর রাস্তা নেই বলেই আটকে আছি। এই ভোররাতে আমি নিষ্ঠুর সত্যটা বুঝতে পারছি, এতো কিছু ঘটবার পরে, এতো নগরে, বন্দরে ঘুরে বেড়াবার পরেও আমার মন ঠিকানা বদলাতে পারেনি, আমি পড়ে আছি সেই আঠারো এল বিহারীলাল চক্রবর্তী লেনে জরাজীর্ণ বাড়িটাতে, কারণ কানাগলি মানেই

ঢুকবে কিন্তু বেরুবে না।

এই যে বেরুতে না পারা, তার জন্য ক্ষতি হয়েছে, ঠিকমতন হিসেবপত্তর কষলে হয়তো ভীষণ ক্ষতি হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু বাদলকাকু ? তাঁকে পাওয়ার থেকে বৃহত্তর লাভ আমার জীবনে কী হতে পারতো ?

এক একটা মানুষের জীবনে এমন হয়, অভাগা হয়েও লটারি জিতে ক্রোড়পতির সিংহাসনে বসে যায়। এই তালিকাতেও আমার নামটা লিখে নিন, বিহারী চক্রবর্তী লেনের দুর্ভাগা এক বালক বিনা প্রত্যাশায় এবং বিনা চেষ্টায় পেয়ে গিয়েছিল বাদলচন্দ্র বসু মহাশয়কে, যাঁকে না পেলে আমার জীবনের সব পাওয়াই বৃথা হয়ে যেতো। শুধু পাওয়াগুলোই নয়, আমি নিজেও বোধ হয় বৃথা হয়ে যেতাম, এই এতোদিন পরে ভোররাতে কাগজে-কলমে বিশ্বসংসারকে আমার বলবার মতন কিছুই থাকতো না।

সম্প্রতি এক সিমেন্ট বিক্রেতা ফরাসী কায়দায় বিজ্ঞাপনী আহ্বান জানিয়েছেন, 'আপনার বাড়ি হোক আপনার পরিচয়'। এই স্লোগান নিয়ে উঁচুমহলে প্রতিবাদ উঠেছে। ভোগসুখের এই সমাজে ভোগবাদী সংস্কৃতিই মানুষকে সেই স্তরে নামিয়ে আনতে পারে যেখানে বাড়িই হবে মানুষের পরিচয়। প্রতিবাদের যুক্তি আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু সবিনয়ে নিবেদন করতে পারি, বাড়িই যে মানুষের পরিচয় তা বিশ শতকের তৃতীয় দশকেও নিষ্ঠুরভাবে সত্য ছিল। তখনকার সিমেন্ট কোম্পানিরা তা জেনেও স্তব্ধ ছিলেন অন্য একটি কারণে, তখন মহাযুদ্ধের কল্যাণে সিমেন্ট উধাও খোলাবাজার থেকে। সরকারী অনুগ্রহ ও আর্থিক অনাচার ছাড়াও যে সিমেন্ট সোজাসুজি পাওয়া যেতে পারে তা দেখতে আমাদের প্রজন্মের বহুমানুষেরই সমস্ত জীবনটাই ব্যয় হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবাদীরা এখন ফরাসী বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যাই বলুন, সেই প্রথম বাবা-মায়ের সঙ্গে বনগ্রাম থেকে ইবিআর ট্রেনে চড়ে শিয়ালদহ স্টেশন পৌঁছে সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যখন হাওড়ার এঁদো গলিতে পদার্পণ করলাম তখন বাড়িই আমাদের পরিচয়। সর্পিল গলিটা ছুঁচলো হতে হতে যেখানে প্রায় মানুষের দমবন্ধ করতে চলেছে সেখানেই

১৮/এল নম্বর বাড়িটা এবং ঠিক তারই সামনে ১৮/কে বাড়ি, যেখানে বাদলকাকুর বসবাস। চারদিকে টিনের চালের এবং টালির ছাদের প্রায় আজব স্থাপত্যের বসতি যার নাম বস্তি। বস্তিবাড়ির আশেপাশেই কিছু একতলা অথবা দোতলা পাকাবাড়ি, যার প্রত্যেকটাতেই একাধিক বাসিন্দা যাঁরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় নিজেদের নাম দিয়েছেন ভাড়াটিয়া।

সেই অসম্ভব সময়ে প্রথম পরিচয়েই মানুষ জানতে চাইতো আমি চৌধুরীবাগান বস্তির ভাড়াটিয়া না ঘরভাড়াটিয়া। এই বিশাল জনবসতির অধীশ্বর ছিলেন এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ চক্রবর্তী। আমার মনে আছে, আমার উকিল বাবাকে বাদলকাকু একদিন জিজ্ঞেস করছেন, ইংরিজিতে টেনান্ট ও ঘরভাড়াটিয়া কথার মধ্যে কী পার্থক্য? অনুসন্ধানের কারণ বাড়িওয়ালা নিঃশব্দে তাঁর ছাপানো রসিদ বইতে সব টেনান্টকে ঘরভাড়াটিয়াতে অধঃপতিত করেছেন।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার কালের দূরত্ব পেরিয়ে এখনও স্মৃতির স্লেট থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। যেখানেই যেতাম পাড়ার মধ্যে, সেখানে, প্রথম প্রশ্ন : কোথায় থাকো? যখন পরিষ্কার হয় আমার ঠিকানা বস্তিতে নয় তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন : কার ভাড়াটে? আমি যে ভাড়াটিয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারি না তা অবশ্যই ধরে নেওয়া হতো, শুধু জানার দরকার কার ভাড়াটে? এপাড়ার প্রায় সব ভাড়াটিয়াই বিহারীলাল চক্রবর্তীর। তাঁর নামানুসারে এই গলি। আগে বলা হতো চৌধুরীবাগান, তারপর কিছু ঘটেছে। উপার্জন, কৃতিত্ব অথবা ত্যাগের জোরে অন্য যতসব রাস্তার নাম পরিবর্তন হয়, এখানে তা হয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে, যদিও এই নামকরণের যথার্থতা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন বয়স তখনও আমার হয়নি।

আমার সীমিত জগতে প্রথম বৃহৎ প্রবেশ বাদলচন্দ্র বসুর। বাদল বসু প্রথম দিনেই কেমন করে কাকু হলেন এবং আমি কেন শঙ্কুসায়েব হলাম তা আজও এক অপার বিস্ময় এবং কিছুটা রহস্য। বাদলকাকুর মা ছিলেন আমার ঠাকুমা, বাদলকাকু অকৃতদার।

ছোটবেলা থেকেই আমার মস্ত অসুবিধে, আমি অকালপক্ক, মা যাকে বিরক্ত হলে বলতেন এঁচোড়ে পাকা। এটাও আমি বুঝতাম না, কারণ সেই বয়সেই আমার মনে হতো এঁচোড় পাকলেই তো তার নাম হয়

কাঁঠাল। যতই আপত্তি জানাই, আমার বদঅভ্যাস, প্রিয়জনকে দুম করে এমন একটা প্রশ্ন করা, যা সাময়িকভাবে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে।

এইসব প্রশ্নের দু'একটা নমুনা আপনাদের দিয়ে রাখি। একবার শ্যামপুকুরে আমার বিধবা দিদিমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি আমার মাকে বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছো কেন? আপনজনরা জানেন, আমার পিতৃদেবের ছিল দ্বিতীয় পক্ষ এবং আমার সুন্দরী মায়ের সঙ্গে তাঁর বয়সের ছিল বিপুল পার্থক্য। দিদিমার চোখে জল, উত্তর না দিয়ে তাঁর অনুসন্ধানের অসহায় প্রচেষ্টা, কে আমাকে দিয়ে এই প্রশ্ন করিয়েছে, তাঁর দুঃখিনী কন্যা নিজেই? না পাড়ার কেউ? এতোদিন পরে স্বীকার করেও লাভ নেই, কেউই এই প্রশ্নটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেয়নি। দিদিমা চোখের জল ফেলে মূল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হলেও, এই সমস্যার পটভূমি, আমার দাদুর আর্থিক বিপর্যয়, আমার পিতৃদেবের আকস্মিক স্ত্রী বিয়োগ ইত্যাদি নানা তথ্য পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি, তার মূল্যায়নও করেছি, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে—কারণ বাবা তার দীর্ঘদিন আগেই আটটি নাবালক সন্তানের দায়দায়িত্ব নিঃসম্বল স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করে সেখানে চলে গিয়েছেন যেখানে অর্থ কোনো অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে না, যেখানে কোনো বোকামি অসহ্য ব্যর্থতার জন্য কাউকে তিরস্কার করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বোকামির বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করি। একতলার বাসিন্দা বাদলকাকুদের দুটি ঘর। একটিতে ঠাকুমা তাঁর ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে থাকতেন, আর একটিতে রাত কাটাতেন বাদলকাকু। দেওয়ালে দুটো বিচিত্র মানুষের বাঁধানো ছবি। একজন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণকারী বীর, প্রবল পরাক্রমে যেন কোনো দুর্লঙ্ঘ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করতে চলেছেন। তারই পাশে ফ্রেমে বাঁধানো এক রোগা, ফোকলা, হাঁটুপর্যন্ত কাপড়পরা বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ কোন্ দুঃসাহসে ওই অশ্বারোহী বীরবিক্রমের দিকে তাকিয়ে অমনভাবে হাসতে পারছেন তা বুঝতে পারতাম না। এই দু'জনকে একই সঙ্গে বাদলকাকু কেন তাঁর ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন তাও বুঝতে পারতাম না। পরে জেনেছিলাম এই অশ্বারোহী সায়েবটির নাম নেপোলিয়ন, কোনো এক সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজদের প্রচণ্ড নাকানিচোবানি খাইয়েছেন। কিন্তু ওই ফোগলাটি কিসের জোরে

হাসছেন? আলাপ-আলোচনায় বাদলকাকু আমাকে কখনই বালক মনে করে কম গুরুত্ব দিতেন না। তিনি আমাকে বলতেন, এই লোকটি বিনা অস্ত্রে ইংরেজের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছে। লোকটা যে তখনও বেঁচে আছে জেনে খুব ভরসা হয়েছিল, আর ঘোড়ায়চড়া সায়েবটা অনেক দিন আগে ইংরেজের কাছে হেরে গিয়ে বন্দিদশায় মরে গিয়েছেন জেনে সেই সময় খুব কষ্ট হয়েছিল।

ঘর আছে, ছবি আছে, খাট আছে, কাকু আছে, অথচ কাকিমা নেই। ব্যাপারটা অকালপক্ক বালকের মনে প্রশ্ন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। আমি সন্ধ্যাবেলায় অনেক সময় আলো নিভিয়ে মেঝেতে একটা শিতলপাটি পেতে বাদলকাকুর পাশে শুয়ে থাকতাম। বলাবাহুল্য এই সময়ে আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা হতো—আগেই বলেছি, বাদলকাকুই প্রথম মানুষ যিনি আমাকে কখনও ছোট বলে মনে করতেন না, সর্ব অর্থে আমি ছিলাম তাঁর সমবয়সী বন্ধু। পরবর্তীকালে আমি জেনেছি, যারা ছোটদের মন জয় করতে চায় তারা বয়সের পার্থক্য নস্যাৎ করে কনিষ্ঠদের সমবয়সীর মর্যাদা দেয়, সংসারে সেইটাই শ্রেয়, যদিও আমি নিজে সেই কাজে কখনও তেমন সফল হইনি। তাই বয়সকালে কনিষ্ঠদের পরমপ্রিয় হয়ে ওঠার দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি আমার নিজেরই দোষে।

বাদলকাকুর মতন মানুষকে আমার প্রশ্ন করার দুঃসাহস হলো : "কাকু আপনার বউ কবে আসবে?"

বাদলকাকু প্রথমে একটু আচমকা ধাক্কা খেলেও সামলে নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে চাইলেন। আমাকে বোঝালেন, কাকিমারা ভীষণ কষ্ট দেয় ঠাকুমাদের। ঠাকুমা অত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না, তাই কাকিমা আনা হয়নি।

ব্যাপারটা আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে, যদি কেউ আমার ঠাকুমাকে কষ্ট দেয় তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় এবিষয়ে আমিও একমত।

সমস্যাটা হয়েছিল পরের দিন। ঠাকুমা একান্তে আমাকে ডেকে অভিযোগ করলেন, "তুমি কী বলেছো বাদলকে? আমি কী বলেছি তোমাকে?" ব্যাপারটা বুঝলাম, পুরো দোষটা ঠাকুমার ঘাড়ে চেপেছে;

বাদলকাকুর আশঙ্কা প্রশ্নটা নিশ্চয় আমার মনগড়া নয়, কেউ আমাকে দিয়ে কথাটা তুলিয়েছে। ঠাকুমার উভয়সঙ্কট। আমাকে বলেন, "বে'র কথা ওকে কখনও জিজ্ঞেস করবে না।" আমি এর পরে কখনও সে প্রশ্ন তুলিনি, তবে যথাসময়ে শুনেছি, পাছে বিধবা মা ও পিতৃহীন ছোটভাইয়ের কোনোরকম আর্থিক কষ্ট হয় এই আশঙ্কায় বাদলকাকু চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সেই কঠিন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। যদিও পরবর্তী সময়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল যখন ছোটভাই প্রায় বিদ্রোহ করে দাদাকে অগ্রাহ্য করে অপমান করে সংসার থেকে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো অন্য কাহিনী, তার জন্যে আজকের এই লেখা নয়।

বাদলকাকুর ছিল নিয়মবাঁধা জীবন, যার মূল্য অথবা তাৎপর্য চোখে দেখলেও তখনই মাথায় ঢোকেনি। খুব ভোরবেলায় বাদলকাকু উঠতেন, তারপর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে অপেক্ষা করতেন আমার জন্যে। আমিই তখন তাঁর প্রিয় বন্ধু—আগেই বলেছি এই বন্ধুত্বের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল সমবয়সীর স্বীকৃতিতে, যদিও আমাদের মধ্যে অন্তত তিন দশকের দূরত্ব! বাদলকাকুর সঙ্গে যখন ভোরবেলায় আমার দেখা হতো তখন নিমডালের দাঁতনে তাঁর দাঁত পরিষ্কার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাদলকাকু টুথব্রাশে বিশ্বাস করতেন না, প্রতিদিন রাত্রে একটি নিমের কাঠি বালতির জলে ফেলে রাখতেন। একবার তিনি যে একবান্ডিল নিমদাঁতন গোপনে ইংরেজ সায়েবকে উপহার দিয়েছিলেন তা আমি জানতাম। প্রচেষ্টা কেন সফল হয়নি, তাও আমার জানা। সায়েব বলেছিলেন, "বোস, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা সস্ত্রীক চেষ্টাও করেছি, কিন্তু অত্যন্ত তেতো, দিনের শুরুটাই তিক্ত হয়ে উঠুক তা আমরা চাই না।"

আমিও সায়েবের সঙ্গে একমত। বাদলকাকু সায়েবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, একটা মাস ধৈর্য ধরতে, "তাহলেই তিতো ঘুচে যাবে!" সায়েব পারেননি। বাদলকাকুর ধারণা এযুগের ইংরেজ সায়েবরা বড্ড সুখী। কোনোরকম ধৈর্য নেই, তাই নেপোলিয়নের কাছে হারতে বসেছিল, এবার হিটলারের হাতে কী হাল হবে তা ভগবানই জানেন। বলাবাহুল্য, যে সময়ের কথা বলছি তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা

বেজে চলেছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলে রাখি। বাদলকাকু একদিন সগর্বে জানালেন, যুদ্ধের দৌলতে আলপিন উধাও হয়েছে বাজার থেকে। কিন্তু কাকুর বুদ্ধিতে সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়েছে—অফিসের জন্যে তিনি যত্নের সঙ্গে বাবলাগাছের কাঁটা সংগ্রহ করেছেন। অনুসন্ধিৎসুরা জেনে রাখুন, এই বাবলা গাছের কাঁটা বেশ কয়েক বছর ধরে যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় আলপিনের ভূমিকা পালন করেছিল, যেমন বাদলকাকুর ইংরেজ সায়েব প্রায় পাঁচ বছর মোটরগাড়ির পরিবর্তে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন পেট্রোল ও টায়ারের অনটন মুলাকাত করতে। আমরা তখনও টুথব্রাশের যুগে আসতে পারিনি, কয়লা উনুন থেকে যে ঘুঁটের ছাই বেরুতো তাই মিহি করে গুঁড়ো করে মা রেখে দিতেন একটা মাটির ধুনুচিতে। প্রশ্ন উঠতে পারে কৌটো নয় কেন? অনুসন্ধিৎসুদের আবার জানাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে সব টিনের কৌটো তখন যুদ্ধযাত্রা করেছিল।

বাদলকাকুর আশা ছিল পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাঁর ইংরেজ সায়েব টুথব্রাশ-টুথপেস্ট ছাড়তে বাধ্য হবেন, কেননা টুথপেস্টের আধার যা তখনকার দিনে পাতলা অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি হতো তাও যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। বাদলকাকুর আশা পূর্ণ হয়নি, তাঁর সায়েব যে করেই হোক বেঙ্গল ক্লাবের স্টোর থেকে টুথপেস্ট সংগ্রহ করতেন, তবে কম পেস্টেও যে চমৎকারভাবে দাঁত মেজে টুথপেস্টের জীবনকাল ডবল করা যায় তা আবিষ্কার করে সাহেব উল্লসিত হয়েছিলেন।

আমার বাবা যেহেতু হাওড়া জেলা কোর্টে ওকালতি করতে যেতেন আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, পৃথিবীর সব লোকই বোধহয় খাওয়া-দাওয়া করে ওকালতি করতে যায় বিভিন্ন কোর্টে।

অফিস এবং চাকরি কথাটা আমি বাদলকাকুর কাছেই প্রথম শুনি। নিমদাঁতন সেরেই, কাঠিটা চিরে নিয়ে জিভছোলা হিসেবে ব্যবহার করতেন বাদলকাকু এবং জিভছোলা ছাড়া প্রভাতী দন্তসেবা যে অসম্পূর্ণ তা আমাকে ধৈর্য সহকারে বোঝাতেন। তারপর দ্রুতগতিতে গঙ্গায় গমন যার দূরত্ব অন্তত দু'মাইল। যন্ত্রবৎ ফিরে এসে 'পেটপুজো' করেই বাদলকাকু রঙিন ফুলশার্ট ও ধুতি পরে ছুটতেন অফিসে। অবশ্যই

পদযাত্রা—যার অর্থ আরও তিন মাইল, হাওড়া স্টেশন পেরিয়ে নদী অতিক্রম করে ক্লাইভসায়েবের নামাঙ্কিত রাস্তা ধরে আর এক ক্লাইভ রোতে পদার্পণ। এই পদযাত্রায় কোনো কষ্ট না হওয়ার যে রহস্য বাদলকাকু কানে কানে বলেছিলেন তা আজও বিজ্ঞাপন জগতের দিকপালদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমার কানে কানে তিনি বলতেন, "ফ্লেক্সের জুতো, এই জুতো পরলে শত ক্রোশ পথকেও নাকি বাড়ির পাশেই বলে মনে হয়।"

বাদলকাকু আরও মজার কথা বলতেন, "ফ্লেক্সের জুতো যেকোনো দোকান থেকে কিনলে এই বিশেষ গুণ পাওয়া যায় না, কিনতে হবে লাটসায়েবের বাড়ির সামনে কাথবার্টসন হারপার কোম্পানি থেকে। স্বয়ং বড়লাটের পায়ের জুতো সরবরাহের গোপন দায়িত্ব নাকি এই প্রতিষ্ঠানের। আরও একটা মজার কথা বলে রাখি। ফ্লেক্সের জুতো কিনেই বাদলকাকু পরতেন না, প্রথমেই মুচি ডেকে নতুন জুতোয় হাফসোল লাগিয়ে নিতেন। এই অদ্ভুত আচরণের যথেষ্ট অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল—জুতোর তলাটা কখনও ক্ষইবে না।

একবার বাদলকাকু আমাকেও একজোড়া সায়েববাড়ির জুতো উপহার দিয়েছিলেন এবং বলাবাহুল্য নতুন অবস্থাতেই হাফসোল লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এই জুতোয় টলটলায়মান হওয়ায় এবং তা ইস্কুলের সহপাঠীদের নজরে পড়ে যাওয়ায় আমাকে বেশ ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু হাসাহাসি হলে কী হবে, বাদলকাকুর সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে আমি আজও বিশ্বাস করি ফ্লেক্স জুতোকে দীর্ঘায়ু করার যে বৈজ্ঞানিক পথ তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তার মধ্যে হাস্যকর কিছুই নেই।

চাকরি এবং অফিস এই দুটো শব্দই আমার কাছে এক সময় রহস্যময় ছিল। আমাকে নিয়ে বাদলকাকু বেশ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "চাকর কথাটা আত্মসম্মানে লাগে, তাই সবাই সার্ভিস বলে। তোমাদের কালিন্দি চাকর কী করে?" বাদলকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"বাবা মা যা অর্ডার করেন তাই করে।" আমার উত্তর।

বাদলকাকু বুঝিয়ে দিলেন, অফিস নামক জায়গায় বড়সায়েব

মেজসায়েব সেজসায়েব ছোটসায়েব বড়বাবু মেজবাবু যা নির্দেশ দেন তাই মানুষে করে ; তিরিশ দিন এইভাবে সায়েবদের কথা শুনলে সায়েবরা মাইনে দেন, সেই মাইনে বাড়িতে এনে মাকে দিলে তিনি পরের তিরিশ দিন খরচাপাতি করেন। যাদের কিছু বাঁচে তারা পোস্টাপিসে খাতা খুলে জমায় অথবা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে ফেলে।

"আর যাদের কিছু বাঁচে না?" অকালপক্ক আমার প্রশ্নের এবং কৌতূহলের শেষ নেই।

"ধার করে তারা", এবং ধারের রহস্যটা আমি বাদলকাকুর কাছেই প্রথম শুনি। বাগনান থেকে প্রথম কলকাতায় এসে অভাবী বাদলকাকু প্রথমে মায়ের গহনা বন্ধক রেখে ধার করেছিলেন, শোধ করতে দেরি হওয়ায় সেই গহনা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এবং সে দুঃখ বাদলকাকু সমস্ত জীবন ধরে ভুলতে পারেননি। খুব ভেবেচিন্তে বাদলকাকু খরচ করতেন এবং আমাকে বলতেন, উপার্জন না করে কখনও ব্যয় করবে না। ধার করবে না কিছুতেই, কারণ ধার বাচ্চা পাড়ে, তার নাম সুদ এবং এই সুদ ব্যাঙের বাচ্চার মতন হুড় হুড় করে বেড়ে যায় এবং কারুর কথা না শুনে চারদিকে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়ায়।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও ঋণ সম্পর্কে বাদলকাকুর সেই শিক্ষার কথা মনে পড়ে যায়, যদিও বুঝি মানুষ শখ করে ধার করে না, বাধ্য হয়েই ধার করে, যেমন আমার মা কয়েকবার ধার করেছিলেন বাড়িতে চাল ছিল না বলে। বাবার তখন মৃত্যু হয়েছে—মায়েরও একটা সোনার হার ছিল। সেটা গেলো। আর উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। বহুকাল পরে প্রথম বইয়ের কিছু টাকা থেকে একটা সোনার হার গড়িয়েছিলাম মায়ের জন্যে। কিন্তু সেই হারটা বন্ধকী দোকানে যাবজ্জীবন বন্দী থাকার পরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া হারের তুলনায় কিছু নয়।

চাকর থেকেই যে চাকরি এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি বাদলকাকুর দয়ায় অত্যন্ত অল্প বয়সেই মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। বাদলকাকু আরও মজার কথা বলতেন। দুনিয়ায় যে যেখানে আছে তারা সবাই তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায়ের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু উপার্জনের উৎস মাত্র একটা। তাই দাঁড়িপাল্লার একদিকে বিশ্বসংসার আর অন্য পাল্লায় কাজকে রেখে ওজন করা শিখতে হবে। বাদলকাকু নিজেও তাই করতেন, ঝড় জল যাই

হোক তিনি অফিসের কাজে বেরোবেনই। তাঁর প্রিয় শ্লোক : ইমারতির মেরামতি, জমিদারির মালগুজুরি, আর চাকরির হাজরি।

ওকালতি পেশার দৌলতে বাবা খড়িয়াপ বসু জমিদারি এস্টেটের রিসিভার ছিলেন, তাই জমিদারির ভিতরের ব্যাপারগুলো আমার ডালভাত ছিল নিতান্ত অপরিণত বয়সে। জরাজীর্ণ ভাড়াটিয়া বাড়িতে মেরামতির কী ভূমিকা তা বিহারী চক্রবর্তী লেনের বাসিন্দা হিসেবেও আমার অজানা থাকার কথা নয়। যা বাদলকাকুর কাছে শুনে এবং তাঁকে নিত্য লক্ষ্য করে শিখে গেলাম তা হলো চাকরিতে হাজরির প্রয়োজনীয়তা। শুধু প্রতিদিনের উপস্থিতি নয়, সময়মতো উপস্থিতির জন্য বসুপরিবারের প্রাত্যহিক সংগ্রাম। সেই ভোরবেলায় উঠে ঠাকুমার উনুনে আঁচ ধরানো, রান্না চড়ানো, আর বাদলকাকুর গঙ্গাস্নান, তারপর ঘড়ির কাঁটা ধরে ডালহৌসি পাড়ায় কালামাজু কোম্পানিতে হাজিরা দেওয়া।

সময়ের সঙ্গে হাতাহাতি করে নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই সর্বত্র উপস্থিত হওয়ার শিক্ষাটা নিজের অজান্তেই বাদলকাকু আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বাদলকাকু আরও একটা মজা করতেন। একখানা মোটা ইংরিজি অভিধান পাশে নিয়ে বাদলকাকু মন দিয়ে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করতেন। কিন্তু এই পাঠের আসর বসতো বিকেলে, অফিস থেকে ফিরবার পরে। বিকেলেও হেঁটে অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেন বাদলকাকু। প্রথমেই জামাকাপড় ছেড়ে গামছা পরে ফ্লেক্সের জুতোটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পরের দিনের জন্যে প্রস্তুত করে রাখতেন। বলতেন, যারা বলে জুতো জুতোর মতন থাকবে, তদ্বির তদারকির দরকার নেই তারা মস্ত ভুল করে। এই জুতোই হলো আমাদের সিপাইকা ঘোড়া, সায়েবরা জুতো দেখেই মানুষকে বিচার করে।

বাদলকাকুর অফিসের বড়কর্তা লিভিংস্টোন সায়েবকে দেখার বহু আগেই আমি তাঁকে ভীষণভাবে জেনে গিয়েছি, তিনি সারাদিন কর্মসূত্রে কী করেন, কবে কোন রঙের জামা পরছেন তিনি, কখন কাকে কী বলছেন, লাঞ্চে কী খাচ্ছেন, এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের খেলা থাকলে বিকেলে কটার সময় থেকে তিনি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন এসব আমার কণ্ঠস্থ। লিভিংস্টোন সায়েবের কথা বাদলকাকুর কাছে

অমৃতসমান, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমি যা বিবরণ প্রত্যহ শুনেছি এবং কালের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও এখনও যা মনে আছে তা দিয়ে আমি ব্রিটেনের বিংশশতকের বিদেশবাণিজ্যের একখানা মহাভারত লিখে ফেলতে পারি।

বাদলকাকুর সঙ্গে মিশে মিশে অনেক বৈপরীত্যের সঙ্গে ঘর করতে শিখেছি তাদের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা আছে তা মনকে তেমন বিচলিত করেনি। বাণিজ্যে বৃটিশরাই যে বিশ্বের সেরা এবং বাদলকাকুর কালামাজু কোম্পানির লুজলিফ বাইন্ডারই যে পৃথিবীর সেরা এ-বিষয়ে বাদলকাকুর ও আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই খাতা আবিষ্কার, যা বাঁধানো অথচ ইচ্ছামতন এবং প্রয়োজন মতন বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনাসম্পন্ন, যে মানবসমাজের এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন সে সম্বন্ধেও বাদলকাকু ও আমি নিঃসন্দেহ। জয় হোক সায়েববাড়ির, সেই সঙ্গে লিভিংস্টোন সায়েব শতায়ু হোন—তা আমরা মনেপ্রাণে চাইতাম।

তাহলে ওই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও মহাত্মা গান্ধীর ছবি কেন? এঁরা তো ইংরেজ তাড়ানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

লিভিংস্টোন সায়েবের অন্ধভক্ত হয়ে বাদলকাকু বৃটিশ হিস্ট্রির যে বিচিত্র ব্যাখ্যা ফেঁদেছিলেন তার তাৎপর্য তখন বুঝিনি। সেই দুঃসময়েও বাদলকাকু বিশ্বাস করতেন, মহাত্মা গান্ধী ও লিভিংস্টোন সায়েব একইসঙ্গে আমাদের দেশে সহঅবস্থান করবেন। আমার ভয় হতো মহাত্মা গান্ধী রাজা হলে ইংরেজকে প্রথমেই তাড়াবেন, এদেশে লিভিংস্টোন সায়েবের থাকা চলবে না, এবং বোধহয় সেইজন্যেই লিভিংস্টোন সায়েব বিলেতে তাঁর বাড়িটাকে সারাক্ষণ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন।

আমি ও বাদলকাকু জনস্রোত থেকে একটু আলাদা হয়ে পড়েছি। আমরা লিভিংস্টোন সায়েব এবং গান্ধী মহারাজ দু'জনেরই জয় চাইছি, আমরা চাইছি এঁরা দু'জনেই একইসঙ্গে সুখে থাকুন। কেমন করে তা সম্ভব হবে, স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। বাদলকাকু তাঁর বিশ্বইতিহাসের ব্যাখ্যা করার জন্যে একমাত্র আমাকেই শ্রোতা নির্বাচন করেছিলেন, আমি মন দিয়ে শুনে যেতাম, বাদলকাকু যে একদম ভুল করতে পারেন না, এবিষয়ে আমার মনের কোথাও তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আমি ভয় পেতাম, মহাত্মা গান্ধী জেতার পরে যদি তিনি লিভিংস্টোন

সায়েবকে তাড়িয়ে দেন তা হলে কী ভীষণ কাণ্ড ঘটবে? সন্ধ্যার স্নান সেরে বাদলকাকু তাঁর শীতলপাটিতে বসে আমাকে আশ্বস্ত করতেন, এদেশের রাজা হওয়ার আগে ইংরেজ এখানে ব্যবসা করেছে মনের আনন্দে। বিজনেসটা আমাদের শিখতে হবে সায়েবদের কাছ থেকে। ইংরেজের মস্ত ভুল হয়েছে দোকানদাবি ছেড়ে সিংহাসনে বসে পড়া, দুটো এক জিনিস নয়, একজনের পক্ষে দুটো কাজ করাও সম্ভব নয়, ফলে ইংরেজ ব্যবসাকে অবহেলা করছে।

এই গুরুতর প্রশ্নের ব্যাপাবে লিভিংস্টোন সায়েবেব সঙ্গে স্টেনোটাইপিস্ট বাদলকাকুর কোনো একান্ত আলোচনা হয়নি তা আমি ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু আশঙ্কা হলো, প্রকাশ্যে না বললেও, কথায় কথায় সম্মানিত লোককে জেলে পোরার বৃটিশনীতি লিভিংস্টোন সায়েবের পছন্দ নয়।

তারপর হঠাৎ অন্য কথা বললেন বাদলকাকু একদিন অফিস থেকে ফিরে। "গান্ধী নিজেই তো একজন বেনিয়া। একটাই চিন্তার ব্যাপার—একজন বেনিয়ার কাছ থেকে আরেজন বেনিয়া ক্ষমতা নিযে নেবার চেষ্টা চালাচ্ছে ; অথচ রাজা হওয়াটা বেনিয়াদের কাজ নয।" এই ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনেক ভেবেছেন বাদলকাকু, তন্ন তন্ন কবে দ্য স্টেটসম্যানের প্রতি লাইন পড়েছেন, শব্দ সম্পর্কে সন্দেহ হলেই চেম্বার্সের ইংরিজি অভিধান খুলেছেন। তারপর শান্ত হয়ে উঠেছেন বাদলকাকু, গান্ধী মহারাজের প্রতি তাঁর সমর্থন ফিরিয়ে নেননি।

আজ এতোদিন পরে জীবনের সব পর্ব কাটিয়ে শেষ পর্বে দাঁড়িয়েও বাদলকাকুর কথাটা মনে পড়ে যায়, রাজা হওয়াটা বেনিয়ার কাজ নয়। মানদণ্ড যখনই রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছে তখনই গোলমাল বেধেছে এই পৃথিবীতে,ওজন দাঁড়ি ছেড়ে ব্যবসায়ী অন্য কিছুতে মন দিলেই সৃষ্টি হয়েছে দুর্যোগের।

আরও একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর বাদলকাকু বেঁচে থাকলে আমাকে দিতে পারতেন। রাজদণ্ড যখন স্বেচ্ছায় আবার মানদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে দুনিয়ার হাটে ফেরিওয়ালা হতে চায় তখনও ফল ভাল হয় কি? আমি শিল্পবাণিজ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা বলছি—রাজা যখন সিংহাসনে বসে দোকানদারি শুরু করেন তখনই যে সব দুঃখের অবসান

হয় না, বরং সমস্যা বহু গুণ বেড়ে যায় তা হাড়ে হাড়ে বুঝতেও মানবসমাজের লেগে গেল পুরো একটা শতাব্দীর অর্ধেক সময়।

সেই ছোটবেলায় কালামাজু অফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেতে খেতে অফিস সম্পর্কে বাদলকাকু আমাকে যে ধারাবিবরণী দিয়ে যেতেন তার থেকে আমি বুঝেছিলাম ব্যবসা চালানো ভীষণ শক্ত ব্যাপার, রাজ্যচালানোর থেকে সেটা কোনো অংশেই কম কঠিন নয়। লিভিংস্টোন সায়েবের খুব কাছে কাছে থেকে, অফিসের চিঠিপত্র নিত্য টাইপ করে বাদলকাকুর ধারণা হয়েছিল ব্যবসায়ে ইংরেজ তুলনাহীন, তার নখের যোগ্য কেউ নয়।

আমার সমবয়সী মানুষদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমারু বিমানের আশঙ্কায় এ-আর-পি নামক এক শক্তির উদ্ভব হয়েছিল আমাদের এই কলকাতা শহরে, যার আভ্যন্তরীণ অর্থ : এয়ার রেড প্রিকশন অর্থাৎ আকাশ পথ থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বিশেষ ধরনের উর্দি অথবা ইউনিফর্মপরা এইসব স্থানীয় সভ্যদের সদম্ভ আচরণ সব সময় জনতার সমর্থন অর্জন করেনি। বাদলকাকু নিজেই একদিন শঙ্কিত হয়ে আমার কাছে শুনলেন, পাড়ার ছোঁড়ারা এ-আর-পি'র নতুন ভাষ্য প্রণয়ন করেছে 'এবার-রণে-পরাজয়', ইংরেজের নিজের হাতে গড়া আধা রণবাহিনীর এই নামকরণ যে লিভিংস্টোন সায়েবের দুঃখের ও দুশ্চিন্তার কারণ হবে তা জেনেও বাদলকাকু এই খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার নৈতিক দায়িত্ব বোধ করেছেন।

নামে বিশ্বযুদ্ধ, কিন্তু আমাদের কাছে ইংরেজ ভারসাস জার্মান ফাটাফাটি, দু'জনের বন্ধুবান্ধব অনেক আছেন, কিন্তু আমরা কেন এরজন্যে দণ্ড দিচ্ছি তা অনেকেই বুঝতে পারতো না। বয়সের তুলনায় পাকা হলেও ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারতাম না, বয়োজ্যেষ্ঠদের আলোচনা দূর থেকে কানখাড়া করে শোনা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না আমার। বাদলকাকুর দুশ্চিন্তা ইংরেজ ও আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ইংরেজ না জিতলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার একথা সত্য, কিন্তু যে দেশ স্বাধীন নয় সে রাজাবদল নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবে কেন? সে কেন চেনা মনিবকে বাঁচানোর জন্যে নিজের রক্ত দিতে রণাঙ্গণে যাবে?

বাদলকাকুর দুঃখ শাসক ইংরেজ বোকামি করছে, ওঁদের উচিত ছিল ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দিয়ে, গান্ধীকে দলে টেনে নেওয়া। গান্ধীর মতন মানুষকে অবিশ্বাস করছে যে ইংরেজ সে ইংরেজ যে বোকা সে সম্বন্ধে বাদলকাকুর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এ-আর-পি বাহিনীর ওপর সাধারণ মানুষের বীতরাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যারা এতোদিন বেকার অবস্থায় রকে আড্ডা দিতো তারাই এখন ইউনিফর্ম ও ঝকঝকে জুতো পরে পাড়ার মাঠে সময়ে অসময়ে ড্রিল করছে, দোকানে গিয়ে মনের সুখে চপকাটলেট খাচ্ছে, বিভিন্ন সাইজের নতুন বালতি বিনামূল্যে সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে সাজিয়ে রাখছে। অথচ খোলাবাজার থেকে বালতি উধাও, নতুন একটা বালতি কিনে বাড়িতে একটু জল জমিয়ে রাখার উপায় নেই সাধারণ গৃহস্থর। এ-আর-পি-রা তখন কম দামে চাল ডাল তেল উপভোগ করছে, তারা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আকাশপথ শত্রুপক্ষ মাটিতে নেমে এলে তারাই প্রাণটা বিসর্জন দেবে এবং সেজন্য জীবনের কাছে কটা দিনের কোনো সুখই বেশি সুখ নয় একথাই ইংরেজের মনে রাখা অবশ্যকর্তব্য।

পাড়ার লোকদের কিন্তু অন্যরকম ধারণা। যতই এরা পাড়ার মাঠে ঝকঝকে জামাপ্যান্ট পরে সামরিক কায়দায় ড্রিল করুক—ঘাস-বিচালি-ঘাস—শত্রুপক্ষ হাজির হলেই এ-আর-পি-র মানে হবে এবার-রণে-পলায়ন! এদের নিয়েই তখন আমাদের পাড়ায় গোপন ছড়া—সাজো সাজো সৈন্যগণ ডাল ভাত খাইয়া/রণের সম্মুখে দাও বমি করিয়া/দুর্গন্ধে পালাইয়া যাইবে শত্রুগণ।

এই কবিতাও যে লিভিংস্টোন সায়েবের মর্মবেদনার কারণ হবে তা বাদলকাকু বুঝতেন এবং নিজেও কিছুটা দুঃখ পেতেন।

সে এক বিচিত্র সময়। জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর অভাব। চাল নেই, ডাল নেই, কেরোসিন তেল নেই। লেখার কাগজও নেই, আমরা নতুন করে স্লেট পেনসিল কিনে লেখা অভ্যাস করছি। যুদ্ধ মানে তো গোলাগুলির বিনিময়, সেখানে কেন কাগজ লাগবে তা আমরা বুঝতে পারতাম না। বাদলকাকু আমাকে বোঝাতেন স্টেটসম্যান পত্রিকায় যা লেখা হচ্ছে, কিন্তু নিজেও ব্যাপারটা পুরো বুঝতেন না।

দুঃসময়ের স্মৃতিও মানুষ বোধহয় যথা শীঘ্র ভুলতে চায়। নাহলে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েকবছর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কোন্‌স্তরে নেমে এসেছিল তা আমরা সবাই ভুলে গেলাম কেমন করে?

নতুন প্রজন্মের বাঙালিরা জেনে রাখুন, তখন ভেতো বাঙালি প্রথম বাধ্য হলো আটার রুটি খেতে। সেই প্রথম কয়েক শতাব্দীর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে বাঙালির রান্নাঘরে আটার প্রবেশ। কিন্তু সেই আটারও পরিমাণ মাপা—কেউ পাউরুটি কিনতে গেলেও রেশনে প্রাপ্য আটার পরিমাণ কমে যেতো। শুধু চাল গম চিনি কেরোসিন নয় মানুষের কাপড় নিয়েও টানাটানি, রেশন কার্ডের তলায় যে কুপন ছাপা থাকতো তাই জমা দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে কাপড় সংগ্রহ করতে হতো। যার অর্থ ইচ্ছে করলেই অগুনতি শার্ট প্যান্ট ধুতি অথবা ব্লাউজ শাড়ি সম্ভব নয়। অনেকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় গামছা পরে সময় কাটাতেন। এই অবস্থার উপর তেমন আলোকপাত হতো না এই জন্যে যে বিদ্যুৎবাতি নিভিয়ে রাখা হতো সন্ধ্যাবেলায়। বিদ্যুতের অভাবে লোডশেডিং নয়, ব্ল্যাকহোল সিটিতে তখন ব্ল্যাকআউটের যুগ—রাস্তার আলো নিভলো, ঘরের আলোয় ঠুলি পরানো হলো, সীমিত সেই আলোও যাতে বাইরে না এসে পড়ে তারজন্যে প্রত্যেকটি জানালায় বিশেষ বোরখা এবং সেই সঙ্গে সতর্ক এ-আর-পিদের চোখরাঙানি। বাইরে আলো বেরুলেই আসামীকে চালান করো থানায়। কিন্তু বাছাধন, আকাশের চাঁদ তো তোমার অর্ডার কানে নেবে না, জোছনা রাতে কী করবে তুমি এ-আর-পি? পূর্ণিমার রাতগুলো যে চিন্তার কারণ আছে তা বাদলকাকু আমাকে বোঝাতেন, কারণ এই সময়েই জাপানি বোমারু বিমান কলকাতা ভ্রমণ করতে পারে।

বাদলকাকুর অফিসের দপ্তরি অতুলকাকু কাছাকাছি থাকতেন। তিনি অবশ্য বলতেন, "ভাববেন না, হিটলার কিংবা তোজো কেউ বাংলার মশার কামড় সহ্য করতে পারবে না, দখল করলেও পালাবার পথ পাবে না মশার অত্যাচারে।" ওইখানে আপত্তি উঠতো, "ক্লাইভ কী করে মুর্শিদাবাদের মশার কামড় সহ্য করে মনের সুখে দমদমে বাড়ি করলেন?" বাদলকাকু এই পর্যায়ে মুখ খুলতেন। "তোমরা বুঝছো না, ক্লাইভ এখানে রাজা হতে আসেননি, এসেছিলেন ব্যবসা করতে।"

বাদলকাকু গৃহী হয়েও প্রায় সন্ন্যাসীর মতন জীবনযাত্রায় বিশ্বাস

করতেন। চা খেতেন না, পান খেতেন না, বিড়ি-সিগ্রেট স্পর্শ করতেন না, সিনেমাকে শতহস্তে দূরে রাখতেন, সিনেমার প্রেমের গান ছিল বিষবৎ, আর থিয়েটার বলতে কেবলমাত্র নদের নিমাই পালা।

সিনেমা তিনি একবারই দেখতে গিয়েছিলেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। নির্দেশ এসেছিল স্বয়ং লিভিংস্টোন সায়েবের কাছ থেকে। এসপ্ল্যানেডের নিউ এম্পায়ারে বাদলকাকু টিকিট কেটে আমাকে নিয়ে ঢুকলেন। মূল ছবি শুরু হবার আগে বিমান আক্রমণের সময় নগরবাসীকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কী করতে হবে, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, কীভাবে এ-আর-পিদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে তা সযত্নে ও সবিস্তারে দেখানো হলো। এই তথ্যচিত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবাক কাণ্ড! মূল ছবি না দেখেই বাদলকাকু আমাকে নিয়ে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এলেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না।

বাদলকাকু আর একটা মজার ব্যাপার করতেন। কিছুদিন অন্তর বিক্রিওয়ালার কাছে পুরনো কাগজ বিক্রি করতেন। এই দিনটির জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, বিক্রিওয়ালাকে ধরে আনতাম। তার সঙ্গে প্রচণ্ড দরাদরি চলতো বাদলকাকুর, দাম ঠিক হওয়ার পরে সঠিক ওজন নিয়ে প্রায় হাতাহাতি। তারপর কাগজের দাম তিনি সাবধানে গুনে নিতেন। তখনকার দিনে হয়তো দেড় টাকা পাওয়া গেলো। বিক্রিওয়ালা যখন তার বস্তা পিঠে নিয়ে চলে যেতে শুরু করছে, তখন তাকে আবার হইহই করিয়ে ফিরিয়ে আনা হতো, বিক্রিওয়ালা ভাবতো আবার কোনো গোলমালে পড়া গেলো এই লোকটার সঙ্গে। ততক্ষণে বাদলকাকু বিক্রির পয়সাটা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। এবার হাসিমুখে তিনি এক-তৃতীয়াংশ বিক্রিওয়ালাকে ফিরিয়ে দিতেন মিষ্টিখাবার জন্যে। তারপর আরও এক-তৃতীয়াংশ তিনি নিজের মায়ের হাতে তুলে দিতেন সিদ্ধেশ্বরী কালীতলায় পুজো দেবার জন্যে। তারপর আমার পালা। আমাকে সঙ্গে নিয়েই বাদলকাকু হাজির হতেন কালীবাবুর বাজারের গড়াই ব্রাদার্সে। ওখান থেকে অবশিষ্ট পয়সায় কিনে দিতেন বিস্কুট লজেন্স। সে এক অবিস্মরণীয় আনন্দের দিন।

বাদলকাকু কতকগুলি বিষয়ে প্রায়ই শিক্ষা দিতেন। অপচয় চলবে না। যেখানকার জিনিস ঠিক সেখানে রাখতে হবে। যে কাজটাই করবে

তা নিখুঁতভাবে করতে হবে। বাদলকাকুর বাক্সে পেন্সিলগুলো দেখবার মতন—যেন শিল্পকর্ম, এইভাবে নিখুঁতভাবে কাটা। মজা করে তিনি বলতেন, ভগবান যা কিছু করেন তাতে খুঁত থাকে না। মানুষকে তিনি এই সুবিধে দেননি। কিন্তু মানুষও ব্যাপারটা বুঝে ভগবানের সঙ্গে কমপিটিশনে নেমে গিয়েছে, সব কাজ এমনভাবে করতে চাইছে সে যাতে ভগবানকে টেক্কা দেওয়া যায়।

আরও একটা বিষয়ে বাদলকাকু ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। বলতেন, মানুষ তো ভগবান নয়, তাই কিছু করতে গেলেই ভুল থেকে যায়। সেইজন্যে কিছু করে বা কিছু লিখে একবার চেক করে নিতে হয়, মিলিয়ে নিতে হয়, তখন ভগবানও হার মেনে নেন।

এই মিলিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা পরবর্তী জীবনে আমি বারবার বুঝেছি। এই স্বভাবের জন্যে কিছু সুবিধেও হয়েছে। সামান্য শিক্ষা নিয়েও পরবর্তী জীবনে ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েবের কাছে প্রায় নির্ভয়ে কাজ করতে পেরেছি।

বাদলকাকু বোধহয় কিছুটা নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর কথা শুনতে বা তাঁর সঙ্গে একমত হতে অনেকেই চাইতো না, তাই প্রাণভরে আমাকে সমবয়সী মনে করে নানা কথা বলতেন। এইসব কথার অনেকগুলি উৎপত্তিস্থল হয়তো লিভিংস্টোন সায়েব। কিছু কিছু আজও ভুলতে পারিনি। বাদলকাকু বলতেন, মানুষ যা চাইবে তা-ই পাবে, যার থেকে তুমি দূরে সরে যেতে চাইবে তা অবশ্যই দূরে সরে যাবে। তাই মানুষকে চাওয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যা চাওয়া হয়নি তা কখনই পাওয়া যাবে না।

বাদলকাকু বলতেন, "হাজার জন বন্ধুও যথেষ্ট নয়, কিন্তু একজন শত্রুই যথেষ্ট, তিনি একাই এক লাখ। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সব জায়গায় তাকে দেখতে পাবে।"

বাদলকাকু কখনও অফিস কামাই করতেন না। মাত্র একবার তিনি পরপর তিনদিন অফিস যাননি। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য, তাঁর ছোটভাই, যাঁর শিক্ষার জন্য বাদলকাকু চিরকুমার রইলেন, একদিন বিদ্রোহ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না—বড়ই কঠিন নিয়মাবলী, চা খাওয়া নিষিদ্ধ, বিড়ি খাওয়া অসম্ভব,

সিনেমার কুঁই কুঁই গান মানুষকে নষ্ট করে, রাস্তায় যা তা খেলে শরীর স্বাস্থ্যের সর্বনাশ হয়, প্রত্যেকটি লেখা দু'বার রিভাইজ করতে হবে, ইংরেজি খবরের কাগজ পড়বার সময়ে পাশে ইংরেজি অভিধান রাখতে হবে, বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে ছাত্রমেধা নিঃশেষ হয়, ভোরবেলায় পড়াশোনাই শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা, এইরকম হাজার রকম নিয়মের শৃঙ্খল সারাক্ষণ কার ভাল লাগতে পারে?

আগেই বলেছি, বাদলকাকু চা-পানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন—চা, সিগ্রেট ও সিনেমা যে ভারতবর্ষকে শেষ করবে এই আশঙ্কা তাঁর সারাক্ষণ ছিল। তাই তাঁর বাড়িতে চায়ের কোনো আয়োজন ছিল না। সেই বাদলকাকুই ভ্রাতাবিদ্রোহের পরের দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে গিয়ে কাপ ডিশ কিনলেন। কারণ প্রিয় বি সি বোসের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে কালামাজু লুজলিফ কোম্পানির বড়সায়েব লিভিংস্টোন সায়েব এতোই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন যে তিনি বোসের বাড়িতে আসছেন খবর পাঠিয়েছেন অতুল চক্রবর্তী মারফত। লিভিংস্টোন সায়েবকে নিজের বাড়িতে চিড়ে দই খাওয়াবেন ঠিক করেছিলেন বাদলকাকু। তারপর কী ভেবে মত পরিবর্তন করলেন। আমার সঙ্গে মতের আদানপ্রদান হলো, সায়েবরা চা খেলে, সিগ্রেট খেলে, ষাঁড়ের ডানলা খেলে দোষ হয় না, কারণ ওগুলোই ওদের ধর্ম।

বাদলচন্দ্র বসু তাঁর কঠিন নিয়মনীতি সাময়িকভাবে শিথিল করে কীভাবে লিভিংস্টোন সায়েবকে নতুন কাপে সুগন্ধি চা খাইয়েছিলেন এবং কেন খাইয়েছিলেন তা নিয়ে বহুকাল পরে একটা গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পে বাদলকাকু হয়ে গিয়েছিলেন অশ্রুমামা। কেউ কেউ বলেছিলেন, অশ্রুমামা একটা কাল্পনিক কমিক ক্যারাকটার। আমি দীর্ঘদিন সেই অভিযোগের কোনো উত্তর দিইনি। কারণ আমার কাছে বাদলকাকু তো কমিক ক্যারাকটার নন। যে মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাস করেছেন তা সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন, বিশ্বসংসারের সবাইকে অমান্য করে একজন অপরিণতবুদ্ধি বালককে সমবয়সী বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে সব কথা শুনিয়েছেন।

বাদলকাকুকে না পেলে আমার এই জীবন বোধহয় অপূর্ণ থেকে যেতো। বড় সংসারে মানুষ হয়েও আমি ছিলাম নিতান্ত একা। আমার

মা সংসারের সহস্র দায়িত্ব নিয়ে এবং পর পর আটটি সন্তানের জন্ম দিতে ও লালন-পালন করতে গিয়ে আমাদের সেবা করলেও সান্নিধ্য দিতে পারতেন না, বাবাও সদাব্যস্ত কঠিন জীবন-সংগ্রামে, একটি কৌতূহলী বালকের হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হবার মতন সময়, সুযোগ বা মানসিকতা তাঁর ছিল না। তারপর তো এলো সেই ভয়াবহ রাত্রি যেদিন তিনি আমার মা ও আটটি নাবালক ছেলেমেয়েকে অকূলপাথারে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন সেই দূর দেশে যেখানে মর্তলোকের কোনো সুখদুঃখের সংবাদ পাঠানোর উপায় নেই। নিরাশায় ভরা বৃহৎ সংসারের একাকীত্ব আমাকে শেষপর্যন্ত কোন পথে নিয়ে যেতো কে জানে, কিন্তু বাদলকাকুর সান্নিধ্য ও স্নেহপ্রশ্রয় আমাকে সঞ্জীবিত করেছিল। বিশ্বসংসারের অনেক কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর আমি বিনাপরিশ্রমেই পেয়ে গিয়েছিলাম—আমার অপূর্ণতা অনেকটা ঢেকে গিয়েছিল।

যে রাতে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তার পরেরদিন বাদলকাকু আমার হাত ধরেছিলেন। আমার বয়স তখন তেরো। এক অজানা আতঙ্ক তখন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে। বাদলকাকু তখনও আমাকে ত্যাগ করেননি, পরিস্থিতির ভয়ঙ্করতা বুঝেও বলেছিলেন, "একটু কষ্ট করতে হবে শঙ্কুসায়েব, কিন্তু তুমি যে শেষপর্যন্ত নিজের চেষ্টায় সব ঠিক করে নেবে তা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

ভাগ্যের খেয়ালে শেষ পর্যন্ত সত্যিই সব বিপর্যয়ের অবসান হয়েছিল, বাদলকাকুর কাছ থেকে যে নিঃশব্দে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা ভীষণ কাজে লেগে গিয়েছিল সংগ্রামের প্রতি পদে পদে। আমার চরম দুর্দিনে বাদলকাকু চোখের সামনে সত্যিই কী দেখেছিলেন তা আমি জানি না, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য, ভালবাসা, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমার এই জীবন যে সত্যিই অপূর্ণ থেকে যেতো সেকথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

**[গ্রন্থসূত্র
চরণ ছুঁয়ে যাই
দ্বিতীয় পর্ব]**

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয়া

শ্রীমতী মেরিয়ন বারওয়েলকে

ভারতবর্ষের প্রতি যাঁর

ভালবাসার অন্ত নেই।

"All the great advances in human history are due to the thought or action of a few exceptional individuals."

—Julian Huxley

গোড়ার কথা

সে প্রায় দুশো বছরের আগেকার কথা। সুইডেনের এক বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের খেয়াল হল পৃথিবীর জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গের কোনও নির্ভরযোগ্য তালিকা নেই! মাথায় তাঁর ভূত চাপল তিনি নিজেই এই অভাব পূরণ করবেন। সুতরাং সর্বত্র তাঁর অনুসন্ধান শুরু হল এবং তারপর কাগজকলম নিয়ে লিখতে বসলেন পৃথিবীর প্রথম জীবজগৎ তালিকা। ভদ্রলোকটির নাম কার্ল ফন লিনিয়াস।

লিনিয়াস তাঁর কর্মবহুল জীবনকালে মাত্র ৪৩৭৯টা নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তারপর এই দুশো বছর ধরে পৃথিবীর আরও কত মানুষ পর্বত, সাগর, মরুভূমি, জলাজঙ্গল ও জনপদে নতুন কীটপতঙ্গ আবিষ্কারের নেশায় নিজেদের যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এমন কী জীবন ব্যয় করলেন। ব্রুস, বাটলার, ক্রিস্ট্যাল, টেলর, কীবিল—এবং আমাদের জীমূতবাহন সেন, যাঁকে নিয়ে এই নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির কাহিনী।

জীমূতবাহন বলতেন, "আমার কাছেই ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার পোকামাকড়ের নাম আছে। অর্থাৎ তোমাদের আট পৃষ্ঠার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সবগুলো পাতায় কোনওরকম হেডিং না দিয়ে যদি শুধু পোকাদের নাম ছাপিয়ে যাওয়া যায় তা হলেও পুরো আট সপ্তাহ লাগবে।"

এখনও নাকি প্রতি বছর চার হাজার নতুন পোকার নাম সংগ্রহ হচ্ছে এবং কারও কারও ধারণা, পৃথিবীতে অন্তত দেড়কোটি রকমের কীটপতঙ্গ আছে।

জীমূতবাহন সেনের নাম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অপরিচিত না-ও হতে পারে। কিন্তু ঈশিতা সেন, ইন্দুমতী দেশাই, মদালসা আর অমিতাভ মিত্রের খবরাখবরও যে তাঁরা রাখবেন এটা আশা করা যায়

না। প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া জীমূতবাহন সম্পর্কে কয়েক লাইনের যে সংবাদ প্রচার করেছিলেন, সংবাদ পাঠকরা তার থেকে জীবমূতবাহনের সংবাদ হয়তো জানতে পেরেছেন।

পি-টি-আই পরিবেশিত সেই সংবাদ স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক সে সম্পর্কে অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু সবটুকু কি জানা গিয়েছে? টেলিপ্রিন্টারে পাঠানো সামান্য ক'লাইন খবরের পিছনে অনেক সময় যে বৃহৎ ঘটনা লুকিয়ে থাকতে পারে জীমূতবাহনের জীবন তাই প্রমাণ করে।

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির কাহিনী শুরু করবার আগে শ্রীমতী ঈশিতা সেনের কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত আবেদন আছে। জীমূতবাহনের এই ইতিবৃত্ত তাঁর হাতেও পৌঁছতে পারে। এই কাহিনী যে তাঁর মনঃপূত হবে এমন আশাও রাখি না। কিন্তু এইটুকু প্রথমেই বলে রাখতে চাই, কাউকে আঘাত দেবার জন্যে বা লোকচক্ষে ছোট করবার জন্যে এই কাহিনীর সৃষ্টি নয়। শ্রীমতী সেনের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি যেন ভুল না বোঝেন কাউকে।

১

বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে এই কাহিনীর পটভূমি। ট্রেনে করে অমিতাভ মিত্র চলছিল জীমূতবাহনের সেই কর্মকেন্দ্রে।

ট্রেনের কামরায় বসে ইঞ্জিনের দোল খেতে খেতেই আবার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। কতগুলো টানেলের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে যে গাড়িখানা ঢুকল আর বেরিয়ে এল তার হিসেব নেই। টানেলের মধ্যে যখন ট্রেনটা ঢুকে পড়ে তখন হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—ট্রেনটা যেন একটা সুতো, কোন বৈশাল দৈত্য তাকে ছুঁচের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলে আবার ভাল লাগে—প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

অমিতাভ দেখল, দূরের পর্বত-শিখরগুলো সেকেলে মেয়েদের মতো স্বামীর মঙ্গলকামনায় সীমন্তে প্রচুর সিঁদুর লাগিয়েছে। ক্ষয়ীভূত

এই শিলা নাকি হিমালয়ের থেকেও বয়োজ্যেষ্ঠা। ট্রেন থেকে পাহাড়ের গাছগুলো হঠাৎ দেখলে মনে হয় চলমান অশ্বারোহীর সারি—অন্ধকার নামার আগেই তারা ব্যস্তভাবে নিকটতম সরাইখানার দিকে ছুটে চলেছে।

অমিতাভ মিত্র সামনের জানলার পরদাটা ভাল করে সরিয়ে দিল—এই ট্রেনটা ভারতবর্ষের অন্য সব ট্রেনের মতো নয়। চলমান ট্রেন থেকে অপরূপা প্রকৃতিকে দু'চোখ ভরে দেখবার জন্যে যাত্রীরা যে ব্যাকুল হতে পারেন তা স্থানীয় রেল কোম্পানির দূরদর্শী কর্মকর্তারা এই লাইনের পত্তনের সময়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ট্রেনের কামরায় বড় বড় কাচের জানলা বসাতে কার্পণ্য করেননি তাঁরা। বসার জায়গাগুলোও সুন্দর।

একটা ছোট্ট স্টেশনকে অবজ্ঞা করে ট্রেনটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চলমান যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভারতবর্ষ দেশটা যে কত বড় তা ট্রেনে না চড়লে বোঝা যায় না। রবিবার সন্ধেবেলায় অমিতাভ গাড়িতে চেপে বসেছিল। তারপর রবিবার গেল, সোমবার গেল—গাড়ি চলার বিরাম নেই। ভারতবর্ষটা যেন একটা রিলে জড়ানো ছিল—কে বোধ হয় মেশিন ঘুরিয়ে অমিতাভর চোখের সামনে সেটাকে আর একটা কাঠিমে জড়িয়ে নিচ্ছে। কত মাঠ, কত নদী, কত অরণ্য, কত পর্বত, কত স্টেশন, কত মানুষ চোখের সামনে এসে আবার বন-বন করে কাঠিমে জড়িয়ে গেল। এর যেন শেষ নেই।

মঙ্গলবারে গাড়ি পালটিয়েছে অমিতাভ। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘণ্টাকয়েক কাটিয়ে আবার এই নতুন ট্রেনটায় উঠে বসেছে। বিদ্যুতে টানছে গাড়িটাকে। গাড়িটা ভেস্টিবিউল্ড।

আগেকার গাড়িটাতে কুপে পেয়েছিল অমিতাভ। ঠিক যেন সেলের বন্দি হয়ে ছিল সে। একটা স্টেশন ছেড়ে আর একটা স্টেশনের পথে মনে হয় পৃথিবীর সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—একটা ক্যাপসুলের ভিতর অবরুদ্ধ অমিতাভ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

পৃথিবী থেকে না হোক চেনা-জানা সবাইকার কাছ থেকে এবার

সত্যিই দূরে সরে যাচ্ছে অমিতাভ। বাবা বলেছিলেন, "এত দূরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

মা বলেছিলেন অমিতাভকে, "তা হলে তোকে পেটে ধরে কী লাভ হল? ইস্কুল থেকেই হোস্টেলে রইলি। কলেজেও হোস্টেল ছাড়লি না। তারপর বেশি বিদ্যের লোভে বিদেশে একা একা পালালি। ফিরে এসেও যদি তোর পড়াশোনার শেষ না হয় তা হলে কবে হবে?"

মায়ের দিকে তাকিয়ে অপরাধী অথচ আদুরে ছেলের মতো অমিতাভ হেসেছিল। মা বলে চললেন, "তারপর একদিন বিয়ে করে বসবি—একেবারে পর হয়ে যাবি। মরে গেলে নিশ্চয় কষ্ট করে কাছা পরবি, হবিষ্যি করবি, পিণ্ডি দিবি, কিন্তু বেঁচে থাকতে মায়ের কাছে থাকলি না।"

তখন কিছুই বলেনি অমিতাভ। এখন ট্রেনের কামরায় বসে টাইম-টেবলের ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে জায়গাটা সত্যি অনেক দূরে। এই এত দূর থেকে দুর্ধর্ষ বিরাট সৈন্যবাহিনী একদিন বাংলা দেশ আক্রমণ করতে যেত! তখন তো ট্রেনও ছিল না।

এই গাড়িতে অমিতাভ একলা নয়—আরও তিনজন আছে। তিনজন নয়—আড়াইজন। তাই বা কেন, রেলের হিসেবে দু'জন বলা উচিত। কারণ তৃতীয় প্রাণীটির অস্তিত্ব তিনমাস আগেও ছিল না। মিলিটারি ভদ্রলোক—আর্মি ভেটারিনারি কোরের ক্যাপ্টেন দেশপাণ্ডে আর মিসেস দেশপাণ্ডে।

সারা রাস্তা দেশপাণ্ডে শুধু ঘোড়ার গল্প বললেন। তাঁর দুঃখ স্ত্রী ঘোড়ায় চড়তে চায় না। ছেলেটা কী হবে কে জানে—মায়ের দোষটা না সংক্রামিত হয়! ঘোড়ায় চড়তে চাক না-চাক ছেলেটা সর্বদা মায়ের কোলে চড়তে চায় এবং সম্প্রতি আর একটি বস্তুর প্রতি তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। লাজুক মা তাকে ফিডিং বোতলের দুধ দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পুত্রটি বেয়াড়া, সে মায়ের দুধ চায়।

মাকে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে অমিতাভ বললে, "আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

করিডর দিয়ে সামনের দিকে যাবার চেষ্টা করলে অমিতাভ। কিন্তু

গাড়িটা বেজায় দুলছে, এগোবার উপায় নেই। পা বাড়াবার চেষ্টা করলেই হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভয়। অমিতাভ মিত্রের মনে হল আরও অনেক শক্তি অদৃশ্য রজ্জু দিয়ে তাকে পিছনে টানবার চেষ্টা করছে।

এখান থেকে দাঁড়িয়েই অমিতাভ দূর দিগন্তের পর্বতশ্রেণী দেখতে পাচ্ছে। আর একটা স্টেশনের ওপর দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। পাশের ছোট ছোট পাথুরে টিবির ওপর কয়েক জোড়া সলজ্জ যুবক-যুবতী নিশ্চল বসে রয়েছে। এ-দেশের গভীরেও কি আজকাল রোমান্স ঢুকে গেল? এটা যদি সত্যি হয় মন্দ কী?

এবার বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। রেস্তোরাঁ-কারে বসে কফির অর্ডার দিলে অমিতাভ।

বাইরে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জায়গাটায় বোধ হয় অনেক নতুন কলকারখানা হচ্ছে! কারখানার শান্ত আলোগুলো আপন মনেই প্রবীণ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদেব মতো স্থিরভাবে ডিউটি করে যাচ্ছে। মাঝে একটা জায়গায় ট্রেনের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা ছটফটে নিওন সাইন জ্বলছে আর নিভছে। জানিয়ে দিচ্ছে এখানে এক্স-বে মেশিন তৈরি হয়। পাশেই একটা নামকরা রঙের কারখানা। তারই পাশে নাইলন মিল। 'মানুষের তৈরি ফাইবার ব্যবহার করুন'—আর একটা নিওন আলো নীরব আবেদন জানাচ্ছে।

আর কিছুটা এগিয়ে গিয়েই বিরাট এক কারখানা—মানুষ বাঁচাবার সবচেয়ে নামকরা কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এখানেই শিশিতে ভবতি হয়। তার পরেই মানুষ নিধনের কল—অর্ডনান্স কারখানা।

অমিতাভর এখন আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। এই ক'দিন একলা অনেক ভেবেছে—কোথায় চলেছে, কীসের সন্ধানে চলেছে, কী লাভ হবে? এ-সব চিন্তার সময় যে লোকটি মনের মধ্যে নিত্য আনাগোনা করেছেন তাঁর নাম অবশ্যই জীমূতবাহন সেন।

সুদূর বিদেশে জীমূতবাহন সেনের সঙ্গে অমিতাভর পরিচয়টা প্রায় গল্পের মতো।

ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার দিতে এসেছিলেন ডক্টর জে বি সেন। সেই উপলক্ষে প্রফেসর ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন। অধ্যাপকদের ভোজসভায় কোনও ছাত্রের থাকবার কথা নয়। কিন্তু দলে একজন

ইন্ডিয়ান বাড়াবার কথা ভেবেই প্রফেসর ব্ল্যাকার অমিতাভকে আসতে বলেছিলেন।

আলাপ করিয়ে দেবার সময় অধ্যাপক ব্ল্যাকার বললেন, "হিয়ার ইজ এ বয় ফ্রম ঢাকা।"

"না না, ঢাকা নয়—সেটা ওয়ান্স আপন এ টাইম। বাবা ওখানে চাকরি করতেন। আসলে ক্যালকাটা," অমিতাভকে বলতে হল।

ডক্টর জে বি সেন গলাবন্ধ কোটের একটা বোতাম সামলাতে সামলাতে শুদ্ধ বাংলায় বললেন, "কলকাতার ছেলে? কোথাকার?"

"নর্থ ক্যালকাটা।"

"মানে শ্যামবাজার?"

"না, দর্জিপাড়া।"

"দর্জিপাড়ার মিত্তির নাকি তোমরা? তোমরা তো ভেরি ফেমাস। এক সময়—সে অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা—ওখানে আমি টিউশানি করতাম।"

জিনিসটা ভাল দেখাচ্ছে না বলে, বাংলায় কথাবার্তা বন্ধ রেখে অমিতাভ একটু দূরে সরে গিয়েছিল।

প্রফেসর ব্ল্যাকার হাসতে হাসতে জীমূতবাহনকে বললেন, "মিট্রাকে আমরা ডি-ইন্ডিয়ানাইজ করবার চেষ্টা করছি! আমি জোর করে বলতে পারি এই ইউনিভার্সিটির প্রতিভাময়ী এবং আকর্ষণীয়া বালিকাদের মনের খাতার প্রথম পাতায় ওর নাম লেখা আছে। মিট্রার মতো প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছোকরাকে আমরা ডারহামেই রাখতে চাই—মিট্রাকে এখানে শিকড় গেড়ে বসতে হবে।"

প্রফেসরের রসিকতায় উপস্থিত সবাই সেখানে গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিলেন—জীমূতবাহন সেনের হেঁড়ে গলা ছাপিয়ে গিয়েছিল।

এক সুযোগে জীমূতবাহন আবার অমিতাভর কাছে সরে এসে বলেছিলেন, "চলে যাবেন না, ডিনারের পর দু'জনে একটু গল্প করা যাবে।"

ডিনারের শেষে দু'জনকেই একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে দেখা গিয়েছিল। জীমূতবাহন সেন ধুতি পরেই পার্টিতে এসেছিলেন। অমিতাভ বলেছিল, "আপনার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

'জীমূতবাহন হাসতে হাসতে বললেন, "দেশের মধ্যে তবু প্যান্ট পরি—কিন্তু দেশ ছাড়লেই ধুতি ছাড়া কিছুই পরতে ইচ্ছে হয় না।"

"কেন? হারিয়ে যাবার ভয়?"

"ঠিক তা নয়—কেমন একটা গোঁ বলতে পারেন", জীমূতবাহন উত্তর দিয়েছিলেন।

নিজের ঘরেই অমিতাভকে নিয়ে এসেছিলেন জীমূতবাহন। কাঠিতে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে জীমূতবাহন বললেন, "খাওয়া-দাওয়া মন্দ হল না,—কিন্তু ঠিক পরিতৃপ্তি হচ্ছে না।"

"কেন বলুন তো?" অমিতাভ প্রশ্ন করেছিল।

"সে আপনারা বুঝবেন না। আমরা সেকেলে প্রেসিডেন্সির গ্রুপ। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের রুমমেট বদ নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। খাবার পর পান আর তার সঙ্গে জরদা না খেলে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে। কিন্তু সে আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন?"

"এই জন্যেই কি আপনি আজকাল ইন্ডিয়ার বাইরে বিশেষ আসতে চান না ডক্টর সেন?" অমিতাভ হাসতে হাসতে বলেছিল।

"সে কী? এ কথা কে বললে আপনাদের? দেশে কাজ পড়ে আছে অনেক। কিন্তু ঘর মজিয়ে কেমন মনের সুখে পর ভুলিয়ে বেড়াচ্ছি। বিশ্ব কৃষি-সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল বি আর সেন মশাই ছাড়লেন না। দেশ-বিদেশে অনেকগুলো সেমিনার করে গেলাম এবার।"

অমিতাভর দিকে একটা চুরুট এগিয়ে দিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "চুরুট খান তো? এটাও আমরা হোস্টেলে অভ্যেস করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে পড়ত হরিহর মহান্তি—ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল, কিন্তু বদমাইসের গাছ। সে বলত সিগারেটটা মেয়েলি নেশা—যদি বেটাছেলে হোস্ তো চুরুট টানবি।"

নিজের চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে জীমূতবাহন এবার বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। অনেকদিন পরে যেন সময়বয়সী এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার সুযোগ পেয়েছেন। চুরুটটা হাতে নিয়ে ঠোঁটটা মুছে ফেলে বললেন, "মেয়েমানুষ বলা থেকে খারাপ গালাগালি তখন ছিল না—আমরা ভয়ে ভয়ে তাই চুরুট চর্চা আরম্ভ করেছিলুম। নিতান্ত পয়সা না থাকলে বিড়ি খেতাম।"

অমিতাভ হাসল। বললে, "চুরুট খেতে পারি না। বড় কাশি আসে।"

জীমূতবাহন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? ঠিক সময়ের মধ্যে হোস্টেলে ফেরবার আইন আছে নিশ্চয়।"

"আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমি অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই।"

জীমূতবাহন ওয়ারড্রোব থেকে একটা আলোয়ান বার করে নিজের পা দুটো জড়িয়ে নিলেন।

অমিতাভ একটু অবাক হয়েই বললে, "এখানেও আলোয়ান এনেছেন?"

জীমূতবাহন পা দুটো মুড়ে বসতে বসতে বললেন, "আর বলেন কেন, কত রকমের বদ অভ্যেস যে করেছি। আলোয়ান না গায়ে জড়ালে আমার শীত ভাঙে না। ওভারকোট থাকলেও তার ওপর একটা আলোয়ান চড়াতে ইচ্ছে হয়। শাড়ি আর আলোয়ান—এরকম ভার্সেটাইল ড্রেস পৃথিবীতে আর আছে বলে আমার জানা নেই।"

অমিতাভ মৃদু হাসল। জীমূতবাহনকে তার বেশ লাগছে। দেখতে টিপিক্যাল মফস্বল ইস্কুলের হেডমাস্টার, কিন্তু আজ দুপুরেই বৈজ্ঞানিক মহলে ভদ্রলোক কীভাবে সমাদৃত হয়েছেন, তাঁর আধুনিকতম চিন্তা কীভাবে আলোড়ন তুলেছে তা অমিতাভ নিজের চোখেই দেখেছে।

ধুতির সঙ্গে বুট-জুতোপরা পা-টা নাড়তে নাড়তে জীমূতবাহন বললেন, "বিনয় সেনমশাই অনেক ভাল কাজ করবার চেষ্টা করছেন। কে জানে, হয়তো 'ফ্রিডম ফ্রম হাঙ্গার' সত্যিই সম্ভব হবে—ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। কিন্তু সমস্যাটা তো শুধু পৃথিবীর তিনশো কোটি মানুষের নয়—এদের সঙ্গে কীটপতঙ্গদের যোগ দিন। তারাও খেতে চায়, খেতে ভালবাসে—আর তাদের কোনও ফ্যামিলি প্ল্যানিং নেই।"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে, ঠোঁটটা আর একবার মুছে নিয়ে জীমূতবাহন জানালেন, "গ্লেন হেরিকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। ছ'মাসের জন্যে সেবার স্টেটসে গিয়েছিলাম। হেরিক বললেন, সেন, ৩১শে মার্চ থেকে ২রা অক্টোবর এই যে ক'মাস তুমি এখানে থাকবে তার মধ্যে একটা স্ত্রী ক্যাবেজ অ্যাফিড থেকে

১,৫৬০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ অ্যাফিডের জন্ম হতে পারে। মানুষের খাবারে ভাগ বসিয়েই তো এইসব পোকাদের বেঁচে থাকতে হবে।"

অমিতাভ বললে, "গতকাল আপনি যে পেপারটা পড়লেন—সেটার এখানকার অনেকেই খুব প্রশংসা করছিলেন।"

এবার পকেট থেকে সুপুরি বার করলেন জীমূতবাহন, এক টুকরো অমিতাভকে দিয়ে আর এক টুকরো নিজের মুখে পুরলেন। গম্ভীরমুখে বললেন, "প্রশংসায় কী হবে? এখনও প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন।"

অমিতাভ সেই সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডক্টর সেনের কত আপনজন হয়ে উঠেছিল। বিদেশেই বোধ হয় এটা হওয়া সম্ভব। জীমূতবাহন যেমন অমিতাভর ব্যক্তিগত খবরাখবর জানতে চাইলেন, তেমনি নিজের কোনও কথাও গোপন করলেন না।

বললেন, "কেন আমি বিদেশে এসেছি আপনাকে বলতে বাধা নেই। ফরেন এক্সচেঞ্জের অবস্থা জানেন তো? পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের খাবার আমদানি করতে গিয়ে ভারতবর্ষ দেউলিয়া হতে বসেছে। অথচ আমার এখন অনেক যন্ত্রপাতি চাই। একবার লোকচার ট্যুরে বেরোলেই কিছু পয়সা পাওয়া যায়, অনেকে টাকার বদলে কিছু যন্ত্রপাতিও দেয়।"

একটু থেমে জীমূতবাহন বললেন, "মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছি এবার। ইউ এস এ-তে খুব ভাল সাড়া পেয়েছি—ইংল্যান্ডে তো বটেই। এবার পথে একবার রোমে ঢুঁ মেরে যাব।"

"আপনি এখন কী করছেন ডক্টর সেন?" অমিতাভ জানতে চায়।

জীমূতবাহন একটু হাসলেন। আপনিকে তুমিতে নামিয়ে এনে বললেন, "তুমি কী করছ বলো? বিদেশেই থেকে যাবে নাকি? এরা অবশ্য মাইনে দেয় ভাল, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও অনেক পাওয়া যায়, স্বাধীনতাও আছে, সম্মানও আছে এবং আছে গবেষণার অবাধ সুযোগ।"

অমিতাভর স্বভাব উত্তর না দিয়ে শুধু শুনে যাওয়া। উত্তরের অপেক্ষা না করেই জীমূতবাহন বললেন, "এমন একদিন ছিল যখন আমিও ভাবতাম বৈজ্ঞানিকের কোনও দেশ নেই। সমস্ত পৃথিবীই তার কর্মভূমি। তার কোনও ধর্মও নেই—একমাত্র সত্য। এই সত্যের সন্ধানে নিজের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই।"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে জীমূতবাহন বললেন, "কতকগুলো ব্যাপারে আমি এখনও সেই এক মত পোষণ করি। কিন্তু অমিতাভ, যদি আমরা দেশকে না দেখি, দেশের সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের চেষ্টা না করি, তা হলেই বা চলবে কী করে?"

সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই ডক্টর সেনকে কেমন যেন ভালবেসে ফেলেছিল অমিতাভ। ডক্টর সেন বললেন, "তোমার ডক্টরেটের থিসিস তো সাবমিট করবার সময় হল। তারপর?"

"এখনও ভেবে দেখিনি। কানাডাতে একটা গবেষণার সুযোগ আছে—এখানকার রয়েল কলেজ অফ এগ্রিকালচারেও কাজ করতে পারি। প্রফেসর ব্ল্যাকার বলছেন, কোনও বড় কেমিক্যাল কোম্পানিতেও বলে দিতে পারেন—শেল, আই-সি-আই বা ডুফার।"

সেই রাত্রে জীমূতবাহন আর কিছু বলেননি। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন অমিতাভকে।

পরের দিনও জীমূতবাহনের লেকচার ছিল, অমিতাভ শুনতে গিয়েছিল। ডায়াসে উঠবার সময় একবার চোখাচোখি হয়েছিল, ডঃ সেন হেসেছিলেন। বক্তৃতার পর আলোচনার সময় দু-একটা প্রশ্ন করেছিল অমিতাভ।

তারপর ডক্টর সেন লন্ডন চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কী খেয়াল হল, ট্রাঙ্ককল করেছিলেন অমিতাভকে।

রাত্রি তখন অনেক, শুয়ে পড়েছিল অমিতাভ। ঘরের টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলেছিল, "হ্যালো।"

ট্রাঙ্ককল শুনে আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল অমিতাভ। ওদিক থেকে চিৎকার করে জীমূতবাহন বললেন, "স্যরি টু ডিসটার্ব ইউ। হোটেলে বসে বসে ভাবছিলাম। বেশ বুঝছি আপনার দেশে ফেরা দরকার। চলে আসুন ইন্ডিয়ায়।"

অবাক হয়ে গিয়েছিল অমিতাভ। লোকটা পাগল নাকি? ওদিক থেকে জীমূতবাহন চিৎকার করে বললেন, "তা হলে কবে আসছেন বলুন?"

অমিতাভ বিব্রতভাবে বললে, "ভেবে দেখি।"

"আমার কথা শুনুন—বেশি ভাববেন না। ভাবতে ভাবতেই দেখবেন

সময় চলে গিয়েছে। শুনুন, দেশে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি করেছি। অনেক ফান্ডামেন্টাল কাজ করা যাবে। টাকা দিতে পারব না বেশি—কিন্তু অনেক 'লাইভলি' প্রবলেম পাবেন। দরিদ্র দেশমাতা আপনাদের মতো ছেলেদের সাহায্য চায়।"

এ রকম আহ্বানের জন্যে অমিতাভ সত্যি প্রস্তুত ছিল না। মন্দ কী? উৎসাহিত হয়ে অমিতাভ বললে, "আপনাকে চিঠি লিখব।"

জীমূতবাহন বললেন, "আজ ভোরে রোম যাচ্ছি। সেখান থেকে লিবিয়া। ত্রিপোলিতে কিছু কাজ আছে। দেশে ফিরে গিয়েই যেন চিঠি পাই।"

এর আগে বাড়ির লোকরা কতবার দেশে আসবার জন্যে করুণ আবেদন করেছেন, অমিতাভ বিশেষ পাত্তা দেয়নি। এই রাত্রে অমিতাভর হঠাৎ ভারতবর্ষে ফেরবার লোভ হচ্ছে। জীমূতবাহন তাকে টেলিফোনেই সম্মোহিত করে ফেলেছেন।

প্রফেসর ব্ল্যাকার হেসে ফেলেছিলেন। অমিতাভকে বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে ডঃ সেন তোমাকে স্পেল-বাউন্ড করেছেন।"

অমিতাভ বলেছিল, "কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।"

প্রফেসর ব্ল্যাকার অমিতাভর দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে কোনওদিন বাধা দেব না। ডঃ সেন বহু চেষ্টায় একটা কিছু গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। দু-একজন কমপিটেন্ট সহকারী প্রত্যাশা করবার অধিকার নিশ্চয়ই তাঁর কাছে। আর তা ছাড়া যদিও সায়ানটিস্টের কোনও সংকীর্ণ ন্যাশন্যাল সেন্টিমেন্ট না থাকা ভাল, তবু তার দেশ যদি কিছু প্রত্যাশা করে তা হলে তা পূরণ করার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত।"

একটু থেমে অধ্যাপক ব্ল্যাকার অমিতাভকে বলেছিলেন, "তুমি তো জানো প্রতি বছর ইংল্যান্ডের কত সেরা বৈজ্ঞানিক বেটার মাইনে এবং বেটার সুযোগের লোভে ইউ এস এ এবং কানাডায় পালাচ্ছে। আমিও যেতে পারতাম, সুযোগ এসেছিল বার বার—কিন্তু ওল্ড সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে পড়ে আছি। এখন ইন্ডিয়া, তোমার মাদারল্যান্ড, যদি তোমার ডাকে কেমন করে আমি না বলতে পারি?"

চুপ করেই বসেছিল অমিতাভ। প্রফেসর ব্ল্যাকার বলেছিলেন, "যারা

পিছনের ব্রিজ পুড়িয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে বলে, আমি তাদের দলে নই ; ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন অন্তত ডারহামের দরজা তোমার জন্যে খোলা থাকবে।"

সোজা কলকাতায় ফিরে এসেছিল অমিতাভ।

ছেলেকে হঠাৎ চলে আসতে দেখে বাড়ির সবাই যে একটু অবাক হয়ে যাননি এমন নয়। তাঁরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা দুঃখ করে বলতেন, "সে বোধ হয় আর ফিরবে না। ওই জন্যে অনেকে খুব বেশি দিন বিদেশে থাকতে বারণ করে। ডি-ন্যাশনালাইজড হয়ে যাবার বিপদটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে।"

"চাকরি নিয়েই এসেছ নাকি? বিলেতে জোগাড় করা চাকরি আর এখানকার চাকরির অনেক তফাত। অন্তত গভর্নমেন্টের সায়েনটিস্ট পুল-এ নাম রেজিস্ট্রি করে এসেছ নিশ্চয় বিলেত থেকে।" আত্মীয়রা প্রশ্ন করেছিলেন।

অমিতাভ কোনও উত্তর দেয়নি।

অমিতাভ একটা জিনিস শিখে ফেলেছে—কথার উত্তর দিলেই কথা বাড়ে। অনেক দিন আগেই পণ্ডিতরা এই সার সত্যটি আবিষ্কার করে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন—সবায়ের দিকে তোমার কান এগিয়ে দেবে, কিন্তু খুব অল্পজনের কাছেই মুখ খুলবে।

নীরবেই অমিতাভ একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল জীমূতবাহন সেনের কাছে। "হঠাৎ ভারতবর্ষে এসেছি—পাকাপাকিভাবে নয়। কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি বলতে পারেন।"

কিন্তু উত্তরটা যে টেলিগ্রামে আসবে তা অমিতাভ ভাবেনি। প্রিপেড টেলিগ্রাম। সঙ্গে টেলিগ্রাফিক মানি-অর্ডারে ট্রেনভাড়া। এখনই চলে এসো।

অন্তত গিয়ে নিজের চোখে সব কিছু দেখতে দোষ কী? ডঃ সেনের কত লেখাই তো বৈজ্ঞানিক জার্নালে পড়েছে অমিতাভ। লোকটা বোধ হয় পাগল—না হলে কেউ বলে আমার এক ট্রাঙ্ক ভরতি অপ্রকাশিত সায়েন্টিফিক লেখা আছে। কিন্তু জানো, আমার তেমন সাহস হয় না। তোমার মতো কাউকে যদি দেখাতে পারতাম।' শোনো কথা! বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জীমূতবাহন সেন একজন কাল-কা-ছোকরাকে

আপনার লেখা শোনাতে চান!

কিছুই ঠিক করা ছিল না। কিন্তু টি-এম-ও ও টেলিগ্রামটাই যেন অমিতাভকে টানতে টানতে এসপ্ল্যানেড বুকিং অফিসে নিয়ে গিয়েছিল, টিকিট কাটাতে বাধ্য করেছিল এবং নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনেও তুলে দিয়েছিল।

রবিবারের সন্ধেবেলায় যে রেলযাত্রা শুরু হয়েছিল, মঙ্গলের এই রাত্রেও তার শেষ হল না!

না, এবার বোধ হয় শেষ হবে। গাড়িটা ইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করেছে। কেবিনটা দেখা যাচ্ছে, স্টেশনটা দূরে নয়। কিন্তু স্টেশন থেকে জায়গাটা কতদূরে কে জানে!

২

ট্রেন থেকে নেমে কোনও অসুবিধাই হল না। স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে তখন ঘোষণা হচ্ছে : কলকাতার প্যাসেঞ্জার মিস্টার অমিতাভ মিত্র, গেটের কাছে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

গাড়ি মানে স্টেশন ওয়াগন। সচরাচর এখানে যেমন দেখা যায় তার থেকে অনেক হালকা। গাড়ির ড্রাইভারটি কিন্তু জনৈক মহিলা। অমিতাভ হাত তুলে নমস্কার করলে।

"আপনিই অমিতাভ মিত্র? নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।" মেয়েটি চমৎকার বাংলায় বললে।

ফোর-হুইলারটা কোন্ মেকের দেখবার জন্যে অমিতাভ ঝুঁকে পড়েছিল। মেয়েটি বললে, "এ-দেশি নয়—জাপানি। খুব হালকা। জাপান এগ্রিকালচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রফেসর মিচিকানা মাস্টারমশাইকে উপহার পাঠিয়েছেন। উনি কিছুদিন আগে এখানে এসেছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের গেস্ট হয়েছিলেন।"

এ-দেশি মেয়েকে জিপ চালাতে দেখে অমিতাভ যে একটু অবাক হয়নি এমন নয়। গাড়িতে উঠে মেয়েটির দিকে অমিতাভ এমনভাবে তাকিয়েছিল, যার অর্থ—প্রয়োজন হলে আমি ড্রাইভ করতে পারি। কিন্তু পথ-প্রদর্শিকা ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মহিলাটি বললে, "মাস্টারমশাই নিজে

এলে আমাকে ড্রাইভ করতে হত না। কিন্তু উনি ল্যাবরেটরিতে আটকে পড়লেন। ল্যাবরেটরির কোলোরাডা বিট্লগুলো হঠাৎ কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। কতকগুলো ইতিমধ্যেই মারা গেল। মাস্টারমশাই ওদের অবজার্ভ করছেন। দু-একটা ওষুধ দিয়ে দেখছেন। হয়তো খাওয়ার দোষ হয়েছে।"

"ফুড পয়জন!" অমিতাভ হেসে উঠল।

সামনের হেড লাইটটা জ্বেলে দিয়ে মেয়েটি বললে, "মাস্টারমশাইয়ের ছোট প্রতিষ্ঠান—ড্রাইভার রাখবার মতো সামর্থ্য নেই। সেই পয়সায় একটা ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারলে খুশি হন তিনি।"

অমিতাভ ভাবছিল, মহিলা-সারথির নাম জিজ্ঞেস করবে—পরিচয়ের পর্বটা যেন অর্ধসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা নিজে থেকে উত্থাপন করাটা বোধ হয় শোভন হবে না।

কম কথা বলে মেয়েটি। কপালে নেমে আসা গুঁড়ো চুলগুলো বাঁ হাতে ঠিক করে নিয়ে সে বেশ অভ্যস্তভাবেই ডানদিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল। তারপর আধা-আলোকিত পথে আবার যাত্রা শুরু হল। হেড লাইটটা গায়ের জোরে খানিকটা জমি ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারের বুকের ওপর নিজের ছোট্ট জমিদারি ফেঁদে বসেছে। সেই আলোর অংশটুকুতে কয়েকটা পতঙ্গ ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। তারা যেন নতুন আগন্তুককে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বসেছে।

মেয়েটি এবার গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিল, সামনে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলেছে। দক্ষ হাতে তাকে পাশ কাটিয়ে পিছনে ফেলে রেখে আবার এগিয়ে চলল সে। যেতে যেতে বললে, "মাস্টারমশাই হলে গাড়ি থামিয়ে ঘোড়াটার পিছনে কিছুটা সময় কাটাতেন—পরীক্ষা করে দেখতেন কোথাও ঘা আছে কিনা।"

"কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অমিতাভ।

"এইসব ঘায়ে একরকম সর্বনাশা মাছি ডিম পাড়ে—স্ক্রু ফ্লাই। মাস্টারমশাই কিছু ম্যাগট জোগাড় করবার চেষ্টা করছেন।"

মাস্টারমশাই সম্বন্ধে সারথিনীর যে অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে, তা তার কথার ভঙ্গিতেই ধরা যায়।

সে এবার বললে, "আপনাকে একটু কষ্ট দেব। গাড়িটা একবার থামিয়ে সামনের ওই দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে নেব।"

অমিতাভ সারথিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল। রঙটা প্রচণ্ড ফরসা বলা চলে না নিশ্চয়। কিন্তু কোথাও বেশ খানিকটা স্নিগ্ধ লালিত্য রয়েছে। একটা নরম লাজুক ভঙ্গি সাড়ে পাঁচ ফুট দেহটার চারিদিকে লতার মতো জড়িয়ে রয়েছে। অথচ লজ্জায় জড়সড় নয়। মাথায় চুল অনেক—পিছনে বিরাট খোঁপা, দেহের তুলনায় যেন একটু বড়ই, অন্তত বাংলা দেশের মাপে। সাদা ফুলের মালা জড়ানো রয়েছে খোঁপায়।

তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল সারথিনী। হাতে খাবারের বদলে বিরাট ঝুড়ি। অমিতাভ সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অবলীলাক্রমে মোটটা পিছনে রেখে দিল সে।

অভিযোগের সুরেই অমিতাভ বললে, "এ কী কথা। আমরা থাকতে মেয়েরা মোট বইবে!"

হাসির মুক্তো ঝরিয়ে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিতে দিতে মেয়েটি বললে, "মাস্টারমশায়ের কিন্তু ও সব খেয়াল থাকে না। তিনি বলেন, আদিম যুগে মোট বহন করবার প্রিভিলেজটা মেয়েদের একচেটিয়া ছিল।"

অমিতাভ বললে, "এ-যুগে সেটা বাতিল। হেভি ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের প্রতিযোগিতা করতেই দেওয়া হয় না।"

সারথিনী লজ্জাও পেল না, আবার প্রগল্‌ভা হয়েও উঠল না। সহজভাবেই বললে, "প্যাকেটটা এমন কিছু ভারী নয়। অর্ডার দেওয়া ছিল। আজকে না নিয়ে গেলে ক্যাবেজ অ্যাফিডগুলো উপোস করে থাকত। মাস্টারমশাই খুব একসাইটেড—ল্যাবরেটরিতে ওরা বাচ্চা পাড়তে শুরু করেছে। তবে ছ' মাসে ষোলোটা জেনারেশন হবে কিনা সন্দেহ! মাস্টারমশাই বলছেন চোদ্দোটা হলেও মন্দ কী!"

"চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয় তা হলে!" অমিতাভ রসিকতা করলে।

মেয়েটি মৃদু হেসে গাড়ি চালনায় মন দিল। অন্ধকারের বুক ভেদ করে কোন এক অজানা গ্রহের উদ্দেশে যেন জিপটা রকেটের মতো ছুটে চলেছে। অমিতাভ আড়চোখে মহিলার নিপুণ হাত-দুটোর দিকে তাকিয়ে

থাকলেও কোনও কথা বললে না।

এবার বোধ হয় লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। ডায়াল ল্যাম্পের আলোয় হাতের ঘড়িটা দেখে নিল সারথিনী। তারপর গাড়িটা থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে সামনের গেটের পাল্লাটা খুলে দিয়ে আবার গাড়িতে চেপে বসল। গাড়িটা ভিতরে ঢুকিয়ে আবার গেটটা বন্ধ করে এল। অমিতাভ নিজেই গেট বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি বাধা দিয়েছিল : "আপনি অতিথি। যদি এখানে থাকেন, তখন আপনি নিজেই করবেন, আমরা কেউই বাধা দেব না।"

"মানে আপনিও বাধা দেবেন না?"

"মোটেই না!"

আরও কথা হত, কিন্তু রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে পথ-প্রদর্শিকা বেশ জোরেই হর্ন টিপল। গাড়িটা কাঁচা রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলেছে, দু'পাশে খেত।

পথ-প্রদর্শিকা বললে, "নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির মধ্যেই চলে এসেছি আমরা।"

সামনের ছোট্ট একটা কটেজে এবার আলো জ্বলে উঠল। জীমূতবাহন সেন যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছেন, তা বুঝতে অমিতাভর দেরি হল না।

একটা ফতুয়া আর পাজামা পরেছেন ডঃ সেন। তিনি যে জিপের আওয়াজ শোনবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তা তাঁর কথাতেই বোঝা গেল। জীমূতবাহন বললেন, "ইন্দুমতী, তোমরা তা হলে এলে? আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল।"

"গাড়ি দেড় ঘণ্টা লেট ছিল, স্যর।" ইন্দুমতী বললে।

"তাই বুঝি? তা হলে তো তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, ইন্দু।" জীমূতবাহন বেশ বিব্রতভাবেই বললেন।

"না মাস্টারমশাই, কষ্ট কী?" ইন্দুমতীর মিষ্টি উত্তর অমিতাভর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল না।

"এসো এসো, অমিতাভ। তোমারও নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে।" জীমূতবাহন অমিতাভকে স্বাগত জানালেন। তারপর ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা দুঃসংবাদ আছে!"

চমকে উঠেছিল অমিতাভ, "কী দুঃসংবাদ!"

"কোলোরাডা বিট্‌লগুলোকে বাঁচানো গেল না। মড়ক লেগেছে, ইন্দু। তুমি যাবার পরে আরও দু' হাজার আমার চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল।"

মাস্টারমশাই যে গভীর দুঃখ পেয়েছেন তা তাঁর কথাবলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। হতাশ হয়েই যেন প্রশ্ন করলেন, "এখন কী হবে বলো তো, ইন্দু?"

"কী হবে, মাস্টারমশাই। আপনি চিন্তা করবেন না, বাবা তো এখনও ইউ এস এ-তে রয়েছেন। আমি কালই চিঠি লিখে দিচ্ছি—আর এক লট পাঠিয়ে দিতে।"

"তা হলে খুবই ভাল হয়। ডাকের চিঠি কবে গিয়ে পৌঁছবে কিছুই ঠিক নেই। তার থেকে একটা কেবল পাঠিয়ে দাও। বিট্‌লগুলোর তো এ ভাবে মরবার কথা নয়। নিশ্চয়ই ফিডিং-এর দোষ হয়েছিল।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন জীমূতবাহন। যেন ঘড়িটার কাছে বকুনি খেয়েই তাঁর সংবিৎ ফিরে এল। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আই অ্যাম ভেরি স্যরি ইন্দু, রাত অনেক হয়েছে, তুমি তোমার ঘরে চলে যাও।"

শুভরাত্রি জানিয়ে ইন্দুমতী বিদায় নিচ্ছিল। কিন্তু জীমূতবাহন ডাকলেন, "ইন্দু, তোমার টর্চ কোথায়?"

"আনিনি স্যর—কিছু অসুবিধে হবে না।"

"না, না, এটা খুব অন্যায়—কত রকমের পোকামাকড় ঘুরে বেড়ায় এখানে—কয়েকটা কাঁকড়াবিছে সেদিন খাঁচা থেকে পালিয়েছে। কোথায় ঘর-সংসার পেতে বংশ বৃদ্ধি করছে ঠিক নেই।"

ইন্দুমতী হাসতে হাসতে বলল, "আমার বৃশ্চিক রাশি, মাস্টারমশাই।"

মাস্টারমশাই এবার ইন্দুমতীর পায়ের দিকে তাকিয়ে আরও রেগে উঠলেন। "আমার নিজের কাজের অন্ত নেই—এতগুলো পোকামাকড়ের তদারক করতে করতেই পাগল হয়ে যাচ্ছি, এরপর যদি আমাকে তোমাদের জুতোর খবরও রাখতে হয়!"

"কী হল, মাস্টারমশাই?" ইন্দুমতী সলজ্জ হেসে জানতে চাইল।

"তুমি আবার চটি পরেছ! বলেছি না, এটা স্লিপারের জায়গা

নয়—এখানে তোমাকে মোজার সঙ্গে চামড়ার ঢাকা-জুতো পরতে হবে। কেন যে তোমরা আমার কথার অবাধ্য হও, বুঝি না।"

ইন্দুমতী হাসিমুখে বকুনিটা হজম করলে, তারপর মাস্টারমশাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

জীমূতবাহন স্নেহভরা কণ্ঠে অমিতাভকে বললেন, "বড় ভাল মেয়ে আমাদের ইন্দুমতী।"

এবার অমিতাভর দিকে মনোযোগ করলেন জীমূতবাহন। "কাল সকালেই তোমাকে একটা বড় টর্চ দিতে হবে। পোকামাকড়দের কোনও নীতিজ্ঞান নেই!"

অমিতাভ একটু হাসল। জীমূতবাহন বললেন, "আর সময় নষ্ট না করে চল তোমার বাংলোয়। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

"আপনি শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন?"

"আরে চলো চলো। কষ্ট কীসের? তোমার জন্যে আলাদা একটা কটেজ ব্যবস্থা করেছি।"

ছোট্ট কটেজ। জীমূতবাহন নিজেই দরজার চাবি খুললেন। দুটো ঘর। একটায় শোবার ব্যবস্থা, আর একটায় বসবার এবং লেখাপড়া করবার। বেশ ছিমছাম। বিছানা ইতিমধ্যেই পরিপাটি করে সাজানো। একটা কাঠের ওয়ারড্রোবও রয়েছে। লাগোয়া বাথরুম।

জীমূত বললেন, "ভাল করে দেখে নাও। জল সব সময় পাবে। কিন্তু স্যরি—কোনও বাথটাব নেই। দোষটা আমারই। ইন্দু বলেছিল, তুমি বিলেত থেকে আসছ—বাথটাব ছাড়া তোমার খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু আমার সেই ছোটবেলা থেকে ঘটি ঢেলে স্নান করার এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে, বড় হোটেলে গিয়েও বাথটাব ব্যবহার করতে পারি না। তবে তোমার বাথটাবের ব্যবস্থা করে দেব।"

"না না, আমার মোটেই অসুবিধে হবে না। ক'দিন আর বিলেতে ছিলাম?" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"স্নান সেরে জামাকাপড় পালটে নাও, আমি তোমার জন্যে বসছি।" জীমূতবাহন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

"না না, আপনি কেন অপেক্ষা করবেন?" অমিতাভ আপত্তি জানায়।

জীমূতবাহন পকেট থেকে এক টুকরো এলাচ বার করে মুখে পুরতে পুরতে বললেন, "আজ প্রথম দিন, আমার ওখানেই তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি। কাল থেকে তুমি স্বাধীন।"

৩

জীমূতবাহনের বাংলোটা ষাট-সত্তর গজ দূরে। মধ্যে লাল সুরকি দিয়ে রাস্তা—এমন কিছু চওড়া নয়, একটা ছোট গাড়ি কোনওরকমে চলে যেতে পারে। বাংলোটা আকারে একটু যা বড়, কয়েকটা বেশি ঘর আছে।

বাড়িতে আব কেউ থাকে বলে মনে হল না, কারণ জীমূতবাহন সেন নিজেই দরজার তালা খুললেন। ড্রইংরুমটা নিতান্ত ছোট নয়—দেওয়ালে অসংখ্য বই-এর সারি।

জীমূতবাহন বললেন, "আমি চাই আমার সাধের এই নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক। কত দূর থেকে আমার কথার ওপর ভরসা করে তুমি এসেছ।"

অমিতাভ প্রতিবাদ কবল, "আপনার কথা ছাড়াও প্রফেসর ব্ল্যাকারের মুখে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির অনেক খবর শুনেছি আর সায়েন্টিফিক জার্নালগুলোও কিছু কিছু উলটে দেখার অভ্যাস আছে আমার। ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারের জার্নালে আপনার একটা লেখার অনুবাদ ছেপেছে দেখলাম।"

"তুমি ফরাসি জানো?"

"কাজ চালানো গোছের।"

বেজায় খুশি হয়ে জীমূতবাহন বললেন, "খুব ভাল হল—ফরাসি না জানার জন্যে মাঝে মাঝে বড্ড অসুবিধে হয়। ফরাসি এনটমোলজিস্ট জাঁ হেনরি ফেবারের লেখাগুলো আমার খুব ভাল লাগে। ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি কিছু কিছু—কিন্তু অবসর সময়ে তোমার সাহায্যে অরিজিন্যালগুলো পড়া যাবে।"

"নিশ্চয়। ফেবারের কিছু লেখা আমিও মূল ফরাসিতে পড়েছি—সত্যি খুব ভাল লাগে।" অমিতাভ উৎসাহের সঙ্গে বললে।

জীমূতবাহনের এই পরিবেশ অমিতাভর বেশ ভাল লাগছে। জীমূতবাহনের মধ্যে বোধ হয় সেই গুণ আছে, যা গান্ধীজির মধ্যে ছিল—মানুষ দেখলেই, খপ করে মোহিত করে টপ করে নিজের কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন। বিলাসী ব্যবসায়ী, বিখ্যাত ব্যারিস্টার, ডাকসাইটে ডাক্তার, উদীয়মান উকিল, কত প্রতিভাধর কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে সচ্ছল দিন কাটাচ্ছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে একবার সাক্ষাতেই মাথায় ভূত চেপে গেল। পসার প্র্যাকটিসে পিছনে ফেলে রেখে জেলখানায় ঢুকতে হল।

অমিতাভর চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "তোমার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে। আমার হরিমোহন যা রাঁধে, তা বোধ হয় তোমার ভাল লাগবে না।"

"মোটেই খারাপ লাগবে না," অমিতাভ জানায়।

জীমূতবাহন বললেন, "হরিমোহনের পূর্বপুরুষ শিবাজীর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধ করার চেয়েও রান্না করাটা যে অনেক শক্ত, তা হরিমোহনের কাজকর্ম দেখলে বুঝতে পারবে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন ডাক দিলেন, "হরিমোহন, হরিমোহন।"

অমিতাভকে বললেন, "মেক ইয়োরসেলফ ইজি—জুতোটুতো খুলে ফেলে নিজের বাড়ির মতো করে বোসো।"

ডাইনিং টেবিলে হরিমোহন একবার আবির্ভূত হয়ে খাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেও, জীমূতবাহনই অমিতাভর দিকে সব এগিয়ে দিতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "এটা আমার অনেক দিনের অভ্যাস। ছাত্রাবস্থায় হোস্টেল থেকে এই মেয়েলি স্বভাবটা আয়ত্ত করি। সবাই টেবিলে বসত। আমিই ভাত-ডালগুলো এগিয়ে দিতাম।"

অমিতাভ এবারও হাসল। জীমূতবাহন বললেন, "এফ এ ও-র ডাইরেক্টর জেনারেল বি আর সেন মশাই একবার রোমে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেখানেও ভুলে আর একটু হলে আমি নিজেই সার্ভ করতে যাচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছিলাম, বিনয়রঞ্জনবাবু জানতে পারেননি। জানলে হয়তো সব জিনিসটাই লঘু করে দিতেন। বলতেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের খাবারের থালায় অন্ন তুলে দেওয়ার সুযোগটা একটা মস্ত প্রিভিলেজ।"

অমিতাভ উত্তর দিলে, "তা সত্যি। পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা ক্রমশ যেরকম গুরুতর আকার ধারণ করছে তা খুবই চিন্তার বিষয়। এবং এটা খুবই গর্বের কথা, এই সমস্যা সমাধানের নেতৃত্বটি যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি একজন ভারতীয়।"

জীমূতবাহন বললেন, "এবার খাওয়া শুরু করো। কোটি কোটি মানুষ যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনাহারে অর্ধাহারে রাত্রি যাপন করছে এ-সব কথা খাবার সময় মনে না আনাই ভাল।"

খাওয়ার টেবিলেই কত আলোচনা হচ্ছিল। জীমূতবাহনকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল অমিতাভ। চোখদুটো দেখলেই মনে হয় বড় স্নেহপ্রবণ। ভারী সরল মানুষটি।

জীমূতবাহনের চশমাটা যা পুরু, কত পাওয়ার কে জানে! তাকানোর কায়দাতেই বোঝা যায় মাইওপিক। অথচ জীমূতবাহন নিজের সাধনায় পৃথিবীর কত দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। শুধু ভূগোলের দূরত্ব নয়—কালের দূরত্ব। লক্ষ কোটি বছর আগে এই প্রাণহীন পৃথিবীতে যেদিন প্রথম প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল, কিংবা সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি বছর আগের সেই প্যালিওজিক যুগেও জীমূতবাহন যে অনায়াসে বিচরণ করেন, তা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারছে অমিতাভ। মাছেদের বয়স তখন অতি সামান্য (এই কয়েক লক্ষ বছর মাত্র!) সিলুরিয়ান পিরিয়ডে প্রথমে পতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেল। হেমিপটেরাদের এই নিকট আত্মীয়কে শিলীভূত অবস্থায় জীমূতবাহন সুইডেনে দেখে এসেছেন। কিংবা পঁচিশ কোটি বছর আগে কার্বনিফেরাস যুগে ড্রাগনাকৃতি পতঙ্গরা যখন আড়াই ফুট লম্বা পাখা মেলে উড়ে বেড়াত, জীমূতবাহন সে সম্বন্ধেও খবর রাখেন!

কথাপ্রসঙ্গে জীমূতবাহন বললেন, "মানুষের বড়াই করবার মতো কিছুই নেই। যদি কারও তা থাকে, সে এই আরশোলার—যা দেখে আমার মেয়ে মদালসা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়, ঘেন্নায় বমি করে ফেলে। কিন্তু জীবিত প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র আরশোলাই ২৫ কোটি বছরের ঐতিহ্য দাবি করতে পারে।"

অমিতাভ জীমূতবাহনের মোটা কাচের চশমার দিকে অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিল। কিন্তু জীমূতবাহন তা লক্ষ্য করলেন না, আরশোলাদের

সম্বন্ধে তাঁর তখন বেশি চিন্তা।

জীমূতবাহন বললেন, "ভেরি প্রিমিটিভ টাইপ অফ ইনসেক্ট! ওদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। নিজেদের গায়ের রঙ, খাবার জিনিস, সামাজিক ব্যবহার কোনও বিষয়েই আরশোলারা খুঁতখুঁতে হয়নি, তাই আজও তারা টিকে রয়েছে। এবং বহু যুগ পরে অস্তগামী সূর্যের কিরণ বরফে আবৃত এই পৃথিবীর শেষ যে প্রাণীটির ওপর এসে পড়বে, সেও নিশ্চয় একটা আরশোলা।"

জীমূতবাহন সেন কিংবা অমিতাভ মিত্র শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে নিশ্চয় উপস্থিত থাকবেন না। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর নায়কের মতো জীমূতবাহন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, অনাগত কালে মানুষের আধিপত্যের একদিন শেষ হবে। প্রকৃতির সংগ্রামে পরাজিত মানুষকে একদিন রণদর্পী পতঙ্গের হাতে পৃথিবীর আধিপত্য সমর্পণ করে চিরবিদায় নিতে হবে।

অমিতাভর চোখদুটো জীমূতবাহনের খুব ভাল লাগছে। চোখ থেকে মানুষের গভীরতা মাপবার একটা সহজাত শক্তি আছে জীমূতবাহনের। ওকে পাঁচজনের থেকে আলাদা মনে হয়েছে জীমূতবাহনের। সেই আশাতেই তো অমিতাভকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। একজন, অন্তত একজন বিশ্বস্ত তরুণ বন্ধুর প্রয়োজন তাঁর, বিজ্ঞানের পদযাত্রায় যে হবে তাঁর সহযাত্রী।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জীমূতবাহন। অমিতাভকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি বলো, পতঙ্গের হাতে আমাদের এই পরাজয় আমরা বিনাযুদ্ধে মেনে নেব? এখন থেকেই আমাদের কিছু স্টেপ নেওয়া উচিত নয়?"

মুখ খুলে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়নি অমিতাভকে। জীমূতবাহন ওর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন সব বুঝে ফেলেছেন। অমিতাভ এখনও তাঁর পরিকল্পনার কিছু জানে না। কানে না শুনে, নিজের চোখে সব কিছু দেখুক অমিতাভ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অমিতাভ ও জীমূতবাহন বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। চাঁদ ওঠেনি। কিন্তু তারায় তারায় ছেয়ে রয়েছে আকাশের উঠোন।

তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে অমিতাভ। ওর মনটা যে একটু কাব্যিক তা জীমূতবাহন সহজে বুঝতে পারেন। তারাদের দিকে তাকিয়ে অমিতাভর কী মনে হয় কে জানে। হয়তো মনে হয় কোনও শাড়ির আঁচলের সোনালি চুমকি, কিংবা স্বর্গ দেওয়ালীতে লক্ষ প্রদীপের সমারোহ। কিন্তু জীমূতবাহনের মনে হয়, পৃথিবীর মতো স্বর্গেও নিশ্চয় পতঙ্গের পরাক্রম আছে। তারাগুলো যেন সুদূরের পতঙ্গ।

আজ না হয় বয়স হয়েছে জীমূতবাহনের ; সংসারের আগুনে জ্বলেপুড়ে তাঁর সমবয়সী অনেকেই হয়তো কুসুমে কেবল কীট দেখেন। কিন্তু যখন তাঁর বয়স কম ছিল, যখন সবে তিনি বিবাহ করেছেন, সবুজ সম্ভাবনার দিনগুলো যখন সামনে নরম কার্পেটের মতো পেতে দেওয়া হয়েছে, তখনও তারকাতে পতঙ্গ দেখেছেন জীমূতবাহন।

ঈশিতা, তাঁর স্ত্রী, নববিবাহিতার সলজ্জ আভায় তখনও রঙিন হয়ে ছিল। কলকাতায় প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে ওদের বাড়ির পিছনে সবুজ ঘাসভরা যে বিরাট লন ছিল সেখানে জীমূতবাহনকে নিয়ে গিয়েছিল ঈশিতা। খোঁপায় ফুল পরেছিল ঈশিতা—আর দুটো বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে গুনগুন করে গান গেয়েছিল, "আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে নিদ্রাবিহীন গগনতলে।"

বোধ হয় ঈশিতা বুঝেছিল, মরমে সে গান ঢুকছে না। তাই বোধহয় বলেছিল, "কী হাঁদা-গঙ্গারামের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ?"

মনে যে একটু আঘাত লাগেনি এমন নয়। কিন্তু জীমূতবাহন এ-সব সহ্য করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই জগদানন্দ বসুর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। ঈশিতা বলেছিল, "জানো, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তোমার খবরাখবর চেয়েছেন।"

"আমার খবর! পৃথিবীতে এত লোক থাকতে গ্রাম্য স্কুলের পাশ করা জীমূতবাহনের খবর নিতে চেয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!"

ঈশিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "তার কারণ তুমি ঈশিতার স্বামী—আমাকে কবিগুরু খুব স্নেহ করেন। জন্মদিনে কবিতা লিখে দিয়েছেন। অসুস্থ হয়ে না পড়লে বিয়েতে ঠিক আসতেন, হয়তো একটু বড় কবিতাই লিখে ফেলতেন। এখন সুস্থ হয়েই তোমার খবরাখবর জানতে চেয়েছেন। একবার জোড়ে শান্তিনিকেতন যেতেও বার বার

অনুরোধ করেছেন।”

ঈশিতা বলেছিল, “তুমি নিজেই ওঁকে চিঠি লেখো না—একটা খামের মধ্যে দু'জনের চিঠি পাঠিয়ে দিই। খুব খুশি হবেন, নিশ্চয় উত্তর দেবেন।”

“রবীন্দ্রনাথকে? ওরে বাবা, মরে গেলেও নয়!”

“কেন, তোমার বাংলা বানান ভুল হয় নাকি? সায়েন্সের ছাত্র, হলেও হতে পারে, কিন্তু আমি তো রয়েছি, দেখে দেব।”

“পাঠশালায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগটা যত্ন করে পড়তে হয়েছিল, তাই বানান ভুল হয় না—কিন্তু একেবারে কাঠখোট্টা মানুষ। একটুও রসকষ নেই,” জীমূতবাহন বলেছিলেন।

“রস না থাকুক, কষ যে আছে সেটা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছ।” অভিমানিনী ঈশিতা উত্তর দিয়েছিল।

রোমান্সের সেই অবমাননা ঈশিতা বোধহয় আজও ভুলতে পারেনি। কিন্তু কী করবেন জীমূতবাহন? কোটি কোটি কীটপতঙ্গের জীবনে আদিম রোমান্সের যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তার গহনে একবার প্রবেশ করলে অন্য কিছুতেই আর রস পাওয়া যায় না।

ঈশিতা যদি তার মধ্যে প্রবেশ করত, সেও নিশ্চয় সমান আনন্দ পেত। মানুষের সমাজে যে উত্থান-পতন চলেছে, পিঁপড়ের সামাজিক কাহিনী কি তার থেকে কম রোমাঞ্চকর? ধরিত্রীর বক্ষ খনন করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মহেঞ্জোদারোর যে ইতিহাস অতীতের আলিঙ্গন থেকে উদ্ধার করেছেন, তা অবশ্যই আকর্ষণীয়; কিন্তু মাটির গর্ভে উই পোকার নগরে যে রমণী প্রতিদিন সাত হাজার সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এবং অলিখিত সংবিধানের বলে ত্রিশ লক্ষ নাগরিকের উপর কৃতিত্ব করছে, সেও কি কম আকর্ষণীয়?

ঈশিতাকে জীমূতবাহন কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, “জানো, উইদের রানিকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গেছে। প্রতিদিন সাতহাজার ডিম পাড়লে অর্ধ-শতাব্দীতে কত হয় ভেবে দেখো তো!”

ঈশিতা কোনও বিস্ময় বোধ করেনি, বরং ঘেন্নায় তার গা ঘিনঘিন করতে শুরু করেছিল। বলেছিল, “সবে মাত্র খেয়ে এসেছি—এখন এই সব বলতে আরম্ভ করলে বমি হয়ে যাবে আমার।”

কিন্তু ঈশিতার অতীত রোমন্থনের অনেক সময় পাওয়া যাবে ; এখন বরং অমিতাভর মনে যে-সব প্রশ্ন জাগতে পারে তার উত্তর দেওয়া যাক।

জীমূতবাহন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আচমকা ঝাঁকানি খেয়ে উঠে পড়ে অমিতাভকে বললেন, "তুমি সিগারেট ধরাচ্ছ না কেন, অমিতাভ? নিজে সিগারেট খাই না, কিন্তু তাই বলে 'নাদার মধ্যে কুকুরের' পলিসি অনুসরণ করি না আমি।"

অমিতাভ তখনও ইতস্তত করছিল দেখে জীমূতবাহন নিজেই ভিতর থেকে সিগারেট নিয়ে এলেন। বললেন, "জাপানী অধ্যাপক মিচিকানা কিছুদিন এখানে আতিথ্য নিয়েছিলেন। তিনি চুরুটের ভক্ত নন। সিগারেট না হলে তাঁর চলত না—সেই সময় কিনে রেখেছিলাম।" জীমূতবাহন সিগাবেট এগিয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিলেন। নিজেও এবাব একটা চুরুট ধরালেন তিনি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে অমিতাভ। ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো প্রশ্নচিহ্নের আকার ধারণ করে জীমূতবাহনকে সেই সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে যা অমিতাভ সোজাসুজি বলতে পারছে না।

অন্তত জীমূতবাহনের তাই মনে হল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি তাই অমিতাভকে বললেন, "তোমার যা-যা জানতে ইচ্ছে করছে আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলো।"

অমিতাভ কোনও উত্তর দিলে না।

"চুপ করে রইলে কেন, অমিতাভ? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের বলতেন—ইউ মাস্ট আস্ক কোয়েশ্চেন্‌স।"

"প্রফেসর ব্ল্যাকারের কাছে শুনেছি, আপনি নতুন করে কিছু করার স্বপ্ন দেখেছেন," অমিতাভ ধীরে ধীরে বললে।

"স্বপ্ন অনেকেই দেখে, অমিতাভ। আসলে সারাজীবন ধরে যা দেখে এলাম সে কি শুধু স্বপ্ন, না তার কোনও বাস্তব সম্ভাবনা আছে? সেইটাই আজকে আমার কাছে, শুধু আমার কাছে কেন, সমাজের কাছে, এমনকি আমার বাড়ির লোকের কাছেও মস্ত বড় একটা প্রশ্ন।"

"মানে?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"মানে, মনে করো পরীক্ষার হলে বহুক্ষণ ধরে একটা জটিল অঙ্ক কষে যাচ্ছ। অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা তুমি নিজেই বুঝতে পারছ

না, অথচ সময় ফুরিয়ে,আসছে। এই অবস্থায় তুমি কি সেই অঙ্কটাই কষে যাবে, না অন্য কোনও সহজ অঙ্ক ধরবার চেষ্টা করবে?"

সিগারেট টানা বন্ধ করে অমিতাভ যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর কথা শুনছে, জীমূতবাহন এবার তা বুঝতে পারলেন। নিজের উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, "একদিন তোমার ঘাড়ে সব ডেটা চাপিয়ে দিতে চাই না। আস্তে আস্তে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। এখন মোটামুটি দরকারি কথাগুলো বলে দিই।"

"বলুন স্যর।"

"তুমি জানো, আমি পেস্টিসাইডের ওপর কাজ করে প্রথম-বৈজ্ঞানিক জগতে নাম করেছিলাম। পৃথিবীতে আমাদের অনেক ফসল দরকার। যদি এতগুলো মানুষকে দু' বেলা খাওয়াতে হয়, তাহলে পোকামাকড়ের হাত থেকে কৃষিপণ্যকে রক্ষা করতেই হবে। ধানের মাজরা পোকা, স্টেম বোরার অর্থাৎ Schoenobius bipunctifera এবং পামরী পোকা—রাইস হিস্পা (Hispa armigera)-এর উপর প্রথম কাজ আরম্ভ করি।"

অমিতাভ বললে, "আপনার গোড়ার যুগের সেই রিপোর্ট ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখনও পড়ে থাকে। হাইমেনোপটেরা, নিউরোপটেরা ও কোলিওপটেরার ওপর আপনার কয়েকটা কাজ তো ক্লাসিক স্বীকৃতি পেয়েছে।"

অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "সে সব কাজের পর বিজ্ঞানের বহু অগ্রগতি হয়েছে—জাপান এবং স্টেটসের বৈজ্ঞানিকরা অনেক নতুন আলোকসম্পাত করেছেন। ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া সেন্‌স রিপোর্টের আর কোনও মূল্য নেই আজ। আর কবে মান্ধাতার আমলে একটা কিছু করে, সেই নাম ভাঙিয়ে বাকি জীবনটা কুঁড়েমি করে এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাও আমি ঘৃণা করি।"

"ভারতীয়দের এ-রকম একটা বদনাম আছে বটে—খুব ভাল স্টার্ট এবং ব্যাড ফিনিস।" অমিতাভ তার নিজের মত জানাল।

"অথচ সব ভাল যার শেষ ভাল।" জীমূতবাহন এবার অমিতাভর কথার সূত্র ধরলেন। "আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, কেমিক্যাল কন্ট্রোল ছাড়া পতঙ্গের এই পরাক্রম থেকে কৃষির মুক্তি নেই। আমেরিকায় সেই সময়

পাগলের মতো পরিশ্রম করেছিলাম এবং ভাগ্যের দেবতা স্মিতহাস্যে আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিপাতও করেছিলেন।”

অমিতাভ বিস্মিতভাবে জীমূতবাহনের কথা শুনে যাচ্ছিল। “আপনি কেমিক্যাল পেস্টিসাইডে দুটো পেটেন্ট পেয়েছিলেন, তাই না?”

“‘অত অল্প সময়ের মধ্যে দুটো পেটেন্ট্ পাওয়া নিতান্ত ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কী বলব? অনেকে তখন বলেছিল, নিজের ফার্ম চালু করো—ক্রমশ বড় কোম্পানি হয়ে উঠবে। নিজের আবিষ্কারকে মূলধন করে যাঁরা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের বিশ্বজোড়া নাম হয়েছে—আলফ্রেড নোবেল, হেনরি ফোর্ড, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, মার্সিজ মার্কনি ও আর্নেস্ট ফন সীমেন্স—আরও কত নাম বলতে পারি।”

“করলেন না কেন? পৃথিবীর রসায়ন শিল্পে একজন ভারতীয়ের নাম অন্তত পরিচিত হয়ে যেত,” অমিতাভ প্রশ্ন করে।

জীমূতবাহন বললেন, “অনেকে যেমন বিশ্বজোড়া কোম্পানি ফেঁদেছেন, তেমন আবার অনেকে দেউলিয়াও হয়ে গিয়েছিলেন।”

“সেটা তো অ্যাডভেঞ্চারের প্রশ্ন। চেষ্টা করে হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা আছে?” অমিতাভ জানতে চায়।

“না অমিতাভ, ব্যবসা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ গবেষণা। তা ছাড়া, আমার এক এক সময় কীটনাশক ইনসেকটিসাইড-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।”

‘মানে, আপনি কী বলতে চান? রাসায়নিক কীটনাশক আবিষ্কৃত না হলে পৃথিবীতে এতদিন দুর্ভিক্ষ লেগে যেত। পোকামাকড় পৃথিবীময় চাষের যে সর্বনাশ করছিল—ইনসেকটিসাইড তার হাত থেকে মানুষকে বক্ষা করেছে।”

জীমূতবাহন চুরুটে আর একটা টান দিয়ে বললেন, “কীটনাশক ছাড়া এগ্রিকালচারের কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না—স্বীকার করি। আমাদের দেশেই প্রতি বছর এক হাজার কোটি টাকা দামের খাদ্যশস্য পোকামাকড় এবং জন্তুজানোয়াররা নষ্ট করছে। কোটি কোটি টাকার কীটনাশক খেতে খেতে বিভিন্ন সময় স্প্রে করা দরকার। পৃথিবীর অন্য দেশেও তাই হচ্ছে—এরোপ্লেন এবং হেলিকপ্টার পর্যন্ত এই কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে ক্রমশই চিন্তিত করে তুলছে

তা হল পতঙ্গরাও বাঁচবার নতুন পথ খুঁজে বার করছে।”

একটু থেমে জীমূতবাহন বললেন, “কীটনাশকে প্রথম দিকে যে-রকম কাজ হত ইতিমধ্যেই আর ততটা হচ্ছে না। এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন পতঙ্গের সহ্যশক্তি এমন বেড়ে যাবে যে, মানুষের তৈরি এই ইনসেকটিসাইডে আর কোনও কাজই হবে না। মশা, মাছি, বিট্‌ল, মথ এরা মহানন্দে রসায়নকে অবজ্ঞা করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে যাবে।”

অমিতাভ বললে, “সেদিন এখনও অনেক দূরে।”

জীমূতবাহন বললেন, “দূরে, কিন্তু হয়তো খুব দূরে নয়। আগে যেখানে ফাইভ পারসেন্টে কাজ হত, এখন সেখানে দশ পারসেন্ট দিতে হচ্ছে, তাতেও সব সময় মনের মতো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। পোকারা নীলকণ্ঠ হবার সাধনা করছে।”

অমিতাভ উত্তর দেয়, “কয়েকটা বড় বড় কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি দেখেছি আমি। নতুন নতুন বিষ বার করবার জন্যে নিরন্তর গবেষণা চলছে। সেই সব ছড়িয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা শিশু চারাদের সর্বভুক পোকাদের হাত থেকে রক্ষা করবে।”

জীমূতবাহন বললেন, “রাসায়নিক যুদ্ধ যারা করছে, করুক। কিন্তু এর বিপদের দিকটা যে ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে উঠবে, এ সম্বন্ধে আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই। নির্বিচারে বিষ ছড়িয়ে, প্রকৃতির রাজ্যে, আমরা ইতিমধ্যে বহু সর্বনাশ করেছি। শত্রু পোকার সঙ্গে, যে-সব পোকা মানুষের বন্ধু, আমরা তাদের নির্বংশ করে ফেলে, নতুন বিপদ ডেকে আনছি।”

“নিখাদ আশীর্বাদ বলে কোনও জিনিস তো পৃথিবীতে নেই। একদিন বাষ্পীয় রেল-ইঞ্জিন আমাদের জন্যে নতুন আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল, কিন্তু তার সঙ্গে এসেছিল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার ভয়ে রেলপথ বিস্তার বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ভাল হত কি?” অমিতাভ নিজের মত জানায়।

কিন্তু জীমূতবাহন এই বিষয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি বললেন, “মোটর গাড়ি না থাকলে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে লোক মারা যেত না—সুতরাং মোটর গাড়ি না হওয়াই ভাল ছিল, এমন মতে নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করি না অমিতাভ। কিন্তু নির্বিচারে ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করে

আমরা ভবিষ্যৎ মানব জাতির দৈহিক ক্ষতি করছি, একথা পশ্চিমের অনেক বৈজ্ঞানিক এখন বলছেন। বৈজ্ঞানিক জার্নালের সীমা পেরিয়ে, মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও এ-সম্বন্ধে কথা উঠছে। আমরা বোধহয় ধীরে ধীরে অনেক শস্যকে বিষাক্ত করে ফেলছি। গরু-বাছুররা এই সব খড় এবং ঘাস খাচ্ছে। তাদের দুধ থেকে এইসব বিষ তোমার আমার ঘরে ফিরে আসছে। কোটি কোটি অনাগত শিশুর ওপর একদিন এই বিষের কী ক্রিয়া হবে, তা এখনও আমাদের জানা নেই।"

অমিতাভ বললে, "তা হলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে চাষা? দেখবে তার সোনার খেত ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ এসে লুট করছে?"

"না তা বলছি না।"

"তবে?"

"কেমিক্যাল কন্ট্রোল আমি ছেড়ে দিতে বলছি না—আরও অনেকদিন ধরে এই সব বিষ আমাদের চাষ-আবাদ রক্ষা করতে সাহায্য করবে। কিন্তু অন্য যে সব পথ রয়েছে, সে সব সম্বন্ধে আরও বেশি করে চিন্তা করবার সময় এসে গিয়েছে। আমার এই ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে সেই নিয়েই তো কাজ চালাবার চেষ্টা করছি।"

"আপনি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের কথা বলছেন?"

জীমূতবাহন বললেন, "ক্যালিফোর্নিয়ায় একবার কটনি কুশন স্কেল পোকার অত্যাচার শুরু হল। অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড থেকে কীভাবে তারা আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় তাদের বংশ তেমন দ্রুত বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় তারা এত বেড়ে যাচ্ছে কেন? এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে আলফ্রেড কীবিল নামে এক ভদ্রলোককে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হল। তিনি সেখানে ওই পোকার জন্মগত শত্রু আর এক পোকাকে আবিষ্কার করলেন। লেডি বার্ড বিট্‌ল এনে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছেড়ে দিতেই মন্ত্রের মতো ফল পাওয়া গেল।"

একটু কেশে জীমূতবাহন বললেন, "আমার বন্ধু ডাক্তার মায়ার পোকা দিয়ে পোকা তাড়ানোর যে আশ্চর্য ফল হাওয়াই দ্বীপে পেয়েছেন, তা তো গল্পের মতো শোনায়। ফিজিতে লেভুয়ানা মথকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। সেখানে ট্যাকিনিড প্যারাসাইট ছেড়ে দিতেই কাজ পাওয়া গিয়েছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন এবার চমকে উঠলেন, বললেন, "প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। এখন আর আলোচনা নয়। আলোচনা করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। দু'দিন ট্রেন জার্নি করে তোমার এখন ঘুমের প্রয়োজন। যতক্ষণ খুশি ঘুমিয়ে থেকো।"

জীমূতবাহন নিজে অমিতাভকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। অমিতাভর ঘরে খাবার জল দেওয়া হয়েছে কিনা নিজে দেখলেন। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

৪

অমিতাভর কটেজ থেকে নিজের বাংলোয় ফিরে আসছেন জীমূতবাহন। তিনি ছাড়া নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সব মানুষ এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এক নম্বর শেডে পতঙ্গদের কনসার্ট শুরু হয়েছে। কত রকমের অদ্ভুত আওয়াজ তাদের—কিন্তু সব মিলে সুন্দর ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে। ওদিকে বাইরের পতঙ্গ শিল্পীরাও অনাহূত হয়েই আসরে যোগ দিয়েছে। ল্যাবরেটরির খেতে অনেক ঝিঁঝিঁ জমা হয়েছে নিশ্চয়—তারাও সঙ্গীত সম্মেলনে মনের সুখে সুর ধরেছে।

টর্চের আলোটা খেতের ওপর ফেললেন জীমূতবাহন। আলোটা অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়ে গেল—কিন্তু ল্যাবরেটরির সীমানার বাইরে নয়। পঞ্চাশ একর জমি নিয়ে এই ল্যাবরেটরি।

একবার শেডে যাবেন নাকি? কাটুই পোকা Agrotis ypsilon-গুলোর খবর নিয়ে এলে হয়। নতুন অতিথি। মাদ্রাজ থেকে আনিয়েছেন তিনি।

কাটুই পোকার জীবনটা আরও ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখবেন জীমূতবাহন। ডিউটি আর টক্সোফিন দিয়ে এদের এখনও নিধন করা হচ্ছে। কিন্তু আর কতদিন? রাতের অন্ধকারে এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে, আলু, ছোলা, তামাক, তুলো এবং মটর গাছের চারার গোড়া কেটে দেয়। সেবার একবছরে একলক্ষ একর জমির চাষ নষ্ট করে দিয়েছিল কাটুই পোকারা।

না, কাল সকালে এদের খোঁজ খবর নিলে চলবে। সেই সঙ্গে আর

একজন অতিথি অমিতাভ মিত্রর খবরও নেওয়া যাবে'খন। টর্চটা হাতে নাচাতে নাচাতে জীমূতবাহন ডান দিকে মোড় ফিরলেন। কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে একবার খামারের পশ্চিম কোণের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে টর্চের আলোটা জ্বালছেন আর নেভাচ্ছেন। যেন অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে।

সাত নম্বর প্লটের কাছাকাছি এসে জীমূতবাহন টর্চ জ্বালানো বন্ধ করে দিলেন। যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এসেছেন তারা আলো পছন্দ করে না। ধানের চাষ হয়ে রয়েছে কয়েক কাঠা জমিতে। গাছগুলো দু'দিন আগেও নীরোগ ছিল। হাওয়াও দুলে দুলে সুস্থ সবুজ শিশুরা তখন জীমূতবাহনকে অভিবাদন জানিয়েছিল। সঙ্গে ছিল ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী বোধ হয় মাস্টারমশাইয়ের হাবভাব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। "কী ভাবছেন মাস্টারমশাই?" ইন্দুমতী প্রশ্ন করেছিল।

"ভাবছি, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে তা এই চারাদের দিকে তাকিয়ে যে কেউ বলে দিতে পারে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তোমার কি মনে হচ্ছে না এরা জীবন্ত? আমাদের দেখে এই সব শিশুরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।"

ইন্দুমতী বলেছিল, "মাস্টারমশাই, আপনি বোধ হয় আমাদের থেকে অনেক বেশি দেখতে পান। ওরাও বোধ হয় বুঝতে পারে, আপনি ওদের বন্ধু।"

খুব খারাপ লেগেছিল, এই সুস্থ সবল নীরোগ শিশুদের মধ্যে রাক্ষসদের ছেড়ে দিতে। কিন্তু ওরা যে গিনিপিগ।

"এদের মধ্যে কী ছাড়ছেন, মাস্টারমশাই?" ইন্দুমতী প্রশ্ন করেছিল।

জীমূতবাহন বলেছিলেন, "সোয়ারমিং কেটারপিলার—বৈজ্ঞানিক নাম স্পোডোপটেরা মরিসিয়া। শিশু ধান চারার চরম শত্রু। বাংলা দেশের চাষীরা বলে লেদা পোকা। জমিতে এদের দেখলে চাষীদের ঘরে কান্না শুরু হয়ে যায়।"

ধান খেতের খুব কাছে এসে পড়েছেন জীমূতবাহন। আলো না জ্বালিয়েই খপ করে একটা চারায় হাত দিলেন তিনি। যা ভেবেছেন তাই—তাঁর হাতেই গোটা পাঁচেক লেদা পোকা ছটফট করছে। রাতের অন্ধকারে তারা নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে। দিনের বেলায় মাটির

তলায় খুনেগুলো লুকিয়ে থাকে, নিরীহ চাষী বুঝতে পারে না। তারপর রাত্রে অন্ধকারে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কত চাষীর ঘরে ঘরে কান্না ওঠে—সোনার ধানে তাদের মাঠ আর ভরে উঠবে না।

লেদা পোকাগুলো হাতের মধ্যে থেকে পালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে—জীমূতবাহনের হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এখনই টিপে মেরে ফেলে একটা চারাগাছকে অন্তত তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু মাত্র দুটো হাতে ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর ক'জনকে তিনি উদ্ধার করবেন? ভারতবর্ষের বিশাল মানচিত্রটা জীমূতবাহনের মানসচক্ষে ভেসে উঠল। তিনি দেখলেন, ধানের চারা দিয়েই যেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমির সুবিশাল মানচিত্রটা তৈরি হয়েছে। পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে কোটি কোটি শিশু হঠাৎ ক্রন্দন শুরু করেছে।

এবার আলো জ্বালালেন জীমূতবাহন। সমস্ত গাছগুলোর রঙ রাতারাতি পালটিয়ে গিয়েছে। সোয়ারমিং কেটারপিলারের দল মরণ আলিঙ্গনে চারাদের আবদ্ধ করেছে। কিন্তু একা তিনি কী করবেন? ভারতবর্ষের কৃষকরা জানে না, একটা ঋতুতেই এরা পাঁচটা বংশধারা বিস্তার করতে পারে।

কেমন যেন মায়া হল জীমূতবাহনের। তাঁর গবেষণার জন্যে চারাগাছগুলো মৃত্যুবরণ করছে—না হলে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির চতুঃসীমানায় লেদা পোকাদের ঢোকার সাধ্য থাকত না। কাল সকালবেলায় সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কীটদের আর দর্শন মিলবে না—তখন মেপে দেখতে হবে একদিনে কত ক্ষতি করতে পেরেছে এরা।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে চারাগুলোকে সঁপে দিয়ে জীমূতবাহন এবার নিজের বাংলোর দিকে চলতে লাগলেন। ঝিঁঝিরা তাদের বাজনা বাজিয়ে চলেছে—এদের কোনও ক্লান্তি নেই।

বাড়িতে ফিরে এসেই যদি জীমূতবাহন ঘুমোতে পারতেন, কেমন সুন্দর হত।

কিন্তু জীমূতবাহনের এক এক দিন কী হয়, কিছুতেই ঘুম আসে না। একদিক দিয়ে তিনি ভাগ্যবান, সাধারণত ঘুমকে ডাক দিলেই এসে হাজির হয়। ঘুমকে ডেকে কতবার জীমূতবাহন কত সর্বনাশ দুশ্চিন্তার হাত থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পেয়েছেন! কিন্তু মাঝে মাঝে কী যে হয় ঘুমদের বাড়ি ফেরার কথাই মনে থাকে না।

শেষ যেবার কলকাতায় ঈশিতার সঙ্গে দেখা হল, বোনের বাড়ির কী একটা বিয়ে নিয়েই সে দিন-রাত ব্যস্ত থাকত। কতদিন পরে কলকাতায় এসেছেন জীমূতবাহন! কিন্তু ঈশিতা বাপের বাড়ির আত্মীয়দের নিয়েই মশগুল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন দেখেছেন দশটা বাজল, এগারোটা বাজল, রাত সাড়ে এগারোটার সময়েও ঈশিতার দেখা নেই। বারোটায় গাড়ি গ্যারেজে তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কিন্তু ঈশিতাকে তিনি কিছুই বলেননি। শুধু একবার তার দিকে তাকিয়েছিলেন। ঈশিতা তা-ও সহ্য করতে পারে না। বিরক্তভাবে বলেছিল, "তোমাকে দেখলে সত্যি হিংসে হয়। সমাজ, সংসার, আত্মীয়স্বজনের কথা না ভেবে কেমন নিজেকে নিয়েই খুশি হয়ে রয়েছ।"

"মানে?" জীমূতবাহন প্রশ্ন করেছিলেন।

'মানে, আমার বাবাও হাইকোর্টের একজন নামজাদা ব্যারিস্টার ছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁকেও কাজ করতে হত। কিন্তু তবুও তিনি সামাজিকতার সমস্ত দায়িত্ব আমার মায়ের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। মাঝে মাঝে নিজেও যেতেন পার্টিতে। সবার সঙ্গে দেখাশোনা করে ফিরে আসতেন। বৈজ্ঞানিককে নিশ্চয় হাইকোর্টের টপ ব্যারিস্টারের থেকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় না।"

বিরক্তভাবে জীমূতবাহনের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, "আজকের পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকের অনেক বেশি ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন।" কিন্তু কী হবে ঈশিতার সঙ্গে তর্ক করে? ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে তর্ক করে কোনওদিন পেরে উঠবেন না।

তর্ক চানও না জীমূতবাহন। শুধু একটু শান্তি চান—অখণ্ড শান্তিতে নিজের সাধনায় মগ্ন থাকতে চান।

যে ঈশিতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল সে আর এই ঈশিতা কি এক? বিয়ের পর সেই মধুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে জীমূতবাহনের। স্বামীকে নিয়ে হইহই করবার, নিজের দলে টানবার জন্যে ঈশিতার কী উৎসাহ!

স্বামীর কোলে মাথা রেখে মুখ ভার করে ঈশিতা বলেছে, "গুরুদেবের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় রইল না। আমাকে দেখেই বললেন, একা কেন? বরকে নিয়ে আসতে পারলি না?"

"তুমি কী উত্তর দিলে?" জীমূতবাহন জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার জন্যে এক কাঁড়ি মিথ্যে কথা বলতে হল।"

প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের জগদানন্দ বসুর বাড়িতে তিনি যে জামাই হয়ে প্রবেশ করতে পারবেন, জীমূতবাহনের কাছে এটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা।

ব্যারিস্টার জগদানন্দ বসুর কন্যারা তখন কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহলে আলোচনার বস্তু। বেথুনের বসু-বালিকারা তখন সর্বগুণান্বিতা বলে স্বীকৃত। এরা গান গায়, আসরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করতে এদের সঙ্কোচ নেই। এরা ঝুড়ি ঝুড়ি গয়না আর জমকালো কাজ-করা শাড়ি পরে লোকের চোখ ধাঁধায় না; অথচ এদের কথাবার্তা, চালচলন, বেশভূষায় রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বসু-বালিকারা যা পরেন, সেইটাই আধুনিক ফ্যাশান হয়ে যায়।

কী করে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন জীমূতবাহন? সেই সব স্মৃতি রোমন্থনের সময় পাওয়া যাবে অনেক। এখন কেবল ঈশিতার সেই অভিমানের দিনটির কথা মনে পড়ছে। তখনও বোধ হয় সম্পূর্ণ আশা ছেড়ে দেয়নি ঈশিতা। ভেবেছিল, স্বামীর জড়তা কাটিয়ে তাকে সামাজিক জীব করে তুলতে পারবে সে।

তাই আনন্দে বিগলিত হয়ে ঈশিতা বলেছিল, "তোমার সাবজেক্টেও আমাকে একটু পড়িয়ে-শুনিয়ে নিয়ো তো।"

বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন জীমূতবাহন। প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন বলো তো?"

"গুরুদেবের কাছে বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। উনি গান গাইতে বললেন। গান গাইলাম। এ-কথা সে-কথার পর বললেন, 'তোর বর কী

করে?' বললাম, কেমেস্ট্রি এবং পোকামাকড়ের জীবন-বৃত্তান্ত দুটো নিয়েই মত্ত হয়ে থাকে।

"কবিগুরু শুনে বেজায় খুশি। বললেন, 'এটা একটা অদ্ভুত বিষয়। এ নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কাজ করবার আছে।' তারপর বললেন, 'তোর তা হলে খুব মজা। কত পোকামাকড়ের ঘরের কথা জানতে পারছিস।'"

"আমি বললাম, পৃথিবীতে এত সুন্দর জিনিস থাকতে পোকামাকড় নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কেন?"

"কবিগুরু রসিকতা করে বললেন, 'তোর সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখি। আমার বন্ধু রায়মশাইয়ের বই পড়ে এই সব শিখেছি। বল দেখি ঝিল্লীপক্ষ পতঙ্গ বলতে কাদের বোঝায়?'

"চুপ করে ছিলাম আমি। কবিগুরু বললেন, 'পারলি না তো—বোলতা, ভীমরুল, কুমার-পোকা এগুলো হল ঝিল্লীপক্ষ পতঙ্গ। আর গোবরে পোকা, উকুন, ঘুণ এরা হল কঠিনপক্ষ পতঙ্গ। এদের চারটে ডানা থাকে—উপরকার ডানা দু'খানা হাড়ের মতো শক্ত।'

"গুরুদেবের কাছে হেরে চলে এসেছি। ভাবছি পতঙ্গবিদের পত্নী যখন হয়েছি তখন এ-সব জেনে রাখব।" ঈশিতার কথাগুলো জীমূতবাহনের বেশ মনে আছে।

আর মনে আছে সহপাঠীদের কথা। বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে তারা বলেছিল, "এতদিন জে বি সেন ছিলিস, এবার আই বি সেন হবি।"

জীমূতবাহন ঠিক বুঝতে না পেরে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। তারা বলেছিল, "জীমূতবাহন এবার ঈশিতাবাহন হবে!"

ইঙ্গিতটা মোটেই ভাল লাগেনি জীমূতবাহনের। তিনি যদি কারও সেবক হন সে বিজ্ঞানের। বড় জোর বি বি সেন অর্থাৎ বিজ্ঞানবাহন সেন হবেন, কোনও দিন আই বি সেন হচ্ছেন না তিনি।

এ-সব পুরনো কথা জীমূতবাহন আজ রাত্রে শুধু শুধু কেন ভাবছেন, তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। এখন একটু ঘুমোলে শরীরটা হালকা হত। কিন্তু বোধ হয় ঘুম আসবে না। কারণ অমিতাভর কথাও আবার মনে পড়ছে। সে-বেচারা নিশ্চয় এতক্ষণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে তাঁর। এখন প্রশ্ন, রাখতে পারবেন তো?

জীমূতবাহনের বয়স হচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠান তিনি নিজের রক্ত দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলছেন, সেখানকার সাধনার ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে মানুষ চাই। অমিতাভর কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা।

৫

"নমস্কার", কটেজের ড্রইংরুমে একটা ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় দূর থেকে ইন্দুমতীকে দেখেই অমিতাভ প্রভাতের শুভেচ্ছাটা ছুড়ে দিল।

গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে ইন্দুমতী অমিতাভর ঘরে ঢুকে পড়ল। নমস্কার জানিয়ে বলল, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো।"

"ঘুম ভালই হয়েছিল। দু'দিন রেলযাত্রার শোধ এক রাতেই তুলে নিয়েছি।" অমিতাভ হাসতে হাসতে বললে।

ইন্দুমতী একটা আশ্বস্ত হল। "তা-ও ভাল। আমার ভয় হচ্ছিল মাস্টারমশাই হয়তো বহুরাত পর্যন্ত আপনাকে জাগিয়ে রাখবেন। ল্যাবরেটরি এবং গবেষণা সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলে ওঁর কোনও খেয়ালই থাকে না।"

"তাই নাকি?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করলে।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে ইন্দুমতী বললে, "সেবার টোকিও থেকে প্রফেসর মিচিকানা যখন এলেন, দুই বন্ধুতে খাওয়া-দাওয়ার পর একদিন আলোচনা করতে বসলেন। তারপর কখন যে রাত কেটে গেছে দু'জনের কেউ খেয়াল করেননি। সকালবেলায় প্রফেসর মিচিকানার খবর নিতে এসে দেখি খুব ঘুমোচ্ছেন—শুনলাম সাড়ে পাঁচটার সময় শুতে এসেছেন, তাও মাস্টারমশাই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন।"

অমিতাভ হাসতে হাসতে বললে, "না, আমার সমস্ত রাত জাগবার সৌভাগ্য হয়নি।"

ইন্দুমতী বললে, "সেদিন মাস্টারমশাইকে খুব বকেছিলাম। মাস্টারমশাই স্বীকার করলেন, দুই বন্ধু মিলে সারারাত ধানের পোকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিস্পা আর্মিজেরা, প্যাডি বাগ, চুঙ্গী পোকা, ভেঁপু পোকা আরও কত কী! ধানের শিষ কাটা লেদা পোকা অর্থাৎ

সার্ফিস ইউনিপাংটাটা নিয়ে তর্ক করতে করতে দু'জনের মধ্যে কথা বন্ধ না হলে হয়তো আবও. চলত। আমরা তো রেগে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিচিকানাকে প্যাডিকানা বলে ডাকতাম।"

"ধানকানা বলেননি এই যথেষ্ট," বলে অমিতাভ হাসতে লাগল।

ইন্দুমতী বললে, "সকালে আর একবার খোঁজ নিয়েছিলাম, তখনও আপনি দরজা খোলেননি। মাস্টারমশাইয়ের কড়া হুকুম, কেউ যেন আপনার ঘুমের ব্যাঘাত না করে। এখানকার লোকদের বদনাম আছে, মোরগ ডাকার আগেই তারা উঠে পড়ে।"

"তাই নাকি? তা হলে তো বিপদের কথা! আমি একটি লেট লতিফ!" ইন্দুমতীর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অমিতাভ বলে।

ইন্দুমতী হেসে বললে, "আপনার সঙ্গ-দোষে মাস্টারমশায়ের যদি কিছু অধঃপতন হয়, তা হলে আমরা অনেকেই খুশি হই। উনি ভোর চারটের সময় উঠে পড়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকেন। ল্যাবরেটবি-ইনসেক্টদের স্টাডি করবার ওইটাই নাকি প্রশস্ত সময়!"

অমিতাভর যে চা খেতে ইচ্ছে করছিল, তা ইন্দুমতী তার মুখের ভাব দেখেই বুঝে নিল। ইন্দুমতী জানালে, "হরিমোহনকে বলে এসেছি, আপনাব এবং আমার চা সে এখানে নিয়ে আসছে।"

হরিমোহন চা এনে হাজির করল। ইন্দুমতী নিজেই চা তৈরি করতে শুরু করলে। চা ঢালতে ঢালতে বললে, "একটা জিনিস বলা হয়নি আপনাকে, মশারি টাঙাতে ভুলবেন না। পোকামাকড়ের আড়তে বসে আছেন। মাস্টারমশায়ের ল্যাবরেটরিতেও কয়েকহাজার মশা বংশবৃদ্ধি করছে। দু-চারটে যে সেখান থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকবে না, এ-কথা গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।"

ইন্দুমতী নামটা অমিতাভর একটু সেকেলে সেকেলে ঠেকেছিল। পরিচয়টাও জানবার আগ্রহ হচ্ছিল না এমন নয়। কিন্তু ইন্দুমতী নিজেই এবার যা প্রকাশ করলে তার জন্যে অমিতাভ প্রস্তুত ছিল না।

ইন্দুমতী বললেন, "আমার পুরো নামটা আপনাকে বলে রাখা ভাল—ইন্দুমতী দেশাই, আমার দেশ গুজরাট।"

বিস্মিত অমিতাভ বললে, "আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন্। এমন সুন্দর বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

হেসে উঠল ইন্দুমতী। "আমার বাংলার একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল। বাবা বলেন, আমার বাংলায় যথেষ্ট দোষ আছে। ছোটবেলায় তিনি শান্তিনিকেতনে পড়েছিলেন ; ওঁর কথা শুনলে বোঝা মুশকিল যে তিনি বাঙালি নন।"

অমিতাভ বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। ইন্দুমতী বললেন, "আমার বাবা অম্বালাল দেশাই মাস্টারমশাইয়ের বিশেষ বন্ধু। ভক্তও বটে। সংসারের চাপে পারিবারিক ব্যবসা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন। ইটালিয়ান কোলাবরেশনে একটা ওষুধের কারখানা খুলেছেন আমেদাবাদে। কিন্তু রিসার্চে খুব ঝোঁক।"

অমিতাভ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দুমতীর কথা শুনতে লাগল। "আমেরিকায় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমার বাবার প্রথম আলাপ। তখন আমার পাঁচ বছর বয়েস। তারপর এই এতদিন ধরে দু'জনের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছে। এই যে বিদেশি সহযোগিতায় নতুন কারখানা হয়েছে, যোগাযোগটা মাস্টারমশাই করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর দুটো পেটেন্ট থাকায় কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল মহলে বেশ জানাশোনা।"

অমিতাভ অভিযোগ করল, "আপনি কিন্তু চা খাচ্ছেন না, মিস দেশাই।"

ইন্দুমতী বললে, "বাড়িতে আমরা চা খাই না। যা বলছিলাম, বাবা মাস্টারমশাইকে ডিরেক্টর বোর্ডে যোগ দিতে বলেছিলেন। মাস্টারমশাই রাজি হলেন না। বড় খেয়ালি লোক। যখনই দরকার হয়, বাবা অবশ্য চলে আসেন। উপদেশ নিয়ে যান।"

অবাক অমিতাভ শুনছিল। ইন্দুমতী বললে, "আমি যে বিজ্ঞান পড়ছি, তাও মাস্টারমশাইয়ের আগ্রহে। বোম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এস-সি পাশ করেছি। তারপর ডি. ফিল-এর জন্যে তৈরি হচ্ছি। ওখানে নামটা রেজিস্ট্রি করা আছে—আমার আসল রিসার্চ গাইড মাস্টারমশাই। যখন খুশি চলে আসি। কোনও প্রবলেম হলেই মাস্টারমশাইকে জ্বালাতন করি।"

"তার মানে আপনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নন?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"অস্থায়ী বাসিন্দা বলতে পারেন। বাবার মতে নিবেদিতা রিসার্চ

ল্যাবরেটরি তো শুধু একটা গবেষণাগার নয়—এটা একটা আশ্রমের মতো। একদিন এই ল্যাবরেটরিকে কেন্দ্র করেই হয়তো বিশ্বভারতীর মতো আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে, যেখানে ন্যাচারাল সায়েন্সের চর্চা হবে। দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর গবেষণার জন্যে নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন।"

"নিবেদিতা কে আপনি জানেন?"

"জানি না মানে? বাবা এবং মাস্টারমশাই এঁরা দুজনেই নিবেদিতার বিশেষ ভক্ত। মাস্টারমশাই তো বলেন, আমরা এই বিদেশিনীকে বুঝে উঠতে পারিনি ; তার দানের কণামাত্র পরিশোধের চেষ্টা করেনি ভারতবর্ষ। আমাদের বাড়িতে ওঁর লেখা সব বই আছে। আর ওঁর বাগবাজারের বাসায় এবং নিবেদিতা গার্লস স্কুলেও গিয়েছি আমি। মাস্টারমশাই বলেন, ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন নিবেদিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু প্রকাশিত হবে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার সাফল্যের পিছনেও নিবেদিতার দান কম নয়। এক সময় তাঁর প্রতিটি ইংরেজি লেখা নিবেদিতা দেখে দিয়েছেন ; বিলেতের বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর প্রাথমিক পরিচিতির ব্যবস্থা সিস্টার নিবেদিতাই করেছিলেন।"

ঘড়ির দিকে তাকালে ইন্দুমতী। "মাস্টারমশাই কয়েকটা কাজ দিয়েছেন, সেগুলো যাবার আগে করে দিয়ে যাব।"

"কবে যাচ্ছেন?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"এক সপ্তাহের মধ্যেই। আমার বড় কষ্ট হয় মাস্টারমশাইয়ের জন্যে। কত বাজে বাজে কাজ যে ওঁকে নিজে হাতে করতে হয়। যে ক'দিন থাকি ওঁকে সাহায্য করি।"

"নিজে হাতে করতে হয়?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

অমিতাভর কাপে আর একটু চা ঢেলে দিয়ে ইন্দুমতী বললে, "কী করবেন বলুন? লোকজন নেই। বেশি লোকজন রাখতে হলে অনেক টাকা দরকার। সে-টাকা মাস্টারমশাই পাবেন কোথায়? কয়েকজন ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট না রাখলেই নয়—তাদের মাইনে আছে। টাকা বাঁচাবার জন্যে চিঠিপত্তর টাইপ করার কাজ উনি নিজেই করেন। আমি এলে যতটা পারি সাহায্য করি। ওঁর রিসার্চের পেপারগুলো টাইপ

করতে আমার খুব ভাল লাগে। টাইপও হয়, আমার পড়াও হয়ে যায়। জিপ আছে, কিন্তু আলাদা ড্রাইভার নেই। আবার একটা এক্স-রে মেশিন আসছে। সেটা কে চালাবে জানি না।"

ইন্দুমতী মেয়েটি বেশ সরল ; কিন্তু অনেক খবর রাখে সে। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির ভিতরের সব খবর তার মুখস্থ। অসুবিধা অনেক আছে, কিন্তু এই ল্যাবরেটরির খ্যাতি একদিন যে দেশের সীমানা পেরিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, সে-সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ নেই।

"যেখানে ইনসেক্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে, সেখানে এক্স-রে মেশিন কী হবে?" অমিতাভ জানতে চায়।

"নিশ্চয় দরকার আছে। মাস্টারমশাই আপনাকে নিশ্চয়ই সব বলবেন সময়মতো। আপনার ওপর অনেক ভরসা করে বসে আছেন।"

"আমার ওপর?"

"বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠাবার পর মাস্টারমশাইয়ের কী উত্তেজনা! আমাকে পর্যন্ত রোজ জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কী মনে হয় ইন্দুমতী? অমিতাভ কি এখানে আসবে?"

"আমাকে কতটুকু দেখেছেন মাস্টারমশাই?" লজ্জা পেয়ে অমিতাভ প্রতিবাদ করে।

"তা জানি না, যাঁরা দেখতে জানেন, অল্প দেখাতেই কাজ হয়ে যায় তাঁদের।" ইন্দুমতী হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

আবার গম্ভীর হয়ে যায় ইন্দুমতী। "যখন দেখি মাস্টারমশাই বেলা দুটোর সময় নিজের খাবার কথা ভুলে পোকামাকড়দের খাওয়াচ্ছেন, যখন দেখি গভীর রাতে আরশোলাদের খাঁচাগুলোর টেমপারেচার কন্ট্রোল করছেন, কিংবা উইপোকাদের ঢিবিটা ঢাকা দেবার জন্যে বৃষ্টির মধ্যে ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন বেশ দুঃখ হয়।"

"ডঃ সেন কি উইপোকাও পুষছেন?"

"শুধু উইপোকা? চলুন আজই দেখাব আপনাকে। এ এক আজব চিড়িয়াখানা। এখানে কত রকমের জীবন্ত কীটপতঙ্গ আছে দেখলে সাধারণ লোক ভয় পেয়ে যাবে।"

ইন্দুমতীকে একটু অপেক্ষা করতে বলে অমিতাভ ভিতর থেকে জামা পালটে এল। ইন্দুমতী বললে, "চটি নয়, বুট পরে নিন। বেমানান হলেও আমি বুট পরেছি। না হলে মাস্টারমশাই বকবেন।"

ল্যাবরেটরিটা বিরাট মনে হচ্ছে। দুনিয়ার অজস্র কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে সত্যিই এক আজব চিড়িয়াখানা তৈরি করেছেন জীমূতবাহন সেন।

সূর্য ওঠার আগেই ডক্টর সেন নিশ্চয় কাজে লেগে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কাচের জারের সামনে এসে ইন্দুমতী দাঁড়িয়ে পড়ল। জারের মধ্যে গোটাকয়েক পোকা রয়েছে। তাদের দেখতে দেখতে ইন্দুমতী বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, একটু অপেক্ষা করবেন?"

অমিতাভ বললে, "নিশ্চয়। ভিজিটরের জন্যে কাজ আটকে থাকতে পারে না।"

ইন্দুমতী বললে, "এদের দায়িত্ব আমার ওপর আছে—একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। এক ধরনের গুবরে পোকা, এখানে নতুন এসেছে। নাগপুরে এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

অমিতাভ সরে গিয়ে পোকাগুলির দিকে ভাল করে তাকাল। ইন্দুমতী বললেন, "লেবুগাছের উইভিল পেস্ট।"

"সাইট্রাস প্ল্যান্টে এ-দেশে তেমন উইভিল হয় না শুনেছিলাম?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

ইন্দুমতী বললে, "বেশি হতে কতক্ষণ, মাস্টারমশাই বলছিলেন।"

ভাল করে লক্ষ্য করে অমিতাভ বললে, "এরা কি মিলোসেরাস?"

খাতার দিকে নজর দিয়ে ইন্দুমতী বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, "ধরলেন কী করে? ভারতবর্ষে খুবই দুষ্প্রাপ্য স্পেসিমেন।"

অমিতাভ বললে, "এনটমোলজি জার্নালে এদের সম্বন্ধে লেখা পড়েছি। কী খাওয়াচ্ছেন এদের?"

"মাস্টারমশাই আঙুরপাতা ছাড়া আর কিছু দিচ্ছেন না। কী পেটুক দেখুন না, একটা পোকা একখানা গোটা পাতা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেলেছে।"

"ল্যাবরেটরিতেই যখন এত খিদে রয়েছে, গাছে এরা কী ভয়াবহ

ক্ষতি করতে পারে বুঝুন।" অমিতাভ বললে।

"আপেল গাছে, আঙুরলতায়, লেবু গাছে বিষাক্ত কীটনাশক বেশি ছড়ানোর পক্ষপাতী নন মাস্টারমশাই। অজ্ঞাতে এই সব ফল দিনের পর দিন খেয়ে মানুষ হয়তো তার সমূহ ক্ষতি করছে।" ইন্দুমতী বললে।

"উনি কি মিলোসেরাসের প্রাকৃতিক শত্রুর সন্ধান করছেন?"

"রীতিমতো। ওঁর ধারণা এখন থেকে প্যারাসাইট খুঁজে রাখা ভাল। হঠাৎ হয়তো উইভিলদের এমন বংশবৃদ্ধি শুরু হবে যে, সাইট্রাস গাছগুলোকে বাঁচানো কঠিন হবে।"

ইন্দুমতী এবার অমিতাভর অনুমতি নিয়ে তার ল্যাবরেটরি রিপোর্ট লিখতে শুরু করল। আর অমিতাভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল মাস্টারমশাইয়ের প্যারাসাইট সন্ধানের কথা।

প্যারাসাইট—পরজীবী! প্রকৃতির রাজ্যে এই পরাশ্রিত কীট-পতঙ্গরা না থাকলে মানুষের কী সর্বনাশই হত! আত্মীয়-নিধনকারী এই বিভীষণদের জন্যেই আজও পৃথিবীতে পতঙ্গের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কত পতঙ্গ তো অন্য পতঙ্গ, তাদের শূককীট এবং ডিম খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই পরজীবীরা, যারা বিনা অনুমতিতেই অন্য জীবের দেহে বাসা বাঁধে। গর্ভিণী পতঙ্গ পোষকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তারপর প্রথম সুযোগেই তার দেহে প্রসবকার্য সম্পন্ন করে পালিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত কীটের দল পোষকের রক্ত-মাংসে বড় হয়ে ওঠে এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়।

পরজীবীদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে কত অনুসন্ধান চলেছে—ডঃ সেনের কত প্রবন্ধই তো অমিতাভ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে। এমন পরজীবী পতঙ্গ আছে যা কেবল একটি পোষক ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে না। আবার এমন পতঙ্গ আছে যে পোষক সম্বন্ধে তত খুঁতখুঁতে নয়—দশ বারো রকম পোষকের যে কোনও একটি হলেই হল। এই পলিফেগাস প্যারাসাইটদের সম্বন্ধে ডঃ সেনের একটি প্রবন্ধ কিছুদিন আগে বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

টেকিনিড মাছি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ছিল সেখানে। মথ এবং প্রজাপতির শূককীটের ওপর এরা ডিম পেড়ে দেয়—ডিমগুলো আঠার

মতো গায়ে লেগে থাকে। তারপর ডিম ফুটে টেকিনিড মাছির শূককীট পোষকের মাংস খেতে শুরু করে।

এই মাছিরই জ্ঞাতিভাই লাইডেলা স্টেবুলাঁ, ইউরোপীয়ান কর্ণবোরার নামে এক সর্বনাশা পোকার যম। গর্ভবতী এই মাছি হাজারখানেক শূককীট কর্ণবোরারের গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসে। ক্ষুধার্ত ম্যাগটগুলো এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কর্ণবোরারের দেহে আশ্রয় নেয়। মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসতে তখন বিলম্ব হয় না—বড় জোর পনেরো-ষোলো দিন। পোষকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগটও সাবালক হয়ে ওঠে এবং লাইডেলা স্টেবুলাঁয় রূপান্তরিত হয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করে।

পোকার পিছনে এরকম প্যারাসাইট লেলিয়ে দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা চলেছে দেশে দেশে। বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের এই সাধনায় জীমূতবাহন আত্মনিয়োগ করেছেন।

ইন্দুমতীর কাজ শেষ হয়েছে। অমিতাভকে সে বললে, "অবাক হয়ে দেখছেন কী? এখন থেকে প্রতিদিন এই সব কীটপতঙ্গের সঙ্গে পরিচয় হবে আপনার।"

অমিতাভ প্রতিবাদ করবে ভেবেছিল। ইন্দুমতীর জানা উচিত, ডারহামের ডি-ফিল অমিতাভ মিত্র কেবল জীমূতবাহন সেনের নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছে। এখানে সে যোগ দেবে কিনা সে-সম্বন্ধে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। অথচ কেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ইন্দুমতী বললে, অমিতাভর সঙ্গে জীমূতবাহনের আশ্রিত ও লালিতপালিত পতঙ্গদের প্রতিদিনের পরিচয় হবে। তবু অমিতাভ কিছুই বলতে পারলে না। ইন্দুমতীর কথাই সাময়িকভাবে বিনা প্রতিবাদে তাকে স্বীকার করে নিতে হল।

অগত্যা পতঙ্গ প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত হল। অমিতাভ বললে, "আমি অন্য কথা ভাবছি। কত ধরনের পোকা এখন নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বসবাস করছে?"

খোঁপার ভারে বিব্রত ইন্দুমতী ফুলের মালা থেকে একটা বোলতা তাড়াতে তাড়াতে বললে, "তা কয়েক হাজার রকম তো বটেই। কখন কোন্‌টা দরকার হবে তার ঠিক নেই। মাস্টারমশাইয়ের মিউজিয়ামে

যাদের মৃতদেহ সংগ্রহ করা আছে তার সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ হাজার।”

“আর এদের তত্ত্বাবধান উনি একা করে চলেছেন? আশ্চর্যই বটে!” অমিতাভ তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারলে না।

মাস্টারমশাই কোথায়?

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট গঙ্গাধর লোলেকার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—তিনি কাজ শেষ করে পুকুরধারে গিয়েছেন।

ওরা দু'জনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। দেড়শো বিঘে জমি যে কতটা তা রাত্রে বোঝা যায়নি। একটু লম্বাটে হওয়ায় জমির যেন শেষ নেই। আর কত রকমের চাষই যে সেখানে হয়েছে।

কিন্তু এক ধরনের চারা কোথাও বেশি নেই। ইন্দুমতী বললে, “ছোট ছোট প্লটে চাষ করায় বিশ্বাস করেন মাস্টারমশাই—এরা তো খুব বড় হতে পারবে না। এখানে পতঙ্গদের ছেড়ে দেওয়া হবে। নিবেদিতা ল্যাবরেটরির গিনিপিগ তো এরাই। প্রত্যেকটা প্লটের নম্বর আছে, নম্বর অনুযায়ী খাতায় সব বিবরণ লেখা থাকে।”

দূরে একটা পুকুর রয়েছে। অবশেষে সেইখানেই জীমূতবাহনকে আবিষ্কার করা গেল। পুকুরধারে একটা ইটের ওপর থুতনিতে হাত দিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছেন। কাছাকাছি গিয়ে অমিতাভ ফিরে যেতে চাইল। বলা যায় না, হয়তো কোনও গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন জীমূতবাহন। শুধু শুধু তাঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না।

ইন্দুমতী বললে, “না না, উনি মোটেই বিরক্ত বোধ করবেন না। বরং আপনাকে দেখলে খুশিই হবেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও দরকার রয়েছে ওঁর সঙ্গে।”

মাস্টারমশাই এবার তাজ্জব কাণ্ড করে বসলেন। জামাকাপড় পরা অবস্থায় জলে নেমে পড়লেন। হঠাৎ কী হল? কিছু পড়ে গেল নাকি? জলের মধ্যে মাস্টারমশাই কী যেন খুঁজছেন? আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা লতার পাতা পটাপট ছিঁড়ে নিলেন। সাঁতার কেটে এবার পাড়ে উঠে এলেন জীমূতবাহন। ভিজে ছপছপ করছে সমস্ত জামাকাপড়।

ইন্দুমতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "তোয়ালে আনেননি?"

জীমূতবাহন লজ্জায় পড়ে গেলেন। "না, আনা হয়নি। তবে জলের দেশের ছেলে আমি—ভেজা অভ্যাস আছে।"

ইন্দুমতী বললে, "না স্যার, এটা আপনার খুব অন্যায়। আমি এখনই তোয়ালে নিয়ে আসছি।" সময় নষ্ট না করে সে এবার দ্রুত তোয়ালে আনতে ছুটল।

অমিতাভ অবাক হয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইল। জীমূতবাহন ততক্ষণে পরম যত্নে কয়েকটা কাচের জারের মধ্যে পাতাগুলো আলাদা আলাদা পুরতে লাগলেন।

"পানিফলের পাতা নয়?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি। জলের পোকামাকড়ও আমাদের কম ক্ষতি করে না। পানিফল অনেক চাষীর লাভের ব্যবসা। কিন্তু সেখানেও পোকারা ডাঁটাগুলো ছিড়ে ফেলছে। পুসা ইনস্টিটিউটে জলের কয়েকটা পোকা ওরা আবিষ্কার করেছে। অনেক কষ্টে কয়েকটা নমুনা আনিয়েছি। কয়েকদিন আগে ওদের এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই খবর নিতে এসেছিলাম।"

অমিতাভ বললে, "জামাটা ছেড়ে ফেললে পারতেন।"

জীমূতবাহন বললেন, "দেখবে? এই উইভিলগুলোর নাম বেগাস ট্রেপি।"

অমিতাভ বললে, "আপনি অন্তত জলটা নিংড়ে ফেলে দিন।"

জীমূতবাহন বললেন, "পোকাগুলোর কোনও প্যারাসাইট আছে। যদি খোঁজখবর নিয়ে তাদের আবিষ্কার করা যায় এবং এই পোকাগুলোর পিছনে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে পানিফলগুলো বেঁচে যাবে।"

"জলের ধারের পোকা। সুতরাং প্যারাসাইট খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে।" অমিতাভ তার মতামত দিল।

জীমূতবাহন বললেন, "তা হলে পানিফলের দাম কমে যাবে। লোকে খেয়ে বাঁচবে। ছোটবেলায় পানিফলের গুঁড়ো দিয়ে মা একরকম জিলিপি করে দিতেন, এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে।"

ইন্দুমতীকে দূর থেকে তোয়ালে নিয়ে আসতে দেখা গেল। জীমূতবাহন বললেন, "ওহো, ইন্দু কবে যাবে জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

ইন্দুর হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে গা মুছতে মুছতে জীমূতবাহন বললেন, "তুমি যে এখানকার লোক নও, এটা কিছুতেই মনে থাকে না। তুমি কবে যাচ্ছ, ইন্দু?"

ইন্দু বললে, "আপনাকে তো বলেছিলাম। সাতদিন আরও আছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার টিকিট কাটার কী ব্যবস্থা হল?"

"আমি তো মাস্টারমশাই আগেই রিজার্ভেশান করে রেখেছি।"

"বেশ ভাল, ইন্দু। আবার কবে আসবে?"

"থিসিসটা জমা দিয়ে এবার আসব। হাতে লম্বা সময় থাকবে, আপনার সঙ্গে নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা চালানো যাবে।"

"নিশ্চয়। তবে আমরা তো সেকেলে হতে চলেছি।" অমিতাভকে দেখিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "এরা নতুন যুগের বৈজ্ঞানিক। আনকোরা বিদেশে থেকে নতুন জ্ঞান নিয়ে এসেছে।"

প্রতিবাদ না করে পারল না অমিতাভ। "বিদেশে কি এর থেকে বেশি কিছু শেখা যায়?"

ইন্দুমতী বললে, "আমি ডক্টর মিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।"

ঘুরে ঘুরে দেখতে কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুর নেমেছে তা তিনজনের কারও খেয়াল হয়নি। ল্যাবরেটরির পোকাদের সঙ্গে অমিতাভর পরিচয়পর্ব শেষ করিয়ে জীমূতবাহন এবার খেতের দিকে যাবার প্রস্তাব করলেন।

একটা চুরুট ধরিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "কী বলো ইন্দু, টমাটো বাগানের দিকে যাওয়া যাক একবার। অমিতাভর নিশ্চয় খুব ভাল লাগবে। টমাটোর ওই বিশ্রী পোকাগুলো—হেলিওথিস অবসোলিটা—কেমন জব্দ হয়ে গিয়েছে।"

অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "ইন্দু অবশ্য এর পিছনে খুব খেটেছে। তুমি হয়তো বলবে, হেলিওথিস অবসোলিটা আর ক'টা টমাটোর ক্ষতি করবে? কিন্তু যে কথা ইন্দুকে আমি বার বার বলি, ছোলার কথাটা ভুলে যেয়ো না। আমাদের দেশের কত লোক ছোলা খেয়ে বাঁচে। কলেজে পড়বার সময় আমরা মোহনবাগানের খেলা

দেখতে যেতাম, পথে ছোলাভাজা কেনা হত। অর্ধেক ছোলায় পোকা। ভুনাওয়ালাকে বকাবকি করতাম—কিন্তু এখন বুঝি সে বেচারা কী করবে? পোকা জব্দ করা তো তার কাজ নয়।"

টমাটো গাছ দেখিয়ে, জীমূতবাহন বললেন, "বিলিতি বেগুন যখন দেখলে তখন দেশি বেগুন কী দোষ কবলে। বেগুনের স্টেমবোরার—ইউসোফেরা পার্টিসেলাও রয়েছে পাশেই। প্রফেসর মিচিকানাকে কয়েকটা উপহার দিতে চেয়েছিলাম—কিন্তু যা লোক, ধান নিয়েই পাগল হয়ে আছেন। অন্য কোনওদিকে নজর নেই।"

বেগুন-বাগানে একবার হাজির হলে কত সময় লাগত ঠিক নেই। কিন্তু অমিতাভর কথা চিন্তা করেই ইন্দুমতী বাধা দিলে। বললে, "মাস্টারমশাই, পৌনে দুটো বাজে।"

জীমূতবাহন বললেন, "তাই তো খেয়াল হয়নি! তোমাদের বোধহয় আমার সঙ্গে খেতে বলেছি, তাই না?"

হেসে ফেললে ইন্দুমতী। "বোধ হয় কী মাস্টারমশাই? বার বার করে বললেন, ইন্দু দুপুরে আজ আমার ওখানে খাবে।"

মাস্টারমশাই একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। "অমিতাভ আমার সঙ্গে খাবে, সে হরিমোহন জানে। তোমারটা বলেছি কিনা মনে করতে পারছি না। চলো সঙ্গে, যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

মাস্টারমশাইয়ের অসহায় অবস্থা দেখে ইন্দুমতী ব্যাপারটা এবার প্রকাশ করে ফেললে। "আপনি মাস্টারমশাই হরিমোহনকে বলেননি। সকালে আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে এলাম।"

"তাই তো করবে মা। হরিমোহনটা কোনও কাজের নয়। কী আবার রেঁধেছে কে জানে, অমিতাভর কষ্ট হবে।" মাস্টারমশাই বিড়বিড় করতে লাগলেন। "ওকে রোজ বলি, আমার সঙ্গে সকালবেলায় রান্নার বিষয়টা আলোচনা করে নিবি।"

ইন্দুমতী বললে, "আপনি ভাববেন না, আজকের মেনু আমি নিজেই ঠিক করে দিয়ে এসেছি।"

জীমূতবাহন বললেন, "আই অ্যাম ভেরি স্যারি, অমিতাভ। তোমাকে স্নান করতে যাবার সময় পর্যন্ত দিইনি। আমি ভোরে স্নান করি, ইন্দুও তো দেখছি ভোরবেলায় কাজ গুছিয়ে ফেলেছে।"

অমিতাভ বললে, "আপনারা বাড়িতে গিয়ে বসুন। আমি দশ মিনিটে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।"

ইন্দুমতীকে নিয়ে জীমূতবাহন নিজের বাংলোয় এলেন। ইন্দুমতীর দুঃখ হল মাস্টারমশাইকে দেখবার কেউ নেই। সকালে নিজে রান্নাঘরে এসে দেখে বেগুন এবং আলু ছাড়া আর কিছুই নেই হরিমোহনের ভাঁড়ারে।

ইন্দুমতী বললে, "অমিতাভবাবু যতদিন থাকবেন, একটু মাছ বা মাংসের ব্যবস্থা করা দরকার। আজকে আমি হরিমোহনকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছি।"

জীমূতবাহন বললেন, "তুমি তো নিরামিষাশী।"

"আমি নিরামিষাশী বলে অমিতাভবাবু বা আপনার তো চলবে না।" ইন্দুমতী জানায়।

জীমূতবাহন অসহায়ভাবে বললেন, "শাকসবজি খেতে আমার খুব ভাল লাগে, অমিতকেও বলে দেব'খন আমি, তুমি ভেব না।"

জীমূতবাহনের জন্যে ইন্দুমতীর মনটা করুণার্দ্র হয়ে উঠল। ভদ্রলোক নিজের সাধনায় মগ্ন থাকবেন, না মাছমাংসের খবর নেবেন?

ইন্দুমতী বললে, "মাস্টারমশাই, খাবার ব্যাপারে অমিতাভবাবুকে আপনি এখন কিছু বলবেন না। খাবার নষ্ট হলে মানুষের কাজে মন বসে না।"

জীমূতবাহন বললেন, "বেশ, তুমি যখন বলছ, ও সম্বন্ধে কোনও কথাই তুলব না। সত্যিই তো, খাওয়ার কষ্টের জন্যে অমিতাভ যদি আমার ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে যায়, তা হলে দুঃখের শেষ থাকবে না।"

জীমূতবাহন এবার কী যেন ভাবতে শুরু করলেন। পাশেই যে ইন্দুমতী বসে রয়েছে খেয়াল নেই। ইন্দুমতী একটু পরে ডাকল, "মাস্টারমশাই।"

জীমূতবাহন নড়েচড়ে বসলেন। "অ্যাঁ। কিছু বলছ আমায়?"

"নাথিং পার্টিকুলার। তেমন কিছু নয়। কে বড়? ব্রহ্মা না বিষ্ণু?"

"মানে?" ইন্দুমতী জিজ্ঞেস করলে।

মোটা চশমাটা খুলে জামার খুঁট দিয়ে মাস্টারমশাই চোখের কোণ

দুটো মুছে নিলেন। বললেন, 'তৈরি করাটা শক্ত হতে পারে, কিন্তু তার থেকে হাজারগুণ শক্ত তাকে রক্ষা করা। এই তো কত সহজে নিবেদিতা ল্যাবরেটরি সৃষ্টি হল। কিন্তু এর স্থিতি হবে কি?"

"কেন হবে না মাস্টারমশাই? নিশ্চয় হবে। আপনার এত পরিশ্রম কি ব্যর্থ হতে পারে?" ইন্দুমতী আশ্বাস দেয়।

"তোমার বাবাও সেই কথা বলেন আমাকে। কিন্তু পৃথিবীতে কত লোক আমার থেকে বেশি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু স্থিতি হয়নি।"

মাস্টারমশাই জামার খুঁট দিয়ে আবার চোখ মুছতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর বকুনি খেলেন। "আপনার রুমাল নেই, মাস্টারমশাই?"

"আছে বই কী, নিশ্চয়ই আছে—চারটে পাঁচটা আছে। কিন্তু আমি তো নস্যি নিই না, তাই রুমাল ছাড়াই চলে যায়।"

"নস্যি আমিও নিই না মাস্টারমশাই, কিন্তু রুমালের দরকার হয়। আপনাকে অনেকদিন বলেছি, ওইভাবে চোখ মুছবেন না, সব সময় পোকামাকড় ঘাঁটছেন, কোনসময় ইনফেকশন হয়ে যাবে।"

মাস্টারমশাই বিনা প্রতিবাদে ইন্দুর কথা মেনে নিলে। "জানো ইন্দু, একদিন আমাদের ল্যাবরেটরিতে ভাইরাস সম্বন্ধেও কাজ হবে। বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল ভাইরাস অসাধ্যসাধন করতে পারে। কানাডাতে অমিতাভ এই কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। ভাইরাস এলে আমাকে অবশ্যই রুমাল রাখতে হবে!"

ইন্দুমতী আর কিছুই বললে না। মনে মনে ভাবলে, এই লোকের মাথায় বিজ্ঞানের এত জটিল সমস্যার সমাধান হয় কী করে?

জীমূতবাহন বললেন, "ছেলেটির প্রতিভা আছে। ওর কথাবার্তা দেখে বুঝলাম, বিদেশে সময়টা নষ্ট করেনি, জানে অনেক কিছু। বোধহয় মনটাও সবুজ। কাজ করতে চায়। অমিতাভ যদি থেকে যায়, আমি আরও বাড়িয়ে ফেলব রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে।"

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবার—অমিতাভ আসছে। জীমূতবাহন বললেন, "অমিতাভ, আজকে তোমার খাওয়ার অসুবিধে হবে। তবে আমি নিজে একদিন রেঁধে তোমাদের খাওয়াব।"

"আপনি রাঁধতে পারেন?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করলে।

"পারি মানে? স্যর পি সি রায়কে প্রায়ই রেঁধে খাওয়াতাম। উনি

আমার খিচুড়ির খুব প্রশংসা করতেন। প্রায়ই বলতেন, জীমূতের কোনও ভাবনা নেই। লেখাপড়ায় ভাল না করলে রান্না লাইনে উন্নতি করবে!"

খেতে খেতে জীমূতবাহন বললেন, "ভাগ্যে ইনসেক্ট ওয়ার্লডে রান্নার হাঙ্গামা নেই—তা হলে এতগুলো পোকামাকড়ের রান্নার ব্যবস্থা করতে করতেই পাগল হয়ে যেতাম।"

ইন্দুমতী বললে, "আমাদের মিউজিয়ামটা কেমন দেখলেন?"

অমিতাভ উত্তর দিলে, "ইন্টারেস্টিং। তবে সাজানোটা আরও বৈজ্ঞানিকভাবে করা যায়—এবং একটা কার্ড ইনডেক্স করতে পারি যদি, ভাল হয়।"

জীমূতবাহন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "ঠিক বলেছ, একটা ইনডেক্স দরকার। তুমি করো, আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হব।"

ইন্দুমতী বললে, "ফিরে এসে আমিও আপনাদের দলে যোগ দেব।"

জীমূতবাহন ইন্দুর হয়ে ওকালতি করলেন, "ওকে তুমি নিতে পারো অমিত, ওর হাতের লেখাটা মুক্তোর মতো।"

এবার তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। অমিতাভ অবাক হয়ে গেল, গতকালও এমন সময় যারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল, তারা এর মধ্যে এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে। জীমূতবাহনের হাবভাব এবং সরল কথাবার্তা দেখে কে বলবে, ইনিই সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে বি সেন, যিনি বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিরাট চাকরি হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন।

খেতে খেতে জীমূতবাহন বললেন, "আর একটা দিকের কথাও অমিত ভেবে দেখো। ইনসেক্টরা আমাদের খাদ্যও হতে পারে—সে ক্ষেত্রে এই দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষের খাবারে প্রোটিনের অভাব থাকবে না।"

অমিতাভ বললে, "ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়—কারণ অতি সহজেই আমরা অসংখ্য ইনসেক্ট সৃষ্টি করতে পারি।"

জীমূতবাহন হাসতে হাসতে বললেন, "এ-ব্যাপারে আমরা অবশ্য ইন্দুমতীর কোনও সাহায্য পাব না। ও মাছ মাংস ছোঁয় না।"

"ছুঁই, খাই না।" ইন্দুমতী প্রতিবাদ করলে।

"আমার মা-ও তাই করতেন। বিধবা মানুষ, আমার জন্যে মাছ

রাঁধতেন, কিন্তু খেতেন না", জীমূতবাহন বললেন। তিনি যে আজ বেজায় খুশি তা তাঁর মুখের ভাব থেকেই ইন্দুমতী বুঝতে পারছে।

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়ে কেটে গেল অমিতাভ নিজেই বুঝতে পারেনি। খেয়াল হল, জীমূতবাহন যখন ইন্দুমতীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তা হলে তুমি যাচ্ছ?"

মাইক্রোস্কোপ থেকে মুখ তুলে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ইন্দুমতী বললে, "হ্যাঁ মাস্টারমশাই।"

অমিতাভর মনে পড়ল, অন্তত সাত-আটদিনের জন্যে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন জীমূতবাহন।

এই ক'দিন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সে প্রায়ই মনে মনে নিজের সঙ্গে তর্ক করেছে। বাক্‌যুদ্ধ অনেক হয়েছে, এবার ভোটে তুলে সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন ইন্দুমতীকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসা। এই দায়িত্বটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই।

ইন্দুমতী নিজেই স্টিয়ারিং ধরতে চেয়েছিল। "আমাকে দিন। এই গাড়িটা চালাতে আমি বেশ অভ্যস্ত।"

অমিতাভ বললে, "আমারও তো অভ্যস্ত হয়ে ওঠা প্রয়োজন। আপনি না হয় ড্রাইভ করে স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ট্রেনে উঠে বসলেন। ফেরার পথে আমার এবং গাড়িটার কী হবে?"

ইন্দুমতী বললে, "আত্মরক্ষার উৎকণ্ঠায় তখন ঠিক চলে আসতে পারবেন!"

গাড়িতে যেতে যেতেই ইন্দু বলেছিল, "আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু ঠিক করলেন নাকি?"

"না, এখনও শুধু দেখে যাচ্ছি, ঠিক করা হয়ে ওঠেনি কিছু।"

ইন্দু বললে, "শেষ পর্যন্ত যদি আপনি থেকে যান, নিবেদিতা ল্যাবরেটরির পক্ষে ভাল হবে। মাস্টারমশাই অনেক কিছু করতে চান। অনেক কিছু করবার মতো শক্তিও ওঁর আছে।"

"বিজ্ঞানের নতুন দিক নিয়ে তিনি যে সাধনা করছেন, সে সম্বন্ধে

কোনও সন্দেহ নেই।"

"আপনি বলছেন?"

"জোর করেই বলছি—কারণ শুধু ইনসেকটিসাইড দিয়ে পোকামাকড়দের চিরদিন দাবিয়ে রাখা না-ও চলতে পারে। তা ছাড়া আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে পোকা দিয়ে পোকা ধ্বংস করতে পারলে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। কেমিক্যাল কীটনাশক আপনাকে বার বার স্প্রে করতে হবে এবং প্রতি বছর তা চালিয়ে যেতে হবে। প্যারাসাইটরা একবার ছাড়া পেলে তারাও প্রকৃতির অংশ হয়ে যাবে এবং বহু বছর ধরে, হয়তো চিরদিনের জন্য, ফসলখেকো কীট-পতঙ্গদের পিছনে তারা রাহুর মতো লেগে থাকবে।"

ট্রেনে উঠে পড়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দুমতী। তারপর একটু ইতস্তত করে বললে, "আপনি ক'দিনের জন্যে এসেছেন। বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি।"

"সঙ্কোচের কী আছে? বলুন।"

"মাস্টারমশাইকে একটু দেখবেন। ওঁকে বড় অসহায় মনে হয়। নিজের কাজে পাগল হয়ে থাকেন, পোকামাকড়ের জগতের অনেক খবর রাখেন, কিন্তু মানুষের জটিলতার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে উঠতে পারেন না।"

লোকটার ওপর অমিতাভর বেশ মায়া পড়ে যাচ্ছে। এই তো ক'দিন সে এখানে এসেছে। এরই মধ্যে সে যেন নিবেদিতা আশ্রমের একজন হয়ে উঠেছে।

অমিতাভ জানতে চাইলে, "ওঁর স্ত্রী এখানে থাকেন না কেন?"

ইন্দু বললে, "কী জানি!"

অমিতাভ বললে, "স্যরি, এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা হয়তো আমার ঠিক হচ্ছে না!"

"কেন জিজ্ঞেস করবেন না? বেশ করবেন, জিজ্ঞেস করবেন। আমার মন বলে, আমাদের সবার উচিত মাস্টারমশাইকে সাহায্য করা। ঈশ্বর ওঁকে অনেক বড় কাজ করবার জন্যে তৈরি করেছেন। একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর জন্যে গর্ববোধ করবে।"

অমিতাভ বললে, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা কেউ বলতে পারে

না মিস্ দেশাই—আজ যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, কাল দেখা যাবে সেইটাই সবচেয়ে সোজা কাজ!"

ইন্দুমতী বললে, "এখানে থাকলে টাকা আনা পাইয়ের মাপে আপনার কী হবে জানি না, কিন্তু এমন কাজের সুযোগ, এমনভাবে জানবার এবং শিখবার সুযোগ আর কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ।"